শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর মহোদয় কর্ত্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য
মনোনীত, কলিকাতা গেজেট—২৩ অক্টোবর, ১৯১৪।

শ্রীমদাচার্য্য

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

সাধনা ও উপদেশ।

শ্রীঅমৃতলাল সেন গুপ্ত প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

[গ্রন্থকার সম্পাদিত সমগ্র গ্রন্থাবলীরই বিক্রয়লব্ধ অর্থ গোস্বামী প্রভুর অভিপ্রেত ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে।]

দাস গুপ্ত এণ্ড কোং,
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক
৫৪।৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা,

১৩২২ সন।

উৎসর্গ-পত্র।

মা !

তোমাদের সাধন-কানন হইতে ফুল পাতা কুড়াইয়া যেমন তেমন করিয়া একটী স্তবক প্রস্তুত করিয়াছি। মা ভিন্ন অবোধ সন্তানের এই ব্যর্থ প্রয়াস আর কেইবা সুন্দর দেখিবে ? তাই তোমারই করপুটে ইহা অর্পণ করিয়া ধন্য হইলাম। অধম কাঙ্গালের এই আন্তরিক অর্চ্চনায় মালীর আনন্দ ও তোমার প্রীতি হইবে সন্দেহ নাই। আশা করি তোমার স্নেহদৃষ্টিপূত এই নির্ম্মাল্যে জীবের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। ইতি—

তোমার দীনহীন সন্তান

অমৃত।

ওঁ হরিঃ।

অবতরণিকা।

জটিনে দণ্ডিনে নিত্যং লম্বোদরশরীরিণে।
কমণ্ডলুনিষঙ্গায় তস্মৈ ব্রহ্মাত্মনে নমঃ॥ ভীষ্মস্তোত্র।
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবং॥

পরমানন্দ মাধবের অভাবনীয় কৃপায় বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আজ শ্রীমদাচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর সাধনা ও উপদেশাবলি-সম্বলিত এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা লইয়া ধর্ম্মার্থী সহৃদয় পাঠকবর্গের সমীপে উপস্থিত হইলাম। আমি অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ ও সাধনহীন, বস্তুতঃই এই মহাপুরুষের অদ্ভুত জীবন ও অশ্রুতপূর্ব্ব কার্য্যকলাপ বর্ণনে সম্পূর্ণই অযোগ্য। তাঁহার জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লিপিবদ্ধ করিলে সহস্রাধিকপত্রবিশিষ্ট বহু গ্রন্থেও যথাযথ বর্ণনা করা যায় না। এতদবস্থায় প্রশ্ন হইতে পারে যে আমি এই দুঃসাহসিক কার্য্যে ব্রতী হইলাম কেন? যে সকল মহৎব্যক্তি এই মহাপুরুষের স্বর্গীয় সঙ্গসুখ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহা মনে করিবেন যে, আমার এই গ্রন্থলিখন প্রয়াস বাতুলতা ও অবিমৃষ্যকারিতার পরিচায়ক। তবে এই মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা করিয়া আত্মশোধন করিব এবং আমার ন্যায় ত্রিতাপক্লিষ্ট ব্যক্তিগণ উপকৃত হইবেন, এই ভাবদ্বয় দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, গোস্বামী প্রভুর জীবনের প্রধান প্রধান কয়েকটী ঘটনা এবং বিশেষ বিশেষ কয়েকটী উপদেশ সংগ্রহ পূর্ব্বক এই ক্ষুদ্রগ্রন্থ

জনসাধারণ সমীপে প্রকাশ করিতে সমুৎসুক হইয়াছি। যথার্থ ধর্ম্ম কি, কি প্রকারে তাহা অনুষ্ঠান করিতে হয়, কি উপায় অবলম্বন করিলে অশেষ দুঃখসঙ্কুল মানবজীবনে চিরশান্তি লাভ করা যায়, এবং পঞ্চম-পুরুষার্থ ভগবৎপ্রেমভক্তি লাভ করিয়া জীবগণ চিরদিনের জন্য ভবক্লেশ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে, গোস্বামী প্রভুর জীবন ও উপদেশসমূহে উল্লিখিত গভীর প্রশ্নসমূহ সম্যক্ সুমীমাংসিত হইয়াছে। আমার দুর্ব্বল ভাষা ও সাধনহীনতার জন্য এই তত্ত্বসমুদয় পরিস্ফুট করিতে সমর্থ না হইলেও, এই পুস্তক পাঠে ধর্ম্মার্থীদিগের লক্ষ্য স্থির হইবে, এবং সাধনপথে উত্তরোত্তর অগ্রসর হইতে প্রবৃত্তি জন্মিবে ইহাই আমার বিশ্বাস।

গ্রন্থ লিখিবার প্রারম্ভে আমি ভাবি নাই যে বর্ত্তমান আকারে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে। গোস্বামী প্রভুর ভক্ত ও অনুরক্ত শিষ্যগণ সময়ে সময়ে যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা, এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ও পুনর্মুদ্রনাভাবে লুপ্তপ্রায় কয়েকটী প্রাণস্পর্শী উপদেশ সংগ্রহ করিয়া প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত জীবনীর সহিত প্রকাশিত করিব, ইহাই আমার পূর্ব্ব-সঙ্কল্প ছিল; কিন্তু লিখিতে লিখিতে অলৌকিক ঘটনাপুঞ্জ একটির পর একটী এমন ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল যে, আমার সাধ্য হইল না ইহার একটীকেও প্রত্যাখ্যান বা পরিত্যাগ করি। তখন ক্ষুদ্রাকারে প্রভুপাদের সাধনতত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিতে প্রলুব্ধ হইলাম। সাজ সজ্জা, শৃঙ্খলা পারিপাট্য প্রভৃতি বিষয়ের দিকে মনোযোগ করিতে আমার অবসর রহিল না। আমার ন্যায় অনেকেরই ধ্রুব বিশ্বাস যে পরবর্ত্তী কালে অনেক সুযোগ্য, সাধনশীল, তত্ত্বানুসন্ধিৎসু সমর্থ ব্যক্তি প্রভুপাদের জীবন ও তৎকর্ত্তৃক প্রচারিত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবেন; এবং তখন এই গ্রন্থসন্নিবিষ্ট সূত্ররূপী ঘটনাসমূহ ও উপদেশাবলী

তাঁহাদিগকে ঐ কার্য্যে কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রদান করিতে পারিবে। যে সত্যধর্ম্ম গোস্বামী প্রভু জীবনে অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, যে সুবিমল ভক্তিস্রোতঃ তাঁহার প্রকটাবস্থায় বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়াছিল, এবং যাহার সুশীতল আশ্রয়ে বহুসংখ্যক ধর্ম্মার্থী নরনারী আনন্দ ও শান্তি লাভ করিয়াছেন, সেই সনাতন ভগবদ্ধর্ম্ম যে বহুলপরিমাণে ভবিষ্যৎকালে দেশ দেশান্তরে আলোচিত ও প্রচারিত হইয়া জগতের অশেষ কল্যাণ বিধান করিবে, তাহাতে আর বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই।

ইতঃপূর্ব্বেই এই বিষয় অবলম্বন করিয়া দুই খানি উপাদেয় গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। উভয় গ্রন্থের লেখকই যোগ্য ব্যক্তি। একখানিতে গোস্বামী প্রভুর ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যকলাপ, কঠোর সাধনা, তীব্র বৈরাগ্য, এবং অপূর্ব্ব সানুরাগ ভজন অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। অপর খানিতে, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ কি প্রকারে গোস্বামী প্রভুর জীবনে অলৌকিকভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল তাহা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আমি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, প্রভুপাদের বাল্য-জীবনে নিষ্ঠাপরিপূর্ণ হিন্দুধর্ম্মানুষ্ঠান, যৌবনে ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, প্রৌঢ়ে যোগ পথাবলম্বন ও শেষজীবনে অশ্রুতপূর্ব্ব প্রেমভক্তি প্রকাশ—এই সকল আপাততঃ বিসদৃশ-প্রতীয়মান্ ঘটনাবলীর মধ্যেও সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে, এবং তাঁহার সমস্ত জীবন একটী অবিচ্ছিন্ন প্রবল ধর্ম্মস্রোতঃ মাত্র।

এই গ্রন্থখানি দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশের নাম সাধনা। ইহাতে গোস্বামী প্রভু কি প্রকারে ধর্ম্মের সোপান হইতে সোপানান্তরে ও তত্ত্ব হইতে তত্ত্বান্তরে পৌঁছিয়াছেন, এবং তাঁহার সমস্ত জীবনটী যে শাস্ত্র ও সদাচারের একখানি সুবিমল উজ্জ্বল আদর্শ তাহাই দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি। দ্বিতীয় খণ্ডের নাম উপদেশামৃত। ইহাতে গোস্বামী প্রভু

আচার্য্যরূপে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মার্থী ও শিষ্যমণ্ডলীকে যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই সকল উপদেশ সর্ব্বসম্প্রদায়ভুক্ত বিভিন্নস্তরের সাধকদিগের নিকট উপাদেয় ও বিশেষ সাহায্যপ্রদ হইবে। সাধনপথে অগ্রসর হইতে যে সকল বাধাবিঘ্ন পরিলক্ষিত হয় তৎসমুদয় অতিক্রম করিবার উপায় এই উপদেশ সমূহের স্থানে স্থানে অতি বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সচরাচর ধর্ম্মোপদেশ যেরূপভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা সাধারণের পক্ষে গ্রহণ করা দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু এই গ্রন্থসন্নিবিষ্ট উপদেশসমূহ তদ্রূপ নহে। আগ্রহের সহিত প্রতিপালন করিতে পারিলে ইহা ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণকে চিরশান্তি-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবে তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

মহাপুরুষদিগের জীবনী মাত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে অসাধারণ গুণগ্রাম-মণ্ডিত ও অলৌকিক ঘটনায় বিজড়িত দেখা যায়। গোস্বামী প্রভুর জীবনেও তাহার অপ্রতুল নাই। এই লৌকিক বিজ্ঞানপ্রধান যুগে যদিও অনেকে তাহাতে আদৌ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবেন না জানি, তথাপি সত্যের অনুরোধে, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রস্ফুটিত করিবার জন্য, নিতান্ত প্রয়োজন-বোধে কতিপয় ঘটনা সন্নিবিষ্ট না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আর মহাপুরুষদিগের জীবনের এই অংশটুকু বাদ দিলে সাধারণ মানুষ হইতে তাঁহাদের পার্থক্য থাকে কোথায়? এই অসাধারণত্বটুকুই তাঁহাদের জীবনের বিশেষত্ব। তারপর অতীন্দ্রিয় বস্তু কি প্রকারে প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে? বৈষ্ণব শাস্ত্রে আছে—"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।" ভগবান্, তাঁহার ধাম, তাঁহার রূপ, তাঁহার লীলা-সমস্তই অপ্রাকৃত অর্থাৎ জড়াতীত। প্রাকৃত জড়ীয় বস্তু দর্শন করিবার জন্য প্রাকৃত জড়ীয় চক্ষু আছে, তদ্রূপ অপ্রাকৃত জড়াতীত বস্তু দর্শন করিবার জন্য অপ্রাকৃত অন্তশ্চক্ষু আছে। ভগবৎকৃপায় সাধনবলে তাহা প্রস্ফুটিত

হইলে তদ্দারাই অপ্রাকৃত বস্তু দর্শন করা যায়, অন্য প্রকারে হইতে পারে না। সে যাহা হউক, যাঁহারা অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা তাহা বাদ দিয়া পড়িতে পারেন। তবে সকলেই যে তাহাতে অবিশ্বাস করিবেন এমন কথাও বলিতে পারা যায় না; কারণ আমাদের দেশ বর্ত্তমান সময়ে যতই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হউক না কেন, এখনও তাহাতে বিশ্বাসী লোকের সম্পূর্ণ অভাব হইয়াছে বলিয়া মনে করা উচিত নহে।

বহু সৌভাগ্যে গোস্বামী প্রভুর সঙ্গে কয়েক বৎসর একত্র বাস করিবার সুযোগ হওয়ায়, কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার নিজের মুখে নিজের জীবনের কোন কোন ঘটনা ও ধর্ম্মতত্ত্বাদি সম্বন্ধে যে সকল অমূল্য উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহারই আদেশমত লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, তাঁহার কতিপয় আত্মীয় স্বজন ও অন্তরঙ্গ শিষ্যদিগের নিকট হইতে তাঁহার পূর্ব্বাপর জীবনের যে সকল কথা অবগত হইয়া সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি; তিনি ব্রাহ্ম-সমাজে অবস্থানকালে তাঁহার ধর্ম্ম ও প্রচার বিষয়ে তাৎকালিক নিয়মানু-সারে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র পত্রিকাদিতে তাঁহার জীবন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে যাহা আলোচিত হইত, সাধারণতঃ সেই সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মৈত্র ও শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর মহাশয় লিখিত জীবনচরিত হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া ও অন্য প্রকারে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। তজ্জন্য তাঁহাদের নিকটে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। অপর যে সকল মহানুভব ব্যক্তিগণ আমাকে এই দুরূহ কার্য্যে বিশেষ ভাবে উৎসাহ, পরামর্শ ও অন্য প্রকারে সহায়তা করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত হরকুমার সাহা এম, এ, বি, এল, ও ঢাকা জগন্নাথ কলেজের

ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার এম, এ, মহাশয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাহায্যকারীদিগের প্রত্যেকের নিকটে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা প্রভৃতি দোষ ত্রিগুণাধীন মানব মাত্রেরই থাকে। এই গ্রন্থেও বহু ভ্রম প্রমাদ দৃষ্ট হইবে; সহৃদয় পাঠকবর্গ তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রদর্শন করিলে ভবিষ্যতে কৃতজ্ঞহৃদয়ে অবনতমস্তকে সংশোধন করিয়া লইব। কিমধিকমিতি।

ঢাকা
গেণ্ডারিয়া আশ্রম।

বিনীত
গ্রন্থকার।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

প্রথম সংস্করণের পুস্তকগুলি নিঃশেষিত হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। সহৃদয় পাঠক ও অনুগ্রাহকবর্গের আগ্রহাতিশয়ে এইবার জীবনীর অংশ প্রায় দ্বিগুণ করা হইল। সম্প্রতি গোস্বামী প্রভু প্রণীত 'বক্তৃতা ও উপদেশ' ও 'আশাবতীর উপাখ্যান' পুনর্মুদ্রিত হওয়ায় উপদেশের অংশ হইতে তদুদ্ধৃত উপদেশগুলি বাদ দিয়া তাহার স্থানে প্রভুপাদপ্রদত্ত বহু নূতন অপ্রকাশিত উপদেশাবলী সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। গ্রন্থের আয়তন বৃদ্ধির তুলনায় মূল্য চারি আনা মাত্র বর্দ্ধিত করা হইল।

এই সংস্করণে যে সকল সহৃদয় ব্যক্তিবর্গ আমাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে মদীয় পরমহিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদ্বয় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ও শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ এম, এ, মহাশয়ের নাম সবিশেষ

উল্লেখযোগ্য। শ্রদ্ধেয় ঠাকুরতা মহাশয় প্রথম সংস্করণের একখানি গ্রন্থ আগাগোড়া দেখিয়া অবশ্যকমত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন এবং বন্ধুপ্রবর নাগ মহাশয় কতকাংশের প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের উভয়ের নিকটে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এতদ্ভিন্ন অপরাপর যে সকল উদারচরিত্র সতীর্থগণ কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদের সংগৃহীত গোস্বামী প্রভুর জীবনের কোন কোন অপ্রকাশিত ঘটনা ও উপদেশাবলী প্রকাশ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া, ও অন্য প্রকারে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের নিকটে আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণের সময় শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন কিয়ৎকাল স্থানান্তরে থাকিতে বাধ্য হওয়ায় তৎকালে প্রুফ দেখিবার ত্রুটীতে কিছু কিছু ভুল রহিয়া গিয়াছে। শুদ্ধিপত্রে তাহা সংশোধন করিয়া দেওয়া হইল। ইহা সত্ত্বেও যে গ্রন্থ সম্পূর্ণ নির্ভুল ও অন্যপ্রকার ভ্রমপ্রমাদ বিবর্জ্জিত হইয়াছে একথা বলিতে পারি না। সহৃদয় পাঠকবর্গ কৃপা করিয়া ইহার ভুল ভ্রান্তি দেখাইয়া দিলে ভবিষ্যতে অবনতমস্তকে সংশোধন করিতে ত্রুটী করিব না। অলমতিবিস্তরেণ।

কলিকাতা,
১লা আষাঢ়, ১৩২২ সন।

বিনীত
গ্রন্থকার।

গ্রন্থকার সম্পাদিত অপরাপর গ্রন্থাবলী :—

(গ্রন্থকার সম্পাদিত সমগ্র গ্রন্থাবলীরই বিক্রয়লব্ধ অর্থ গোস্বামী প্রভুর আদিষ্ট ও অভিপ্রেত ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে। গ্রন্থকারের ইহাতে কোন লৌকিক স্বার্থ নাই।)

১। **সত্যধর্ম্ম** (এই গ্রন্থ গোস্বামী প্রভুর পুরীধামে অবস্থানকালে তাঁহার আদেশমত লিখিত হয়, এবং তাঁহার নিকটে পঠিত হইলে তিনি ইহা প্রকাশ করিতে অনুমতি প্রদান করেন।) দ্বিতীয় সংস্করণ ।৵০

২। **উপদেশমঞ্জরী** (ধর্ম্মপ্রাণ শিক্ষিত যুবকদিগের উপযোগী প্রশ্নোত্তরচ্ছলে গোস্বামী প্রভুর ১১০টী অমূল্য উপদেশ) ।/০

৩। **শাস্ত্র ও সদাচার** (নবীন ধর্ম্মার্থীর অবশ্য পাঠ্য) ৵০

৪। **মানবজীবনের লক্ষ্য ও পরকাল** (গোস্বামী প্রভু প্রদত্ত দুইটী সারগর্ভ বক্তৃতা) ৵০

৫। **নাম-ব্রহ্ম ও সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়।**

(গ্রন্থকার প্রণীত যে কোন দুইখানি গ্রন্থ একত্র ক্রয় করিলে এই গ্রন্থ বিনা মূল্যে পাইবেন।)

প্রাপ্তিস্থান :—

দাসগুপ্ত এণ্ড কোং, ৫৪।৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। সরকার ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ৬৮ নং জনসন্ রোড, ঢাকা। ম্যানেজার গেণ্ডারিয়া আশ্রম, ঢাকা। ডাক্তার চুণীলাল গুহ, নাজীর মহল্লা, বরিশাল। ম্যানেজার, কাশী-যোগাশ্রম, বেনারস সিটী। শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর সেন উকিল, মাদারিপুর, ফরিদপুর। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র গুহ রায়, ২৩ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা এবং কলিকাতা ও ঢাকার অপরাপর প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

সূচীপত্র।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নবম পরিচ্ছেদ।

দশম পরিচ্ছেদ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮১	১৪,১৫	গোস্বামী প্রভু	গোস্বামী মহাশয়
৯৮	২১	ঐ	ঐ
২৬৬	[illegible]	বিরাজমানা	বিরাজমান্
২৭১	১৫	রাজে	রাজ্যে
২৭৩	৩	আত্মত্তত্ত্ব	আত্মতত্ত্ব
২৭৪	৩,২৩	ভগবত্তত্তত্ত্বে, সত্ত্বের	ভগবত্তত্ত্ব, সত্যের
২৭৫	৯,১৬,১৭,২৩	আশক্তি	আসক্তি
২৭৬	১৫	যেন	যানি
ঐ	১৬	তদ্বিজিজ্ঞাসু	তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব
৩১৫,৩৩৮,৪৬৫	১৪,১৫,৬	সম্বরণ	সংবরণ
৩৩৭	৭	প্রভূ	প্রভু
৩১৩	৫	রাধারাগীর	রাধারাণীর
৩৮৮	১৫	বোললুর	বোলপুর
৩৮৯	১৭	করুণ	করুন
৩৯০	৯,১০,১২,১৯	গোস্বামী প্রভু	গোস্বামী মহাশয়
৩৯১	৪,৫,১২	ঐ	ঐ
৪১৫	২২	গিয়াছে	গিয়াছেন
৪১৬	১৮	ভার	ভাড়
৪৭২	১০	শিষ্যমণ্ডলী	শিষ্যমণ্ডলীর

শ্রীমদাচার্য্য প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

ওঁ হরিঃ।

শ্রীমদাচার্য্য

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-

সাধনা ও উপদেশ।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মঙ্গলাচরণ।

যৎপ্রসাদাৎ লভেদ্‌জ্ঞানং দিব্যং ভক্তিযুতো নরঃ।
নিষ্কলং নির্ম্মমং নিত্যং তং নমামি শিবং গুরুং॥

ভক্তিমান্ ব্যক্তি যাঁহার প্রসাদে দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হন, যিনি নিষ্কল, নির্ম্মম ও নিত্য, সেই শিবস্বরূপ গুরুদেবকে নমস্কার।

যং ধ্যায়ন্তে বুধাঃ সমাধিসময়ে শুদ্ধং বিয়ৎসন্নিভং
নিত্যানন্দময়ং প্রসন্নমমলং সর্ব্বেশ্বরং নির্গুণং।
ব্যক্তাব্যক্তপরং প্রপঞ্চরহিতং ধ্যানৈকগম্যং বিভুং
তং সংসারহেতুমজরং বন্দে গুরুং মুক্তিদং॥

বুধগণ সমাধিকালে, জলদবিরহিত গগনবৎ নির্ম্মল, প্রসন্ন, নির্গুণ, নিত্যানন্দময় যে দেবাদিদেব বিভুকে ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই ধ্যানগম্য, ব্যক্ত অথচ অব্যক্ত, মায়াদিপরিশূন্য, জগন্নিয়ন্তা, জরামৃত্যুবিবর্জ্জিত গুরুদেবকে নমস্কার।

অভিরামাভিরূপায় নমো ভূভারহারিণে।
জটাহিবলয়প্রেঙ্খা চারুতাণ্ডবচারিণে॥
মুহুশ্চ হরিহুঙ্কারৈ রন্তকাতঙ্কবারিণে।
নমো মানসহংসায় স্বান্তধ্বান্তান্তকারিণে॥

যিনি অভিরাম ও ভূভারহারী; জটারূপ সর্পমণ্ডলীর নৃত্যসহকারে যিনি তাণ্ডব করিয়া থাকেন, এবং মুহুর্মুহু হরিহুঙ্কার দ্বারা যিনি যমভয় নিবারণ করেন; হৃদয়ান্ধকারের বিলোপ-বিধায়ক সেই মানস-হংসকে কোটি কোটি নমস্কার।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্ ॥২॥

চিত্ত-দর্পণের পরিমার্জ্জক, ভবরূপ মহাদাবানলের নির্ব্বাপক, কল্যাণ-শ্বেতোৎপলের জ্যোৎস্নাপ্রদায়ক, ব্রহ্মবিদ্যারূপবধূর প্রাণস্বরূপ, আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধক, প্রতিপদে পূর্ণামৃতাস্বাদন, সর্ব্বাত্মস্নেহন, পরম সাধন শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন জয়যুক্ত হয় ॥ ২ ॥

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্ ।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥৩॥

যে উন্নতোজ্জ্বলভক্তিরসাস্বাদ হইতে জীব সুদীর্ঘকাল বঞ্চিত ছিল, সেই পরমবস্তু প্রদান করিবার জন্য, করুণাবশে কলিতে অবতীর্ণ, মনোহর-কান্তি-পটলে সমুদ্ভাসিত শ্রীহরি শচীনন্দন তোমাদের হৃদয়কন্দরে বিলসিত হউন ॥ ৩ ॥

গ্রন্থ-সূচনা।

শ্রীমদ্‌মধ্বাচার্য্য, ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে, পদ্মপুরাণ হইতে প্রমাণস্বরূপ কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, লিখিয়াছেন,—'দ্বাপরে সর্ব্বত্র জ্ঞান আকুলীভূতে তন্নির্ণয়ায় ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রাদিভির্থিতো ভগবান্নারায়ণঃ ব্যাসরূপেণাবততার। অথেষ্টানিষ্টপ্রাপ্তিপরিহারেচ্ছুনাং তদ্যোগ্যতামবিজানতাং তজ্জ্ঞাপনার্থং বেদমুৎসন্নং ব্যঞ্জয়ংশ্চতুর্ধা ব্যভজৎ চতুর্ব্বিংশতিধা একশতধা সহস্রধা দ্বাদশধা চ। এবং তদর্থনির্ণয়ায় ব্রহ্মসূত্রাণি চকার।'' অর্থাৎ দ্বাপর

যুগে ব্রহ্মবিদ্যা বিলুপ্ত হইলে, সেই জ্ঞানবিপ্লব নিবারণ করিয়া ব্রহ্মবিজ্ঞান-নির্ণয়ার্থ ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র ইত্যাদি দেবগণ সমবেত হইয়া ভগবান্ নারায়ণের নিকট উপস্থিত হন, এবং তাঁহাকে ব্রহ্মবিজ্ঞাননিরূপণার্থ প্রার্থনা করিলে, নারায়ণ ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর তিনি দেখিলেন, যাঁহারা ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারে সমুৎসুক, তাঁহারা সকলেই যোগবিজ্ঞান-বিহীন। কেহই যোগের দ্বারা সদসৎ নির্ণয় করিতে পারেন না। তখন ব্যাসদেব যোগানভিজ্ঞ ব্যক্তিদের যোগবিজ্ঞানের নিমিত্ত সমস্ত বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করেন। পরে ঐ বেদকে চতুর্ব্বিংশতি, একশত, এক-সহস্র ও দ্বাদশ প্রকারে বিভাগ করিয়া, সেই বেদার্থ নিরূপণ করিবার জন্য ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করেন।

"এবংবিধানি সূত্রাণি কৃত্বা ব্যাসো মহাযশাঃ।
ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবেষু মনুষ্যপিতৃপক্ষিষু।
জ্ঞানং সংস্থাপ্য ভগবান্ ক্রীড়তে পুরুষোত্তমঃ॥"

পদ্মপুরাণ।

অর্থাৎ—এইরূপে মহাযশাঃ ব্যাসদেব, ব্রহ্মসূত্রসকল প্রণয়ন করিয়া, ব্রহ্মা রুদ্র ইত্যাদি দেবগণ ও মনুষ্য-পিতৃ-পক্ষী ইত্যাদি জীবগণে ব্রহ্মবিজ্ঞান স্থাপন করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

সম্প্রতি আমরাও যে মহাপুরুষের জীবনীসম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া সর্ব্বসাধারণসমক্ষে উপস্থিত করিতে সমুৎসুক হইয়াছি, তাঁহার ধরাধামে আগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে এতদ্দেশে ধর্ম্মের অবস্থার বিষয় সম্যক্ আলোচনা করিলে ইহা প্রতীত হইবে যে, তখনও ব্রহ্মবিদ্যাচর্চ্চা পূর্ব্বোক্ত দ্বাপরযুগের তাৎকালিক অবস্থার অনুরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

নদীয়াবিহারী শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বের অবস্থাও ঐরূপই ছিল। গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাবের প্রাক্কালে সাধারণের নিকট ধর্ম্ম কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতাতে পরিণত হইয়াছিল, অপেক্ষাকৃত শিক্ষিতসম্প্রদায়, ভগবানে প্রকৃত বিশ্বাস হারাইয়া, শুষ্কজ্ঞান, অপ্রতিষ্ঠতর্ক, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি ধর্ম্মের বাহিরের খোসাভুষি লইয়া টানাটানি করিতেছিলেন। এই সুযোগে চতুর শাস্ত্রব্যবসায়িগণ, ধর্ম্মের নামে ঘোর অধর্ম্মের স্রোতঃ খরতরবেগে প্রবাহিত করিয়া, দেশের সর্ব্বনাশসাধনে ব্যাপৃত ছিল। প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু মহানুভব ব্যক্তিগণ তাঁহাদের আত্মার পিপাসানিবারণের উপায় অনুসন্ধান করিয়াও পাইতেছিলেন না। এমন সময়ে পাশ্চাত্য খৃষ্টধর্ম্ম নব-কলেবরে, নূতন-আকারে, আপাতমনোহরবেশে, এক অভিনব আদর্শ সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া, সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে গ্রাস করিবার মানসেই যেন ভারতবর্ষে পদার্পণ করিল। অদূরদর্শী বহু লোক এই নূতন ধর্ম্মের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্য আকর্ষণে, খৃষ্টান পাদ্রীদিগের শ্রুতিমধুর উপদেশে, ইংরাজী-শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে অনেকে বিমোহিত হইতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ, স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, অম্লানবদনে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভারতের বিষম সমস্যার দিন উপস্থিত হইল; ধর্ম্মপ্রাণ সুধীজন ভাবিলেন হিন্দুস্থানে হিন্দু-ধর্ম্ম বুঝি আর তিষ্ঠিতে পারিল না।

দেশের এইরূপ ভয়ানক দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া, ভারতমাতার সুসন্তান প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইল। কেমন করিয়া, কি উপায়ে, ভারতকে এই ভীষণ ধর্ম্মবিপ্লব হইতে রক্ষা করা যায়, দিবানিশি এই চিন্তা তাঁহার চিত্তক্ষেত্র অধিকার করিল, এবং উপস্থিত বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষে তিনি সেই সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন সত্যসনাতন প্রভুর শরণাপন্ন হইলেন। ভক্তাধীন

ভগবান্, ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য এবং এই অধঃপতিত দেশের পুনরুদ্ধারসাধন করিবার অভিপ্রায়ে, ভক্তের প্রাণে এক অপূর্ব্বশক্তি সঞ্চারিত করিয়া, ভারতমাতার সর্ব্বদুঃখাপহ মহৌষধি ব্রহ্মবিদ্যার বীজ রোপণ করিয়া দিলেন, এবং তাঁহারই প্রেরণায় মহাত্মা রামমোহন রায় বৈদিক ব্রাহ্মধর্ম্মের এমন এক অত্যুজ্জ্বল আদর্শ শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মানস-নেত্রের সম্মুখে ধরিলেন, যাহার নিকট সুসভ্য খৃষ্টধর্ম্মের আদর্শ, চন্দ্রালোকে খদ্যোতের ন্যায়, একেবারে নিষ্প্রভ লইয়া পড়িল। শিক্ষিত ভারতবাসী, এমন কি বিচক্ষণ খৃষ্টান পাদ্রিগণও, বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে তাঁহার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; খৃষ্টধর্ম্মের প্রবল স্রোতের মুখে পর্ব্বত-প্রমাণ বাধা পতিত হইল। এইরূপে ব্রহ্মবাদী ঋষিদিগের পীঠস্থানে লুপ্ত-প্রায় ব্রহ্মবিদ্যার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইল।

যিনি যে কার্য্যের জন্য জগতে আগমন করেন, ভগবদিচ্ছায় তাহা সম্পন্ন হইয়া গেলে, তাঁহার জীবনের আর কোনও আবশ্যকতা থাকে না। মহাত্মা রামমোহন রায়ও, বঙ্গদেশের তদানীন্তন ঊষর-ক্ষেত্রে এক অপূর্ব্ব ধর্ম্মবৃক্ষ রোপণ করিয়া, কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। অতঃপর মঙ্গলময়ের ইঙ্গিতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার স্থানে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি বেদান্ত উপনিষদ্ হইতে বহু উপাদেয় সূত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা "ব্রাহ্মধর্ম্ম" নামক গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলেন এবং নবীন-উৎসাহে সমধিক আগ্রহসহকারে এই অভিনব ধর্ম্মের প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার কার্য্য মহাত্মা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক রোপিত ধর্ম্মবৃক্ষের বেষ্টন-স্বরূপ হইল; এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রতিভাশালী মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার সহায় হইলেন। কিন্তু কি জানি কেন, কিসের অভাবে, বৃক্ষ আর তেমন বৰ্দ্ধিত হইতেছে না দেখিয়া, প্রচারক-প্রবর বিস্মিত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে, ভক্তের আহ্বানে, ভগবানের শুভ-ইচ্ছায়, জীবের

বহুভাগ্যে, পুণ্যশ্লোক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের আহ্বানে, শ্রীশচীনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর, নামযজ্ঞভূমি শ্রীবাসের অঙ্গনে প্রবেশের ন্যায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-বিনির্ম্মিত ব্রাহ্মধর্ম্ম-রঙ্গমঞ্চে মহোল্লাসে প্রবিষ্ট হইলেন,এবং মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহায়তায়, অদম্য উৎসাহে এবং অসাধারণ অধ্যবসায়সহকারে, ঋষিকল্প রামমোহন-রায়-রোপিত ধর্ম্মবৃক্ষের মূল হইতে, দুর্নীতি-মৃত্তিকা খননপূর্ব্বক,কুসংস্কার আবর্জ্জনা অপসারিত করিলেন। ভগবৎ-প্রীতিবারি-সেচনে, তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনরূপ আলোক ও বায়ুর ব্যবস্থায়, অত্যল্পকাল মধ্যেই ব্রাহ্মধর্ম্ম-বৃক্ষ শাখাপল্লবে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, বঙ্গদেশের বহুস্থানে ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, শিক্ষিত যুবকগণ দলে দলে আসিয়া ব্রাহ্মসমাজের কলেবর পুষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন ; আপামরসাধারণ এই অপূর্ব্ব বৃক্ষের দিকে অনিমেষনেত্রে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

কিন্তু হায় ! এ কি হইল ? এই শোভন-বৃক্ষে ফুলফল ধরে না কেন ? কত স্বার্থত্যাগ, কত আত্মবলিদান, কত অসাধ্য-সাধনা করিয়া যে বৃক্ষ উৎপন্ন করা হইল, তাহাতে ফল ধরিতেছে না, ইহা অপেক্ষা, গভীর দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে ? বাগানের মালি-গণ ইহা দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ভগবদ্বিধানে দৃঢ়বিশ্বাসী অমিততেজাঃ আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ কিছুতেই হতাশ হইবার লোক ছিলেন না। তিনি ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য, ভগবন্নির্দ্দেশে ব্রাহ্মসমাজের ক্ষুদ্র বেষ্টন অতিক্রম করিয়া, "এই মহাব্যাধির ঔষধের অনুসন্ধান যদি পাই তবেই ফিরিব, নচেৎ এই শেষ 'প্রস্থান'" এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, অনন্ত উন্মুক্ত আকাশতলে আসিয়া পড়িলেন, এবং উন্মত্তের ন্যায়, অনাহার অনিদ্রা ইত্যাদি অশেষবিধ ক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়া, সেই ভবরোগমহৌষধির সন্ধানে পদব্রজে দেশবিদেশে ভ্রমণ করিতে,

লাগিলেন। ব্যাঘ্র, ভল্লূক, বন্যমহিষাদি হিংস্র জন্তু ও দস্যু-তস্করপ্রভৃতি দুর্বৃত্তগণের করালকবল হইতে আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পাইয়া, অসংখ্য নির্জ্জন কানন ও অগণ্য গিরিকন্দরে অনুসন্ধানপূর্ব্বক, বহুসম্প্রদায়ভুক্ত সাধু মহাত্মাগণের সেবা ও সঙ্গের পর অবশেষে, গয়াতীর্থে আকাশগঙ্গা-নামক পর্ব্বতে মানসসরোবরবাসী ভগবান্ ব্রহ্মানন্দ পরহংসদেবের নিকট হইতে উক্ত ব্যাধির অমোঘ ঔষধ সংগ্রহ করিয়া, হৃষ্টচিত্তে ব্রাহ্মসমাজে পুনঃ-প্রবিষ্ট হইলেন এবং কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মবিদ্যাবৃক্ষের সেবার কার্য্যে ব্রতী হইলেন।

তাঁহার কার্য্য-প্রণালীতে কিছু কিছু নূতনত্ব অনুভব করিয়া, সহকারী-দিগের কেহ কেহ বিস্মিত হইতে লাগিলেন, অনেকে তাঁহাদের অভীপ্সিত-ফললাভবিষয়ে সন্দিহান হইয়া পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িলেন; কিন্তু আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, ভগবচ্ছক্তির প্রেরণায় নিজ মনে, আপন প্রাণে, সংস্কারকার্য্যে তৎপর হইলেন। তিনি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন, ধর্ম্ম বাহিরের বস্তু নয়, অন্তরের জিনিষ; ধর্ম্ম প্রণালীতে নাই, অনুষ্ঠানে আছে; মতের বিশুদ্ধতাতে নাই, পবিত্র জীবনে আছে; কোনও দলে বা তীর্থে আবদ্ধ নহে, অথচ সকল দলে ও তীর্থেই আংশিক-রূপে বর্ত্তমান আছে এবং মানবহৃদয়ই এই ধর্ম্ম-পাদপের মূল; সাক্ষাৎভাবে জীবন্ত সদ্‌গুরুর আশ্রয়গ্রহণ এবং তদুপদিষ্ট শাস্ত্র ও সদাচার-সম্মত পন্থার অনুসরণ না করিলে যথার্থ ধর্ম্মলাভ সম্ভবপর নহে।

তিনি স্বীয় গুরুদেবের নিকট হইতে যে সজীব ধর্ম্মবীজ হৃদয়-ক্ষেত্রে রোপণ করাইয়া আনিয়াছিলেন, তাহা সাধন-ভজনরূপ অনুকূল জলবায়ুর সাহায্যে এবং ক্ষেত্রের গুণে, অচিরকালমধ্যেই অঙ্কুরিত ও শাখাপল্লবে বর্দ্ধিত হইয়া ফুলফলে সুশোভিত হইল; তাহার সৌরভে দশদিক আমোদিত হইয়া উঠিল; এবং চতুর্দ্দিক হইতে ধর্ম্মপিপাসু-ভ্রমরনিকর পুঞ্জে

পুঞ্জে আসিয়া মধুরগুঞ্জনে ধর্ম্মকাননকে মুখরিত করিয়া তুলিল। নানা দিগ্‌দেশ হইতে, অসংখ্য ভক্তকোকিল, সমবেত হইয়া, বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া, মনের উল্লাসে পঞ্চমস্বরে গাইতে লাগিল; স্বর্গ হইতে দেবগণ যেন পুষ্পবর্ষণ করিলেন। আমাদের 'কৃষ্ণ-মালীর' চিরদিনের আশা পূর্ণ হইল, তাঁহার অদম্য চেষ্টা সফল হইল। ধর্ম্মের জন্য তাঁহার আশৈশব অক্লান্ত পরিশ্রম এতদিনের পরে সুফল প্রসব করিল।

গোস্বামী প্রভু উত্তম আহার্য্য বস্তু পাইলে, তাহা অপরকে না দিয়া কখনও খাইতে পারিতেন না। এখন তিনি যে ত্রিতাপহারক, ভবব্যাধিবিনাশক, সর্ব্বাত্মনপক অমূল্য নামসুধারস সঞ্চয় করিয়া আনিয়াছিলেন, যাহা পান করিলে জীব শিব হয়, মানুষ দেবতা হয়, তাহা সমস্ত নরনারীকে আস্বাদন করাইতে ব্যাকুল হইলেন এবং স্বীয় গুরুদেবের আদেশে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে, উপস্থিত ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তি-মাত্রকেই বিনা মূল্যে অকাতরে বিতরণ করিতে লাগিলেন; এবং ধর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মসংস্থাপনপূর্ব্বক, লুপ্তপ্রায় ব্রহ্মবিদ্যার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতঃ, যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক-শ্রীমন্‌মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত সুনির্ম্মল সার্ব্বভৌমিক বৈষ্ণবধর্ম্মকে সচ্‌শাস্ত্রানভিজ্ঞ উপধর্ম্মীদিগের কবল হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া, হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আহ্বানে, জগন্নাথক্ষেত্রে মানবলীলা সংবরণ করিলেন। কিন্তু, তিনি যে সনাতন ধর্ম্মের বীজ বপন করিয়া গেলেন, তাহা কিছুতেই নষ্ট হইবার নহে। উপযুক্ত জলবায়ুর সংযোগ হইলেই, তাহা হইতে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের উদ্ভব হইবে এবং সেই সকল বৃক্ষের সুপক্ক ফল হইতে পুনরায়, নূতন নূতন অসংখ্য বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে থাকিবে। এই প্রকারে কালক্রমে সমগ্র দেশই এক অপূর্ব্ব ধর্ম্মকাননে পরিণত হইবে। সেদিন এখনও,

আসে নাই, কিন্তু নিশ্চয় আসিবে ; সেই সত্যযুগ ও সত্যধর্ম্মের জয়পতাকা মহাত্মাগণের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে।

আজ ত্রয়োদশবর্ষ অতীত হইল, (১৩০৬ সনের জ্যৈষ্ঠমাসে,) প্রভুপাদ নরলীলা সংবরণ করিয়াছেন। প্রকট অবস্থায় যে অপূর্ব্ব ধর্ম্মস্রোতঃ তিনি বঙ্গদেশের উপর দিয়া প্রবাহিত করিয়াছিলেন, যে মহোচ্চধর্ম্মের আদর্শ লোকসমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন,সেই বিশেষ বস্তু সূত্ররূপে নির্দ্দেশ করাই এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূলদেহ ধারণের শেষ দিন পর্য্যন্ত জীবের পরমহিতসাধন কার্য্যই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। "ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি" এই মহামন্ত্রের প্রেরণায় তিনি পূর্ণ-পুরুষকে লাভ না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই নিরস্ত হন নাই। জীবনের প্রথমভাগেই তিনি যে সকল অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অতি অল্পসংখ্যক সাধুমহাত্মার ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তিনি কিছুতেই এই সকল অবস্থাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। পূর্ণকাম হইবার মানসে বংশ-মর্য্যাদা, জাত্যভিমান, জ্ঞান-গরিমা, আত্মসুখ, সাংসারিক সম্পৎসমৃদ্ধি সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্বসম্প্রদায়ের সাধুদিগের আনুগত্য ও ভজনপ্রণালী অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। প্রভুপাদ এই ভাবে প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন ধর্ম্ম-সমাজে অবস্থিতি করিয়াছিলেন বলিয়া, অনেক স্থূলদর্শী লোক তাঁহার জীবনের ঘটনাসমূহের সামঞ্জস্য দর্শন করিতে অসমর্থ। কিন্তু তটস্থ হইয়া বিচার করিলে ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, তাঁহার জীবনলীলা আশ্চর্য্য সামঞ্জস্যপূর্ণ, শাস্ত্র-সদাচারানুমোদিত অপূর্ব্ব ঘটনা-প্রবাহ। * ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে জীবের যে সকল অবস্থা হয়,

* প্রভুপাদ পুরীধামে অবস্থানকালে একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে— "স্থিরচিত্তে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাইবে; আমার জীবনের পূর্ব্বাপর প্রত্যেক কার্য্য ও বাক্যের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য রহিয়াছে।" অপর এক সময়ে

ব্রাহ্মসমাজে অবস্থানকালে তাঁহাতে তাহা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপর যুঞ্জন ও যুক্তযোগীর অবস্থা শাস্ত্রে যেরূপ বর্ণিত আছে তৎসমুদয় একটী একটী করিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। শেষজীবনে তিনি, সর্ব্বাঙ্গে সুশোভন তিলক, মস্তকে অপূর্ব্ব জটা, বক্ষে পবিত্র মালালহরী ও অঙ্গে ভগবান্ বস্ত্র ধারণ করিয়া, ভক্তি-শাস্ত্রোল্লিখিত সমস্ত বাহ্য ও আভ্যন্তরিক অবস্থা জীবের কল্যাণার্থ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গ-ক্রমে একদিন বলিয়াছিলেন,—"আমি রহস্যচ্ছলেও কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই।" সাধারণ জীবের ন্যায় যৌবনের আবিলতা স্বপ্নেও তাঁহার কখনও ঘটে নাই।

শাস্ত্রে আছে "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি"; প্রভুপাদের দর্শনে এ বিষয়ে চক্ষু ও কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন হইয়াছে। সাধক যোগারূঢ় হইলে এবং প্রেম ভক্তি লাভকরিলে জীবনে কি আশ্চর্য্য অবস্থা ঘটে, তাহা তাঁহার সমসাময়িক মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। বস্তুতঃ গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব জীবনকাহিনী শাস্ত্র ও সদাচারের একখানি অত্যুজ্জ্বল চিত্রপট মাত্র।

ভক্তিশাস্ত্রে সাধনপন্থার তিনটী ক্রমের কথা উল্লিখিত আছে—ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্।

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

বলিয়া ছিলেন—"জীবন একখানি নৌকার ন্যায় এক স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। দুই পার্শ্বে নিত্য নূতন দৃশ্য দেখা যাইতেছে, কখনও মরুভূমি কখনও পুষ্পবন; কখনও সমতল ক্ষেত্র, কখনও বন্ধুর প্রদেশ। যখন যাহা দেখিতেছি, তাহাই বলিতেছি।" যাহারা শুনিতেছে, তাহারা অনেক কথারই অসামঞ্জস্য দেখিবে। কিন্তু তাই বলিয়া ত আর সত্য গোপন করা যায় না।" নব্যভারত।

অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয় তত্ত্বকেই তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই একই তত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ আখ্যায় অভিহিত হয়।

প্রাগুক্ত তিনটি তত্ত্ব আবার ত্রিবিধ-সাধন-সাপেক্ষ।

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অর্থাৎ জ্ঞানসাধন দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব, যোগসাধন দ্বারা পরমাত্মতত্ত্ব ও ভক্তিসাধন দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব লাভ হয়।

জীবজগতে ইহারও নিম্নতর আরও কয়েকটী স্তর আছে—যথা জড়ত্ব, পশুত্ব, ও মনুষ্যত্ব। ভগবৎকৃপায় জীব পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্বস্তরে আরোহণ করিতে পারিলেই ব্রহ্মবিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়, এবং ক্রমে জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান), যোগ ও ভক্তি এ তিনটী স্তর অতিক্রম করিতে পারিলেই, সাধক পঞ্চমপুরুষার্থ লাভ করিয়া শ্রীভগবানের আনন্দময় অপ্রাকৃত নিত্যলীলায় প্রবেশ করিতে পারেন।

'ব্রহ্মবিদ্যামন্দিরে উক্ত তিন শ্রেণীর সাধকেই স্ব স্ব শ্রেণীতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। এক এক শ্রেণীর শেষপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, প্রত্যেকেই আপন আপন উপরের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন, এবং নিম্নতর শ্রেণীর উত্তীর্ণ সাধকগণ তত্তৎ স্থান অধিকার করেন। যে সাধক যে শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তিনি সেই শ্রেণীর এবং তাহার নিম্নতর শ্রেণীর অধীত বিষয়ের কথাই বলিতে পারেন, উচ্চতর শ্রেণীর কোনও কথা বলিতে তাঁহার অধিকার জন্মে না। যিনি জ্ঞানের শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তিনি জ্ঞানের কথাই আলোচনা করিতে পারেন, এবং

ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান ভিন্ন আর কোনও উচ্চতর অবস্থা থাকিতে পারে, তাহা তাঁহার ধারণায় আসে না। এই প্রকার যিনি যোগসাধনা করেন, তিনি জ্ঞান ও যোগের কথাই বলিতে পারেন, ভক্তিতত্ত্ব তাঁহার সাধ্যায়ত্ত হয় না—ইত্যাদি। এই বিদ্যালয়ে আবার একশ্রেণী অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধতন শ্রেণীতে উন্নয়নের ব্যবস্থাও দৃষ্ট হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়িয়া কেহ যোগতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না এবং যোগ ছাড়িয়া কেহ ভক্তিতত্ত্বে অধিকারী হন না—ইত্যাদি। গোস্বামীপ্রভুর জীবন আলোচনা করিলে আমরা ইহাই দেখিতে পাই যে তিনিও, পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান, যোগ ও ভক্তি এই তিনটী সোপান ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করিয়া, যখন যে সোপানের সাধক সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাকে তদুপযোগী শিক্ষা দীক্ষা দান করিয়া, সমর্থকে সঙ্গে লইয়া, অসমর্থকে স্বীয় শ্রেণীর শিক্ষণীয় বিষয়ে পরিপক্কতালাভের জন্য পশ্চাতে রাখিয়া, কিজানি কিসের জন্য, উধাও হইয়া, হুমা পক্ষীর ন্যায় অনন্তের দিকে ছুটিতে ছুটিতে অবশেষে সেই 'রসো বৈ সঃ' রসের সায়রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন।

সাধনপথের ক্রমসম্বন্ধে গোস্বামীপ্রভুর স্বহস্তলিখিত উপদেশ এইরূপ :—"প্রত্যেক সাধককে তিনটি অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হয়। ১ম, ব্রহ্মভাব ; এই অবস্থায় সাধক দেখেন যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এক অদ্বিতীয় চৈতন্যময় ; উহাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলে। ২য় অবস্থা যোগ ; ইহা হঠযোগ নহে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ। এই অবস্থায় সাধক দেখিতে পান যে তাঁহার শরীরের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এক অনির্ব্বচনীয় শক্তির অধীন। কেবল শরীর নহে, আত্মার সমস্ত বৃত্তি সেই শক্তির অধীন। সেই শক্তি নড়িতেছে চড়িতেছে, তাহার স্পর্শ, ঘ্রাণ, স্বাদ অনুভূত হইতেছে; কিন্তু এই স্পর্শ, ঘ্রাণ, স্বাদ অব্যক্ত। গর্ভবতী নারী যেমন গর্ভস্থ সন্তান অনুভব করেন, ইহাও সেইরূপ। ৩য়, ভগবদ্‌ভাব অর্থাৎ লীলা। এই

অবস্থায় সাধকের নিকট ব্রহ্ম অনন্তভাবে দেখা দেন। কালী-দুর্গা প্রভৃতি অসংখ্য দেবতা, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার প্রত্যক্ষীভূত হন। এই জগতে মনুষ্য যেমন ব্রহ্মের লীলার পরিচয়, সেইরূপ অসংখ্য জগতে যতভাবে যেরূপে ব্রহ্ম লীলা করেন, সমস্তই সাধকের নিকটে প্রকাশিত হয়। পূর্ব্ব-কালে ঋষিগণ, কলিযুগে শাক্যসিংহ প্রভৃতি যাঁহারা সাধন করিয়াছেন, তাঁহারাই ঐ সমস্ত রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সাধক এইরূপে ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ এই ত্রিবিধ ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া, ব্রহ্মরূপ অনন্ত-সাগরে ঝম্প প্রদান করেন। তখন 'একমেবাদ্বিতীয়ং সচ্চিদানন্দ' সাগরে আপনাকে ভুলিয়া তাহাতেই কখনও সাঁতার দেন, কখনও নিমগ্ন হন।" *

আমরাও গোস্বামী প্রভুর স্বীয় জীবনের পূর্ব্বোক্ত তিনটী স্তরের অবস্থার আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁহার জীবন ও ধর্ম্মবিষয়ক অপরাপর অত্যাবশ্যক কতিপয় ঘটনা বিবৃত করিয়া, এই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত করিয়াছি। কারণ, তাঁহার জীবনকাহিনী এত অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ এবং তাহাতে এত বিচিত্রতার সমাবেশ যে, তাহা যথাযথ সংগ্রহ ও তত্ত্বতঃ হৃদয়ঙ্গম করিয়া লিপিবদ্ধ করা অস্মাদৃশ সাধনহীন, অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নহে। লুপ্তপ্রায় ব্রহ্মবিদ্যার পুনরুদ্ধারকার্য্য সংক্ষেপতঃ বর্ণনা করা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য।

বিদ্যা দুই প্রকার, অপরা বিদ্যা ও পরা বিদ্যা। ঋক্, যজুঃ, সাম, ও অথর্ব্ব—এই চারি বেদ এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই ছয় বেদাঙ্গ অপরা বিদ্যা নামে অভিহিত, এবং যদ্দ্বারা সেই অক্ষর পরব্রহ্মকে লাভ ও সম্ভোগ করা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা। এই পরা বিদ্যা সাধনসাপেক্ষ, 'সাধন বিনা সাধ্যবস্তু কেহ নাহি পায়।' শিব, শুক, নারদ হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশা, মুসা, শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধদেব,

* মৌনী অবস্থায় গোস্বামী প্রভুর স্বহস্ত লিখিত উপদেশ।

শঙ্করাচার্য্য, গুরুনানক, এবং (অধুনাতন) রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, লোকনাথ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি অবতার ও মহাপুরুষদিগের জীবনী এই বাক্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই সাধনবস্তু কি তাহা নিজে অনুষ্ঠান করিয়া না দেখাইলে অপরের পক্ষে অনুসরণ করা অসম্ভব। বৈষ্ণবশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুসম্বন্ধে লিখিত আছে—'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।' প্রকৃতপক্ষে আচার ও প্রচার একাধার হইতে উদ্ভূত না হইলে তাহা সম্যক্ ফলদায়ী এবং জনসমাজ কর্ত্তৃক গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। গোস্বামী প্রভুর জীবনেও আমরা দেখিতে পাই যে তিনি স্বীয় জীবনে, আপনার উপদিষ্ট ধর্ম্ম যথাযথ আচরণ করিয়া, তাহার ফলের জীবন্ত সাক্ষ্য, প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ঈদৃশ মহাপুরুষের আবির্ভাব জীবের বহু-ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। বস্তুতঃ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতির বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন, জ্ঞানসূর্য্য উদিত করিয়া অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিবার উপযুক্ত, অসংখ্য ক্ষুদ্র প্রলোভনময় উপধর্ম্মের খরবেগ-স্রোত ফিরাইয়া অনন্ত শান্তিময় পূর্ণধর্ম্মের দিকে উন্মুখ করিতে সমর্থ, ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, যখন তখন, যেখানে সেখানে, প্রকটিত হন না। গোস্বামী প্রভুর আগমনে আজ চিরপূত অদ্বৈতবংশ অধিকতর পবিত্র, বঙ্গদেশ ধন্য, বাঙ্গালী-জাতি গৌরবান্বিত, এবং মুমুক্ষু জীবগণের আশাপ্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মাতাপিতা ও পূর্ব্বপুরুষ।

চারিশত বৎসর অতীত হইল, নদীয়াজেলার অন্তঃপাতী শ্রীপাট শান্তিপুরে শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য প্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে তিনি মহাবিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে যে, এই মহাপুরুষ, জগৎকে ভক্তিশূন্য দেখিয়া, জীবের দুঃখে অতীব কাতর হইলেন এবং তাহাদিগকে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে স্নান করাইয়া পরা শান্তি প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে, কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সাগ্রহ আহ্বানে ও ঘন ঘন হুঙ্কারে আকৃষ্ট হইয়া, ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ, ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য, শ্রীগৌরাঙ্গরূপে, নিত্যানন্দরূপী শ্রীমদ্বলদেবের সমভিব্যাহারে, অবতীর্ণ হইলেন, এবং গদাধর-শ্রীবাসাদি পার্ষদবৃন্দের সহযোগে, কলিহত জীবকে ত্রিতাপজ্বালা-নিবারক ভবব্যাধিনাশক হরিনামামৃত পান করাইয়া উন্মত্ত করিয়া তুলিলেন, বঙ্গদেশের তদানীন্তন ঊষরক্ষেত্রকে অপ্রাকৃত ব্রজধামের প্রেমবারি বর্ষণ করিয়া পরিষিক্ত করিলেন; নামতরঙ্গে দেশ প্লাবিত হইল এবং লক্ষ লক্ষ পাপী তাপী নরনারী তাহাতে অবগাহনপূর্ব্বক নবজীবন লাভ করিয়া উদ্ধার পাইয়া গেল।

কালের অচিন্ত্যনীয় প্রভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় পার্ষদবৃন্দের অন্তর্ধানের পর চারিশত বৎসর যাইতে না-যাইতেই তাঁহাদিগের ধর্ম্ম

একেবারে মলিন হইয়া পড়িল। ধর্ম্মের নামে নানা প্রকার অধর্ম্মের স্রোতঃ বঙ্গমাতার বক্ষের উপর দিয়া প্রবলবেগে বহিতে আরম্ভ করিল। শাস্ত্রও সদাচার ভ্রষ্ট আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, কিশোরীসাধক প্রভৃতি উপধর্ম্ম যাজকগণের অত্যাচারে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত সুনির্ম্মল সার্ব্বভৌমিক বৈষ্ণব-ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে মহা হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইল। এমন সময়ে শান্তিপুরে শ্রীমদদ্বৈতবংশে অদ্বৈতাচার্য্যোপম, পরদুঃখকাতর, পরমভাগবত একজন পুরুষপ্রবর আবির্ভূত হইলেন। ইঁহার নাম শ্রীমদানন্দকিশোর গোস্বামী।

প্রভুপাদ আনন্দকিশোর গোস্বামী স্বীয় পূর্ব্বপুরুষ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের ঈদৃশী দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া মর্ম্মান্তিক ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন। কেমন করিয়া লুপ্তপ্রায় ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারসাধন হইবে, কিসে জীবের দুঃখ দূর হইবে, এই ভাবিয়া তিনি সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকিতেন এবং অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় কুলাধিদেবতা ৺শ্যামসুন্দরের শ্রীচরণে আপনার মনের কথা প্রাণের ব্যথা নিবেদন করিয়া কথঞ্চিৎ শান্তি প্রাপ্ত হইতেন। সংসারের যাবতীয় ভোগবিলাসবিবর্জ্জিত, পরসেবানিরত এই মহাপুরুষ দিবসের অধিকাংশ সময় ৺শ্যামসুন্দরের সেবায় ও শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি ভক্তিশাস্ত্র-পাঠে অতিবাহিত করিতেন।

শ্রীমদানন্দকিশোর গোস্বামী মহোদয়, তদানীন্তন অপরাপর গোস্বামি-সন্তানদিগের ন্যায় যাজ্ঞাদ্বারা শিষ্য-সেবকদিগের নিকট হইতে কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতেন না। তাহারা অযাচিতভাবে যাহা প্রদান করিত তাহাই সাদরে গ্রহণ করিতেন। ভাগবতাদি শাস্ত্র পাঠের দ্বারাও তাঁহার বিস্তর অর্থের সমাগম হইত; কিন্তু তিনি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের দিকে, একেবারেই দৃষ্টি না রাখিয়া, মুক্তহস্তে সৎকার্য্যে সেই সকল অর্থ ব্যয় করিতেন। দীনদুঃখী, অন্ধ, আতুর প্রভৃতি কোনপ্রকার যাচকই তাঁহার

নিকট হইতে বিমুখ হইয়া যাইত না। নিরাশ্রয় দরিদ্র শিষ্যদিগকেও তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ত্রুটি করিতেন না। সেবাবিষয়ে তিনি এতদূর নিষ্ঠাবান্ ছিলেন যে ঠাকুরের ভোগ রন্ধন করিবার কাষ্ঠাদি পর্য্যন্ত গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া শুকাইয়া লইতেন। এই জন্য লোকে তাঁহাকে "লাকড়ী ধোয়া" গোঁসাই বলিত।

শ্রীমদানন্দকিশোর গোস্বামী মহোদয় একজন অতিশয় উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিবার সময়ে চক্ষুর জলে তাঁহার বক্ষঃ ভাসিয়া অবশেষে গ্রন্থের পাতা পর্য্যন্ত সিক্ত করিত, পুলকাদি অপরাপর সাত্ত্বিক ভাবকদম্ব সর্ব্বাঙ্গে বিকসিত হইয়া উঠিত; এবং সময়ে সময়ে রোমকূপ হইতে রক্তোদ্গমে উত্তরীয় বসন রঞ্জিত হইত। কখনও কখনও প্রেমের গভীর উচ্ছ্বাসে 'রাধাশ্যাম,' 'রাধাপ্যারী,' 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ইত্যাদি বাক্য তাঁহার শ্রীমুখ হইতে এমন তেজের সহিত উচ্চারিত হইত যে, তাহা শ্রবণ করিলে নিতান্ত পাষাণ-হৃদয়ও ভগবদ্ভাবে বিগলিত হইয়া যাইত। এতদবস্থায় একদিন হঠাৎ তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইল, তিনি তাঁহার নিত্যপূজার শালগ্রামচক্র গলদেশে বন্ধন করিয়া, গৌরনিতাই সীতানাথকে স্মরণ করিয়া পদব্রজে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবদর্শনে যাত্রা করিলেন; এবং শান্তিপুর হইতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে করিতে প্রায় এক বৎসরে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। কঠিন মৃত্তিকাঘর্ষণে তাঁহার বক্ষঃস্থলে ও জানুর সন্ধিতে ঘা হইয়া গিয়াছিল। তিনি ক্ষত-স্থানে ন্যাকড়া জড়াইয়া লইতেন, তবুও সাষ্টাঙ্গ করিতে নিরস্ত হন নাই। এইরূপ ভয়ানক ক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, ক্ষেত্রস্বামীকে দর্শন করিয়া অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সহবাসে এতদূর আবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, শ্রীক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না বলিয়াই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এমন সময়ে

একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে জগন্নাথদেব তাঁহাকে বলিতেছেন, "তুই বাড়ী যা, আমরা দুইজন তোর পুত্ররূপে উৎপন্ন হইব এবং তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।" অকস্মাৎ এইরূপ শুভ বর লাভ করিয়া তিনি পূর্ব্ব-সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক মনের আনন্দে, প্রফুল্ল-হৃদয়ে জন্মভূমি শান্তিপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। এতদিন পরে তিনি শান্তিপুরকে শান্তিপুর বলিয়া উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। ইতঃপূর্ব্বে জীবের দুঃখে কাতরতাপ্রযুক্ত, স্বীয় পূর্ব্বপুরুষপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের গ্লানিদর্শনহেতু, তাঁহার মুখমণ্ডলে যে একপ্রকার কালিমার আভা প্রকটিত হইয়াছিল, এখন তাহা প্রায় বিলুপ্ত হইল। সূক্ষ্মদর্শিগণ তাহা লক্ষ্য করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া, মনে মনে পুনঃ দারপরিগ্রহ করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

শ্রীমদানন্দকিশোর গোস্বামী মহোদয় ইতঃপূর্ব্বে দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ দুইবার বিপত্নীক হন। পত্নীদ্বয়ের কোন সন্তানাদি হইয়াছিল না। আনন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ৺গোপীমাধব গোস্বামী মহাশয়, মৃত্যুর প্রাক্‌কালে, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নিকটে ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন, "ভাই! আমার অন্তিমকালের একটী বাক্য তোমাকে রাখিতে হইবে। আমি নিঃসন্তান, অতএব তোমার কনিষ্ঠ পুত্রটি আমার পত্নীকে দত্তক প্রদান করিও।" এই কথা শুনিয়া আনন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয় অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"সে কি? আপনি কি প্রলাপ বকিতেছেন? আমি যে বিপত্নীক, এবং আমার কোন সন্তানাদিও নাই। এ যে আপনি আশ্চর্য্য কথা বলিতেছেন!" তদুত্তরে ৺গোপীমাধব গোস্বামী মহাশয় বলিলেন—"আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, তোমার বিবাহ হইয়াছে এবং দুইটী পুত্র জন্মিয়াছে; অতএব তোমাকে বিবাহ করিতেই হইবে। পুত্র হইলে একটী পুত্র অবশ্য আমাকে দত্তক প্রদান করিও, কারণ আমি অপুত্রক"।

কিন্তু আনন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয় পুনরায় বিবাহ করিবেন না বলিয়াই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সুতরাং জ্যৈষ্ঠ-ভ্রাতার এই বাক্যে তখন তেমন আস্থা প্রদান করেন নাই। কিন্তু জগন্নাথক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই ভবিষ্যদ্-বাণীর কথা স্মরণ করিয়া, মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, কারণ ভগবন্নির্দ্দেশে তিনি এখন বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। অতঃপর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে, নদীয়া জেলার অন্তর্গত শিকারপুরের নিকটবর্ত্তী দহকুলগ্রামবাসী পরম-ভাগবত ৺গৌরিপ্রসাদ জোদ্দার মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দেবীকে বিবাহ করেন। ইঁহারই গর্ভে শ্রীমদানন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বরে দুইটী পুত্ররত্ন লাভ করিলেন। প্রথমটীর নাম ব্রজগোপাল এবং দ্বিতীয়টীর নাম বিজয়কৃষ্ণ।

জননী স্বর্ণময়ী, অসামান্য গুণে সমালঙ্কৃতা ছিলেন। ইঁহার ন্যায় দয়াবতী নারী জগতে দুর্ল্লভ। জীবের দুঃখ ইনি আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। কেহ কোন বিষয়ের অভাব জ্ঞাপন করিলে, দেবী স্বর্ণময়ী সর্ব্বস্ব দান করিতেও কুণ্ঠিতা হইতেন না। হাতে অর্থ না থাকিলে, দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি থালা, ঘটী, বাটী ইত্যাদি তৈজসপত্র ও কোনও কোনও সময়ে গৃহের যাবতীয় আহার্য্য বস্তু পর্য্যন্ত দান করিয়া ফেলিতেন; এবং তজ্জন্য গৃহস্থদিগকে অনেক দিন উপবাসী থাকিতে হইত। একবার তাঁহার ভাসুরপুত্রের জন্মোপলক্ষে, সমাগত ধোপা, নাপিত, বাদ্যকর প্রভৃতিকে গৃহের সমুদয় ঘটি, বাটী, বস্ত্রাদি দান করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরে বাজার হইতে দ্রব্যাদি আনাইয়া গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল।

জননী স্বর্ণময়ী জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন, রোগীকে ঔষধপথ্য, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনাদান ইত্যাদি কার্য্যে সর্ব্বদাই ব্যাপৃতা থাকিতেন। অপরকে খাওয়াইয়া ইনি বড়ই সুখী হইতেন। প্রত্যহ চারি

পাঁচ জনের উপযুক্ত অতিরিক্ত অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া গরীবদুঃখীদিগকে অনুসন্ধানকরতঃ আহার করাইতেন, এবং পরে নিজে আহার করিতেন।

শান্তিপুরের বাজারে অনেক গরীবদুঃখী স্ত্রীলোক শাকসব্জি ইত্যাদি বিক্রয় করিতে আসিত। কিন্তু তাহাদের ক্রয়বিক্রয়কার্য্য সমাধা করিয়া বাটী যাইতে অনেক সময়ে দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া যাইত। দেবী স্বর্ণময়ী এই সকল অনাহারক্লিষ্ট দীনদুঃখীদিগকে নিজের বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া, আদরের সহিত পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া বিদায় দিতেন। তিনি বলিতেন—"যে একাকী আপনার জন্য রান্না করে, সে ত শেয়াল-কুকুরের মত। পাঁচজনের কম কিছুতেই রান্না করা উচিত নয়।" কৃপণদিগের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন যে, "উহারা বড়ই দয়ার পাত্র, নিজেদের থাকিতে খাইতে পায় না।" এজন্য তিনি কৃপণদিগকে অধিকতর যত্নসহকারে খাওয়াইতেন।

একবার শান্তিপুরে কোথা হইতে একটি পাগলিনী আসিয়াছিল। তাহার রুক্ষ কেশ, ছিন্ন বেশ ইত্যাদি দেখিয়া, দুষ্ট বালকের দল তাহাকে নানা প্রকারে উত্ত্যক্ত করিতে আরম্ভ করিল। কেহ তাহার গায়ে ধূলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কেহ বা ঢিল ছুড়িতে লাগিল। কিন্তু পাগলিনী কাহাকেও কোনও কথা না বলিয়া কেবল একপ্রকার অব্যক্ত করুণ শব্দ উচ্চারণ করিয়া সময়ে সময়ে দারুণ মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিল। দেবী স্বর্ণময়ী পাগলিনীকে এইরূপ অসহায় দেখিয়া, স্নেহভরে হাত ধরিয়া নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন; এবং তাড়াতাড়ি তাহার মস্তকে যথেষ্ট পরিমাণে তৈল মাখিয়া দিয়া তদুপরি কলসে কলসে জল ঢালিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইরূপ জলের ধারা দিবার পর পাগলিনীর চৈতন্য হইল। চেতন পাইয়াই বলিল—"মা! তুমি আমায় জুড়াইয়া দিলে, আর কেউত আমায় এমনটী কল্লে না। সবাই আমায় পাগল বলে, ক্ষেপায়,

জ্বালার উপর জ্বালা দেয়। তুমি কি দেবতা মা ?" পরে জানাগেল যে পাগলিনী একটী পুত্রশোকাতুরা দরিদ্রা জননী। অতঃপর দেবী স্বর্ণময়ী পাগলিনীকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক তাহার বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

একবার শীতকালে সন্ধ্যার সময় জননী স্বর্ণময়ী কলিকাতার রাজপথ দিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতেছিলেন। এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, পথের পার্শ্বে একখানি খোলার ঘরের সম্মুখে একজন বারাঙ্গনা দাঁড়াইয়া আছে। তিনি তখন সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। কিন্তু প্রত্যাগমন করিবার সময়ে যখন দেখিলেন যে, উক্ত স্ত্রীলোকটী তদবস্থায়ই দুরন্ত শীতে অত্যন্ত ক্লেশভোগ করিতেছে, তখন দেবী স্বর্ণময়ীর দয়া শতগুণে উছলিয়া উঠিল। তিনি, তাঁহার নিকট যাহা কিছু ছিল তৎসমস্তই ঐ বারাঙ্গনাকে প্রদান করিয়া সস্নেহে বলিলেন—"বাছা, আর শীতে কষ্টভোগ করিও না, এখন ঘরে গিয়া শয়ন কর।"

এই দয়াবতী নারী আত্মপরবিচাররহিতা হইয়া সকলকেই সমানচক্ষে দেখিতেন। এমন কি, পরিচারিকার পুত্রের সঙ্গেও তাঁহার নিজের পুত্রের কোনরূপ প্রভেদ করিতেন না। গোস্বামী প্রভু একদিন মায়ের সমদর্শিতার কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"তিনি দাসী-পুত্রকে আমার সহিত তুল্যরূপে ভালবাসিতেন। একখানা থালা, একটী ঘটী, একটী গ্লাস তাহাকেও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।" যে সকল মুটেমজুরদিগকে সাধারণতঃ লোকে অবহেলার চক্ষে দর্শন করে, তাহা-দিগকেও ইঁনি অতিশয় দয়ার চক্ষে দেখিতেন। একদিন একজন কাঠুরিয়ার সঙ্গে মজুরীর পয়সা লইয়া গোস্বামী প্রভুর কথাবার্ত্তা হইতেছিল। মজুরের দাবী অপেক্ষা গোস্বামী প্রভু কিছু কম দিতে চাহিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া মজুর বলিল—"দাদা গোঁসাই, আপনার সঙ্গে দর ঠিক

হইবে না, আপনি মাগোঁসাইকে ডাকুন।” গোস্বামী প্রভু মাতাঠাকুরাণীকে ডাকিলে, তিনি সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া বলিলেন—“গরীব লোকের দুই চারি আনা মারিয়া তুই কি বড় লোক হবি? ইহাদের সহিত গোল করিস্ না। ইহারা যা চায় তাই দে। ইহাদিগকে বরং কিছু বেশীই দিতে হয়, নতুবা ইহাদের স্ত্রীপুত্রেরা কি খাইয়া বাঁচিবে?”

স্বর্ণময়ী দেবী বাৎসল্যপ্রেমের আধারস্বরূপা ছিলেন। তাঁহার সন্তানবাৎসল্যের কথা উল্লেখ করিয়া গোস্বামী প্রভু একদিন বলিয়াছিলেন—“আমি বিদেশে যদি কোন আঘাত পাইতাম, রোগযন্ত্রণায় কাতর হইতাম, অথবা কোন হিংস্রজন্তুর সম্মুখে পড়িয়া সভয়চিত্তে মাকে ডাকিতাম, বাটী আসিবামাত্র মাতাঠাকুরাণী এক এক দিনের ঘটনা আশ্চর্য্যভাবে উল্লেখ করিতেন। গয়ার পাহাড়ে একদিন পাথরে পা ঠেকাতে এরূপ আঘাত লাগিয়াছিল যে, ‘মাগো’ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম। পরে বাড়ী আসিলে মা বলিলেন—“তুই কি খুব আঘাত পেয়েছিলি? পায়ে পাথর ঠেক্‌লে যেমন আঘাত লাগে, হঠাৎ একদিন আমার তেম্‌নি হ’ল। আমি ভাব্‌লুম ঘরে ব’সে আছি পাথর কোথায়? তখন তোর ডাক আমার কাণে বাজ্‌লো, মনে হ’ল তুই কষ্ট পেয়েছিস্।”

স্বর্ণময়ীর মাতাপিতা অনেকদিন পর্য্যন্ত নিঃসন্তান অবস্থায় ছিলেন। পরে একটী মুসলমান ফকিরের বরে ইঁহার জন্ম হয়। বরদানকালে স্বর্ণময়ীর মাতাপিতা ফকিরের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের প্রথম সন্তানটী তাঁহাকে দিবেন, কিন্তু সময়কালে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে ইতস্ততঃ করাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—“এই সন্তান অনেক, সময় স্ববশে থাকিবে না।” এই ঘটনার পর বহুদিন নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হইল। ফকিরেরও কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছিল না। কিন্তু বিধির বিধান অন্যরূপ। ফকিরের দেহান্তের পরে সময়ে সময়ে স্বর্ণময়ীর

দেহে তাঁহার আবির্ভাব হইত। এই অবস্থায় স্বর্ণময়ী ফকিরী ভাষায় নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা বলিতেন, এবং অধিকাংশ সময়ে উন্মাদের ন্যায় থাকিতেন। এতদবস্থায় একবার তিনি বনগ্রামের কোন জঙ্গলের মধ্যে একটী বন্যব্যাঘ্রের সহিত একত্রে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যাঘ্র তাঁহাকে কোনরূপ হিংসা করে নাই। ঘটনাটী গোস্বামী প্রভুর স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা :—"আমি যখন লাহোরে ছিলাম, তখন একদিন হঠাৎ বাড়ীর চিঠি পাইলাম যে, আমার মাতা ঠাকুরাণী পাগল হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। পত্র পড়িয়া যেন আমার সমস্ত শরীরে তাড়িত বহিতে লাগিল। তখনই বাড়ী রওয়ানা হইলাম। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণায় মাতা ঠাকুরাণীর এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। তিনি বড় দয়ালু ছিলেন, কাহারও মুখ মলিন দেখিলে ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইতেন। ইহাতে বাড়ীর লোকে তাঁহাকে বড় জ্বালা দিত। সে যাহাহউক, আমি বাড়ী আসিয়াই অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু তাঁহাকে পাইলাম না। তখন ঘোষণা করিয়া দিলাম, 'যে আমার মাকে আনিয়া দিবে তাহাকে যাতায়াতের খরচ ও পঁচিশ টাকা পুরস্কার দিব।' সমস্ত জেলায় ও থানায় এই ঘোষণা দেওয়া হইল; কিন্তু কেহই মাকে আনিয়া দিতে পারিল না। তখন আমি নিজে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া একদিন রাণাঘাটে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় শুনিতে পাইলাম, কয়েকটী লোক বলিতে বলিতে যাইতেছে—'ভাই, পাগলিনী স্ত্রীলোকটী যেন নক্ষত্রের মত ছুটিয়া চলে।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'মহাশয়! তাঁহাকে কোথায় দেখিলেন?' তাহারা বনগ্রামের নিকটস্থ একটী গ্রামের নাম করিল। তখন রেলগাড়ী হয় নাই। ওখান হইতে হাটিয়া উক্ত গ্রামে যাইতেছি, এমন সময় শুনিতে পাইলাম, রাস্তায় কতকগুলি কাঠুরিয়া বলাবলি করিয়া যাইতেছে—'ভাই, কি অদ্ভুত স্ত্রীলোক! বাঘের গলায় শিয়র দিয়া

ঘুমাইতেছে।' আমি উক্ত স্ত্রীলোকটীর কথা জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল—'বনে কাঠ কাটিতে গিয়া এক আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়াছি। এক উলঙ্গ স্ত্রীলোক একটা বাঘের পেটে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে, আর বাঘটা স্ত্রীলোকটীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।' এই কথা শুনিয়া আমি বনের ভিতর প্রবেশ করিলাম, এবং কিছুক্ষণ অনুসন্ধানের পর একস্থানে দেখিতে পাইলাম যে, সত্য সত্যই বাঘের গায়ে মাথা রাখিয়া মাতা ঠাকুরাণী ঘুমাইতেছেন। তখন গ্রামে গিয়া কতিপয় ভদ্রলোককে এই কথা জানাইলে তাঁহারা আমার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। সকলে একত্র হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম। তখন দূর হইতে শুনিতে পাইলাম, মাতাঠাকুরাণী জাগিয়া বাঘকে বলিতেছেন,—'বাঘ, তুই কার? আমার? আমার যদি হোস্ তবে আমায় পিঠে কর দেখিনি? বুঝিয়াছি তুই আমার নোস্। আমি উলঙ্গ কালী, দশভুজা নই, দশভুজা দুর্গা হ'লে তুই আমায় পিঠে চড়াতি।' মাতা ঠাকুরাণীর কথা শুনিয়া আমরা সকলে বিস্মিত হইলাম। কি আশ্চর্য্য! বাঘটা কিন্তু মাকে একটুকুও হিংসা করিতেছে না। কতক্ষণ পরে মা আবার বলিলেন—'বাঘ তুই থাক্, আমি তোর জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসি।' এই কথা বলিয়া জঙ্গল হইতে বাহির হইতে লাগিলেন। তাঁহাকে কাছে আসিতে দেখিয়া আমি দ্রুতগতিতে যাইয়া তাঁহার পায় পড়িলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন—'তুই কে রে?' আমি ভাবিলাম, যদি এখন ঠিক পরিচয় দেই, তবে কোনও ফল হইবে না। তাই বলিলাম—'আমি আপনার দাস।' মা বলিলেন—'দাস কি রে? দাস কি মুখে বল্লেই হয়? ওহো! তোকে ত চেনা চেনা বোধ হচ্ছে।' আমি বলিলাম—'আপনি জগতের সমস্ত জানেন, আমাকে চিনিবেন না কেন?' মা উত্তর করিলেন—'তা নয়, তোকে যেন কোথায় দেখেছি।' আমি পুনঃপুনঃ মাকে প্রণাম করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে মা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—'তুই এতদিন কোথায় ছিলি ?' আমি দেখিলাম, মা'র চৈতন্য হইয়াছে। তখন বলিলাম—'আমি লাহোরে ছিলাম।' মা উত্তর করিলেন—'তা ত জানি, কবে এসেছিস্ ?' আমি বলিলাম—'বাড়ী আসিয়া দেখি, তুমি বাড়ীতে নাই, তাই তোমার তল্লাসে বাহির হইয়াছি।' এই বলিয়া তাড়াতাড়ি তৈল আনিয়া মায়ের মাথায় দিলাম। তৎপর স্নান করাইলাম। এইরূপ দুই তিনবার স্নান করাইবার পর মায়ের গায়ে যে একপ্রকার দুর্গন্ধ হইয়াছিল, তাহা অন্তর্হিত হইল। তখন নূতন কাপড় পরাইয়া তুলসী-তলায় আসন পাতিয়া মাকে বলিলাম—'মা আহ্নিক কর।' মা বলিলেন—'আহ্নিক কাকে বলে ?' আমি বলিলাম—'মা, আহ্নিক কি তোমার মনে নাই ? আমি ব'লে দেব ?' মা বলিলেন—'বল্ তো ?' তখন মা বাল্যকালে আমাকে যে মন্ত্র দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কাণে বলিলাম। শ্রবণমাত্র মায়ের চোক্ দিয়া দর্ দর্ ধারে জল পড়িতে লাগিল। ক্রমে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। তখন তাঁহাকে লইয়া শান্তিপুরে উপস্থিত হইলাম।"

আর একবার দেবী স্বর্ণময়ী উন্মাদ অবস্থায় শান্তিপুর হইতে একাকিনী ঢাকা গোণ্ডারিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলে, গোস্বামী প্রভু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা, তুমি একাকিনী কি প্রকারে এতদূর পথ অতিক্রম করিয়া আসিলে ?" তদুত্তরে দেবী স্বর্ণময়ী বলিলেন,—"আমাকে সকলে পাগলাগারদে দিতে চেয়েছিল। আমি ভয় পাইয়া শ্যামসুন্দরকে (কুলদেবতা) বলিলাম—শ্যামসুন্দর ! তুমি আমাকে আমার ছেলের কাছে রেখে এস। তিনি বলিলেন— 'তোর ছেলে কোথায় ?' আমি বলিলাম— 'আর চালাকি করিতে হইবে না, শীঘ্র রেখে আয়।' তখন শ্যামসুন্দর তোকে দিবার জন্য তাঁহার গাত্রবস্ত্র আমার হাতে দিয়া আমাকে ঢাকায়

রাখিয়া গেলেন।” এই বলিয়া ৺শ্যামসুন্দরের একখণ্ড উত্তরীয় বস্ত্র গোস্বামী প্রভুর হস্তে অর্পণ করিলেন। গোস্বামী প্রভু ভাবে অভিভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা মস্তকে ধারণ করিলেন।

এই অদ্ভুত রমণীর সম্বন্ধে আরও অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়। শুনিয়াছি, অনেক পরলোক গত আত্মার সঙ্গে ইঁহার নানাবিষয়ের কথাবার্ত্তা হইত। ইঁহাদের কুলদেবতা ৺শ্যামসুন্দর দেবের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ইঁহার নানাপ্রকার কথোপকথন হইত, সূর্য্যে ও বৃক্ষাদির পত্রে পত্রে ইনি রাধাকৃষ্ণ দর্শন করিতেন। গোস্বামী প্রভু ৺পুরুষোত্তমধামে কলেবর পরিত্যাগ করিবেন ইহা বহুকাল পূর্ব্বেই তাঁহার দিব্যদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিল। সেই জন্য তিনি তাঁহাকে মাতৃস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া পুরী গমন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এইরূপ অসাধারণ মাতাপিতার গৃহেই দেশের ভাবী গৌরবরবি প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় সমুদিত হইয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জন্ম ও বাল্যাবস্থা।

১২৪৮ সনের শ্রাবণ মাস। দিবাকর এই মাত্র অস্তমিত হইয়াছেন। প্রকৃতিদেবী সমস্ত দিবসের কোলাহলের পর প্রশান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। সুবিমল সান্ধ্য-সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া পরিশ্রান্তা প্রকৃতি-জননীকে যেন ব্যজন করিতে লাগিলেন। আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া দশদিক আনন্দরসে আপ্লুত করিয়া তুলিল। তারপর ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের ঝুলনযাত্রাপ্রযুক্ত আজ গৌড়মণ্ডল কৃষ্ণপ্রেমে মাতিয়া উঠিয়াছে। স্থানে স্থানে ভক্তমণ্ডলী সমবেত হইয়া, কৃষ্ণগুণগানে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতে লাগিলেন। ঘরে ঘরে মঙ্গল শঙ্খঘণ্টাধ্বনি বাজিয়া উঠিল। সকলেরই চিত্ত সুবিমল ভক্তিরসে পরিপূর্ণ। পুরোহিতগণ "ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। এই সর্ব্বগুণোপেত পরমশুভমুহূর্ত্তে, নদীয়ার অন্তর্গত শিকারপুরের নিকটবর্ত্তী দহকুলনামক গ্রামের এক নিভৃতপ্রান্তরে একটী বৃক্ষতলে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ কৃষ্ণনাম শুনিতে শুনিতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। শাক্যকুল-গৌরবরবি মহাত্মা বুদ্ধদেবও বৃক্ষতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঘটনার কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে কোন কারণে পুলিশের লোক গোস্বামী প্রভুর মাতামহ ৺গৌরীপ্রসাদ জোদ্দার মহাশয়ের বাড়ী ঘেরাও করে। বাটীস্থিত স্ত্রীলোকেরা ভয়ে যিনি যেখানে পারিলেন সরিয়া পড়িলেন। আসন্নপ্রসবা জননী স্বর্ণময়ী, বাড়ীর পশ্চাৎ ভাগে একটী চালিতাবৃক্ষের নীচে কচুবনের মধ্যে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন। বর্ষাপ্রযুক্ত সেখানে অল্প অল্প জলও জমিয়াছিল। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তখন

'লালপাগড়ীর' ভয়ে পুরুষদিগকেও কিরূপ বুদ্ধিহারা ও ত্রস্ত হইতে হইত, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, একটী কুলবধূর পক্ষে এই ঘটনা বিস্ময়কর বোধ হইবে না। সে যাহা হউক, পুলিশের হাঙ্গামা চুকিয়া গেলে, স্বর্ণময়ীকে ঘরে না দেখিয়া বাড়ীর লোকেরা কিঞ্চিৎ ভীত ও চিন্তিত হইলেন। ইতস্ততঃ অনুসন্ধানের পর দেখা গেল যে, তিনি উক্ত বৃক্ষতলে একটী মৃতপ্রায় অজ্ঞান শিশুকে অঙ্কে ধারণ করিয়া ধ্যানমগ্নাবস্থায় উপবিষ্টা রহিয়াছেন। শিশুর দিব্যকান্তিতে চতুর্দ্দিক্ উজ্জ্বল বোধ হইতেছে, নেত্র জলে জননীর বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে।

ভগবান্ রামচন্দ্র, বুদ্ধদেব, মহাত্মা যিশু, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি অবতার ও মহাপুরুষগণের জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা কেহই সাধারণ মানুষের মত জন্মগ্রহণ করেন নাই। সকলের জন্মের সঙ্গেই অলৌকিক ঘটনা বিজড়িত। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের জন্মও সমধিক বিস্ময়জনক। অনুসন্ধানকারিগণ সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন অনুভব করিয়া, দেবী স্বর্ণময়ী আস্তে আস্তে চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন, —"দেখ, এই শিশু আমার পেটে জন্মায় নাই। আকাশ হইতে একটী দিব্যদেহধারী পুরুষ ইহাকে আমার ক্রোড়ে স্থাপনপূর্ব্বক, সমধিক যত্ন-সহকারে ইহার লালনপালন করিতে করযোড়ে অনুনয় বিনয় করিয়া অন্তর্হিত হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে আমার গর্ভলক্ষণও তিরোহিত হইল।" তিনি অপর কোন কোন সময় তাঁহার গর্ভাবস্থার কথাপ্রসঙ্গে যে সকল অদ্ভুত ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিতেন, তাহা তাঁহার স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা :—"রাসপূর্ণিমার দিন আমি গৃহদেবতা ৺শ্যাম-সুন্দরের রাসপূজা দর্শন করিয়া গৃহাভিমুখে যাইতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম যেন, ৺বিগ্রহ হইতে একটী জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি বাহির হইয়া, আমার অঞ্চল ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে গৃহে আগমন করিল। আমি চমকিয়া উঠিলাম।

কিন্তু ফিরিয়া আর কিছুই দেখিলাম না। গর্ভাবস্থায় আমি নানাপ্রকার দেবদেবী দর্শন করিতাম। শয়ন করিয়া আছি, দেখিতাম আমার গর্ভস্থ সন্তান বাহির হইয়া পার্শ্বে শয়ন করিয়া আছে। তাঁহার অঙ্গপ্রভায় গৃহ সমুজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। আমি যখন চলিতাম ফিরিতাম, তখন আমার অঞ্চল ধরিয়া কে যেন নূপুর পায় দিয়া আমার অনুগমন করিত। আমি সর্ব্বদা ভয় পাইতাম। কোন কোন দিন গৃহখানি একপ্রকার স্বর্গীয়গন্ধে আমোদিত হইয়া উঠিত।" গোস্বামী প্রভু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, একদিন স্বর্ণময়ী দেবী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"দেখ্, তোর যে জন্ম, এ স্ত্রীপুরুষসংসর্গের দ্বারা যেরূপে হয়, সেরূপে হয় নাই। তোর পিতা শ্রীক্ষেত্র হইতে আসিয়া মনের দ্বারা আমার ভিতর তোকে স্থাপন করিয়াছিলেন।" গোস্বামী প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি স্থাপন করিয়াছিলেন?" স্বর্ণময়ী বলিলেন—"শালগ্রামের কি চোখ্ কাণ আছে রে? কোন ভাল পণ্ডিতের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে বুঝিতে পারিবি।" সে যাহা হউক, সদ্যোজাত শিশুকে অজ্ঞানাবস্থায় দেখিয়া সকলে চিন্তিত হইলেন। শিশুসহ প্রসূতিকে তাড়াতাড়ি সূতিকাগৃহে লইয়া গিয়া চিকিৎসক ডাকা হইল। ডাক্তার আসিয়া দুইটী ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন; বুকে মালিশ করিবার জন্য অহিফেনসংমিশ্রিত একটী এবং সেবন করাইবার জন্য অপর একটী। মাতা ভুলক্রমে অহিফেন সংযুক্ত ঔষধটিই খাওয়াইয়া দিলেন; কিন্তু বিধাতার কি আশ্চর্য্য বিধান! তাহাতেই সন্তানের উপকার দর্শিল। শিশুটী অল্পক্ষণপরেই চৈতন্য প্রাপ্ত হইল। কুলকামিনীগণ আনন্দে উলুধ্বনি করিয়া উঠিলেন। জননী স্বর্ণময়ীর গণ্ড বহিয়া আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই প্রকারে দেশের ভাবী ধর্ম্মস্থাপয়িতা, সত্যধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য ধরাধামে আবির্ভূত হইলেন।

এই অদ্ভুত বালকের জন্মের ছয় মাস পরে জননী স্বর্ণময়ী শান্তিপুরে পতিগৃহে উপনীতা হইলেন। শুদ্ধসত্ত্ব শ্রীমদানন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয়, পুরুষোত্তমকৃপালব্ধ পুত্রের মুখ দর্শন করতঃ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, গরীবদুঃখীদিগকে যথাসাধ্য দান করিলেন। কিছু দিন পরে মহাসমারোহের সহিত পুত্রের অন্নপ্রাশন ও নামকরণ ক্রিয়া সমাপন করিয়া, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ৺গোপীমাধব গোস্বামী মহাশয়ের অন্তিমকালের প্রতিশ্রুতি অনুসারে, শ্রীমদানন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয় পুত্রটী তদীয় বিধবা ভ্রাতৃ-বধূকে দত্তক প্রদান করিলেন। রাশিচক্রে বালকের দুইটী নাম উঠিয়াছিল, দিগ্বিজয় ও বিজয়কৃষ্ণ। শ্রীমান্ বিজয়কৃষ্ণ স্বীয় মাতৃদেবীকে 'তুতুমা' ও দত্তকগ্রহণকারিণী অন্য মাতাকে "মা-জননী" বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন।

ইহার প্রায় তিনবৎসর পরে শ্রীমান্ বিজয়কৃষ্ণ পিতৃহীন হইলেন। দত্তকগ্রহণকারিণী মাতা ইতঃপূর্ব্বেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, সুতরাং উভয় সন্তানের লালনপালনের ভারই শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দেবীর উপরে পড়িল। তিনি শিষ্যবাড়ী ভ্রমণ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইতেন, তদ্দ্বারাই কোন প্রকারে কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। মাতা, পিতৃহীন বালক দুইটীকে লইয়া কখনও পিত্রালয় শিকারপুরে, কখনও বা শান্তিপুরে বাস করিতেন।

অতি শিশুকাল হইতেই বিজয়কৃষ্ণের সুকোমল পবিত্রহৃদয়ে ধর্ম্মভাবের উন্মেষ দেখা দিয়াছিল। তিনি মাতাপিতা প্রভৃতি আত্মীয়গণের অনুকরণে পূজা-অর্চ্চনা, সন্ধ্যা-বন্দনা, ঠাকুর-নমস্কার, তুলসীবৃক্ষে জলদান ইত্যাদি কর্ম্ম করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন; এবং আপন মনে, নিজের ভাবে ঐ সকল কার্য্যের এমন সুন্দর অনুকরণ করিতেন, যাহাতে বালবৃদ্ধ-বনিতা মুগ্ধ হইয়া যাইত।

বালক বিজয়কৃষ্ণ সময়ে সময়ে স্বীয় কুলদেবতা ৺শ্যামসুন্দরের বিগ্রহকে স্বহস্তে সেবা করিতে অত্যন্ত জেদ করিতেন। কিন্তু তিনি নিতান্ত শিশু ও অনুপবীতী, এজন্য তাঁহাকে শ্যামসুন্দরের মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। ইহাতে তিনি মর্ম্মান্তিক ক্লেশ প্রকাশ করিতেন এবং বাল্যবুদ্ধিবশতঃ ইহার জন্য ৺শ্যামসুন্দরকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া, কখনও মন্দিরের বাহিরে থাকিয়া, কখনও বা স্বপ্নযোগে তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিতেন। এই সময়ে তাঁহার কথাবার্ত্তা, হাবভাবে প্রকাশ পাইত যেন স্বয়ং শ্যামসুন্দরের সহিত তাঁহার বাক্যালাপ ও ভাববিনিময় চলিতেছে।

শিশুকাল হইতেই বিজয়কৃষ্ণ সন্ন্যাসী সাজিতে ভালবাসিতেন। কাপড় ছিঁড়িয়া কৌপীন পরিধান করিতেন। এই সময় তাঁহার মস্তকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জটা ছিল। তজ্জন্য সকলে তাঁহাকে 'জ'টে গোঁসাই' বলিত।

এই সময়ে শান্তিপুরে অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইত। বালক বিজয়কৃষ্ণ, সকলের অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের সঙ্গতে প্রবেশ করিতেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতেন, সতৃষ্ণনয়নে তাঁহাদের ঠাকুরের ভোগ পূজা আরতি দর্শন করিতেন, আর অবিরলধারে তাঁহার চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইত। তাঁহার এই সকল অদ্ভুত কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া উপস্থিত সাধু-সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে সাতিশয় আদর যত্ন করিতেন।

একদিবস অপরাহ্নে বিজয়কৃষ্ণ গৃহ হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, কেহই বলিতে পারে না। এদিকে সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া স্নেহময়ী জননী অত্যন্ত কাতরা হইয়া পড়িলেন। সমস্ত রজনী অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাকে না পাইয়া, আত্মীয়স্বজন প্রমাদ গণিলেন, গৃহে হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইল। পরদিন প্রাতে সংবাদ পাওয়া গেল যে, ৺শ্যামচাঁদের বাড়ী সন্ন্যাসিগণের মধ্যে বালক বিজয়কৃষ্ণ হাসিমুখে বসিয়া

আছে। সাধুগণ তাহাকে অতিশয় যত্নপূর্ব্বক আহার করাইয়া পূর্ব্বরাত্রে তাঁহাদের নিকটে রাখিয়াছিলেন। অপর একদিন বিজয়কৃষ্ণকে গৃহের সন্নিকটে বনের মধ্যে একটী বিল্ববৃক্ষমূলে সাধুদিগের অনুকরণে মুদ্রিত-নেত্র ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল।

বালক বিজয়কৃষ্ণ, সহচরগণসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিয়া খেলা করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। সহচরগণ, বিজয়কৃষ্ণ ও ব্রজ-গোপালকে কৃষ্ণ বলরাম সাজাইয়া, এবং আপনাদিগের মধ্যে কেহ শ্রীদাম, কেহ সুদাম, কেহবা সুবল সাজিয়া অদ্ভুত কৃষ্ণলীলার অভিনয় করিতেন। বালসুলভ সরলতাবশতঃ তাঁহাদের ঐ সকল কার্য্য সকলেরই প্রীতি উৎপাদন করিত। দিবসের খেলা অন্তে, সহচরগণ পরিবেষ্টিত হইয়া যখন দুই ভ্রাতা, দুই হস্ত দ্বারা পরস্পরের গলদেশ ধারণপূর্ব্বক তাঁহাদের অপর হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া—

"কানাই বলাই দুই ভাই।
পথ ছেড়ে দে বাড়ী যাই ॥"

এই গান করতঃ বলয়াকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে নাচিতে গৃহাভিমুখে গমন করিতেন, তখন উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া তাঁহাদের অদ্ভুত চেষ্টা নিরীক্ষণ করিত।

শিকারপুরের পাঠশালাতেই বিজয়কৃষ্ণের বিদ্যারম্ভ হয়। শ্রীমান্ বিজয়কৃষ্ণ বাল্যকালে যদিও অতিশয় চঞ্চল ও একগুঁয়ে ছিলেন, কিন্তু লেখাপড়ায় তিনি কখনও অমনোযোগী ছিলেন না। শান্তিপুরে অবস্থান-কালে তিনি ৺ ভগবান্ সরকার মহাশয়ের পাঠশালাতে বিদ্যাভ্যাস করিতেন।

এই সময় একবার শান্তিপুরে কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়া অনেক লোক

মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণের কতিপয় সহপাঠীও মারা পড়েন। তাঁহাদের মৃত্যুতে শ্রীমান্ বিজয়কৃষ্ণের কোমল প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল; এবং তিনি এত অল্পবয়সেই জন্মমৃত্যুর রহস্য লইয়া বিষম সমস্যায় পতিত হইয়াছিলেন। সহপাঠিগণের মৃত্যুর পর তিনি সর্ব্বদাই এইরূপ চিন্তা করিতেন যে, "আমার সহপাঠিগণ যে স্থানে বসিতেন, যে পুস্তক পাঠ করিতেন, যাহা লইয়া খেলাধূলা করিতেন, তাহা সমস্তই বর্ত্তমান আছে, অথচ তাঁহারা নাই, ইহা কথনই হইতে পারে না। তাঁহারা নিশ্চয়ই কোনও স্থানে আছেন।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি একদিবস পাঠশালায় যাইতেছেন, এমন সময় পথিমধ্যে একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে তাঁহার পরলোকগত সহপাঠিগণ সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"বিজয়! এই দেখ ভাই. আমরা আছি, আমাদের জন্য দুঃখ করিও না।" অকস্মাৎ এইপ্রকার দৈববাণী শুনিয়া, তিনি ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন; এবং দ্রুতপদে পাঠশালায় গিয়া গুরু ভগবান্ সরকার মহাশয়ের নিকটে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। কিন্তু গুরু-মহাশয় এই কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া, বিজয়কৃষ্ণ তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া ঘটনার সত্যতা-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে পুনঃ পুনঃ জেদ করিতে লাগিলেন। অবশেষে গুরুমহাশয় তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া বলিলেন—"তুমি আমাকে তাহাদের কথা শুনাইতে পারিবে ত?" বিজয়কৃষ্ণ সরলপ্রাণে উত্তর করিলেন—"হাঁ, নিশ্চয় পারিব।" এই কথা শুনিয়া ৺সরকার মহাশয় তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তথায় পরলোকগত ছাত্রদিগকে না দেখিয়া, অথবা তাহাদের কথা না শুনিতে পাইয়া, বিজয়কৃষ্ণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। ইহাতে বিজয়কৃষ্ণ অত্যন্ত ভয় পাইয়া পরলোকগত আত্মাদিগকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"দেখ ভাই

সব, তোমরা যেমন পূর্ব্বে আমার সহিত কথা বলিয়াছিলে, সেইরূপ আবার বল, নচেৎ আর রক্ষা নাই ;" এই কথা বলিবামাত্র পরলোকগত বালকেরা সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"গুরুমহাশয়! উহাকে প্রহার করিবেন না, এই দেখুন আমরা আছি।" এই কথা শুনিয়া গুরুমহাশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বিজয়কৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিয়া পুনঃ পুনঃ মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন।

৺ভগবান্ সরকার মহাশয় একজন স্বধর্ম্মপরায়ণ নিষ্ঠাবান্ সাধক-পুরুষ ছিলেন। তিনি বালক বিজয়কৃষ্ণের অসাধারণ সরলতা, সত্যপ্রিয়তা, তেজস্বিতা ইত্যাদি গুণে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে অতিশয় স্নেহের সহিত লেখাপড়া শিক্ষা দিতেন, বিজয়কৃষ্ণও তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। পরবর্ত্তীকালে ৺ভগবান্ সরকার মহাশয়ের কথাপ্রসঙ্গে একদিন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—"গুরু মহাশয় একদিন পাঠশালায় ছাত্রদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—'ওরে ছেলেরা, কা'ল সকালে আসিস্, ঐকসঙ্গে গঙ্গায় নাইতে যা'ব। সেখানে আমি দেহত্যাগ করিব।' সেই রাত্রিতে এই সংবাদ লোকের মুখে মুখে শান্তিপুরময় ব্যাপ্ত হওয়ায়, পরদিন পূর্ব্বাহ্নে পাঠশালা স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধে পূর্ণ হইল। গুরুমহাশয়, সকলকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার পুত্রটিকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাঘাটে উপনীত হইলেন ; এবং স্নানাদি-ক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক সকলকে প্রণামকরতঃ গঙ্গাজলে বসিয়া জপ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। ক্রমে জনতায় গঙ্গাঘাট পূর্ণ হইল। জয়ধ্বনিতে যেন গঙ্গায় তরঙ্গ উঠিল। এইরূপে জপ শেষ করিয়া গুরুমহাশয় বলিলেন—'ছেলে সব, আমি কায়স্থ, তোমরা অনেকে ব্রাহ্মণ, আমি তোমাদিগকে কত তাড়না করিয়াছি, এখন বাপু সকল, আমার মাথায় পা দেও, আর সময় নাই, ঐ দেখ আমার রথ আসিতেছে।' ইহা বলিয়া তিনি দণ্ডায়মান হইলেন এবং নাম করিতে করিতে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিলেন ; আশ্চর্য্যের

বিষয় যে, দেহ পড়িয়া গেল না। তখন সমস্ত ব্রাহ্মণ-শূদ্র ছাত্র মিলিয়া যেমন পিতামাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে হয়, তেমনি তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।”

‘জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন—‘মানবের পক্ষে শিক্ষা, সংসর্গ এবং বংশের প্রভাব অতিক্রম করা দুরূহ।’ এইজন্য উহার প্রত্যেকটি বিজয়কৃষ্ণের চরিত্রে ভক্তি-বিকাশের অনুকূল হইয়াছিল। সকল প্রকার অনুকূলতা তাঁহার ভক্তিপুষ্পকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল; অথবা বিধাতা মানব-মণ্ডলীকে অহৈতুকী ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্যই এই স্বভাবশিশুকে অপার্থিব ভক্তি ভূষণে অলঙ্কৃত করিয়া, হরিনাম-মুখরিত পুণ্যভূমি শান্তিপুরে প্রেরণ করিয়াছিলেন।’

অবতার ও মহাপুরুষগণের জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই বাল্যজীবনে চঞ্চল ও উদ্ধতের শিরোমণি ছিলেন। ভগবান্ যশোদানন্দনের চঞ্চলতা ও দৌরাত্ম্যে ব্রজমণ্ডল অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। নিমাই পণ্ডিতের চাঞ্চল্য ও ঔদ্ধত্য লোকপ্রসিদ্ধ। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, মহাপুরুষগণের সমস্ত মানসিক বৃত্তি, নিখিল শক্তিই সাধারণ মনুষ্য হইতে অত্যধিক। সেই সকল বৃত্তি অথবা শক্তি, দেশ, কাল ও অবস্থা অনুসারে যখন যে দিকে প্রযুক্ত হয়, তখন সেই দিকেই তাহা অসাধারণরূপে প্রকাশ পায়, যাহা দেখিয়া সাধারণ লোক বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়। তাঁহাদিগের বাল্যজীবনের চঞ্চলতা, ঔদ্ধত্য, একগুঁয়েমি ইত্যাদি বৃত্তিগুলি, উত্তরকালে সৎকার্য্যে নির্ভীকতা, সত্য প্রতিপালনে দৃঢ়তা, দুর্নীতি ও দুষ্কার্য্য নিবারণে লোকোত্তর তেজস্বিতা ইত্যাদি গুণে পরিণত হয়।

বিজয়কৃষ্ণও বাল্যকালে অনেক সময় অনেক প্রকার চঞ্চলতা ও কৌতুহলোদ্দীপক চতুরতা প্রকাশ করিতেন; কিন্তু এই বালসুলভ্

চপলতাও কোনও না কোনও প্রকারের অসত্য কি দুর্নীতি নিবারণ চেষ্টায় পর্য্যবসিত হইত। কিছু দিন হইল, শান্তিপুরনিবাসী একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন—"গোস্বামী মহাশয় আমার বাল্যবন্ধু ছিলেন। শিশুকালের চঞ্চলতার মধ্যেও তাঁহার অদ্ভুত সত্যপ্রিয়তা ও অসাধারণ তেজস্বিতা দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি। সাক্ষাৎ অদ্বৈতপ্রভু পুনঃ শান্তিপুরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে আদর মর্য্যাদা করিতে পারিলাম না। তোমরা ধন্য, তাঁহার সঙ্গসুখ ভোগ করিয়াছ।" এই বলিয়া সাশ্রুনয়নে আমাদিগকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন।

একদিবস বিজয়কৃষ্ণ সহচরদিগের সহিত মিলিত হইয়া শান্তিপুর মহকুমার তদানীন্তন ডেপুটী কলেক্টর ৺ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের অশ্ব ধরিয়া তদুপরি আরোহণ করিয়াছিলেন। অশ্বরক্ষক ইহা জানিতে পারিয়া, সুযোগক্রমে বালকদিগকে ধৃত করিতে চেষ্টা করিলে, তাহারা সকলে পলায়ন করিল; কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ পলায়ন করিলেন না। তিনি নির্ভয়চিত্তে অশ্বরক্ষকের সহিত ডেপুটীবাবুর নিকটে উপস্থিত হইলেন। ডেপুটীবাবু সক্রোধে প্রশ্ন করিলেন—"তোমরা আমার অশ্ব লইয়াছিলে?" বিজয়-কৃষ্ণ উত্তর করিলেন—"হাঁ! লইয়াছিলাম।" ডেপুটীবাবু—"কেন লইয়া-ছিলে?" বিজয়কৃষ্ণ—"আরোহণ করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই লইয়া-ছিলাম।" ইহাতে ডেপুটীবাবু কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার অশ্ব লইতে তোমাদের ভয় হইল না? জান আমি কে?" বিজয়কৃষ্ণ পূর্ব্বের ন্যায় দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিলেন—"জানি, আপনি এই স্থানের ডেপুটীবাবু, আপনার অশ্ব লইতে আমাদিগের বিন্দু-মাত্রও ভয় হয় নাই।" বিজয়কৃষ্ণের এই প্রকার নির্ভীকতা, সত্যপ্রিয়তা ও সরলতা দর্শন করিয়া সুবিজ্ঞ ডেপুটীবাবু অতীব সন্তুষ্ট হইলেন, এবং

বালকের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া বলিলেন—"তোমাদের যখন ঘোড়া চড়িবার ইচ্ছা হইবে, তখন আমাকে বলিও, আমি অশ্ব সজ্জিত করিয়া দিব, নচেৎ পড়িয়া যাইতে পার।"

বালক বিজয়কৃষ্ণ যাত্রাগান শুনিতে অতিশয় ভাল বাসিতেন। যে কোন স্থানে যাত্রাগান হইবে বলিয়া সংবাদ পাইতেন, সেই স্থানেই কখনও একাকী কখনও বা সহচরদিগের সহিত, উপস্থিত হইতেন। সেখানে যাইয়াও দুষ্টামী করিতে ছাড়িতেন না। তামাকখোরেরা হুঁকা লইয়া অনেক সময়ে গানের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত করিত। ইহার একটা প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য, বালকের মনে ইহা উদিত হওয়ায়, কোনও সুযোগে হুঁকায় একগাছি সূতা বাঁধিয়া রাখিতেন, এবং তামাক খাইবার সময় উপস্থিত হইলে যখন হুঁকা লইয়া কাড়াকাড়ি লাগিত, তখন দূর হইতে সূতা ধরিয়া টান দিতেন। ইহাতে কল্কীর আগুন চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হওয়াতে যাত্রার আসরের মধ্যে একটা হৈ চৈ পড়িয়া যাইত, আর দুষ্ট বালকেরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিত। তিনি গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে গিয়াও নানা প্রকার আমোদকৌতুক করিতেন। ইঁহার অসীম সাহস ও অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব থাকায় ইঁনি বালকদলের নেতা হইয়াছিলেন।

বাল্যকালে একটী পরলোকগত আত্মা, গোস্বামী প্রভুকে বিপদে আপদে রক্ষা করিতেন। রাত্রিতে যাত্রাগান শুনিতে গিয়া দৈবাৎ সহচর বালকদিগের সঙ্গ ছাড়া হইয়া পড়িলে, অথবা বিপক্ষীয় দলের বালকদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইলে, পূর্ব্বোক্ত আত্মা মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অন্ধকার রাত্রিতে লণ্ঠন ধরিয়া তাঁহাকে বাড়ীতে পৌছাইয়া দিতেন এবং দুর্দ্দান্ত বালকদিগের কবল হইতে রক্ষা করিতেন। এতৎপ্রসঙ্গে গোস্বামীপ্রভু একদিন বলিয়াছিলেন :—"একদিন রাত্রিতে বাড়ী হইতে অনেক দূরে একস্থানে বারোয়ারী গান শুনিতে গিয়া ঘুমাইয়া পড়ি। জাগিয়া দেখি,

যাত্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, লোকজন সব যার যার বাড়ী চলিয়া গিয়াছে; আমি একাকীই ফরাসের উপরে পড়িয়া রহিয়াছি। তখন ভাবিতে লাগিলাম, এখন কেমন করিয়া বাড়ী যাই; এমন সময় একজন লোক খড়ম পায়ে দিয়া চট্‌পট্‌ শব্দ করিতে করিতে লণ্ঠনহস্তে করিয়া আমার নিকটে আগমনপূর্ব্বক বলিল—'চল এখন বাড়ী চল।' নিকটে আসিলে দেখিলাম, ইঁনি আমার পূর্ব্বপরিচিত পথপ্রদর্শক! কারণ, ইহার পূর্ব্বেও দুই তিন বার ইঁনি আমাকে রাত্রিতে পথ দেখাইয়া বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। আমি তখন মনে করিতাম, মা বুঝি আমাকে বাড়ী নিবার জন্য ইঁহাকে আমার নিকট প্রেরণ করেন। একদিন মার মনে সন্দেহ হওয়াতে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুই কার সঙ্গে রাত্রিতে গান শুনিয়া বাড়ী আসিস্?' আমি বলিলাম—'সে কি? তুমি যাহাকে পাঠাও, সেই ত আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইসে।' এই কথা শুনিয়া মা কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইলেন, এবং আমাকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন—'খবরদার আর কখনও রাত্রিতে যাত্রাগান শুনিতে যাইতে পার্‌বি না। শান্তিপুরে অনেক ব্রহ্মদৈত্য বাস করে। কোন্ দিন তোকে ঘাড় মট্‌কাইয়া মারিয়া ফেলিবে।' তারপর বলিলেন—'এই সকল প্রেতাত্মার গয়ায় পিণ্ড দিলে উদ্ধার হয়।' অন্য একদিন আমি আবার ব্রহ্মদৈত্যকে দেখিয়া বলিলাম—"তুমি কে?" সে উত্তর করিল—'তা দিয়া তোর কাজ কি? তুই এখন বাড়ী চল।' আমি বলিলাম—'মা আমাকে বলিয়াছেন—এ সকল স্থানে অনেক ব্রহ্মদৈত্য বাস করিয়া থাকে, তাহারা লোকের উপর অনেক সময় অনেক অত্যাচার করে, তবে ইহাদের নামে গয়ায় পিণ্ড দিলে না কি উদ্ধার হইয়া যায়।' এই কথা শুনিয়া সে উত্তর করিল—'হাঁ, গয়ায় পিণ্ড দিলে উদ্ধার হয়।' এই কথা বলিয়া আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ী যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল,

কিন্তু আমার কোন ভয় উপস্থিত হইল না, তাহার সঙ্গেই বাড়ী চলিলাম। পথিমধ্যে একস্থানে সে আমাকে বলিল—'দেখ, বাঁধা রাস্তা দিয়া গেলে অনেক ঘুরিয়া যাইতে হইবে, কিন্তু (একটী জঙ্গলাকীর্ণ পরিত্যক্ত বাড়ী লক্ষ্য করিয়া) এই পুরাতন ভিটার উপর দিয়া গেলে, অল্প সময়ের মধ্যে বাড়ী যাওয়া যাইবে। তবে এ স্থানের বৃক্ষাদিতে অনেক বানর বাস করে, তাহারা হয়ত যাইবার সময় গাছের ডাল নাড়িতে পারে। তুমি তাহাতে ভয় পাইও না।' এমন সময় গাছের উপর হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল—'তুমি উহাকে কি মিথ্যা বুঝাইতেছ, আমি যদি প্রকৃত কথা বলিয়া দি?' তখন আমার পথপ্রদর্শক আত্মা তাহাকে খুব ধম্‌কাইয়া উত্তর করিল—'বটে, এখনও তোদের শিক্ষা হইল না? যাহার জন্য এত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিস্, সেই দুষ্টপ্রকৃতি এখনও ত্যাগ করিতে পারিতেছিস্ না?' ইত্যবসরে আর একটী আত্মা বৃক্ষের উপর হইতে গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিল—'পরলোক দেখ, পরলোক দেখ।' এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি ত অবাক্। পথপ্রদর্শক আর বাক্যব্যয় না করিয়া, আমাকে সঙ্গে লইয়া গৃহাভিমুখে চলিল। মা এতক্ষণ পর্য্যন্ত ঘরের বাহিরে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। পরলোকগত আত্মা আমাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া নিকটবর্ত্তী এক তালগাছের উপর উঠিয়া গেল। মা তাহাকে স্বচক্ষে দর্শন করিলেন। পরে বলিলেন—'ইনি আমাদের কুলদেবতা ৺শ্যামসুন্দরের পূজারি ছিলেন। ইঁহার নাম ছিল পুরন্দর পূজারি, সেবার জিনিষ অপহরণ করার অপরাধে এই গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।' এই পরলোকগত পুরন্দর পূজারির কথাপ্রসঙ্গে তিনি আরও বলিলেন যে,—'ইনি আর একদিনও আমাকে বিপক্ষদলের বালকদিগের হস্ত হইতে আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন। আমাদের পাড়ার একটী দল ছিল। অপর পাড়ার দলের সঙ্গে অনেক সময় আমাদের নানা বিষয়

লইয়া ঝগড়া মারামারি হইত। একদিন অজ্ঞাতসারে বিরুদ্ধদলের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিলাম। তাহারা আমাকে একাকী পাইয়া প্রহার করিবার জন্য লাঠিহস্তে উপস্থিত হইল। আমি ভাবিলাম, আজ আর রক্ষা নাই। এমন সময় হঠাৎ পুরন্দর পূজারি উপস্থিত হইয়া, আমার চতুর্দ্দিকে ভন্ ভন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। তাহাতে রাশি রাশি ধূলি উত্থিত হইয়া বিরোধীদলের লোকদিগের চোখে মুখে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, আমাকে তাহারা দেখিতে পাইল না। আমি ইত্যবসরে দৌড়িয়া নিজের দলের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম।' পরবর্ত্তীকালে আমি যখন গয়ায় গিয়াছিলাম, তখন ইঁহার উদ্দেশে বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান করিয়াছিলাম।"

গোস্বামীপ্রভু বাল্যকালে অনেকবার প্রাণসঙ্কট বিপদ হইতে আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পাইয়াছেন। একবার একটা চোর, অলঙ্কারের লোভে তাঁহাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া লইয়া যায়। তারপর কি জানি, কি ভাবিয়া অথবা বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া, বালককে তদবস্থায়ই বাটীর নিকট রাখিয়া প্রস্থান করে।

আর একবার জননী স্বর্ণময়ী, বিজয়কৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া কোনও আত্মীয়ের বাড়ীতে বিবাহ উপলক্ষে গমন করিয়াছিলেন। বিবাহের গোলমালের মধ্যে কয়েকজন দস্যু নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহাকে চুরি করিয়া কোন নির্জ্জন অরণ্যস্থিত একটী কালীবাড়ীতে লইয়া গিয়া, দেবীর নিকট বলি দিবার উপক্রম করে। এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে একটী পাগল তথায় আগমনকরতঃ দস্যুদিগের হস্ত হইতে খড়্গ কাড়িয়া লইয়া, তাহা-দিগকে ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দেয়; এবং অবশেষে বিজয়কৃষ্ণকে ক্রোড়ে গ্রহণপূর্ব্বক বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া আত্মীয়গণের নিকট সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করে।

অপর এক সময় স্বর্ণময়ীদেবী শ্রীমান্ ব্রজগোপাল ও বিজয়কৃষ্ণকে

সঙ্গে লইয়া পিত্রালয় হইতে নৌকাপথে শান্তিপুর যাত্রা করেন। নদী ঘুরিয়া যাইতে হইলে শান্তিপুর পৌঁছাইতে দুই তিন দিবস সময়ের আবশ্যক, এতদ্ভিন্ন একটী সোজা পথও ছিল। কিন্তু সেই পথে জল অল্প থাকা প্রযুক্ত নৌকা চলিবে কি না, সে বিষয়ে মাল্লাগণের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। কিন্তু অবশেষে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া সেই পথেই নৌকা চালাইতে লাগিল। কিছুদূর অগ্রসর হইলে, নৌকা বালু-চড়ায় আট্‌কাইয়া গেল, এখন অগ্রসর হওয়া অথবা পিছনে হটিয়া যাওয়া দুইই অসম্ভব হইয়া পড়িল। এদিকে সন্ধ্যা উপস্থিত। সে সকল অঞ্চলে তখন চোর-ডাকাতের ভয় ছিল। জননী স্বর্ণময়ী অত্যন্ত চিন্তিতা হইয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। নৌকা আপনা আপনিই চড়ার উপর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। উপস্থিত সকলে ভয়ে অচেতন হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎকাল পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন, নৌকা শান্তিপুরের ঘাটে রহিয়াছে। তখন ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিতে দিতে জননী স্বর্ণময়ী, বালক দুইটীকে সঙ্গে লইয়া স্বামীগৃহে উপস্থিত হইলেন। ভাবী জীবনে যাঁহার দ্বারা শ্রীমন্ মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত লুপ্তপ্রায় বৈষ্ণবধর্ম্ম পুনর্জীবিত হইবে, বাল্যকালে এইরূপে তাঁহাকে ভগবান্ পুনঃ পুনঃ ভয়ানক ভয়ানক বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

টোলে অধ্যয়ন, উপবীত সংস্কার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ।

পাঠশালার শিক্ষা সমাপনান্তে বিজয়কৃষ্ণ, শান্তিপুরনিবাসী পরম-ভাগবত ৺গোবিন্দচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের টোলে প্রবিষ্ট হন, এবং তথায় এক বৎসরের মধ্যে সমগ্র মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আয়ত্ত করেন। বালকের এইরূপ মেধাশক্তির পরিচয় পাইয়া, শান্তিপুর ও নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দ্বাদশবৎসর বয়ঃক্রমকালে বিজয়কৃষ্ণের উপনয়ন সংস্কার হয়। এই সময়ে কুলপ্রথানুসারে তিনি স্বীয় মাতৃদেবীর নিকট হইতে তান্ত্রিকী দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক যথাশাস্ত্র ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হন। তদবধি তাঁহার জীবনের গতি অদ্ভুতরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। বালক বিজয়কৃষ্ণ এখন বাল্য-চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া, জীবনের কঠোর-কর্ত্তব্যের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। যে নীতি, ধর্ম্মের প্রথম সোপান, যাহার উপর ধর্ম্মকর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, তাহা এই সময়ে দেশ হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে সমস্ত টোল এতদিন পর্য্যন্ত নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল, এখন তাহারই অন্তর্ভুক্ত ছাত্রগণের দুর্নীতিমূলক অত্যাচারে প্রতিবেশীদিগকে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতে হইত। শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যেও অনেকে প্রকাশ্যে ব্যভিচার ও মদ্যাদি-পান করিতে লজ্জাবোধ করিতেন না। দেশের নীতি-ধর্ম্মের এইরূপ ভয়ানক-দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া, বিজয়কৃষ্ণ প্রাণে প্রাণে দারুণ ক্লেশ অনুভব

করিতে লাগিলেন, এবং অবশেষে 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন' এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া, দেশের ছোট বড় বহু লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দুর্নীতির মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন; এবং বাল্য-সহচর-দিগের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া নীতিপরায়ণ তেজস্বী কতকগুলি বালক সংগ্রহ করিয়া একটী দল গঠন করিলেন। নীতিভ্রষ্ট লোকদিগকে সমুচিত শিক্ষা প্রদান করাই এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সমিতির সভ্যগণ প্রথমে দুষ্টলোকদিগকে তাহাদিগের অন্যায় কার্য্যের দোষ দেখাইয়া দিতেন; তাহাতেও ক্ষান্ত না হইলে, তাহাদিগের উপর অন্য প্রকার শাসন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এইরূপ করাতে বিজয়কৃষ্ণ বহু লোকের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইলেন। তাহারা তাঁহাকে নানা প্রকারে অপদস্থ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল।

শান্তিপুরের গঙ্গার ঘাটে তখন স্ত্রী-পুরুষে এক স্থানেই স্নানাদি করিতেন। মহিলাগণ স্নান করিয়া উঠিবার সময় দুষ্ট লোকেরা তাঁহাদিগের প্রতি কুদৃষ্টিপাত করিত। বিজয়কৃষ্ণ প্রকাশ্যভাবে এইরূপ ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করাতে একদল লোক তাহাকে জব্দ করিবার জন্য গোপনে পরামর্শ করিল যে, বিজয়কৃষ্ণ যখন প্রত্যুষে গঙ্গা স্নান করিতে যাইবে, তখন তাহাকে বেদম প্রহার করিতে হইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহাদের এই দুরভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না। তাহারা একদিন অন্ধকারের মধ্যে ভুলক্রমে বিজয়কৃষ্ণ ভাবিয়া, অপর এক ব্যক্তিকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল; পরে ভুল বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইয়া পলায়ন করিল। দুষ্টদিগের দুরভিসন্ধির কথাও প্রকাশিত হইয়া পড়িল। এই ঘটনার কিয়দ্দিন পরে শান্তিপুরের বিশিষ্টলোকদিগের অভিপ্রায়ানুসারে পুরুষ ও রমণীদিগের স্নান করিবার জন্য দুইটী স্বতন্ত্র ঘাট নির্দ্দিষ্ট হইল। নীতিপরায়ণ তেজস্বী বালকের সদিচ্ছাই পূর্ণ হইল।

শান্তিপুরে রাসোৎসবের সময় দেশ-দেশান্তর হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। এই সময় নীতিভ্রষ্ট দুষ্টলোকেরা সুযোগক্রমে অসহায়া রমণীদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে চেষ্টা করে। এই সকল দুর্বৃত্তগণের হস্ত হইতে অবলা রমণীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, তেজস্বী বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার সমিতির সভ্যগণের সহিত দলবদ্ধ হইয়া যাত্রীদিগের মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন, এবং প্রয়োজন হইলে অত্যাচারীদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এই সত্যপ্রতিজ্ঞ নীতিস্মান্ পর-দুঃখকাতর তেজস্বী বালকদিগের ভয়ে আর কেহই যাত্রীদিগের প্রতি অসৎ ব্যবহার করিতে সাহসী হইত না।

একদিন বিজয়কৃষ্ণ একটী দুর্নীতিপরায়ণ বালককে কোনও প্রকারে ভুলাইয়া গঙ্গাগর্ভে বিচরণ করিবার জন্য তাহার সহিত একখানি নৌকায় আরোহণ করিলেন। নৌকা গঙ্গার মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলে পূর্ব্বোক্ত বালকটীকে বলিলেন—"তুমি যদি তোমার চরিত্র সংশোধন করিবার জন্য এখনই প্রতিজ্ঞা না কর, তবে তোমাকে হাত-পা বাঁধিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিব ?" বালক ভয়ে জড়সড় হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলে পর, তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বিদায় দিলেন। বলা বাহুল্য, বালকটী তদবধি সংশোধিত হইয়া গিয়াছিল।

জনৈক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সহধর্ম্মিণী, তাঁহার স্বামীর উপপত্নীর উপদ্রব হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অভিপ্রায়ে বিজয়কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি একদিন সুযোগ বুঝিয়া সদলবলে মার্ মার্ রবে আত্মীয়ের ঘরে প্রবিষ্ট হইলে, স্ত্রীলোকটী ভয়ে প্রস্থান করিল। বয়ঃজ্যেষ্ঠ আত্মীয়টী বিজয়কৃষ্ণকে এই কার্য্যের জন্য তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করিলেন বটে, কিন্তু সত্যের বলে বলীয়ান্ নির্ভীক বালক তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না।

একদিন বিজয়কৃষ্ণের একটী প্রিয় সহচর তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার

জন্য মুখে মন্ত মাখিয়া নিকটে উপস্থিত হইলে, তিনি সহচরের মুখে চপেটাঘাতকরতঃ পুনরায় তাঁহার মুখ দর্শন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। সুহচরটী, এই লঘু পাপে এত গুরুদণ্ড হইবে একথা আদৌ মনে করিতে পারেন নাই। কিছুদিন পর্য্যন্ত বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার সহিত কথা না বলাতে, তিনি এতদূর মর্ম্মাহত হইলেন যে, একেবারে সংসার ত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। এই ঘটনার প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে উক্ত সহচরটী সন্ন্যাসীর বেশে গোস্বামীপ্রভুর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য শান্তিপুরে উপস্থিত হন। গোস্বামীপ্রভু তখন অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া বাল্য-বন্ধুকে দুইবাহু প্রসারণপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন, এবং নিজকৃত কঠোর শাসনের কথা উল্লেখ করিয়া, দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। উত্তরে বন্ধু-প্রবর বলিলেন—"বিজয়, তুমিই আমার ধর্ম্ম-জীবনের মূল। তোমার শাসনেই আমার চৈতন্যের উদয় হইয়াছিল এবং আমি মানবজীবনের গাম্ভীর্য্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম ইত্যাদি।"

এই প্রকারে বিজয়কৃষ্ণ নিজে নীতিপরায়ণ হইয়া, অপরকে নীতি-বিষয়ক উপদেশ ও শিক্ষা প্রদান করিবার সঙ্গে সঙ্গে অত্যধিক নিষ্ঠা সহকারে কুল-প্রথানুসারে স্বধর্ম্ম যাজন করিতে লাগিলেন। প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান ও ইষ্টমন্ত্রজপ, সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যসকল তিনি এমন পরিপাটীরূপে অনুষ্ঠান করিতেন যে, বৃদ্ধেরাও তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতেন, এবং এই অদ্ভুত বালকের ভবিষ্যৎ জীবনসম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা করিতেন। কণ্ঠে তুলসীর মালা, মস্তকে সুদীর্ঘ শিখা, ললাটে মনোহর তিলক, গলদেশে লম্বমান শুভ্র যজ্ঞোপবীত, নধরকান্তিবিশিষ্ট এই নবকিশোর বালকটীকে দেখিয়া শান্তিপুরবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা বিমুগ্ধ হইতেন। তাঁহার বালসুলভ চপলতার সঙ্গে এমন এক অপূর্ব্ব কমনীয় ভাব বিদ্যমান ছিল, তাঁহার স্পষ্টবাদিতা ও তেজস্বিতার সঙ্গে

এমন এক সুস্নিগ্ধ সরলতা ও স্বর্গীয় মাধুর্য্য বিজড়িত ছিল, তাঁহার কঠোর শাসনের মধ্যে এমন এক কল্যাণময় সহৃদয়তা মিশ্রিত ছিল যে, তাঁহার একান্ত বিরুদ্ধবাদীরাও তাঁহাকে সমাদর না করিয়া থাকিতে পারিত না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ, ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ, মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন, উপবীত ত্যাগ, শান্তিপুর সমাজ কর্ত্তৃক পরিবর্জ্জন, বাগআঁচড়ায় অবস্থান।

শান্তিপুরের টোলের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে গোস্বামী প্রভু তাঁহার বাল্য-সহচর শান্তিপুরনিবাসী ৺অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সহিত কলিকাতায় আগমনকরতঃ সংস্কৃত-কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। অঘোরনাথ অতিশয় সাধুপ্রকৃতির লোক ছিলেন বলিয়া সকলে তাঁহাকে সম্মান করিয়া 'সাধু অঘোরনাথ' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। উভয়ের চরিত্রে অনেক বিষয় সামঞ্জস্য থাকা হেতু বাল্যকাল হইতেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের এই ভালবাসা গভীর প্রণয়ে পরিণত হয়; এবং পরবর্ত্তী-কালে উভয়ে প্রবল ধর্ম্মানুরাগে উদ্দীপিত হইয়া, জ্বলন্ত উৎসাহ ও অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে ভারতের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে ব্রহ্মনামের জয়বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু কালের করাল গতিতে অসময়ে অঘোরনাথ, তাঁহার বাল্যসখা, অকপট বন্ধু ও জীবনের ধ্রুবতারা প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের সঙ্গ হইতে বিচ্যুত হন। সাধু অঘোরনাথের পরলোকপ্রাপ্তির পর, গোস্বামী প্রভু তাঁহার কথা বলিতে বলিতে অনেক সময় অশ্রু-সম্বরণ করিতে পারিতেন না।

সংস্কৃত-কলেজে অধ্যয়নকালে গোস্বামী প্রভুর উদ্বাহ-কার্য্য সম্পন্ন হয়। তদীয় মাতুলালয় শীকারপুর গ্রামবাসী পূজ্যপাদ ৺রামচন্দ্র ভাদুড়ী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী যোগমায়া দেবীর সহিত গোস্বামীপ্রভু বিবাহ-

সূত্রে আবদ্ধ হন। বিবাহের সময় তাঁহার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ ও তদীয় পত্নীর বয়স মাত্র ছয় বৎসর ছিল।

সংস্কৃত-কলেজে বেদান্ত পড়িয়া, গোস্বামী প্রভু একজন পরম বৈদান্তিক হইয়া উঠিলেন ; পূজা অর্চ্চনাদিতে তাঁহার আস্থা কমিয়া যাইতে লাগিল, এবং তৎপরিবর্ত্তে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'অহং ব্রহ্ম', এই সকল ভাব তাঁহার অন্তঃস্তল অধিকার করিয়া বসিল। এই সময় একদিবস রংপুর জেলার অন্তর্গত আমলাগাছিনামক গ্রামে গোস্বামী প্রভুর জনৈক পৈত্রিক শিষ্য—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥" ইত্যাদি

মন্ত্রোচ্চারণকরতঃ তাঁহার পদপূজা করিতেছিলেন। গোস্বামী প্রভু তাহাতে চমকিয়া উঠিলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, "আমাতে এ সকল ক্ষমতা নাই, আমি স্বয়ং কিরূপে পরিত্রাণ পাইব তাহার নিশ্চয়তা নাই, দূর হউক, এরূপ কপটাচরণ আর করিব না। যদি কখনও ভগবান্ জীবের পরিত্রাণের ক্ষমতা অর্পণ করেন, তবেই পুনরায় শিষ্য করিব, নতুবা শিষ্য করা অথবা তাহাদের পূজাগ্রহণ করা এই পর্য্যন্ত।" মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, তিনি শিষ্যবাড়ী গমন পরিত্যাগ করিলেন ; এবং স্বাধীনভাবে স্বোপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া কলিকাতা মেডিকেল-কলেজে অধ্যয়নে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি এক দিন দৈববাণী শ্রবণ করিলেন—"পরলোক চিন্তা কর।" কে বলিল, লোক দেখিতে না পাইয়া ভয়ে তাঁহার জ্বর হইয়াছিল।

এই সময় কোন কার্য্যোপলক্ষে গোস্বামী প্রভু বগুড়া জেলায় গমন করেন। তথায় শিববাটিনিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল রায়, হারাধন

বর্দ্ধন্ ও গোবিন্দচন্দ্র দাস নামক তিনজন ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মের সহবাসে তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি ব্রাহ্মসমাজের নাম শুনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু লোকমুখে নানা কথা শুনিয়া ব্রাহ্মদিগকে যথেচ্ছাচারী, সুরাপায়ী বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু বগুড়াবাসী তিনজন ব্রাহ্মের সংস্পর্শে তাঁহার সেই সন্দেহ নিরাকৃত হইল। উক্ত তিনজন ব্রাহ্ম, গোস্বামী প্রভুকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন।

বগুড়া হইতে কলিকাতায় আগমন করিয়া, গোস্বামী প্রভু একজন বন্ধুর দুশ্চেষ্টায় অত্যন্ত ক্লেশে পতিত হইলেন। বন্ধুটি তাঁহার সমস্ত অর্থ চুরি করিয়া, জুয়া খেলিয়া পলায়ন করে। হাতে একটী পয়সাও নাই, অথচ কলিকাতায় থাকিয়া সংস্কৃত-কলেজে পড়িতেও প্রবল ইচ্ছা। অতঃপর তিনি প্রাতঃস্মরণীয় ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার বাসাস্থ কতিপয় ভদ্রসন্তানের দুর্ব্ব্যবহারে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আর কাহাকেও বাসায় স্থান দিবেন না। তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া, গোস্বামী প্রভু ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে আবেদন করিলে, তিনি তাঁহার আবেদনপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কিন্তু গোস্বামী প্রভু, ঠাকুর মহাশয়ের এই কার্য্যে বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না, কারণ তিনি বগুড়াস্থ ব্রাহ্মত্রয়ের নিকটে তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি শুনিয়াছিলেন। মনে করিলেন, অনেক লোকে ইঁহাদিগকে নানারূপে প্রতারণা করে, এজন্য তাঁহার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারেন নাই, তাহাতে তাঁহার দোষ কি? দিবসে উপবাস, রাত্রে গোলদিঘীর পাড়ে সংস্কৃত-কলেজের বারাণ্ডায় শয়ন, এই অবস্থায় তিন চারি দিন কাটিয়া গেল। কলিকাতায় যদিও গোস্বামী প্রভুর অনেক বন্ধু-বান্ধব ছিলেন, কিন্তু বিপদকালে তাঁহাদের নিকটে গেলে কোনরূপ অবজ্ঞায়

পাছে বন্ধুতা নষ্ট হয়, এই আশঙ্কা করিয়া তাঁহাদের বাটীতে গেলেন না। যাঁহার জন্য তিনি এত কষ্টে পতিত হইয়াছিলেন, এমন সময় তাঁহার সেই বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনিও অনাহারে ক্লেশ পাইতেছিলেন। তাঁহার শুষ্ক মুখ দেখিয়া গোস্বামী প্রভুর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি তাঁহাকে কোনরূপ ভৎর্সনা না করিয়া, তাঁহার নিকটে যে চারি আনার পয়সা ছিল, তদ্দ্বারা খাবার কিনিয়া দুই জনে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন; এবং অবশেষে একত্রে একটী ভদ্রলোকের বাসায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভদ্রলোকটী ভয়ানক মাতাল ছিলেন। তিনি নানা উপায়ে গোস্বামী প্রভুকে মদ খাওয়াইতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু গোস্বামী প্রভু তাঁহার সমক্ষেই সুরাপানের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিলে, তিনি গোপনে: গোপনে মদ খাইতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে গোস্বামী প্রভু বলিয়াছিলেন—"সুরাপান-নিবারণ-বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মের শাসন অতি চমৎকার। * ইংরাজি-ভাষা শিক্ষা এবং ইংরাজদিগের সহবাস, খৃষ্টানধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব, বিলাতি-সভ্যতার বাহ্যিক আকর্ষণ, এই সকল কারণে সুরাপান ভারতবর্ষে অধিক প্রচলিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত কারণগুলির একটিরও সাহায্য না পাওয়াতে, ঘোর পাড়াগেঁয়ে অসভ্য হইয়া, সুরাপায়ীদিগকে বিলক্ষণরূপে গালিবর্ষণ করিতাম। তখন আমি অসভ্য না থাকিলে নিশ্চয়ই প্রধান প্রধান লোকের ন্যায়, আমিও সুরাপায়ী হইতাম, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।" †

এই সময় গোস্বামী প্রভুর বগুড়াস্থ বন্ধুত্রয়ের ব্রাহ্মসমাজে যাইবার অনুরোধের কথা তাঁহার মনে হইল। সেই দিন বুধবার ছিল, সায়ংকাল

---

* "মদ্যমদেয়মপেয়মগ্রাহ্যং" ইহাই মদ্যপাননিষেধক শ্রুতিবাক্য।

† গোস্বামী মহাশয় প্রণীত 'ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা' নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

উপস্থিত হইলেই তিনি ব্রাহ্মসমাজে গমন করিলেন। সমাজে গিয়া সে স্থানের আলোকমালা, সুমধুর সঙ্গীত, ভক্তিভাবে স্তোত্র-পাঠ, বহুসংখ্যক লোকের গম্ভীর ভাব ইত্যাদি দর্শন ও শ্রবণ করিয়া, গোস্বামী প্রভু ব্রাহ্মসমাজকে স্বর্গধাম বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মসমাজসম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্বের ভ্রান্ত-সংস্কার দূর হইল। সেই দিন আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'পাপীর দুর্দ্দশা ও ঈশ্বরের বিশেষ করুণা' সম্বন্ধে একটী অতীব হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতা শুনিয়া গোস্বামী প্রভুর পূর্ব্বকার ভক্তিভাব স্মৃতিপথে উদিত হইল। এতদিন যে ইষ্ট-দেবতার পূজা করেন নাই, তজ্জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল; অশ্রু, কম্প ইত্যাদি সাত্বিকভাব তাঁহার শরীরে প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি নিজকে নিতান্ত নিরাশ্রয় অনুভব করিয়া, মনে মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন—"দয়াময় ঈশ্বর, ধর্ম্মসম্বন্ধে আমার ন্যায় হতভাগ্য লোক বোধ হয় পৃথিবীতে আর কেহ নাই। পূর্ব্বে ইষ্ট-দেবতার পূজা করিয়া অপার আনন্দ ভোগ করিতাম, এখন তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছি। এই মাত্র শুনিলাম, তুমি অনাথের নাথ। প্রভো! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমি আমাকে রাখ, আমি আর কোথায়ও যাইব না। তোমার দ্বারেই পড়িয়া রহিলাম।" এই প্রার্থনা করিবামাত্র তিনি অনেক পরিমাণে শান্তিলাভ করিলেন এবং প্রাণে অধিকতর বল অনুভব করিতে লাগিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, মনে মনে তাঁহাকে ধর্ম্মজীবনের গুরু বলিয়া ভক্তিভাবে প্রণামপূর্ব্বক ব্রাহ্মসমাজ হইতে বহির্গত হইলেন। এইরূপে অনন্ত-লীলাময়ের একটী অপূর্ব্ব লীলা-রস প্রকটন করিবার জন্য, ভারতের লুপ্তপ্রায় ব্রহ্মবিদ্যার পুনঃসংস্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে, কলি-কলুষনাশন তারকব্রহ্ম হরিনাম জীবের ঘরে ঘরে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে, নিষ্ঠাবান্, নীতিপরায়ণ, তেজস্বী, ক্ষমাশীল,

পরদুঃখকাতর, সত্যের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জনক্ষম, শান্তিপুরের অকলঙ্কচন্দ্র বিজয়কৃষ্ণ, শুভদিনে শুভমুহূর্ত্তে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেন।

এই সময় হইতে গোস্বামী প্রভু, প্রত্যহ নিয়মিত উপাসনা করিয়া অপার শান্তিসুখ অনুভব করিতেন ; এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে অভিলাষী হইতেন, নির্জ্জনে প্রার্থনা করিয়া দয়াময় পিতার নিকট হইতে তাহার উপযুক্ত উত্তর পাইতে লাগিলেন। যে দিন যে সত্য প্রাপ্ত হইতেন, তাহা লিখিয়া রাখিতেন ; এবং সেই লেখাগুলি সংগ্রহ করিয়া 'ধর্ম্মশিক্ষা' নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। এই সকল সত্য-লাভসম্বন্ধে গোস্বামী প্রভু তাঁহার অভিমত, প্রচারকের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বিষয়ক আলোচনাপ্রসঙ্গে তাৎকালিক 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রিকাতে অতি সুস্পষ্ট-ভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তথা হইতে তাহার কতকাংশ নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করা হইল যথা :—

"আমি একজন ব্রাহ্মধর্ম্মের অধম প্রচারক। আমি নামের বা গৌরবের জন্য প্রচার-ব্রত গ্রহণ করি নাই। আমার আত্মার গভীর স্থানে কি একটী আশ্চর্য্য শক্তি আছে। এ শক্তি আমার নহে। ইহা আমার যত্নসাপেক্ষ নহে, ইহার উপর কোন প্রভুত্ব নাই। আমার ইচ্ছার সঙ্গে ও ইহার সঙ্গে প্রায় কোন সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। এ শক্তি আমাকে অন্ধের ন্যায় পরিচালন করে এবং ভবিষ্যতে কোথায় পরিচালন করিবে, বলিতে পারি না। ইঁহা আমার প্রবৃত্তিকে জগতের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা পরিশ্রম করিতে আদেশ করে। ঈশ্বরের ইচ্ছানুগত কার্য্যসম্পাদনে ইঁহাই আমাকে উত্তেজনা করে, এবং নিজের আত্মার মহোন্নতি সাধন করিতেও ব্যাকুল করে। ইঁহার আদেশ এইরূপ পরিষ্কার ও বোধগম্য যে, আমি কখনও ইঁহা বিস্মৃত হইতে ও অগ্রাহ্য করিতে পারি না। ইঁহাই আমাকে প্রচারকনাম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। আমি

সর্ব্বদা মনকে বুঝাই, বলি 'হৃদয়, তুমি কি জানিতেছ না যে, তুমি অত্যন্ত মলিন ও অধম। তুমি কি সাহসে প্রচারকার্য্যের গুরুভার আপনার মস্তকে লইতে অগ্রসর হইলে?' কিন্তু পরক্ষণেই উপরিলিখিত শক্তি আমার অন্তরে উদ্বেলিত হইয়া উঠে এবং বলে—'তুমি অগ্রসর হও।' আমার বিশ্বাস, এই শক্তির আদেশ ঈশ্বরের বাক্য, ইঁহা প্রচারকের জীবন। ইঁহাই ভয় বিপদের সম্বল, নিরাশার ঔষধ, প্রার্থনার ইন্ধন। ইঁহা ব্যতীত আমি অন্ধ অপেক্ষাও অসহায় হইয়া যাই, মুমূর্ষু অপেক্ষাও নির্জীব হইয়া যাই।"

"আমি সততই এই শক্তির আদেশ গ্রাহ্য করিতে চেষ্টা করি। শীঘ্রই হউক্ আর বিলম্বেই হউক তাহা প্রতিপালন করি; এবং যখনই প্রতিপালন করিতে সাহসী হই, তখনই সফলতা লাভ করি। * * * * পাপে পুণ্যে, সুখে অসুখে, সম্পদে দারিদ্র্যে আমি এই অদ্ভুত শক্তির আদেশ শুনিতে পাই। নিষ্কলঙ্ক নীল আকাশ দেখিয়া হৃদয় যখন উচ্চ ও প্রশস্ত হয়, তখন ইঁহা আমাকে বলে—'তুমি এমত সুন্দর জগতের একস্থানে বসিয়া কি করিবে?' যখন সুমন্দ সুমিষ্ট মারুত আমার তাবৎ শরীরকে সুখী করে তখন ইঁহা বলে, 'তুমি কি সুখে গৃহে বসিয়া আছ? এই অনিল-হিল্লোল কোথা হইতে আসিতেছে, কোথায় যাইতেছে বিবেচনা কর এবং তুমিও সেইরূপ সর্ব্বস্থানে ভ্রমণ কর। ইহার রমণীয়তা দেশভেদে, কালভেদে অসমান নহে; তোমার অনুরাগ ও চেষ্টা সেইরূপ মধুর বাহিনী হইবে! অগ্রসর হও।' অমনি আমার শরীর মন ব্যাকুলিত হইয়া উঠে; এবং যেখানে তাঁহার কার্য্য সেইখানেই যাইতে ব্যস্ত হয়। 'অগ্রসর হও' এই প্রকার উক্তির আদেশ শুনিলে আমার হৃৎকম্প হয়, ভয়ে দুঃখে, বিশ্বাসে বিস্ময়ে অন্তর পরিপূর্ণ হয়। আমি কোনক্রমেই ঐ আদেশ না শুনিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। ইহা আমার গৌরব নহে

কিন্তু মনের কথা; এবং কেনই যে এ কথা লোকের বিশ্বাসযোগ্য হইবে না, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আমার সকল অবস্থাতেই আমি ইঁহার বশবর্ত্তী হইয়াছি, এবং সকল অবস্থাতেই হইব। পরমেশ্বর আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

অতঃপর গোঁস্বামী প্রভু কলিকাতা হইতে বগুড়া হইয়া শান্তিপুর গমন করিলেন। তথায় একদিন তিনি মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন যে, ভগবান্ সমস্ত মনুষ্যকে সৃজন করিয়াছেন, তিনিই সকলের মাতা-পিতা, সুতরাং প্রত্যেক নরনারীকে ভাইভগিনী বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর যখন সকলের প্রাণেই বাস করেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না, এজন্য মানুষ মানুষকে ঘৃণা করিলে নিশ্চয়ই মহাপাপ হয়। অতএব জাতিভেদ স্বীকার করিলে ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া স্বীকার করা যায় কি প্রকারে? এই প্রকার আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে একাদশ-বর্ষীয় একটী বালক হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"যদি তুমি জাতিভেদ না মান তবে পৈতা রাখিয়াছ কেন?" বালকের কথা ঠিক বোধ হওয়াতে, গোস্বামী প্রভু তৎক্ষণাৎ উপবীত ত্যাগ করিলেন। জননী স্বর্ণময়ী এই ব্যাপার অবগত হইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলে, মাতৃহত্যা-ভয়ে গোস্বামী প্রভু পুনরায় উপবীত গ্রহণ করিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, গোস্বামী প্রভু কলিকাতায় আসিয়া মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালাবিভাগে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়, একদিন শ্রবণ করিলেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হয়, দীক্ষিত না হইলে ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি পায় না। এই কথায় বিশ্বাস হওয়াতে তিনি ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু উপবীত ত্যাগ করিতে না পারিয়া, গোস্বামী প্রভু অত্যন্ত অশান্তিভোগ করিতে লাগিলেন। একদিন ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে

গোস্বামী প্রভু প্রশ্ন করিলেন—"উপবীত রাখা উচিত কি না, মৎস্য-মাংস আহার করা উচিত কি না?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন—"উপবীত রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। উপবীত না রাখিলে সমাজের অনিষ্ট হয়। এই দেখ, আমি উপবীত রাখিয়াছি। মৎস্য-মাংস না খাইলে শরীর রক্ষা হয় না; মশা ছারপোকা যখন মার, তখন অন্য জীবহত্যায় দোষ কি?" এই দুইটী উত্তর শুনিয়া গোস্বামী প্রভু সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না; কিন্তু তিনি দেবেন্দ্রনাথের অন্যান্য গুণ স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি বীতশ্রদ্ধও হইলেন না।

গোস্বামী প্রভু মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নকালে একবার কলেজের অধ্যক্ষের সহিত বাঙ্গলা বিভাগের ছাত্রগণের বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়। অধ্যক্ষ মহাশয় একটী ছাত্রকে ঔষধচুরির অপবাদ দিয়া পুলিশের হস্তে অর্পণ করেন। গোলযোগের ইহাই হেতু; কিন্তু গোস্বামী প্রভুর নিকটে এই কার্য্য অতীব অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হওয়ায়, তিনি ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন, এবং বাঙ্গালাবিভাগের অপরাপর ছাত্রদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া, একযোগে কলেজ পরিত্যাগ করেন। কলেজ পরিত্যাগ করিয়া ছাত্রগণ দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহায্যপ্রার্থী হন। তিনি সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, ছাত্রগণের পৃষ্ঠপোষকস্বরূপ তদানীন্তন ছোটলাট মহামতি বিডন্ সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার সহায়তায় সমস্ত বিবাদ মিটাইয়া দেন। কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়, লাট সাহেবের আদেশে ছাত্রগণের নিকটে তাঁহার কার্য্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া, বিনাদণ্ডে তাহাদিগকে কলেজে গ্রহণ করেন। এই ঘটনা উপলক্ষে গোস্বামী প্রভু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হন। তিনি, গোস্বামী প্রভুর অমানুষিক তেজস্বিতা, অসাধারণ ন্যায়নিষ্ঠা, তীব্র ধর্ম্মানুরাগ ইত্যাদি গুণে মুগ্ধ হন; এবং একদিবস তাঁহার

মুখে ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। তখন প্রসঙ্গক্রমে গোস্বামী প্রভু বিদ্যাসাগরমহাশয় প্রণীত 'বোধোদয়' নামক গ্রন্থে, প্রকৃত বোধ উদয়ের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ ভগবদ্বিষয়ক কোন কথা না থাকাতে, অতীব দুঃখ প্রকাশ করেন। উদারচরিত্র, গুণগ্রাহী বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সূক্ষ্মদর্শী ধর্ম্মপ্রাণ যুবকের কার্য্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, পরবর্ত্তী সংস্করণে ভগবদ্বিষয়ক কথা সন্নিবিষ্ট করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন এবং তাহার পরের সংস্করণেই উক্ত গ্রন্থে ঈশ্বরবিষয়ক একটী নূতন পাঠ সংযুক্ত করেন।

এই সময় পূর্ব্ববঙ্গবাসী মেডিকেল কলেজের কতিপয় ছাত্র একত্রিত হইয়া 'হিতসঞ্চারিণী' নামে একটী সভা সংগঠনপূর্ব্বক নীতি, ধর্ম্মতত্ত্ব ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন। গোস্বামী প্রভু এই সভায় রীতিমত যোগ দিতেন। এই সভায় একদিন আলোচিত হইল যে, যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি হইবে, তাহা প্রতিপালন না করা মহাপাপ ও কপটতা। এই আলোচনার পরই বাটীতে পত্র লিখিয়া গোস্বামী প্রভু উপবীত ত্যাগ করিলেন। ইহা লইয়া চতুর্দ্দিকে তুমুল আন্দোলন উত্থিত হইল। সোমপ্রকাশ পত্রিকার সম্পাদক ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, গোস্বামী প্রভুকে এই কার্য্যের জন্য উৎসাহদান, এবং উপবীতত্যাগের বিরোধী বলিয়া, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিলেন।

গোস্বামী প্রভু বাল্যকাল হইতেই অতীব পরদুঃখকাতর ছিলেন। মানুষের কথা দূরে থাকুক, সামান্য জীবজন্তুর ক্লেশ দেখিলেও তিনি কাঁদিয়া ফেলিতেন এবং তাহা অপনোদন করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এই বৃত্তি অধিকতর প্রস্ফুটিত ও অনন্তদিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসা অবধি ধর্ম্মের অবনতি, নরনারীর পাপতাপ, সমাজের ভ্রম কুসংস্কার ইত্যাদি

তাঁহাকে অত্যধিক ক্লিষ্ট করিতে লাগিল। কেমন করিয়া, কি উপায়ে ইহার প্রতিবিধান হইতে পারে, ইহা ভাবিয়া তিনি আকুল হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে একদিন হঠাৎ তাঁহার মনে উদয় হইল যে, পথে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে, এবং সেই দিনই অপরাহ্নে প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্মুখে রাস্তার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, ব্রাহ্মসমাজের সরল সত্যসকল প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার জ্বলন্ত উৎসাহপূর্ণ, অপার্থিব ভক্তিরস-সিক্ত, প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া, প্রায় চারি পাঁচশত লোক, বক্তৃতা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় রাজপথে দণ্ডায়মান ছিল। এইরূপে ব্রাহ্মসমাজে সর্ব্বপ্রথম প্রচারপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল। ইহার পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের কোন প্রচারক ছিল না অথবা বক্তৃতা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের ভাবও কাহারও মনে উদিত হয় নাই।

১৮৬০ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় 'সঙ্গতসভা' নামে একটী সভা স্থাপিত হয়। ভক্তিভাজন কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়, বন্ধুবর্গ লইয়া এই সভায় ধর্ম্মালোচনা করিতেন। এই স্থানে কেশবচন্দ্রের সহিত গোস্বামী প্রভুর প্রথম পরিচয় হয়। গোস্বামী প্রভু তদবধি 'সঙ্গতসভায়' যোগদান উপলক্ষে, যতই কেশবচন্দ্রের সহিত মিশিতে আরম্ভ করিলেন, ততই তাঁহার সরলতা, তেজস্বিতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা ইত্যাদি গুণে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন ; এবং অচিরকালমধ্যেই দুই স্বভাবসাধু গভীর প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, দুই জনই দুই জনের প্রধান অবলম্বন হইলেন। দুই জনেরই এক লক্ষ্য, এক উদ্দেশ্য হইল। এইরূপে দুইটী শক্তিশালী মহাপুরুষ, হাত ধরাধরি করিয়া জ্বলন্ত উৎসাহে, নির্ভীক-হৃদয়ে অশেষবিধ বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া, জীবের ঘরে ঘরে সর্ব্বসুমঙ্গল পরিত্রাণবার্ত্তা প্রচার করিতে অগ্রসর হইলেন।

এই সময়ে একবার গোস্বামী প্রভু শান্তিপুর গমন করেন। তথায়

উপস্থিত হইলে, উপবীতত্যাগব্যাপার লইয়া ঘোর আন্দোলন হইতে লাগিল। শান্তিপুরবাসীরা গোস্বামী প্রভুর উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিল। পথে বহির্গত হইলে, কেহ তাঁহাকে গালি দিত, কেহ তাঁহার গাত্রে ধূলি নিক্ষেপ করিত, কেহবা তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইত।

একদিবস কোন গোস্বামিবাড়ী কীর্ত্তন শুনিতে গিয়া, তিনি অঙ্গনের প্রাচীর ঘেসিয়া অপরাপর গোস্বামিসন্তানগণের সহিত একাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। এই সুযোগে শান্তিপুরবাসী কতিপয় নীচপ্রকৃতির লোক, একটী দীর্ঘ জুতার মালা গাঁথিয়া ছাদের উপর হইতে গোস্বামী প্রভুর গলদেশ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিল; কিন্তু বিধির বিধান অন্যরূপ। উক্ত মালা প্রাচীরসংলগ্ন একটী লৌহশলাকায় ঠেকিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া সেই বাটীস্থিত একটী গোস্বামিসন্তানেরই গলদেশে নিপতিত হইয়াছিল!

অপর এক দিবস কোন স্থানে কীর্ত্তনের মধ্যে গোস্বামী প্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভাবাবেশে তিনি কখন হাস্য, কখনও ক্রন্দন করিতেছিলেন। ইহাতে তাঁহার বিদ্বেষী কতিপয় অব্রসজ্ঞ গোস্বামি-সন্তান তাঁহাকে কীর্ত্তনের বিঘ্নকারী মনে করিয়া কীর্ত্তনস্থল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন; এবং সেই সময় অপর একজন জিঘাংসাপরায়ণ লোক গোস্বামী প্রভুকে কপটাচারী জ্ঞান করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য একটী চিমটা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাঁহার গায়ে চাপিয়া ধরে। কিন্তু গোস্বামী প্রভু তখন ভাবাবেশে ইহজগৎ ছাড়িয়া অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রবেশপূর্ব্বক, অনন্তলীলারসময়ের লীলারস সম্ভোগ করিতেছিলেন, সুতরাং ইহার কিছুই তিনি তখন জানিতে পারিয়াছিলেন না।

প্রবাদ আছে যে, যখন শ্রীগৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণানন্তর শান্তিপুর

হইতে পুরীধামে যাত্রা করেন, তখন শচীমাতা ও ভক্তবৃন্দের বিশেষ আগ্রহে শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুকে শান্তিপুরের কোন নির্জ্জনস্থানে বাস করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। মহাপ্রভু তাহাতে সম্মত না হওয়াতে অদ্বৈতপ্রভু অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলিলেন যে, "তুমি যেমন আমাদের আন্তরিক অনুরোধ উপেক্ষা করতঃ প্রাণে দারুণ ব্যথা দিয়া চলিয়া যাইতেছ, তেমনি তোমাকেও একদিন ক্লেশভোগ করিতে হইবে। এই বংশে তোমাকে আসিতে হইবে। তখন ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিলেও, কেহ তোমার কথায় কর্ণপাত করিবে না, অপিচ লোকেরা তোমার গায়ে ধূলি নিক্ষেপ করিবে, তোমাকে উপহাস করিবে, আরও সহস্র অপমানে নির্য্যাতন করিবে"। বস্তুতঃ গোস্বামী প্রভুর উপর এই সময় শান্তিপুরবাসিগণ যেরূপ অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে অদ্বৈত প্রভুর পূর্ব্বোক্ত অভিসম্পাতের কথা স্বতঃই মনে উদিত হয়। সে যাহা হউক, উপবীত ত্যাগ করাতে গোস্বামী প্রভুর ব্রাহ্মবন্ধুগণও তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিলেন। গোস্বামী প্রভুর অগ্রজ হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া এক প্রকাণ্ড সভা আহ্বান করতঃ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। শান্তিপুরের অপরাপর গোস্বামিগণ তাঁহাকে শীঘ্র শান্তিপুর ত্যাগ করিতে জেদ করাতে, তিনি নির্ভীক-হৃদয়ে উত্তর করিলেন—"আমি কিছুদিন শান্তিপুরে থাকিয়া ইহার উপকার করিতে চেষ্টা করিব। আমার বিশ্বাস যে, কালে এই শ্যামসুন্দরের মন্দির ব্রহ্মমন্দিরে পরিণত হইবে।" অতঃপর তিনি কিছুদিন শান্তিপুরে অবস্থান পূর্ব্বক তথায় একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন।

গোস্বামী প্রভুর আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত কিশোরিলাল মৈত্র মহাশয় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না। এই অপরাধে মৈত্র মহাশয়কে শান্তিপুর ত্যাগ

করিতে হইল। তিনি গোস্বামী প্রভুর সঙ্গে সপরিবারে কলিকাতায় আগমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব তখন চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। যশোহর জেলার অন্তর্গত বাগআঁচড়া গ্রাম হইতে অনেকগুলি ধর্ম্মার্থী লোক, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া কলিকাতাস্থ প্রচারকদিগের নিকট পত্র লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু সেখানে যায় কে? উপযুক্ত প্রচারক কোথায়? এই ঘটনা অবগত হইয়া গোস্বামী প্রভুর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি তথায় যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। এদিকে তাঁহার মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষার সময় অতি নিকটবর্ত্তী। এই সময় কলেজ ত্যাগ করিলে ভবিষ্যতে কি প্রকারে তাঁহার পরিবার প্রতিপালিত হইবে, এই আশঙ্কা করিয়া গোস্বামী প্রভুর কতিপয় আত্মীয় বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে বাগআঁচড়ায় যাইতে বাধা দিতে লাগিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিলেন যে, "যিনি মরুভূমিতে তৃণগুল্ম রক্ষা করেন, সমুদ্রের গভীর নীরমধ্যে প্রাণিপুঞ্জকে প্রতিপালন করিতেছেন, তিনি কি অনাহারে দুঃখী পরিবারকে বিনাশ করিবেন?" এই কথা শুনিয়া তাঁহারা সকলে নিরস্ত হইলেন।

কিন্তু ভক্তভাজন আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বলিলেন যে, "ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক হইতে হইলে রীতিমত পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইবে।" গোস্বামী প্রভু পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইলেন এবং রীতিমত পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। তৎপর কেশববাবু আদেশ করিলেন যে প্রথম হইতে সমস্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পাঠ করিতে হইবে। গোস্বামী প্রভু প্রায় দুই মাস পরিশ্রম করিয়া তত্ত্ববোধিনীও পাঠ করিলেন। অতঃপর আচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে প্রধান আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকটে যাইতে অনুজ্ঞা করিলেন। অনুমতি পাইয়া গোস্বামী প্রভু শ্রীরামপুরে দেবেন্দ্রনাথের নিকটে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাকে প্রচারক

বলিয়া স্বীকার ও গ্রহণ করিলেন; এবং কিয়ৎকাল তাঁহার নিকটে তৎকৃত সংস্কৃত "ব্রাহ্মধর্ম্ম" নামক পুস্তক অধ্যয়ন করিতে বলিলেন। অধ্যয়ন শেষ হইলে মহর্ষি তাঁহাকে প্রথমতঃ কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে প্রচার করিতে আদেশ করিলেন। তিনি তিন চারি মাস যাবৎ পটলডাঙ্গা, নেবুতলা, শ্রীরামপুর, কোন্নগর ইত্যাদি স্থানে প্রচার করিলে পর, আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বাগআঁচড়ায় যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন। তদনুসারে তিনি ১৭৮৫ শকের ১০ই পৌষ বাগআঁচড়ায় আগমন করিলেন। এস্থানের ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহার প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল। মূর্খ লোকের হাতে পড়িয়া ধর্ম্মের কিরূপ অধোগতি হইতে পারে, তাহা তিনি এইস্থানে বিশেষ ভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি "ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যথা—"মহাত্মা চৈতন্যের বিশুদ্ধভক্তিময় ধর্ম্ম অধিকাংশ মূর্খলোকের হস্তে পড়িয়া কলঙ্কিত হইয়া গেল। বাগ-আঁচড়ার অবস্থা প্রায় সেইরূপই হইতেছে। কতকগুলি লোক ব্যভিচারকে ধর্ম্মের নামে প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিতেছে। জ্ঞানচর্চ্চা ভিন্ন এই সকল অভদ্র ব্যবহার হইতে কিরূপে রক্ষা পাওয়া যায়? দুর্ভিক্ষে ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে অন্নদান না করিলে, মহামারীতে পীড়িত ব্যক্তিকে ঔষধ পথ্য প্রদান না করিলে লোকে নিষ্ঠুরতা বলে, কিন্তু জ্ঞানহীন মূর্খদিগের আন্তরিক দুর্দ্দশা, ধর্ম্মহীন পাপদগ্ধ মনুষ্যের হৃদয়-যন্ত্রণা দূরীভূত না করিলে কেহই নিষ্ঠুরতা মনে করে না। দুঃখ দূর করাই যদি দয়ার কার্য্য হয়, তবে পাপযন্ত্রণা দূর করা অপেক্ষা পৃথিবীতে দয়ার কার্য্য আর কিছুই নাই। যাহারা কখনও পাপের যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, তাহারাই জানে অন্নদান অপেক্ষা স্বর্গীয় উপদেশের মূল্য কত অধিক। যে পাপের যন্ত্রণা ভোগ করে, সেই ব্যক্তিই পাপদগ্ধ মনুষ্যের জন্য অশ্রুপাত করে।

বাগআঁচড়ার শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিলে ক্রন্দন না করিয়া থাকা যায় না।" অতঃপর, এই স্থানের অনেকগুলি ধর্ম্মপিপাসু লোক গোস্বামী প্রভুর নিকটে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। জ্ঞানের চর্চ্চা না হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থায়ী হইবে না, এই বিবেচনা করিয়া তিনি এইস্থানে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, এবং কিছুদিন থাকিয়া প্রত্যহ তথায় ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা করিতে লাগিলেন।

এই সময় একদিন রাত্রে গোস্বামী প্রভু একটী আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন করেন। স্বপ্নটী যথাযথ বিবৃত করা যাইতেছে :—

তিনি দেখিলেন যে, কালীমল্লিক নামক জনৈক পরলোকগত ব্রাহ্ম তাঁহার নিকটে আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে একটি কুকুর ও বিড়াল আছে। তিনি আসিয়া বলিলেন যে—"আমি আমার মৃত্যুসময়ে একটি উইল করিয়া গিয়াছি, সেই উইলে এইরূপ লেখা আছে যে, আমার স্ত্রী স্বধর্ম্মে থাকিলে ও স্বধর্ম্মানুযায়ী আমার শ্রাদ্ধ করিলে, জীবিতাবস্থায় আমার সম্পত্তি ভোগ করিতে পাইবে। তাহার মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি আমার ভাগিনেয়তে পর্য্যাপ্ত হইবে, আমার স্ত্রী স্বধর্ম্মনিরত না থাকিলে সমস্ত সম্পত্তি আমার ভাগিনেয় পাইবে, এবং আমার ভাগিনেয় ধর্ম্মানুযায়ী আমার শ্রাদ্ধাদি করিতে বাধ্য থাকিবে। কিন্তু আমার ত্যক্ত-সম্পত্তি বর্ত্তমানে আমার জ্ঞাতিগণ ভোগদখল করিতেছে, তাহারা আমার শ্রাদ্ধাদি পর্য্যন্ত করে নাই। বর্ত্তমানে আমি বিশেষ কষ্টে আছি। আপনি একটা ব্যবস্থা করিয়া আমার কষ্ট অপনোদন করুন।" গোস্বামী প্রভু স্বপ্ন দেখিয়া পাছে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত ভুলিয়া যান, এইজন্য শেষরাত্রে উঠিয়াই ভগবানের গুণগান করিতে থাকেন, পরে প্রাতঃকালে সকলকে ডাকাইয়া স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলেন। তাঁহার জ্ঞাতিগণ সকলেই ব্রাহ্ম ছিলেন। স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া সকলেই অতীব বিস্মিত হইলেন, এবং তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিতে সকলেই

স্বীকৃত হইলেন। পরলোকগত কালীমল্লিকের ভাগিনেয়কে ডাকাইয়া তাঁহার নিকট হইতে উইল আনা হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উইলে যে সব সর্ত্ত লিখা ছিল, সমস্ত গুলিই কালীমল্লিক স্বপ্নে লিখিয়া দেখাইয়াছিলেন। অতঃপর কালীমল্লিকের শ্রাদ্ধের দিন নির্দ্ধারিত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে গোস্বামী প্রভু কালীমল্লিকের শ্রাদ্ধ-কার্য্য নিষ্পন্ন করিলেন। কাঙ্গাল দুঃখীদিগেকে অর্থদান করা হইল। সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে সময়ে কালীমল্লিকের শ্রাদ্ধকার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া গেল, ঠিক্ সেই সময়ে সন্নিকটস্থ একটি কাঁঠাল গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িল, সকলে দেখিয়া অবাক্ হইল। কালীমল্লিক স্বপ্নে বলিয়াছিলেন যে রীতিমত শ্রাদ্ধ হইলে তিনি তাঁহার পরিচয় দিবেন, বস্তুতঃ তাহাই হইল।

এই স্থানে অবস্থানকালে একদিবস ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে বাগআঁচড়া-নিবাসী ৵প্রাণনাথমল্লিক নামক একজন ব্রাহ্ম, গোস্বামী প্রভুকে বলিলেন যে, যদি ব্রাহ্মমতে উপবীত ধারণ করা কপটতা ও মহাপাপ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, তবে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও বেচারাম বাবু উপবীত ত্যাগ না করিয়া কি প্রকারে বেদীর কার্য্য করিতেছেন? তাঁহাদের দৃষ্টান্তে অনেকে উপবীত রাখা উচিত মনে করিবে। এই সরলপ্রকৃতির ব্রাহ্মের কথা গোস্বামী প্রভুর নিকটে ঠিক্ মনে হওয়াতে, তিনি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও সম্পাদক কেশবচন্দ্রের নিকটে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিলেন যে, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ (আদি ব্রাহ্মসমাজ) সকল সমাজের আদর্শ। ইহার সমস্ত দোষগুণই অপরাপর ব্রাহ্মসমাজে অনুকরণ করিবে। উপবীত রাখা ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ; সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যগণ যদি উপবীতধারী হন, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মসমাজকে অসত্যের আলয় বলিয়া

পরিত্যাগ করিবেন। শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র সেন, গোস্বামী প্রভুর মত সমর্থন করিয়া এই পত্র ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথকে দেখাইলেন। অতঃপর কেশববাবুর বিশেষ অনুরোধে গোস্বামী প্রভু এবং দেবেন্দ্রনাথের অনুরোধে শ্রীযুত অন্নদাবাবু ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য হইতে স্বীকৃত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যের পদগ্রহণ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, পূর্ব্ববঙ্গে প্রচার, শান্তিপুর, কালনা ও নবদ্বীপ ভ্রমণ, কলিকাতা অবস্থান।

বাগআঁচড়া হইতে কলিকাতায় আগমন করিয়া, গোস্বামী প্রভু ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যের পদে নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই সময় এক দিবস দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার দৌহিত্রের নামকরণ উপলক্ষে, গোস্বামী প্রভুকে উপাচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে অনুরোধ করিয়া, একখণ্ড গরদের কাপড় ও একটী অঙ্গুরীয় সহ তাঁহার বৈবাহিকের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন। এ সকল কার্য্য প্রশ্রয় পাইলে পাছে ব্রাহ্মসমাজে পৌরহিত্যের ব্যাপার প্রচলিত হয়, এই আশঙ্কা করিয়া, গোস্বামী প্রভু বরণের দ্রব্যগুলি প্রত্যর্পণ করতঃ ভক্তি-ভাজন দেবেন্দ্রনাথকে এক পত্র লিখিলেন। ইহাতে দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই গোস্বামী প্রভুর উপর বিরক্ত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজে এই প্রথম বিরক্তির ভাব দেখা দিল। ইহাতে গোস্বামী প্রভু এতদূর দুঃখিত হইয়াছিলেন যে, এই বিষয় উল্লেখ করিবার সময় দেবেন্দ্রনাথের নিকটে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন।

একদিন দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন যে, তিনি গোস্বামী প্রভুকে যেখানে যাইতে বলিবেন, তাঁহাকে সেই স্থানেই যাইতে হইবে। তদুত্তরে গোস্বামী

প্রভু, ঠাকুরমহাশয়কে বলিলেন—"ঈশ্বরের আদেশ শুনিয়া প্রচারক্ষেত্রে গমন না করিলে জগতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইবে না। স্বাধীনভাবে প্রচার করিতে দিন। প্রচারের মধ্যে যেন সংসারের প্রভুত্ব প্রবেশ না করে।" এই কথা শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথ লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, সকলস্থানে গমন করিতে পারি না; এজন্য আমার যেস্থানে যাইতে ইচ্ছা হয়, সেখানে যদি তুমি গমন কর তাহা হইলে আমার মনে বিশেষ আনন্দ হয়।" পরে বলিলেন—"স্বাধীনভাবে ঈশ্বরের সত্য প্রচার কর, বীজ বপন কর, ঈশ্বরের কৃপাতে সুফল উৎপন্ন হইবে। ফলের জন্য চিন্তা করিও না। ফলদাতা ঈশ্বর, তিনি তোমার সহায় থাকুন।"

এদিকে বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও বেচারামবাবুকে পদচ্যুত করিয়া, অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক লোকদিগকে আচার্য্যপদ প্রদান করাতে, দেবেন্দ্রনাথের উপর প্রাচীন ব্রাহ্মগণ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। এমন সময় শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সহচরদিগের উদ্যোগে দুইটী অসবর্ণ বিবাহ সম্পন্ন হইল। নব্য ব্রাহ্মদিগের এই সকল কার্য্যে দেবেন্দ্রনাথ ভীত হইলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী ছিলেন; এখন সর্ব্বপ্রকার সংস্কার-কার্য্য হইতেই যুবকদিগকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকেই ঘোরতর আন্দোলনের স্রোতঃ প্রবাহিত হইল। যুবকগণ অদম্য উৎসাহে, অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে, আপনাদের বিবেকানুযায়ী কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিলেন।

এই সময় একটী প্রবল ঝঞ্ঝাবাত কলিকাতার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল। রাজপথে বুক সমান জল দাঁড়াইয়াছিল। সেই প্রবল ঝটিকা-বেগে বহু গৃহ ভগ্ন, অসংখ্য বৃক্ষ উন্মূলিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাজপথ নদীর স্রোতে পরিণত হইল। অগণ্য মৃতদেহ সেই স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে! নরনারীর আর্ত্তনাদে এক মহাপ্রলয়ের দৃশ্যের

সূচনা হইয়াছে। সকলেই আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত। দিবসেই ঘোর অন্ধকারে পৃথিবী সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। গোস্বামী প্রভু ছাদে উঠিয়া প্রকৃতি-দেবীর এই তাণ্ডবলীলা দর্শন করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার মনে হইল অদ্য বুধবার, উপাসনার দিন; কিন্তু কাহার সাধ্য যে ঘরের বাহির হয়? উপাসনার সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, গোস্বামী প্রভু ততই অস্থির হইতে লাগিলেন। এই দুর্য্যোগের মধ্যে বন্ধুগণ তাঁহাকে গৃহের বাহির হইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রবল ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষার নিকটে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন পরাস্ত হইল। তিনি কোমর বাঁধিয়া গৃহের বাহির হইলেন। হ্যালিডে ষ্ট্রীটের নিকটে গিয়া দেখিলেন গলা জল হইয়াছে। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সাঁতার জলে পড়িলেন। অবশিষ্ট সমস্তপথ প্রায় সন্তরণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহে উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখেন ঘর জনশূন্য, এবং সমাজগৃহও ভগ্ন দশায় উপনীত হইয়াছে। তখন মন্দিরের ভৃত্যদ্বারা একখানি পত্র প্রেরণ করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তদুত্তরে লিখিলেন—"আজ প্রকৃতির মধ্যে যে ভীষণ ব্যাপার হইতেছে তুমি তাহাতে পরমেশ্বরের লীলা দর্শন কর।" সুতরাং তাঁহাকে একাকী বসিয়াই উপাসনা করিতে হইল। উপাসনান্তে প্রত্যাগমন করিবার সময় পথিমধ্যে কেশববাবুর সহিত গোস্বামী প্রভুর দেখা হইল। তিনিও সমাজে গমন করিতেছিলেন। পুনরায় দুইজনে একত্র হইয়া সমাজে আগমনপূর্ব্বক উপাসনা করিয়া স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এই ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতে কলিকাতার অনেক পুরাতন গৃহের সঙ্গে ব্রাহ্ম-সমাজের গৃহ ভূমিসাৎ হইয়া গেলে, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীতে ব্রাহ্মসমাজ উঠিয়া যায়। এই বাটীতে যে দিন প্রথম উপাসনা হয়, সেই দিন গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে পূর্ব্বের উপবীত-

ধারী আচার্য্যগণ বেদীতে উপাসনা করিতেছেন। এইরূপ কার্য্য তাঁহাদের অসহ্য বোধ হওয়াতে, গোস্বামী প্রভু মন্দিরের বাহিরে দণ্ডায়মান হইয়া ইহার ঘোর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। কেশববাবু প্রথমতঃ উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন, পরে গোস্বামী প্রভুর যুক্তিপূর্ণ বাক্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন, এবং সেই মুহূর্ত্তেই যুবকদল গোস্বামী প্রভুকে অগ্রণী করিয়া অন্যত্র গিয়া উপাসনা করিলেন।

সময়ান্তরে গোস্বামী প্রভু প্রমুখ তেজস্বী ব্রাহ্মগণ দেবেন্দ্রনাথকে ঐরূপ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। যুবকগণ বুধবার ব্যতীত অন্য একদিন উপাসনা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, দেবেন্দ্রনাথ তাহাতেও আপত্তি করিলেন। সুতরাং তাঁহারা বাধ্য হইয়া উক্ত ব্রাহ্মসমাজের সংস্রব ত্যাগ করতঃ ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিবার সময় যুবক ব্রাহ্মগণ দেবেন্দ্রনাথকে 'মহর্ষি' আখ্যা প্রদান করিয়া এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। মহর্ষিও কেশববাবুকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাঁহার নিজের ব্রাহ্মসমাজের নাম 'আদিব্রাহ্মসমাজ' রাখিলেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের ব্রাহ্ম ইহাতে স্বাক্ষর করিয়া সভ্য হইলেন। প্রচারকগণ নবীন উদ্যমে, জ্বলন্ত উৎসাহে, ভারতের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের তীব্র বৈরাগ্য, অসাধারণ অধ্যবসায়, অকপট স্বার্থত্যাগ, অলোকসামান্য ধর্ম্মানুরাগ প্রভৃতি গুণে মুগ্ধ হইয়া বহু শিক্ষিত ভদ্রসন্তান ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ প্রচারক্ষেত্রে নামিলেন। প্রকৃত স্বর্গ-দূতের ন্যায় প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় নামিলেন। 'যদি আসে তাঁর কাজে, দিয়াছেন যে প্রাণ; ছাড়ি যাব অনায়াসে তাঁরে

করিব দান।' যেমন কথা তেমনি কাজ। দেহ প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়া 'ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্' মহামন্ত্র সার করিয়া, প্রভুর চরণে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া প্রভুর মহাকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রভুর কার্য্যে তাঁহার অগ্রপশ্চাৎ ভাবিবার অবসর ছিল না। তিনি আপনার শরীরের দিকেও দৃক্‌পাত করিলেন না। পরিজনের সুবিধা অসুবিধা, সুখ স্বচ্ছন্দতার পানেও চাহিলেন না, এবং নিন্দা প্রশংসার মুখাপেক্ষাও করিলেন না। কিন্তু অবিচলিত উৎসাহে, অটল অধ্যবসায়ে, পূর্ণপ্রাণে প্রভুর কার্য্যে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার গতি অবারিত এবং বাণী অপরাঙ্মুখী হইল।" * তাঁহার অদম্য চেষ্টায় বঙ্গদেশের বহুস্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল।

এই সময়ে গোস্বামী প্রভু সাংসারিক ভয়ানক অভাব অনাটনের মধ্যে মানুষের উপর কোনরূপ প্রত্যাশা না রাখিয়া, নিজের এবং পরিজনের সামান্য সুখসচ্ছন্দতার প্রতিও দৃক্‌পাত না করিয়া, যে প্রকারে স্বীয় জীবনের মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন তাহার উদাহরণস্বরূপ একটী মাত্র ঘটনা উল্লেখ করা যাইতেছে। নির্জ্জনে উপাসনা করিবার জন্য একদিন প্রাতে গোস্বামী প্রভু কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে গমন করিয়াছিলেন। তখন সেই স্থানে আহারাদির কোনরূপ বন্দোবস্ত ছিল না। গোস্বামী প্রভু প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিয়া উপাসনা করিয়া অতিবাহিত করিলেন। তৃতীয় প্রহরে অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হওয়াতে উপাসনায় মন বসিতেছে না দেখিয়া নিকটস্থ জলাশয় হইতে কিঞ্চিৎ কর্দ্দম ও জলপান করিলেন। পরে সমস্ত দিন নির্জ্জন সাধন করিয়া সন্ধ্যার সময় কলিকাতাস্থ স্বীয় ভবনে উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন অর্থাভাবে গৃহে সেই দিন পাক হয় নাই। গোস্বামী প্রভুর সহধর্ম্মিণী শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী, গোস্বামী প্রভুর ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল মৈত্র মহাশয়ের ভুক্তাবশিষ্ট

* তত্ত্বকৌমুদী।

একমুষ্টি অন্ন খাইয়া রহিয়াছেন ও তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী পাতকুয়ার জলমাত্র পান করিয়া রহিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া গোস্বামী প্রভু ধীরে ধীরে গিয়া শয়ন করিলেন। এমন সময় শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ব্রাহ্ম ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতে গোস্বামী প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহার মুখ মলিন দেখিয়া বলিলেন—"গোঁসাই, আজ আপনাদের আহার হয় নাই বোধ হয়"। তিনি উত্তর করিলেন—"অন্যদিন ভগবানের উপর নির্ভর করি, আর আজ নিজের উপর নির্ভর করিতে গিয়াছিলাম তাই এই।" এই কথা শুনিয়া শ্রদ্ধেয় যদুনাথবাবু নিজের জামার পকেটে হাত দিয়া ৫৭৷৷০ (দেড় পয়সা) মাত্র প্রাপ্ত হইলেন। তদ্দ্বারা মুড়ি ক্রয় করিয়া তিন জনে আহার করিলেন। পরদিন যদুনাথবাবু শ্রীযুক্ত কান্তিবাবুর (জনৈক ব্রাহ্ম) নিকটে পূর্ব্বদিনের কথা প্রকাশ করিলে, তিনি একখণ্ড আধুলী গোস্বামী প্রভুর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। উহাদ্বারা আহার্য্য দ্রব্যাদি আনাইয়া রন্ধন করা হইল। এমন সময় হালিসহর নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবুর শ্বশুর ও শ্যালক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহেন্দ্রবাবুর শ্বশুর মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার পুত্রের তিন দিন আহার হয় নাই। তাঁহাদিগকে আহার করিতে বলা হইল। তাঁহাদের আহার শেষ হইলে অবশিষ্ট যাহা ছিল তদ্দ্বারা গোস্বামী প্রভুর শ্বশ্রূঠাকুরাণী শ্রীযুক্তা মুক্তকেশী দেবী ও শ্রীমতী যোগমায়া দেবী ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন এবং গোস্বামী মহাশয়ের জন্য যৎকিঞ্চিৎ রাখিয়া দিলেন। এমন সময় গোস্বামী প্রভু ও মহেন্দ্র বাবু আসিলেন। তাঁহারা, যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহাই আহার করিয়া কোন প্রকারে দিনযাপন করিলেন। তৎপর দিবস শ্রীযুক্তা মুক্তকেশী দেবীর পূজার বাসন বিক্রয় করিয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা প্রাপ্ত হইলেন, তদ্দ্বারা সে দিনের আহারের কার্য্য সম্পন্ন করা হইল। এই প্রকারে কত সময়ে যে গোস্বামী প্রভু ও তাঁহার পরিবারস্থ লোকদিগকে

অনাহারে অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন।

এতদিন খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ, নানা প্রকার অনুকূল অবস্থার মধ্য দিয়া বিনা বাধায় ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, এবং তাহাদের কার্য্যের আশানুরূপ ফলপ্রাপ্ত হইয়া এতদূর উৎফুল্ল হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ, অচিরকালমধ্যেই সমগ্র ভারতবাসীকে খৃষ্টান করিয়া ফেলিবেন, এরূপ জল্পনা কল্পনা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু এখন তাঁহারা এই অভিনব ব্রাহ্মধর্ম্ম, ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর অসামান্য প্রভাব দর্শন করিয়া বিচলিত হইয়া পড়িলেন; এবং কি করিয়া এই নূতন ধর্ম্মস্রোতের গতিরোধ করা যাইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। বিলাতের কতিপয় প্রধান প্রধান পাদ্রীসাহেব পরামর্শ করিয়া, এই নবীন ধর্ম্মের প্রচারকদিগকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিবার অভিপ্রায়ে, একজন সুপণ্ডিত বিচক্ষণ পাদ্রীকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন। এই সময় গোস্বামী প্রভু, শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি প্রচারকগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থে এলাহাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন। পাদ্রীসাহেব বিলাত হইতে বোম্বাই হইয়া বরাবর এলাহাবাদে উপস্থিত হইলেন।

একদিন প্রচারকগণ উপাসনান্তে আপন আপন কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, এমন সময় পাদ্রী সাহেব তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। শ্রদ্ধেয় কেশববাবু তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা পূর্ব্বক আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন যে, ভারতে যে এক নূতন ধর্ম্ম অভ্যুত্থিত হইয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে বাধা প্রদান করিতেছে, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য তিনি বিলাত হইতে আগমন করিয়াছেন; সম্প্রতি তাঁহাদের সঙ্গে ধর্ম্মসম্বন্ধে

বিচার করিতে চাহেন। সুবিচক্ষণ গুণগ্রাহী পাদ্রীসাহেব এতক্ষণ তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে সকলকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি গোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, "তোমাদিগের মধ্যে এই যে ধীর স্থির অটলভাবে বসিয়া আছেন ইহাঁর নাম কি?" কেশববাবু বলিলেন—"বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।" পরে পাদ্রীসাহেব বলিলেন—"আমি জানি এবং বিশ্বাস করি, খৃষ্ট ভিন্ন পৃথিবীর নরনারীর আর কোন উপাস্য নাই। আর তাহাদের পাপভার মোচন করিবার উপযুক্ত পুরুষই বা অন্য কে থাকিতে পারে? তোমরা কোন্ দেবতার পূজা কর? তোমাদের পরিত্রাতাই বা কে? এই সকল বিষয় জানিতে আমি তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। তোমাদের মধ্যে যিনি এখনও উপাসনার স্থান পরিত্যাগ করেন নাই, যাঁহার নাম তুমি বিজয়কৃষ্ণ বলিলে, তাঁহার সহিতই আমি আলাপ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। তিনি যদি দয়া করিয়া এই টেবিলের কোন চেয়ারে আসিয়া বসেন, তবে সুবিধা হয়। আমি ইংরাজ, এই প্রকারে বসিবার আমার অভ্যাস নাই। আমার ইচ্ছা হইতেছে না যে উঁহার উপাসনা ভঙ্গ করি।"

এমন সময় গোস্বামী প্রভুর ধ্যান ভঙ্গ হইল। তাঁহার মুদ্রিতচক্ষু নড়িতে লাগিল। শরীরের স্পন্দহীন অবস্থা ধীরে ধীরে অপসৃত হইল। উপাসনার অবসানকালীন শান্তিবাচক শব্দ—'হরিঃ ওঁ, শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ' উচ্চারণ করিয়া গাত্রোত্থান করিলে, শ্রদ্ধেয় কেশববাবু তাঁহাকে পাদ্রীসাহেবের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। গোস্বামী প্রভু, সাহেব বাঙ্গালা ভাষা জানেন শুনিয়া, বাঙ্গালাতেই তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন; পরে বলিলেন—"সাহেব, ধর্ম্ম ত অনেক প্রচার করিয়াছেন, গ্রন্থাদিও বিস্তর পাঠ করিয়াছেন এবং এখন ধর্ম্ম প্রচার করিতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন। ভাল, আমার

এই কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর দিন:—১। ধর্ম্ম কাহাকে বলে? ২। ধর্ম্মের উৎপত্তি-স্থান কোথায়? ৩। আত্মা কাহাকে বলে এবং তাহার স্বরূপ কি? ৪। সত্য কি বস্তু এবং সত্য কাহাকে বলে? ৫। মায়া কি বস্তু এবং মায়া কাহাকে বলে? ৬। অসত্য কি এবং পাপ কি? সুবিজ্ঞ পাদ্রীসাহেব এই সকল প্রশ্নের গভীরতা উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন—"এই সকল প্রশ্ন কেহ আমাকে কখনও জিজ্ঞাসা করে নাই, নিজের অন্তরেও কখনও উদয় হয় নাই। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আর কিছুই জানি না, কেবল যিশুখৃষ্ট ও বাইবেল জানি।" তখন কেশববাবু সাহেবকে বলিলেন,—"সাহেব, এই দেশের নাম ভারতবর্ষ। এই দেশ হইতে সভ্যতা এবং ধর্ম্ম প্রথমে গ্রীস্ দেশে যায়, তথা হইতে সমস্ত ইউরোপ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই ভারতবর্ষ যে মহাদেশের অন্তর্গত তাহার নাম এসিয়া। এই এসিয়ার উত্তর-পশ্চিম-প্রান্তে কোন ক্ষুদ্র গ্রামে তোমাদের যিশুখৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তোমাদের অপেক্ষা আমরা খৃষ্টকে অধিকরূপে জানি এবং তাঁহাকে মহাপুরুষজ্ঞানে ভক্তি করিয়া থাকি। কিন্তু তিনি আমাদের উপাস্য নহেন। আমাদের উপাস্য তাঁহার পিতা পরমেশ্বর। তিনি এক এবং অবিভক্ত। এই যে আমাদিগকে দেখিতেছ, আমরাও সেই এক এবং অবিভক্ত ঈশ্বরের পুত্র। যদি তুমি ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে চাও, তবে এখান হইতে ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাও এবং আমাদের উত্থাপিত প্রশ্ন সেখানে গিয়া বল। পরে তথা হইতে উত্তর সংগ্রহ করিয়া পুনরায় এ দেশে আসিও।" এইরূপ কথোপকথনের পর পাদ্রীসাহেব আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া বিলাতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। *

* ফরিদপুর সদরদী নিবাসী ৺শ্রীধর ঘোষ মহাশয় কথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত।

অতঃপর গোস্বামী প্রভু ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য পঞ্জাবদেশে উপস্থিত হইলেন। শুনিয়াছি যে, এই স্থানে অবস্থানকালে একদিন তাঁহার চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছিল। শুভ্র স্বচ্ছ স্ফটিকমণির সম্মুখে নীল লোহিত ইত্যাদি যখন যে বর্ণ-বিশিষ্ট দ্রব্যাদি উপস্থাপিত করা যায়, তখন তাহাতে সেই বর্ণেরই সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব পতিত হয়। গোস্বামী প্রভুর এই মনোবিকারও তদ্রূপ কোন কারণেই সংঘটিত হইয়া থাকিবে, নচেৎ তাঁহার ন্যায় আজন্ম পবিত্রাত্মার হৃদয়েঃসামান্য অকিঞ্চিৎকর ঘটনায় এইরূপ অবৈধভাব উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। সে যাহাহউক, নিশীথে আত্ম-চিন্তাকালে ঐ বিষয় স্মরণ হওয়াতে, তিনি মনে মনে সাতিশয় অনুতপ্ত হইতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে শান্তি পাইবার আশায় তাঁহার সেই সময়ের মনের অবস্থানুরূপ একটী গান রচনা করিয়া অনেকক্ষণ গান করিলেন। গানটী এই ;—

রাগিণী মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

"মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে (নাথ) ডাকিব তোমায়।
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যথায়।
তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনলসম,
আমি পাপী তৃণসম, কেমনে পূজিব তোমায়।
শুনি তব নামের গুণে, তরে মহাপাপী জনে,
লইতে পবিত্র নাম কাঁপে হে মম হৃদয়।
অভ্যস্ত পাপের সেবায় জীবন চলিয়া যায়,
কেমনে করিব আমি পবিত্র পথ আশ্রয়।
এ পাতকী নরাধমে, তার যদি দয়াল নামে,
বল করে' কেশে ধরে' দাও চরণে আশ্রয়।"

এই গান করিবার পরেও তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তন হইল না দেখিয়া, তিনি আত্মহত্যা করিতে সঙ্কল্প করিয়া গভীর রাত্রিতে রাভিনদীর তীরে উপনীত হইলেন, এবং পরিধেয় বস্ত্রে কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড জড়াইয়া গলদেশে বন্ধনপূর্ব্বক যেই জলে ঝাঁপ দিবেন, এমন সময় পশ্চাৎ দিক্ হইতে একজন মুসলমান ফকির আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন—"ইয়ে বাচ্চা, শরীর ছোড়নেছে পাপ-প্রবৃত্তি নষ্ট হোগা নেহি। তু ধৈরয ধর। তেরা ভালা হোগা। যব্ পাপ ছুটে গা, তু কুচ্ নেহি জানেগা। আভি বহুত রোজ দের হায়। খোদা সব কামকা সময় ঠিক কর রাখা। বাতাস্‌সে ধূর উড়তা, ওভি খোদাকা ইচ্ছাসে হোতা। ঘাবরাও মৎ। দুনিয়ামে খোদাকা খেল দেখ।"—অর্থাৎ বৎস! শরীর-নাশে পাপের নাশ হয় না। ধৈর্য্য ধর, তোমার মঙ্গল হইবে। যখন পাপ তোমাকে ছাড়িয়া যাইবে, তখন তুমি তাহা জানিতেও পারিবে না। কিন্তু এখন তাহার অনেক দেরী আছে। ভগবান্ সমস্ত কার্য্যেরই সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। বায়ুতে যে ধূলিরাশি উত্থিত হয়, তাহাও তাঁহারই ইচ্ছাতে সম্পন্ন হয়। অতএব চিন্তিত হইও না। জগতে জগদীশ্বরের লীলা দর্শন কর। গোস্বামী প্রভু বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি এই ব্যাপার কিরূপে অবগত হইলেন?" ফকির সাহেব হিন্দিতে বলিলেন—"আমি ভজন করিতেছিলাম, এমন সময় দৈববাণী হইল যে এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করিতেছে, শীঘ্র রক্ষা কর।" তদুত্তরে গোস্বামী প্রভু পুনরায় বলিলেন—"দেখুন, আমার মন বড় অপবিত্র। এই অপবিত্র জীবন ধারণ করিয়া ফল কি?" ফকির উত্তর করিলেন—"তবে এই অপবিত্র জীবন লইয়া পরকালে যাইয়া বা লাভ কি? ভগবানের নাম কর, তিনিই তোমাকে পবিত্র করিবেন। জীবন পবিত্র করিয়া পরলোকে যেও। তুমি নিজকে অতিশয় অপবিত্র মনে

করিতেছ বটে, কিন্তু তুমি যে কি সুন্দর বস্তু তাহা তুমি এখন দেখিতে পাইতেছ না। সাধনপথে অগ্রসর হইলে যখন তোমার নিকটে একখানি আয়নার মত প্রকাশিত হইবে, তাহাতে তোমার স্বরূপ দেখিলে, তুমি যে কি সুন্দর বস্তু তাহা বুঝিতে পারিবে। প্রতিদিন শয়ন করিবার সময় ভগবানের মাতৃ-বাচক নাম জপ করিবে। জপ করিতে করিতে যখন মন তন্ময় হইয়া যাইবে, তখন নিদ্রা যাইবে। এইরূপ করিলে কোন প্রকার মলিন চিন্তায় তোমাকে চঞ্চল করিতে পারিবে না—ইত্যাদি।" এই প্রকার সান্ত্বনাসূচক উপদেশ প্রদান করিয়া, ফকির সাহেব স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন; গোস্বামী প্রভু গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া শয়ন করিলেন। এই ঘটনার বহুদিন পরে হরিদ্বারে গোস্বামী প্রভুর সঙ্গে ফকিরের পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। গোস্বামী প্রভু তখন যোগ অবলম্বন করিয়া উচ্চাবস্থা লাভ করিয়াছেন। ফকির সাহেব, গোস্বামী প্রভুর অবস্থা দর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"দেখ ত, এখন কেমন সুন্দর অবস্থা লাভ করিয়াছ। তখন আত্মহত্যা করিলে কি লাভ হইত—ইত্যাদি।"

অতঃপর গোস্বামী প্রভু, শিখ-সম্প্রদায়ের প্রধানতম তীর্থস্থান গুরুদরবার দর্শন করিবার জন্য অমৃতসরে উপনীত হন। কথিত আছে যে, কোন সময় গুরু নানকজী তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া একটী শুষ্ক পুষ্করিণীর নিকটে জল যাচ্ঞা করিলে, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে উত্তম পানীয় জল আবির্ভূত হইয়াছিল। সেই হইতে উক্ত পুষ্করিণী 'অমৃতসায়র' নামে অভিহিত হয়। এই অমৃতসায়র হইতে 'অমৃতসর' নামের উৎপত্তি হইয়াছে। শিখসম্প্রদায়ের চতুর্থ গুরু রামদাসজী ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে অমৃতসায়রকে বৃহদাকারে খনন করাইয়া, অভ্যন্তরে একটী মনোহর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই মন্দিরকে শিখগণ গুরুদরবার বা 'দরবার সাহেব' বলিয়া থাকেন। কালের কুটিল-গতিতে এই স্থান কিছুদিনের জন্য আফগানমুসলমানদিগের

হস্তগত হয়, এবং সেই সময় তাহারা মন্দিরটীকে বিধ্বস্ত ও অশেষ প্রকারে কলঙ্কিত করে। পরে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে মহারাজা রণজিৎ সিংহ অমৃতসর অধিকার করেন, এবং মন্দিরটী পুনঃসংস্কৃত করিয়া উহা সুবর্ণমণ্ডিত করিয়া দেন। সেই দিন হইতে উহা সুবর্ণমন্দির (Golden Temple) নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

সুবিস্তীর্ণ অমৃতসরোবর দীর্ঘে ও প্রস্থে সমান। ইহার চতুঃপার্শ্ব শ্বেত-প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত। বায়ু দ্বারা ঈষদান্দোলিত স্বচ্ছসলিলা সরোবরের মধ্যস্থলে সুবর্ণমন্দির বিরাজিত থাকিয়া চতুর্দ্দিকে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। তীর হইতে মন্দিরে যাইবার জন্য একটী মর্ম্মর-সেতু আছে। মন্দিরটীও মর্ম্মর-প্রস্তর-নির্ম্মিত। ইহার অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ আছে। তাহার সর্ব্বপ্রধান প্রকোষ্ঠে গুরু নানক, গুরু গোবিন্দ প্রভৃতি শিখ-গুরুদিগের রচিত গ্রন্থসমূহের সারসংগ্রহ 'গ্রন্থসাহেবজী' সুরক্ষিত হইয়া অতীব জাঁকজমকের সহিত প্রত্যহ পূজিত হইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন তথায় অন্য কোন দেবতার বিগ্রহাদি নাই।

এই স্থানের অষ্টপ্রহরব্যাপী জাগ্রত জীবন্ত ধর্ম্মস্রোতঃ সন্দর্শন করিয়া গোস্বামী প্রভু মুগ্ধ হইয়াছিলেন। দিবারাত্রের অধিকাংশ সময় মন্দির অভ্যন্তরে পাঠ, পূজা, কীর্ত্তন, ভোগ, আরতি ইত্যাদি অতিশয় পরিপাটিরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কেবল রাত্রি চারি ঘটিকা হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত কীর্ত্তনাদি বন্ধ থাকে। কিন্তু তখনও অনেকে জাগ্রত থাকিয়া ধ্যান-ধারণাদি করিয়া থাকেন। অদ্যাবধি এই নিয়ম প্রচলিত আছে। পরবর্ত্তী কালে গোস্বামী প্রভু অনেক সময় গুরুদরবারের মাহাত্ম্য-সূচক অনেক কথা ব্যক্ত করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন।

কিছুদিন পঞ্জাবদেশে অবস্থান করিবার পর, গোস্বামী প্রভু ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য মথুরা হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হইলেন।

তথায় একদিন ব্রাহ্মধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতার সময় শ্রীভগবানের গোষ্ঠলীলা বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎশ্রবণে সঙ্গীয় ব্রাহ্মগণ উদ্বেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বক্তৃতান্তে আসনগ্রহণ করিলে তাঁহাদের মধ্যে একজন গোস্বামী প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি ব্রাহ্মধর্ম্মের বক্তৃতা করিতে গিয়া এ সব কি বলিলেন?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন—"স্থানমাহাত্ম্য আছে, আমি কিছু কল্পনা করিয়া বলি নাই; যে দৃশ্য সম্মুখে পড়িয়াছিল তাহাই বর্ণনা করিয়াছি।" ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-মন্দিরেও এইরূপ কত ঘটনা ঘটিত। অনেক সময় জগজ্জননীর আবির্ভাবে বিভোর হইয়া, তাঁহার অপ্রাকৃত রূপ বর্ণনা করিতেন, মা! মা! বলিয়া অধীর হইতেন, কিন্তু উপস্থিত উপাসকমণ্ডলী উহা ভগবতী কি জগদ্ধাত্রীর আরাধনা হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিতেন না; এবং প্রত্যেকেই আপনার ভাবে গোস্বামী প্রভুর ঐ সাক্ষাৎ পূজায় যোগ দান করিতেন।

শ্রীবৃন্দাবন হইতে গোস্বামী প্রভু ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থে মথুরা হইয়া আগ্রা গমন করেন। এই স্থানে অবস্থানকালে তিনি একটী অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করেন। তৎকথিত স্বপ্নের বিবরণ 'ধর্ম্মতত্ত্ব' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—"তাজ (তাজমহল) দর্শনান্তে এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করি। বোধ হইল আমি তাজের প্রাঙ্গণস্থ উদ্যানে গিয়াছি। উদ্যানের বৃক্ষগুলি পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেই অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যদর্শনে তাঁহাদিগকে দেবকন্যা মনে হইল। ইতিমধ্যে তাঁহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কিজন্য এই পবিত্র স্থানে আসিয়াছ?' এবং আমি দেখিলাম তাঁহারা একবার বৃক্ষ আর একবার স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন। আমি তাঁহাদের এইরূপ বেশ-পরিবর্ত্তনে বিমুগ্ধ হইয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে থাকিলাম এবং পরে জিজ্ঞাসা করিলাম—

আমি আপনাদের নিকটে একটী উপদেশ গ্রহণ করিতে আসিয়াছি, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী তাহা কিরূপে বুঝিব? তাঁহারা বলিলেন—'তুমি আজও ঈশ্বর-বিষয়ে অনভিজ্ঞ? যাঁহার রাজ্যে বাস কর, যাঁহার দয়া ভিন্ন এক দণ্ড বাঁচ না, তাঁহার বিষয়ে কোন্ প্রাণে সংশয় করিতেছ?' আমি লজ্জিত-ভাবে উত্তর করিলাম যে, 'আমি একজন ঘোর মূর্খ, কিছুই জানি না; আপনারা উপদেশ দিয়া আমাকে সুখী করুন।' তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—'আমাদের মত সুন্দরী কোথাও দেখিয়াছ?' উত্তর—'না, স্বপ্নেও দেখি নাই।' তাঁহারা—'একমাত্র ঈশ্বরই আমাদিগকে এত সুন্দরী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি আমাদের মধ্যে আছেন। তাঁহার সৌন্দর্য্যের শোভা আমাদের শরীর দিয়া বহির্গত হইতেছে বলিয়া আমাদের এমন শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য হইয়াছে। তাঁহার অধিষ্ঠান ভিন্ন কিছুই সুন্দর হইতে পারে না। ইহার গূঢ় অর্থ যদি বুঝিয়া থাক, তবে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বরকে পরম সুন্দর বলিয়া দেখিতে পাইবে।' ইহা বলিয়া তাহারা বৃক্ষরূপ ধারণ করিল। অপর দিকে চাহিয়া দেখি, শুভ্র-শ্মশ্রুধারী কতিপয় বৃদ্ধ কহিতেছেন—'যে ঈশ্বরকে সুন্দর বলিয়া জানিলে তাঁহাকে প্রাণ বলিয়া জান। কেবল তিনি আমাদের প্রাণরূপে আছেন বলিয়া আমরা এতদূর সারবান্ হইয়াছি।' ইহা বলিতে বলিতে কেহ কেহ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাচীন বৃক্ষরূপ ধারণ করিলেন। এই সময় আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি এই স্বপ্নটী দ্বারা অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি। পূর্ব্বে যাহা শূন্যমাত্র জ্ঞান হইত, এখন দয়াময় ঈশ্বরের পবিত্র আবির্ভাবে তাহা পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়।"

আগ্রা হইতে গোস্বামী প্রভু লক্ষ্ণৌ, কাণপুর প্রভৃতি স্থানে গমনপূর্ব্বক সেই সকল অঞ্চলে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এইরূপে পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় ব্রহ্ম-নামের জয়-নিশান প্রোথিত করিয়া, গোস্বামী প্রভু কিছুদিন বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য শান্তিপুর গমন করেন। এই স্থানে কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া ১২৭২ সালে আশ্বিন মাসে কলিকাতা আগমন করেন, এবং তথা হইতে আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও সাধু অঘোরনাথকে সঙ্গে লইয়া ১৯শে কার্ত্তিক পুনরায় প্রচারার্থে ঢাকা নগরীতে উপস্থিত হন। ইঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ঢাকানিবাসী ব্রাহ্মগণ সাতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বুড়ীগঙ্গার তীরে দণ্ডায়মান ছিলেন। অবশেষে ইঁহাদিগকে পাইয়া তাঁহাদের আর আনন্দের অবধি ছিল না। বাঙ্গালাবাজারনিবাসী প্রসিদ্ধ ধনী জীবনবাবুর বহির্ব্বাটীতে এই ক্ষণজন্মা প্রচারদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইঁহারা প্রায় একমাস কাল ঢাকায় অবস্থানপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া, ১১ই অগ্রহায়ণ আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও সাধু অঘোরনাথ মৈমনসিংহ যাত্রা করিলেন, এবং গোস্বামী প্রভু স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের আরমাণিটোলাস্থিত বাটীতে থাকিয়া প্রচারকার্য্যে ব্রতী রহিলেন।

অতঃপর পৌষমাসে গোস্বামী প্রভু ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশ্যে ঢাকা হইতে বরিশাল আগমন পূর্ব্বক স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের গৃহে পনর দিন অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি, 'ব্রাহ্মধর্ম্ম কি,' 'উপাসনা মনুষ্যের জীবন,' 'পরকাল,' 'আত্মদৃষ্টি' 'ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য' প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহার প্রাণস্পর্শী উপাসনা, তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়া প্রতিদিন শত শত লোক উপাসনা স্থলে উপস্থিত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু তিনি বরিশালবাসীর তৎকালিক নীতিবিষয়ক ঘোর দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া এতদূর মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন যে, এক দিন রাত্রিতে ঐ বিষয় চিন্তা করিতে করিতে বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়াছিলেন; এবং অবশেষে যন্ত্রণায় আত্মা একেবারে

অসহ্য বোধ হওয়াতে নদীতে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে গমন করিয়াছিলেন। নদীতীরে উপস্থিত হইবামাত্র দৈববাণী হইল—'আত্মহত্যা করিও না, সময়ে সমস্ত ঠিক হইয়া যাইবে।' অকস্মাৎ এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া তিনি ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন।

বরিশাল হইতে গোস্বামী প্রভু নোয়াখালী গমন করেন। তাঁহার আগমনে স্থানীয় লোকের ধর্ম্মোৎসাহ শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। যাঁহারা পূর্ব্বে হিন্দু-সমাজের ভয়ে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইতেন না, তাঁহারাও গোস্বামী প্রভুর জলন্ত উৎসাহ ও জীবন্ত ভক্তিভাবপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিতে দলে দলে সমাজগৃহে উপস্থিত হইতেন।

নোয়াখালি হইতে গোস্বামী প্রভু চট্টগ্রাম গমনপূর্ব্বক, 'ধর্ম্মই মনুষ্যের জীবন,' 'উপাসনা ও ঈশ্বরোপলব্ধি', 'পরকাল' প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা ও জীবন্ত উপাসনায় স্থানীয় লোকের মধ্যে বিশেষ ধর্ম্মোৎসাহ জন্মে। চট্টগ্রামের পথে তিনি চট্টগ্রাম পাহাড়, রঘুনন্দনের পাহাড় ও চন্দ্রনাথ পর্ব্বত দর্শন করেন। চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের শুরুধ্বনিকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, লবণাখ্যকুণ্ড, সীতাকুণ্ড ও সহস্রধারা ইত্যাদি প্রস্রবণ ও পর্ব্বতের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়া গোস্বামী প্রভু অতীব মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এইস্থানে অবস্থানকালে তিনি একটী অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করেন। স্বপ্নবৃত্তান্ত গোস্বামী প্রভুর স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি যথা :—বহুদিন হইল একবার পদব্রজে চট্টগ্রাম গমন করিয়াছিলাম। তখন গমনকালে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম। অবশেষে আমি সীতাকুণ্ডের নিকটে পর্ব্বতপার্শ্বে নিদ্রিত হই। শরীর ক্লান্ত ছিল, শীঘ্রই নিদ্রা হইল। তখন এই এক ব্যাপার দেখিলাম যে, সমস্ত বৃহদাকার নক্ষত্রমণ্ডল, এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আমার সম্মুখে ঘোর বেগে

ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তাহার পশ্চাদ্দেশে দেখিলাম এক মহান্ পুরুষ। এই দৃশ্য আমি আর অধিক দেখিতে পাইলাম না। তখন সেই পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'তুমি কে পরিচয় দাও।' তিনি বলিলেন—'আমি পুরুষ, আর যাহা দেখিতেছ ইহা প্রকৃতি।' প্রাচীন গ্রন্থে পুরুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা কথা পাঠ করিয়াছিলাম। এই ব্যাপারে আমার হৃদয়ের এক দ্বার উন্মুক্ত হইল। ঈশ্বরের সম্বন্ধে পুরুষ ও প্রকৃতি কি? পুরুষ সত্তা মাত্র। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইহা পুরুষ। এই পুরুষের মহিমা বর্ণনাতেই উপনিষদ্ ও শ্রুতি পূর্ণ।"

চট্টগ্রাম হইতে গোস্বামী প্রভু কুমিল্লায় গমন করিয়া স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের বাসভবনে ১৪।১৫ দিন অবস্থান করেন। তাঁহার শুভাগমনে ত্রিপুরানিবাসী ব্রাহ্মগণের মধ্যে নব-জীবনের সঞ্চার হয়। এই স্থানে অবস্থানকালে ত্রিপুরা ব্রাহ্মমন্দির, ত্রিপুরা শাখাসমাজ, ব্রজসুন্দর বাবুর বাসভবন প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে 'উপাসনা', 'ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা', 'ঈশ্বরই মানব-জীবনের লক্ষ্য' 'ঈশ্বর-প্রেমই আনন্দের প্রস্রবণ' ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে বক্তৃতা ও উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহার মৃতসঞ্জীবনী বক্তৃতা শ্রবণে বহু ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণের প্রাণে নব আশার সঞ্চার হইয়াছিল। অতঃপর ফাল্গুন মাসে কুমিল্লা হইতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাত্রা করেন। তথায় ৪।৫ দিন অবস্থান করিয়া 'ব্রাহ্মধর্ম্ম কি?' 'উপাসনার আবশ্যকতা,' 'পরিত্রাণের উপায়' প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহার প্রাণস্পর্শী উপদেশ শ্রবণ করিয়া একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে গোস্বামী প্রভু পুনরায় বরিশাল গমন করেন, এবং তথায় ২৫।২৬ দিন অবস্থানপূর্ব্বক 'ঈশ্বর লাভ', 'বাহ্য পৌত্তলিকতা 'আন্তরিক পৌত্তলিকতা' প্রভৃতি বিষয়ে উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান

করেন। এই সময় পূর্ব্ববাঙ্গালায় সর্ব্বপ্রথম স্ত্রী-স্বাধীনতার সূত্রপাত হয়। স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস-প্রমুখ তেজস্বী ব্রাহ্মগণের চেষ্টায় একটী পতিতা-নারী ও কয়েকটী বিধবা মহিলার পুনর্ব্বিবাহ হয়। স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে গোস্বামী প্রভু যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—"ঈশ্বরের অধীন হওয়া—ধর্ম্মের অধীন হওয়াই প্রকৃত স্বাধীনতা। সমাজভয়ে সত্য-প্রতিপালনে বিরত থাকাই প্রকৃত অধীনতা। আন্তরিক রিপুদিগকে বশীভূত করিয়া পবিত্র থাকাই যথার্থ স্বাধীনতা। রিপুদিগের অধীন হইয়া পাপের দাস হওয়াই প্রকৃত পরাধীনতা। পুরুষের সহিত প্রকাশ্যরূপে আলাপ করা, প্রকাশ্যপথে পদব্রজে অথবা অনাবৃতযানে বিচরণ করা, পুরুষদিগের সভায় উপস্থিত হইয়া স্বাধীনতা প্রদর্শন করা, ইহার একটীকেও স্বাধীনতা বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, আমাদের দেশের নীচশ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ সর্ব্বত্র বিচরণ করে, সর্ব্বদা পুরুষমণ্ডলীতে অবস্থিতি করে, তজ্জন্য তাহাদিগকে স্বাধীন বলা যায় না। তাহারা সম্পূর্ণরূপে রিপুর অধীন, অথচ প্রচলিত দেশাচারকে অসত্য জানিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না।" *

অতঃপর তিনি বরিশাল হইতে কলিকাতায় গমন করেন। এই সময় বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, ব্রাহ্মমতে শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান লইয়া ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল; দুর্ব্বল ব্রাহ্মগণ আদি-সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে 'যিশুখৃষ্ট, ইউরোপ ও আসিয়া' এবং 'গ্রেট ম্যান' নামক কেশববাবুর দুইটি বক্তৃতার গূঢ়ভাব গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া, আদি-ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মগণ কেশববাবুকে খৃষ্টান বলিয়া গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। অসন্তোষ এতদূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহারা মিথ্যা

* "ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

কথা বলিতেও কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। "মনুষ্য বিদ্বেষ-পরবশ হইলে কোন দুষ্কর্ম্মই তাহার অকৃত থাকে না। ধর্ম্ম লইয়া যেমন পরস্পরে অকৃত্রিম প্রণয় হইয়া থাকে, ধর্ম্মের নামে তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণে বিদ্বেষের উৎপত্তি হয়। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের পিতা হইয়াও পুত্রের প্রতি যে সকল দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা কে না অবগত আছেন? রোমানক্যাথলিক খৃষ্টানেরা প্রটেষ্টাণ্টদিগের প্রতি যেরূপ রোমহর্ষণ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা শুনিতে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই দৃশ্য দর্শন করিয়া কে বলিতে পারে ব্রাহ্মসমাজ শান্তির নিকেতন?" *

ব্রাহ্মসমাজের এই সকল গোলযোগে গোস্বামী প্রভুর মন বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, অন্তরে সহিষ্ণুতা ছিল না এবং তিনি দীর্ঘকাল উপাসনা করিতে পারিতেন না। তাহাতে অশান্তি শতগুণে বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে, তিনি শান্তির আশায় কলিকাতা ত্যাগ করতঃ শান্তিপুরে উপস্থিত হইয়া, প্রকৃতির শোভা দর্শনপূর্ব্বক হৃদয়ের জ্বালা দূর করিবার অভিপ্রায়ে, প্রতিদিন রাত্রিতে গঙ্গাতীরে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। বসন্তকালে শান্তিপুরে গঙ্গাতীরের শোভা অতিশয় মনোরম। বহুবিস্তৃত শুভ্র বালুকারাশির উপর চন্দ্রের কিরণ নিপতিত হইলে যে কি এক অপূর্ব্ব শোভা প্রকটিত হয়, তাহা না দেখিলে অনুভূত হয় না। ঊর্দ্ধে সুনীল আকাশে নক্ষত্ররাজি-পরিবেষ্টিত নির্ম্মল চন্দ্রমার মনোহারিণী শোভা, নিম্নে স্বচ্ছসলিলা ভাগীরথী মৃদুমন্দ-গতিতে ক্ষীণ-কল্লোল বুকে লইয়া প্রবাহিতা হইতেছে; সেই তরঙ্গমালায় পূর্ণচন্দ্র যেন শতখণ্ডে বিভক্ত হইয়া এক অপূর্ব্ব নৃত্য বিস্তার করিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে নিশাচর পক্ষিগণের সুমধুর ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইতেছে। এই সকল শোভা, সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে কার প্রাণ না শীতল হয়? গোস্বামী প্রভু

* গোস্বামী প্রভু কৃত "ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

প্রতিদিন গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে লাগিলেন। জনসমাজের কুটীলতা, কপটতা, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতির সঙ্ঘাতে হৃদয় উত্তপ্ত হইলে সাধুরা এইরূপেই প্রকৃতিদেবীর ক্রোড়ে শান্তি ও বিশ্রামসুখ লাভ করেন।

এই সময় শান্তিপুরনিবাসী ৺হরিমোহন প্রামাণিক নামক একজন বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ভক্তের সহিত গোস্বামী প্রভুর বন্ধুত্ব জন্মে। গোস্বামী প্রভু প্রাণের অবস্থা খুলিয়া বলিলে, তিনি তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতে অনুরোধ করেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, শ্রীমতী রাধিকা মহাভাব, অতএব তিনিও ব্রহ্মজ্ঞানী,—ইত্যাদি কোমল মধুর বাক্যে তাঁহাকে অনেক সময় সান্ত্বনা দিতেন। প্রামাণিক মহাশয়ের অনুরোধে গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহার জীবনের এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বিনয়, ভক্তি, অনুরাগ, ব্যাকুলতা, ঈশ্বর দর্শন ও সম্ভোগ প্রভৃতি বিষয় তাঁহাকে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে নিমজ্জিত করিল। 'জীবে দয়া ও নামে রুচি' এই তত্ত্বদ্বয়ের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া গোস্বামী প্রভু ভাবে বিভোর হইলেন এবং মনে মনে শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবকে গুরু বলিয়া প্রণাম করিলেন।

অতঃপর শ্রদ্ধেয় প্রামাণিক মহাশয়, গোস্বামী প্রভুকে সঙ্গে লইয়া শ্রীপাঠ কালনায় সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করিতে গমন করেন। আশ্রমে উপস্থিত হইলে বাবাজী মহাশয়, গোস্বামী প্রভুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণামকরতঃ উপবেশন করিতে আসন প্রদান করিলেন। এই সময় গোস্বামী প্রভু তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলপান করিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, অতএব তাঁহাকে যেন স্বতন্ত্র পাত্রে পানীয় দেওয়া হয়। ইহা শুনিয়া বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"সে কি প্রভো!

ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে কি ভক্তির অধিকারী হওয়া যায়? প্রভো! আমার আকাঙ্ক্ষায় বাধা দিবেন না। দয়া ক'রে এই পাত্রেই জলপান করুন।" এই বলিয়া সুনির্ম্মল গঙ্গোদকপূর্ণ স্বীয় কমণ্ডলু তাঁহাকে প্রদান করিলেন। গোস্বামী প্রভু নিরুত্তর হইয়া কমণ্ডলুর জল পান করিয়া রাখিয়া দিলে, বাবাজী মহাশয় তাহা স্বীয় ললাটে ঠেকাইয়া অবশিষ্ট জলটুকু পান করিলেন। তাঁহার এইরূপ ব্যবহার দর্শন করিয়া, উপস্থিত জনৈক ভদ্রলোক বলিলেন—"বাবাজি! এ কি করিলেন? ইনি যে পৈতা ফেলে দিয়েছেন, ব্রাহ্মসমাজে ঢুকেছেন, কিছুই মানেন না।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"আরে, আমার অদ্বৈতেরও ত পৈতা ছিল না। ব্রাহ্মসমাজে ঢুকেছেন, কিন্তু দেখ, সেখানেও আমার গোসাই আচার্য্য!" ইহাতে পূর্ব্বোক্ত লোকটী একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"তা ঠিকই ব'লেছেন, আচার্য্য! কেমন আচার্য্য দেখ্‌তে তো পাচ্ছেন? কেমন ধুতি-চাদর, কেমন জামা, কেমন জুতা, বাঃ!" বাবাজী মহাশয় সজলনেত্রে উত্তর করিলেন—"আহা! প্রভুকে পরিপাটী করে সাজান, এ তো আমাদের কর্ত্তব্য, কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, আমরা তাহা পার্‌লাম না। প্রভু নিজের প্রয়োজনীয় জিনিষ নিজেই সংগ্রহ করিয়া লইতেছেন, ইহা দেখিয়া আমরা যে একটু আনন্দ করিব, হায়! হায়! তাহাও আমাদের ভাগ্যে নাই।" এই কথা বলিতে বলিতে বাবাজী মহাশয় বালকের মত হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কাল্‌নাস্থিত এই আশ্রমেই গোস্বামী প্রভু প্রথম নাম-ব্রহ্মের পূজা পরিদর্শন করেন এবং কলিযুগে এই পূজাই শ্রেষ্ঠ, ইহা তাঁহার হৃদয়ে স্বতঃ উদিত হয়। উত্তরকালে কলি-পাবনাবতার শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রত্যাদেশক্রমে গোস্বামী প্রভু ঢাকানগরীতে স্বীয় গেণ্ডেরিয়া আশ্রমে

৺নাম-ব্রহ্ম স্থাপনকরতঃ তাঁহার পূজা প্রচলিত করেন। যথাস্থানে ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

অতঃপর গোস্বামী প্রভু তদীয় বন্ধু স্বর্গীয় নীলকমল দেবকে সঙ্গে লইয়া, সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করিবার জন্য নবদ্বীপ গমন করেন। কালনার ভগবানদাস বাবাজী মহাশয়ের ন্যায় ইনিও একজন প্রেমিক ভক্ত ছিলেন। এই দুইজন মহাপুরুষ গৌড়মণ্ডলে অবস্থানকরতঃ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মৃতপ্রায় ধর্ম্মকে কথঞ্চিৎ সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন, তজ্জন্য সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজ ইঁহাদের নিকটে চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। সে যাহা হউক, গোস্বামী প্রভু নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া, বাবাজী মহাশয়ের আশ্রমে গমন করিলেন। বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় এই নবাগত অতিথিদ্বয়কে সাদরে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাদের আগমনে হর্ষ-প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল সদালাপের পর গোস্বামী প্রভু, বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভক্তি কিসে হয়?' এই কথা শুনিয়া বাবাজী মহাশয় থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে হুঙ্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন—"সে কি প্রভো! তুমি কি আমাকে প্রতারণা করিতে আসিয়াছ? ভক্তির ভাণ্ডারী হইয়া তুমি আমার মত জীবাধমের নিকট ভক্তি-লাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি তোমার ললাটে তিলক, মস্তকে জটাভার ও গলদেশে তুলসীর মালা সন্দর্শন করিতেছি।' এই কথা বলিতে বলিতে বাবাজী মহাশয়ের এতদূর প্রেমোচ্ছ্বাস হইয়াছিল যে, তাঁহার সর্ব্বশরীর শিমুলের কাঁটার ন্যায় রোমাঞ্চিত হইয়াছিল ও মস্তকের শিখাটী পর্য্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, সিদ্ধ-পুরুষের এই ভবিষ্যৎবাণী সফল হইয়াছিল। গোস্বামী প্রভু শেষজীবনে তিলক, মালা, জটা ইত্যাদি বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, বাবাজী মহাশয় ভাব সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে উপদেশ দিলেন—"যদি প্রেমভক্তি লাভ করিতে চাও, তবে দীনহীন অকিঞ্চন হও। অন্তরে একবিন্দু অহঙ্কার থাকিতেও ভক্তিলাভ হইতে পারে না। জলের স্রোতঃ যেমন ঊর্দ্ধগামী হয় না, ভক্তিও তদ্রূপ অহঙ্কারীর হৃদয়ে উদিত হয় না।"

অতঃপর বাবাজী মহাশয়, গোস্বামী প্রভুকে একটী পাত্রে করিয়া কিছু খাদ্যদ্রব্য সাদরে প্রদান করিলেন। তিনি আহার করিয়া পাত্রটী একধারে রাখিয়া দিলে, তাহাতে যে ভুক্তাবশিষ্ট ছিল তাহা হঠাৎ বাবাজী মহাশয় স্বীয় মুখবিবরে প্রদানপূর্ব্বক ভাবাবেশে বলিতে লাগিলেন—"চিত্রগুপ্ত সাক্ষী, আজ আমি প্রভু-সন্তানের প্রসাদ পাইয়াছি।" গোস্বামী প্রভু তাহার ঐ কার্য্যে বাধা দিয়া বলিলেন—"আপনি আমার ভুক্তাবশিষ্ট আহার করিবেন না, আমি ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছি"। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন—"তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী হও আর যেই হও, অদ্বৈত-বংশে জন্মেছ। তোমার প্রসাদ আমি খাবো না, নিশ্চয়ই খা'ব। অতঃপর গোস্বামী প্রভু সিদ্ধ প্রেমিক মহানুভব চৈতন্যদাস বাবাজী মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শান্তিপুর প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে গোস্বামী প্রভু নদীয়াবিহারী শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ধর্ম্মের সার, কলিহত জীবের একমাত্র সাধন 'জীবে দয়া, নামে রুচি' তত্ত্ব সংগ্রহপূর্ব্বক তদ্দ্বারা ব্রাহ্মসমাজকে সঞ্জীবিত করিবার অভিপ্রায়ে, কলিকাতায় আগমনকরতঃ কেশবচন্দ্রের সহিত যোগদান করিলেন। কেশববাবু তখন প্রচারকদিগকে লইয়া প্রতিদিন বিশেষভাবে উপাসনা ও আলোচনাদি করিতেছিলেন। এই সময় এক দিবস গোস্বামী প্রভুর অগ্রজ প্রভুপাদ ব্রজগোপাল গোস্বামী মহোদয় কলিকাতায় আগমন করিয়া, গোস্বামী মহাশয়ের বাসভবনে নিম্নলিখিত সংকীর্ত্তন করিলেন।

কীর্ত্তনের সুর।

"কানু পরশমণি আমার।
কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ,
নয়নের ভূষণ আমার সে রূপ দরশন,
বদনের ভূষণ আমার সে রূপ গান,
হস্তের ভূষণ আমার সে পদ সেবন,
(ভূষণের কি আর বাকী আছে),
আমি কৃষ্ণচন্দ্র-হার প'রেছি গলে॥"

ভাব-লয়-তাল-যুক্ত এই সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া, উপস্থিত সকলেই ভক্তিভাবে বিগলিত হইয়াছিলেন। গোস্বামী প্রভু ব্রাহ্মসমাজে সংকীর্ত্তন করিবার জন্য কেশববাবুকে অনুরোধ করিলে, তিনি সম্মতি প্রকাশ করিলেন। এই প্রকারে প্রভুপাদ ব্রজগোপাল গোস্বামী মহোদয় দ্বারা ব্রাহ্মসমাজে সংকীর্ত্তন প্রচলনের সূত্রপাত হইল।

প্রভুপাদ ব্রজগোপাল, গোস্বামী প্রভু অপেক্ষা ২॥০ বৎসরের বড় ছিলেন। ইঁনিও মাতুলালয় শিকারপুরেই জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই দুই ভ্রাতার মধ্যে গভীর ভালবাসা জন্মিয়াছিল। কেহই কাহাকে এক মুহূর্ত্ত না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। ইঁহাদের আহার নিদ্রা, শয়ন উপবেশন, খেলাধুলা ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারই একত্রে সম্পাদিত হইত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ভালবাসা অত্যধিক ঘনীভূত হইয়াছিল এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহা অক্ষুণ্ণ ছিল। প্রভুপাদ ব্রজগোপাল বয়ঃজ্যেষ্ঠ হইলেও প্রগাঢ় স্নেহবশতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতার অমতে কোন কার্য্যই করিতেন না। গোস্বামী প্রভু উপবীত পরিত্যাগ করিলে, শান্তিপুর-সমাজ কর্ত্তৃক নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া যদিও ৺ব্রজগোপাল

গোস্বামী মহোদয় প্রকাশ্যভাবে তাঁহার সহিত সামাজিক বন্ধন ছিন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের পরস্পরের অন্তরের বন্ধন বিন্দুমাত্রও শিথিল হইয়াছিল না ; এবং এই কার্য্য তিনি গোস্বামী প্রভুর অভিপ্রায়ানুসারেই করিয়াছিলেন। স্বীয় অগ্রজকে সমাজের ভয়ানক অত্যাচারের হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত করিবার জন্যই গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে ঐরূপ কার্য্য করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

যুগাবতার নদীয়াবিহারী শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত সুবিমল সার্ব্বভৌমিক বৈষ্ণবধর্ম্মের গ্লানি দূর করা দুই প্রভুর জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ; এবং দুইজনে দুইটী স্বতন্ত্র প্রণালী দ্বারা সেই কার্য্যসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন। গোস্বামী প্রভু যুক্তি, বিচার, জ্ঞান ইত্যাদির সহায়তায় শিক্ষিত-সমাজের ভিতরে কার্য্য করিতে লাগিলেন, এবং ৺ব্রজগোপাল গোস্বামী মহাশয় অশিক্ষিত ও অপেক্ষাকৃত নিম্ন-শ্রেণীর মধ্যে কথকতা ও সংকীর্ত্তন দ্বারা শাস্ত্র ও সদাচার-সম্মত বৈষ্ণবাচার সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। গোস্বামী প্রভু পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে উক্ত কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করাইবার জন্য শান্তিপুরের বড় গোস্বামী বাড়ীর প্রসিদ্ধ কথক প্রভুপাদ তারণগোস্বামী মহাশয়ের নিকটে কথকতা শিক্ষা করাইয়াছিলেন।

প্রভুপাদ ব্রজগোপাল গোস্বামী অতীব সুগায়ক ছিলেন এবং অতিশয় উচ্চকণ্ঠে গান করিতে পারিতেন। শেষ রাত্রে তিনি যখন গৃহের ছাদে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে ভোর কীর্ত্তন করিতেন, তখন সুদূর গুপ্তিপাড়া, কালনা, গাড়াগড়, ছোট রাণাঘাট প্রভৃতি স্থান হইতে তাহা শুনা যাইত, এবং সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে তাঁহার ভক্তিবিগলিত গানে আকৃষ্ট হইয়া তত্তৎ অঞ্চলের ভগবদ্ভক্তগণ স্ব স্ব ইষ্টদেবের উপাসনায় মনোনিবেশ করিতেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাঁহার গানে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, শুধু গান শুনিবার জন্যই ২।৩ বার শান্তিপুরে তাঁহার আলয়ে অতিথিরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন।

কথকতার সময়েও মধ্যে মধ্যে গান করিয়া তিনি শ্রোতৃবর্গকে ধর্ম্ম-বিষয়ে আকৃষ্ট করিতে যত্ন করিতেন; এবং উহার ফলও অতীব সন্তোষ-জনক হইত। ৺ব্রজগোপাল গোস্বামী মহোদয়ের ভক্তিপূর্ণ কথকতা, তাঁহার ভাব-তাল-লয়সমন্বিত সুমধুর গান শ্রবণে বহুলোকের ধর্ম্মভাব বিকশিত হইত। তিনি কথকতা করিতে যখন যে স্থানে গমন করিতেন, তখন সেই স্থানেই একটী ছোটখাট মহোৎসব সম্পন্ন হইত। তাঁহার সুমিষ্ট প্রাণস্পর্শী কথকতা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত বহুদূর হইতেও দলে দলে লোক আগমন করিত; এবং কথা অন্তে তারকব্রহ্ম হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া গ্রামবাসিগণকে মাতাইয়া তুলিত। এইরূপে স্বীয় জীবনের ব্রত উদযাপন করতঃ, তিনি ৩৭।৩৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে রংপুর জেলার অন্তর্গত রসুলপুর নামক গ্রামে, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ মণ্ডল পোপের বাটীতে নশ্বর-দেহ পরিত্যাগ করিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

তাঁহার তিরোধানের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তিনি তাঁহার কতিপয় শিষ্যকে বলিয়াছিলেন যে, মৃত্যু অন্তে তাঁহার দেহ সংকার না করিয়া যেন সমাধিস্থ করা হয়। কিন্তু গোস্বামি-সন্তানের দেহ সমাধিস্থ করিয়া রীতিমত ভোগ-পূজাদি দিতে না পারিলে অপরাধ হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া উপস্থিত গরীব শিষ্যগণ তাঁহার পরিত্যক্ত দেহ সংকার করিবার সঙ্কল্প করিয়া নিকটবর্ত্তী তিস্তা ও মানস্ নদীর সঙ্গমস্থলে শবসহ উপনীত হইল। এই সময় একটী অতীব বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটিত হইল। পরিত্যক্ত দেহ নদীতীরে জনৈক সঙ্গীয় লোকের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া, অবশিষ্ট শবদাহকগণ কাষ্ঠ সংগ্রহ করিবার জন্য ইতস্ততঃ গমন করিল; কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া তথায় শব অথবা প্রহরীকে না দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল। অতঃপর প্রহরীকে অনুসন্ধান করিয়া শবের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল যে, তাহারা কাষ্ঠ-সংগ্রহ করিবার জন্য অন্যত্র গমন করিবার কিয়ৎকাল পরে

উক্ত শবে জীবনসঞ্চারের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া ভয় পাইয়া প্রস্থান করিয়াছিল। শবের কথা সে কিছুই বলিতে পারে না। এই কথা শুনিয়া তাহারা পুনরায় নদীতীরে আগমনপূর্ব্বক, জলে স্থলে অনেক অনুসন্ধান করিয়াও শবের কোন চিহ্ন দেখিতে না পাইয়া ক্ষুণ্ণমনে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

এই ঘটনার পরদিবস রংপুর, চিলমারীনিবাসী, জনৈক ভগবদ্ভক্ত, ৺ব্রজগোপাল গোস্বামী মহাশয়কে দর্শন করিবার জন্য রসুলপুর গমন করেন। তিনি প্রভুপাদের তীরোধানের কথা অবগত ছিলেন না। পথিমধ্যে হঠাৎ তিনি প্রভুপাদের দর্শন পাইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। কথাপ্রসঙ্গে ৺ব্রজগোপাল গোস্বামী মহোদয় তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি শ্রীবৃন্দাবন রওয়ানা হইয়াছেন, আর দেশে ফিরিবেন না; অতএব দুর্গানন্দ নামক তদীয় শিষ্যের নিকটে তাঁহার যে গচ্ছিত ধন আছে, তদ্দ্বারা যেন শীঘ্রই মহোৎসব করা হয়। লোকটী তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া যথাসময়ে দুর্গানন্দের বাটীতে উপনীত হইয়া ঐ কথা উল্লেখ করিলে, তাহারা আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হইল, কারণ তাহারা প্রভুপাদের দেহত্যাগের কথা অবগত ছিল। অতঃপর একাদশ দিনে শ্রীমান্ দুর্গানন্দ, স্বীয় গুরুদেব কর্ত্তৃক গচ্ছিত অর্থাদির দ্বারা মহাসমারোহে মহোৎসব সম্পন্ন করিলেন।

গোস্বামী প্রভু কোন এক সময় স্বীয় অগ্রজের তিরোধানের স্থান দর্শন করিবার জন্য তিস্তা-মানস্ সঙ্গমে উপস্থিত হইয়া শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁহার উদ্দেশে তর্পণ করিয়াছিলেন।*

গোস্বামী প্রভুর উদ্যোগে অতঃপর কলিকাতার অন্তর্গত উল্টাডিঙ্গির

* ৺ব্রজগোপাল গোস্বামী মহোদয়ের পৌত্র এবং 'বালক বিজয়কৃষ্ণ' নামক গ্রন্থপ্রণেতা প্রভুপাদ সীতানাথ গোস্বামি-প্রদত্ত বিবরণ অবলম্বনে লিখিত।

৺মনোহরদাস বাবাজী মহাশয় দ্বারা ব্রাহ্মসমাজে সংকীর্ত্তন করান হইল। তিনি গান ধরিলেন—

"প্রেম পরশমণি শ্রীশচীনন্দন,
বিলাইছেন প্রেমসুধা দেখি দীনহীন রে।" ইত্যাদি।

এই দিন ব্রাহ্মসমাজে এক অপূর্ব্ব ভাবের স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছিল। কিছু দিন কীর্ত্তন করিতে করিতে অনেকে অহৈতুকী ভক্তিরসে পরিষিক্ত হইতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত সংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম প্রচলনের পর, ব্রাহ্মসমাজের এক অপূর্ব্ব কল্যাণকর যুগান্তর উপস্থিত হয়। কলিকাতায় যেমন কীর্ত্তন হইতে লাগিল, তদ্রূপ অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজেও কীর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইল। ঢাকা-ব্রাহ্মসমাজে কীর্ত্তনের বিশেষ প্রচলন হইল। যে সংকীর্ত্তন-মদিরাপানে এক সময় সমগ্রদেশ মাতিয়া উঠিয়াছিল, যাহার উত্তালতরঙ্গ-সঙ্ঘাতে দেশ হইতে জাতিগত, বর্ণগত, অর্থগত, সর্ব্বপ্রকারের হিংসা-বিদ্বেষ তৃণের মত ভাসিয়া গিয়াছিল, বলিতে কি, যাহার প্রভাবে বাঙ্গালীজাতি নবজীবন লাভ করিয়াছিল, সেই সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ কীর্ত্তনকে অধিকাংশ শিক্ষিত-লোকেরা এতদিন ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিতেন। তাঁহারা ইহাকে নিম্নশ্রেণীর লোকের ও আউল, বাউল প্রভৃতি শাস্ত্র-সদাচার-বিবর্জ্জিত উপধর্ম্ম-যাজকদিগের ভজন-প্রণালী বলিয়াই জানিতেন। কলিহত জীবের উদ্ধারকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেরণায়, গোস্বামী প্রভু এতদিন পরে আবার সেই নামসংকীর্ত্তন পুনঃপ্রচলন করিলেন এবং শিক্ষিত-সমাজে ইহা আদরে গৃহীত হইল।

গোস্বামী প্রভুর প্রথম-রচিত কীর্ত্তন দুইটী নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে যথা :—

কীর্ত্তনের সুর—লোফা।

১। পাপে মলিন মোরা চল সবে ভাই,
পিতার চরণে ধরি কাঁদিয়ে লুটাই রে।
পতিতপাবন পিতা ভকতবৎসল,
উদ্ধারেন পাপীজনে দেখি অসহায় রে।
প্রেমের জলধি তিনি সংসার-পাথারে,
পতিত দেখিয়ে দয়া তাই এত হয় রে।
বিলম্ব ক'রো না আর ভুলিয়ে মায়ায়,
ত্বরিত লইগে চল তাঁর পদাশ্রয় রে।

কীর্ত্তনের সুর—একতালা।

২। পতিতপাবন ভকতজীবন অখিলতারণ
বল রে সবাই।
বল্ রে বল্ রে বল্ রে সবাই।
যাঁরে ডাক্‌লে হৃদয় শীতল হবে।
যাঁরে ডাক্‌লে পাপী তরে যাবে।
ওরে এমন নাম আর পাবি না রে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ঢাকা-সহরে প্রচারক্ষেত্র-স্থাপন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও চিকিৎসা-ব্যবসায়, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের দ্বার-উদ্ঘাটন, অতিরিক্ত পরিশ্রমে হৃদ্‌রোগের উদ্ভব, তন্দ্রাবস্থায় মহাপ্রভুর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্তি, কেশববাবুর সহিত মতভেদের সূচনা।

১৭৮৭ শকে গোস্বামী প্রভু ঢাকাসহরে স্থায়ীভাবে প্রচার-ক্ষেত্র স্থাপন করিয়া, স্বোপার্জ্জিত অর্থে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের অভিপ্রায়, চিকিৎসা-ব্যবসায় ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকার্য্য একত্রে সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

তাঁহার উদ্যোগে "১২৭২ সনে "ঢাকা সঙ্গতসভা" সংস্থাপিত হয়। বাবু বঙ্গচন্দ্র রায়, ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়, ভুবনমোহন সেন, রজনীকান্ত ঘোষ এবং আরও কয়েকটী শিক্ষিত যুবক এই সভার সভ্য ছিলেন। • • • ২৭৬ সনের অগ্রহায়ণ মাসে ব্রাহ্মমন্দির-কার্য্য শেষ হইলে, ২১ ২২ শে অগ্রহায়ণ অতিসমারোহসহকারে গৃহ-প্রবেশ-কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। এই উৎসব উপলক্ষে কেশববাবুকে পুনরায় আহ্বান করা হয়। গোস্বামী প্রভু তৎকালে এখানকার উপাচার্য্য ছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি ঢাকা পরিত্যাগ করিলে, কালীপ্রসন্ন ঘোষ সমাজের আচার্য্যের কার্য্য করেন।

"এমন সময় কি প্রকার লোক সমাজের উপাচার্য্য নিযুক্ত হইতে

পারেন এবং সমাজগৃহে খোল-করতাল লইয়া কীর্ত্তন হইতে পারে কি না, এই বিষয় লইয়া যুবক ও অধিকবয়স্ক ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মতভেদ হয়। যে সকল ব্যক্তি নিজে পৌত্তলিক ক্রিয়া করেন কিংবা তাহাতে যোগ দেন, এরূপ লোক ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য নিযুক্ত হইতে পারেন না, যুবকগণ এরূপ মত প্রকাশ করেন। বয়স্কদিগের উহাতে আপত্তি ছিল না; কিন্তু সমাজগৃহে খোল-করতাল লইয়া কীর্ত্তনে আপত্তি করেন। যুবকগণ খোল-করতাল ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। অধিকবয়স্কদিগের মত প্রবল হওয়াতে যুবকগণ ঢাকাপ্রকাশ পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিয়া পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া, স্থানান্তরে একটী উপাসনা-সমাজ স্থাপন করেন। ১২৭৭ সনের ভাদ্র মাসে এই ঘটনা ঘটে। প্রচারক বিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এই সময় এখানে থাকিয়া যুবকগণকে পরিচালিত করেন। ১২৮০ সনে পুনর্ব্বার যুবকমণ্ডলী আহূত হন।" *

ভগবদ্বিধানে পুনর্ব্বার দুই দল মিলিত হইলে, প্রবলবেগে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার-কার্য্য আরম্ভ হইল। গোস্বামী প্রভু ঢাকা সহরকে কেন্দ্র করিয়া মৈমন-সিংহ, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, বরিশাল প্রভৃতি জেলার কোন স্থানে নৌকাযোগে, কোন স্থানে পদব্রজে গমনকরতঃ, কখন অনাহারে কখনও বা চিড়ামুড়ি ভক্ষণপূর্ব্বক, অক্লান্ত-পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায়সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার জ্বলন্ত-দৃষ্টান্তে পূর্ব্ব-বাঙ্গালা মাতিয়া উঠিল, এবং সহস্র সহস্র নরনারী ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া নবজীবন লাভে ধন্য হইলেন।

এখনকার মত সেই সময় যাতায়াতের সুবিধা না থাকাতে এবং অনেক

---

* ঢাকা ব্রাহ্ম-সমাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকবিবাসে প্রণেতার নিকট প্রাপ্ত।

সময় অর্থাভাবে, দূরবর্ত্তী স্থানে ভ্রমণকালে গোস্বামী প্রভুকে কিরূপ ভয়ানক ভয়ানক বিপদে পতিত হইতে হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। একবার ঢাকা হইতে শিবসাগর যাইবার সময় গোস্বামী প্রভু ষ্টীমারের মধ্যে ৫।৬ দিন উপবাসী ছিলেন। গন্তব্য স্থানে ষ্টীমার লাগিলে, তিনি তথা হইতে অবতরণপূর্ব্বক স্নানাদি ক্রিয়া সম্পাদনকরতঃ নদীর কিনারা হইতে কিছু আঠালিয়া মাটি ও জল পান করিয়া ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করিয়াছিলেন। নিজের প্রয়োজনের জন্য অপরের নিকট যাচ্ঞা করাকে তিনি এতদূর হেয় জ্ঞান করিতেন যে, উক্ত ষ্টীমারের মধ্যে পরিচিত লোক থাকা সত্ত্বেও তাহাদিগের নিকটে আপনার অভাব জ্ঞাপন করেন নাই।

২। এক সময় জনৈক পথপ্রদর্শকের সঙ্গে পদব্রজে চৈম সিংহ যাইবার পথে গোস্বামী প্রভু বন্য মহিষের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিলেন। বন্যমহিষ দূর হইতে তাঁহাদিগের প্রতি শৃঙ্গ খাড়া করিয়া বেগে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। পথপ্রদর্শক ইহা দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। গোস্বামী প্রভু অন্তিমকাল উপস্থিত ভাবিয়া, পথিমধ্যে উপবেশন-করতঃ মুদ্রিত নয়নে ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। সেই গ্রাম্য-পথটি খুব অপ্রশস্ত ও উহার দুই পার্শ্বে সুদীর্ঘ কাশবন বিদ্যমান ছিল। এমন সময় হঠাৎ ঘূর্ণিবায়ু উত্থিত হইয়া কাশবন আন্দোলিত হওয়াতে, মহিষের গতি কথঞ্চিৎ রুদ্ধ হইল। ইত্যবসরে পথপ্রদর্শক কিঞ্চিৎ দূরে একটী গর্ত্ত দেখিতে পাইয়া, গোস্বামী প্রভুর হস্তধারণপূর্ব্বক তথায় লইয়া গেল। তখন গোস্বামী প্রভু "বিপদবারণ মধুসূদনের" কৃপা স্মরণ-পূর্ব্বক মনের উল্লাসে গান ধরিলে, পথপ্রদর্শক পুনরায় বিপদের আশঙ্কা করিয়া তাহাতে বাধা প্রদান করিল। ক্ষণকালের মধ্যে বায়ু অপসারিত হইল, মহিষও তীব্রবেগে লক্ষ্য স্থানে আগমন করিল; কিন্তু আগন্তুকদিগকে

তথায় দেখিতে না পাইয়া, ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে শৃঙ্গ দ্বারা মৃত্তিকা-খনন ও মলমূত্রাদি ত্যাগ করিয়া পরিশেষে ক্ষুন্নমনে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

৩। একবার ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য ঢাকা হইতে নৌকাযোগে কোন স্থানে গমনকালে পদ্মানদীতে ঝড়তুফানে গোস্বামী প্রভুর নৌকা জলমগ্ন হইল। মাঝি-মাল্লারা কে কোথায় গেল, তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। নৌকা মগ্ন হইবার পরেও কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত গোস্বামী প্রভুর জ্ঞান ছিল। এই অবস্থায় তিনি অনুভব করিলেন যে, নৌকা একেবারে মাটীতে গিয়া ঠেকিয়াছে এবং কে যেন তাহা টানিয়া কোন্ দিকে লইয়া যাইতেছে। ইহার পর গোস্বামী প্রভু অচেতন হইয়া পড়িলেন। চৈতন্য প্রাপ্ত হইলে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, কয়েকজন ধীবর তাঁহাকে একটী চড়ার উপর রাখিয়া অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত করিতেছে। তিনি কি প্রকারে এই স্থানে উপস্থিত হইলেন, এই কথা গোস্বামী প্রভু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে, তাহাদিগের মধ্যে একজন উত্তর করিল—ঝড়ের সময় দূর হইতে তাহারা একখানি নৌকা ডুবিতে দেখিয়াছিল, কিন্তু তুফানের আধিক্যবশতঃ সাহায্যার্থে আগমন করিতে পারে নাই। ঝড় থামিয়া গেলে নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, চড়ার উপর একখানি নৌকা রহিয়াছে এবং তন্মধ্যে গোস্বামী প্রভু অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া আছেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে যত্ন করাতে, ভগবানের কৃপায় এখন কৃতকার্য্য হইয়াছে। গোস্বামী প্রভু কত সময়ে এইরূপ কত বিপদে পড়িয়াছেন এবং ভগবানের কৃপায় কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, সে সকল ধ্যান করিলে ভয়, বিস্ময় এবং কৃতজ্ঞতায় হৃদয় পরিপূর্ণ হয়।

চিকিৎসাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে গোস্বামী প্রভুর ধর্ম্ম-প্রচারে অনেক সময় বিঘ্ন ঘটিত, অথচ চিকিৎসা-কার্য্যও পরিত্যাগ করিতে পারেন না;

কারণ, তিনি কাহারও নিকটে কিছুরই প্রত্যাশা না রাখিয়া স্বোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারাই পরিবার প্রতিপালন করিবার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন; এবং ব্রাহ্মসমাজও তখন পর্য্যন্ত প্রচারকদিগের ব্যয়ভার বহন করিবার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। গরীব রোগীদিগের সুবিধার জন্য গোস্বামী প্রভু আট আনা মাত্র দর্শনী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। তাহাও সকলের নিকটে গ্রহণ করিতেন না। অধিকন্তু তাঁহাকে অনেক সময় রোগীদিগের ঔষধ ও পথ্যের ব্যয়ভার বহন করিতে হইত।

গোস্বামী প্রভুর চিকিৎসা-ব্যবসায়ের সঙ্গে একটী অতীব আশ্চর্য্য ঘটনার সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ বক্তা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতৃদেব স্বর্গীয় ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, স্বপ্নযোগে গোস্বামী প্রভুকে অনেক কঠিন রোগের ব্যবস্থা বলিয়া দিতেন; এবং ঐ সকল ব্যবস্থানুসারে চিকিৎসা করিয়া তিনি অতিরিক্ত ফল প্রাপ্ত হইতেন। এইরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত। গোস্বামী প্রভু শয়ন করিবার সময় কাগজ ও পেন্সিল বিছানায় রাখিয়া নিদ্রা যাইতেন রাত্রিকালে যেদিন ঐরূপ স্বপ্ন দেখিতেন, তাহা জাগরিত হইয়াই স্মরণ থাকিতে থাকিতে লিখিয়া রাখিতেন। গোস্বামী প্রভু শান্তিপুরে অবস্থানকালে তথায় একবার ভীষণ ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে অনেক লোক মরিতে লাগিল। তিনি ব্যাকুল হইয়া চিকিৎসাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। রাত্রিতে স্বপ্নাবস্থায় পূর্ব্বোক্ত ডাক্তার একখানি ব্যবস্থাপত্র লিখাইয়া দিলেন। গোস্বামী প্রভু পরদিন প্রত্যূষে রোগীদিগকে ঐ ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, ঔষধটী অব্যর্থ ফলপ্রদ হইল। বহুলোক এই দৈবঘটনায় বাঁচিয়া গেল। ব্যবস্থাপত্রে কৃমিনিবারক ঔষধই অধিক পরিমাণে ছিল। পরিশেষে গোস্বামী প্রভু দেখিলেন যে, সেবারকার বিসূচিকা রোগ কৃমি দ্বারাই উৎপন্ন হইয়াছিল; তন্নিমিত্ত অপরাপর চিকিৎসকগণ

ঐ রোগের সাধারণ ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া একটি রোগীকেও বাঁচাইতে পারেন নাই।

গোস্বামী প্রভু যখন যে রোগীর চিকিৎসা-ভার গ্রহণ করিতেন, তখন তিনি প্রাণপণ করিয়া তাহার সেবা-শুশ্রূষায় তৎপর হইতেন। একবার শান্তিপুরের অপরপারস্থিত গুপ্তিপাড়ার একটী রোগী তাঁহার চিকিৎসাধীন হয়। তিনি প্রাতে খেয়া নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া, রোগী দেখিয়া শান্তিপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রোগীর অবস্থা খারাপ ছিল, সুতরাং ঔষধাদি লইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে না দেখিলে চলে না। এদিকে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। একে বর্ষাকাল, তাহাতে আবার ভয়ানক ঝঞ্ঝাবাত, কাহার সাধ্য যে নদী পার হয়? খেয়া-নৌকার পাটনী ঈদৃশ ঝড়তুফানের মধ্যে কিছুতেই গোস্বামী প্রভুকে পার করিতে স্বীকৃত হইল না। অগত্যা তিনি ঔষধের শিশি বস্ত্র দ্বারা জড়াইয়া মস্তকে বন্ধনপূর্ব্বক, ভীষণ-তরঙ্গসমাকুল ভাদ্র মাসের ভরা নদী সন্তরণকরতঃ পার হইলেন; এবং যথাসময়ে রোগীর বাটীতে উপনীত হইয়া, উপস্থিত সকলকে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন করিলেন। এবম্প্রকার দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন চিকিৎসক সংসারক্ষেত্রে কত জন দেখা যায়?

একবার একটী কঠিন রোগীর চিকিৎসার ভার গোস্বামী প্রভুর উপর অর্পিত হইলে, তিনি যথাসাধ্য তাহার রোগ-প্রতিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রোগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া, তিনি তাহার আত্মীয় স্বজনকে অপর চিকিৎসক ডাকিতে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে একজন বড় ডাক্তার ডাকা হইল এবং তাঁহার চিকিৎসায় রোগী ক্রমে ক্রমে আরোগ্য লাভ করিল। এই ঘটনায় গোস্বামী প্রভু দেখিতে পাইলেন যে, তিনি প্রকৃত রোগ চিনিতে পারেন নাই এবং রোগী তাঁহার চিকিৎসাধীনে থাকিলে নিশ্চয়ই মারা পড়িত। ইহাতে তিনি এতদূর বিচলিত হইয়াছিলেন যে, যাহাতে লোকের জীবনমরণের ভারগ্রহণ

করিতে হয়, এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ চিকিৎসা-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। এমন সময় একদিন স্বপ্নযোগে স্বর্গীয় দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গোস্বামী প্রভুকে বলিলেন—"তোমাকে কেবল চিকিৎসা-ব্যবসায় করিলে চলিবে না। যাহাতে লোকের ভবরোগের চিকিৎসা হয়, তাহা করিতে হইবে।" ইহার পর গোস্বামী প্রভু নিজের পরিবারপ্রতিপালনের ভার সম্পূর্ণরূপে ভগবানের উপর অর্পণপূর্ব্বক, চিকিৎসাব্যবসায় পরিত্যাগকরতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারে ব্রতী হইলেন, এবং সাংসারিক সুখদুঃখ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া, অদম্য উৎসাহে বঙ্গদেশের নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে ব্রহ্মনাম প্রচার করিতে লাগিলেন।

চিকিৎসা ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া গোস্বামী প্রভু তদীয় বন্ধু ৺ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা যথাযথ উদ্ধৃত করা যাইতেছে, যথা :—

অধমের নিবেদন,

আমি ভিখারীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ব্যবসায় করা আমার কার্য্য নহে। আমি পুনর্ব্বার ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইলাম। বোধ হয় অল্প দিন মধ্যেই আপনার গৃহ শূন্য থাকিবে। ব্রাহ্মভ্রাতারা আমাকে সাহায্য করেন ভালই, না করেন তাহাও ভাল। ঈশ্বরের চরণে শরীর-মন বহুদিন অবধি বিক্রয় করিয়াছি। তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। অন্তর্যামী ঈশ্বর আমাকে স্নেহের সহিত সাহায্য করিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হউক। আমার শোণিত ব্রাহ্মধর্ম্মকে পোষণ করুক। ১৭৮৭ শক পৌষ, ঢাকা।

এই বৎসর ব্রহ্মোৎসবের সময় গোস্বামী প্রভু কলিকাতায় আগমন করিলে, মহাসমারোহের সহিত উৎসবক্রিয়া সম্পন্ন হইল। চারিদিকেই ব্রহ্মনামের জয়ধ্বনি উত্থিত হইল, ঘরে ঘরে ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোচনা

হইতে লাগিল। উৎসবান্তে শ্রদ্ধেয় কেশববাবু কিয়ৎকাল সপরিবারে মুঙ্গেরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ঐ সময় তথাকার কতিপয় ব্রাহ্ম, কেশববাবুকে অবতার মনে করিয়া তাঁহার পদধূলিগ্রহণ, পাদপ্রশংসাদি কার্য্য সম্পাদন করিতেন। এই কার্য্য গোস্বামী প্রভু প্রমুখ কতিপয় ব্রাহ্মের নিকটে ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ বোধ হওয়ায়, তাঁহারা কেশববাবুকে ইহার প্রতিকার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তদুত্তরে কেশববাবু বলিলেন যে তিনি মনুষ্যের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন না। কেশববাবুর এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া, তাঁহারা প্রকাশ্য সংবাদপত্রে ঐ কার্য্যের প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। চারিদিকে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। কেশববাবুর অনুগত লোকেরা এই ঘটনায়, গোস্বামী প্রভুর উপর এতদূর বিরক্ত হইলেন যে, তাঁহারা তাঁহাকে অবিশ্বাসী নাস্তিক বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রহার পর্য্যন্ত করিতেও প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

এই সকল গোলযোগ উপস্থিত হইলে, গোস্বামী প্রভু শান্তিপুরে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সময় একটী আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। গোস্বামী প্রভুর কুলাধিদেবতা ৺শ্যামসুন্দর তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া বলিলেন—"আমি তোকে ঘর হইতে বাহির করিলাম, আবার তুই গৃহে প্রবেশ করিলি। আমি তোকে কিছুতেই সংসারে লিপ্ত হইতে দিব না।" গোস্বামী প্রভু ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেও অনেকবার ৺শ্যামসুন্দর, কখনও স্বপ্নে, কখনও বা জাগ্রতাবস্থায় তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন করিতেন। কিন্তু তিনি বেদান্ত পড়িয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবার পর, ঐ সকল ব্যাপার তাঁহার নিকটে কল্পনা অথবা মস্তিষ্কের কোনরূপ ক্রিয়া বলিয়া সন্দেহ হওয়াতে, কিছুদিন পর্য্যন্ত ঐ প্রকার কথাবার্ত্তা একেবারেই বন্ধ ছিল। বহুদিন

পরে আজ আবার ৺শ্যামসুন্দর, গোস্বামী প্রভুর সহিত পূর্ব্বের ন্যায় কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে প্রকাশ্য পত্রিকায় নরপূজার প্রতিবাদ হইতে থাকিলে, কেশববাবুর চৈতন্য জন্মিল। তিনি, পদধারণ, চরণে পড়িয়া ক্রন্দন ইত্যাদি কার্য্য বন্ধ করিয়া দিলেন। যে দুইজন ব্রাহ্ম কেশববাবুকে অবতার মনে করিতেন, তাঁহারা কেশববাবু অবতার কি না, এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি অস্বীকার করিলেন। তখন তাঁহারা কেশববাবুকে ভণ্ড বলিয়া ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিলেন। কেশববাবু শান্তিপুরে গোস্বামী প্রভুর নিকটে দুঃখপ্রকাশ করিয়া চিঠি লিখিলেন এবং যাহাতে সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায় ও পূর্ব্বের ন্যায় ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হয়, তজ্জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিলেন। এই পত্র পাইয়া গোস্বামী প্রভু কলিকাতায় আগমন করিয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে কেশববাবুর সহিত মিলিত হইলেন; এবং তাঁহার আন্তরিক চেষ্টায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরস্পর বিরোধীদলের ভিতরে সদ্ভাব স্থাপিত হইল।

এই সকল গোলযোগের কিছুদিন পর ১৭৯১ শকের ৭ই ভাদ্র রবিবার ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। সেই দিনের জীবন্ত উপাসনায় ও স্বর্গীয় উৎসাহের স্রোতে ব্রাহ্মদিগের পূর্ব্বের মনোমালিন্য ধুইয়া গেল, এবং ৺আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণবিহারী সেন, ক্ষীরোদচন্দ্র রায় প্রভৃতি বহু শিক্ষিত যুবক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে কেশববাবু ইংলণ্ডে গমন করেন। তথায় ছয় মাস কাল অবস্থানপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া, কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইহার পরেই ব্রাহ্ম-বিবাহ-বিধি লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইতে লাগিল। আদি-ব্রাহ্মসমাজ ইহার প্রতিবাদ করাতে,

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। দুই সমাজের ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে সদ্ভাবটুকু পুনরায় আগমন করিয়াছিল, এই ঘটনায় তাহা একেবারেই বিলুপ্ত হইল। কেশববাবুপ্রমুখ ব্রাহ্মগণ, আদিসমাজের কথা উপেক্ষা করিয়া, যাহাতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সদ্ভাবের বৃদ্ধি হয়, তাঁহাদের উপাসনা জীবন্ত হয়, এ বিষয়ে যত্নবান্ হইলেন। কেশববাবুর উদ্যোগে 'ভারত-সংস্কার' নামে একটী সভা স্থাপিত হইল। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, 'সুলভ সমাচার' নামক সংবাদপত্র প্রকাশ, দাতব্য-ঔষধালয় স্থাপন, সুরাপান নিবারণ, সামান্য লোকদিগকে শিক্ষাদান প্রভৃতি কয়েকটী কার্য্যের ভার সভা গ্রহণ করিলেন। সভাগণের মধ্যে এক এক জন একটী অথবা ততোধিক কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া, অতীব উৎসাহের সহিত কর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

এই সময় কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বেহালা নামক গ্রামে ভয়ানক ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়। উক্ত সভা ঐস্থানে একটী দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া, তাহার পরিচালনের ভার গোস্বামী প্রভুর উপরে ন্যস্ত করেন। তিনি অতিপ্রত্যূষে ঔষধাদি সঙ্গে লইয়া পদব্রজে বেহালায় গমন করিতেন এবং ঔষধ বিতরণ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে, কোন কোন দিন তাঁহার দ্বিপ্রহর অতীত হইত; তৎপরে তিনি স্নানাহার করিতেন। আহারান্তে স্ত্রী বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন; রজনীযোগে আবার সংবাদপত্রের জন্য প্রবন্ধাদি লিখিতেন। এই প্রকার অতিরিক্ত পরিশ্রমে গোস্বামী প্রভুর হৃদ্‌রোগ উপস্থিত হইল। দারুণ হৃদ্‌রোগে সময় সময় তিনি মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইতেন। এক দিন ঐ রোগে তিনি এত অধিক সময় পর্য্যন্ত অজ্ঞানাবস্থায় ছিলেন যে, তাঁহার আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে মৃতজ্ঞানে আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন। অতঃপর ডাক্তার অন্নদাচরণ

কান্তগিরী মহাশয়ের আন্তরিক চেষ্টায় তাঁহার মূর্চ্ছা অপনীত হইল। কিন্তু এখন হইতে গোস্বামী প্রভু হৃদ্‌রোগের যন্ত্রণাধিক্যে যেখানে সেখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। এই জন্য শ্রদ্ধেয় কেশববাবু সর্ব্বদা তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এক জন লোক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

এই সময় গোস্বামী প্রভু একদিন স্বপ্ন দেখিলেন যে, কে যেন আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছে যে, "কলিকাতার জগন্নাথঘাটে একজন সাধু অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার নিকটে হৃদ্‌রোগের ঔষধ আছে। তুমি তথা হইতে ঔষধ সংগ্রহ করিয়া সেবন কর।" তদনুসারে গোস্বামী প্রভু জগন্নাথঘাটে অনুসন্ধান করিয়া সেই সাধুর দর্শন পাইয়া তাঁহার নিকটে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। সাধুর নিকটে যে অল্প পরিমাণ ঔষধ ছিল, তাহা তিনি গোস্বামী প্রভুকে প্রদান করিয়া বলিলেন যে, "ইহা দ্বারা ব্যারাম সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে না, তবে মূর্চ্ছা অপনীত হইবে। আর কয়েক দিবস পূর্ব্বে আসিলে অধিক ঔষধ দিতে পারিতাম।" সেই ঔষধ সেবন করিবার পর, বস্তুতঃই তাঁহার মূর্চ্ছা দূরীভূত হইল, কিন্তু ব্যাধির মূল উৎপাটিত হইল না।

অতঃপর গোস্বামী প্রভু মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ প্রসিদ্ধ চিবার্স সাহেবের শরণাপন্ন হন। গোস্বামী প্রভু যখন মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তখন তাঁহার অসাধারণ তেজস্বিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যবাদিতা প্রভৃতি গুণে মুগ্ধ হইয়া, সুবিজ্ঞ গুণগ্রাহী মহামতি চিবার্স সাহেব তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। গোস্বামী প্রভুর ব্যারামের আনুপূর্ব্বিক ঘটনা শ্রবণ করিয়া, তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত গোস্বামী প্রভুকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষাকরতঃ, রোগোপশমের জন্য অল্প মাত্রায় মরফিয়া সেবনের ব্যবস্থা প্রদানপূর্ব্বক, একখানি সুদীর্ঘ ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, "ইহাতে তোমার ব্যারাম নির্ম্মূল হইবে না, তবে হৃদ্‌পিণ্ডের বেদনা হ্রাস

পাইবে এবং অবশেষে এই রোগেই তোমার মৃত্যু সংঘটিত হইবে;" এই ব্যবস্থাপত্রে তিনি, গোস্বামী প্রভুর কত বৎসর বয়সের সময় ব্যারামের গতিবিধি কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইবে, এবং তদনুসারে মরফিয়ার মাত্রা কি পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে হইবে, তাহা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়া, মৃত্যুর একটী সন পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে পরবর্ত্তী-কালে একদিন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছিলেন যে, চিবার্স সাহেবের ব্যবস্থা-পত্রের মৃত্যুর ঘটনাটি ব্যতীত আর সমুদয় ঘটনাই অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছে। কারণ, ঐ সময় তন্নির্দ্দিষ্ট সনটী উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে যাহা হউক, চিবার্স সাহেবের ব্যবস্থানুসারে সেই হইতে হৃৎপিণ্ডের বেদনা উপশমের জন্য গোস্বামী প্রভু নিয়মিতরূপে মরফিয়া সেবন করিতে বাধ্য হন। পরবর্ত্তীকালে ঘটনাচক্রে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত গোস্বামী প্রভুর সংস্রব ছিন্ন হইবার পর, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাবদুষ্ট, মাৎসর্য্যপরায়ণ কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য তাঁহার সাধনলব্ধ অবস্থাকে মরফিয়ার ক্রিয়াবিশেষ বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই; এবং এতদুপলক্ষে এক দিন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম শ্রদ্ধেয় ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টো-পাধ্যায় মহাশয় গোস্বামী প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন যে, মরফিয়া সেবনের দরুণ তাঁহার মস্তিষ্কের ক্রিয়ার কোন বিপর্য্যয় ঘটে কি না। তদুত্তরে গোস্বামী প্রভু বলিলেন—"না, মরফিয়া আমার পীড়িত হৃৎপিণ্ডের উপরই কার্য্য করে, উহার বেদনার উপশম হয়, অপর কোন অনিষ্ট করে না।" বলা বাহুল্য যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে থাকা কালীন, ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক সভার আদেশানুসারে, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থিত ডাক্তারী ঔষধালয়ের স্বত্বাধি-কারী শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহলানবিস মহাশয় গোস্বামী প্রভুকে বিনামূল্যে মরফিয়া যোগাইতেন। কারণ, প্রচারকদিগের ব্যয়ভার তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত দুইটী ঔষধে ব্যারাম উপশমিত হইলে, গোস্বামী প্রভু দিনাজপুর, রংপুর, কুচবিহার প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিতে গমন করেন অনিয়মে ব্যারাম পুনরায় বৃদ্ধি পাইলে, তিনি কিছু দিন শান্তিপুরে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে লা ছোট বেলঘরিয়ার বাগানে ভক্তিভাজন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত কেশববাবুর পরিচয় হয়। পরমহংসদেবের কঠোর বৈরাগ্য দর্শন করিয়া, তিনি বৈরাগ্য সাধন করিতে আরম্ভ করেন এবং গোস্বামী প্রভুকে কলিকাতায় আসিতে অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন। পত্র পাইয়া গোস্বামী প্রভু কলিকাতায় আগমনকরতঃ দেখিলেন যে, কেশববাবু স্বহস্তে রন্ধন করেন এবং সময় সময় একতারা বাজাইয়া ভজন করেন। পরমহংসদেবের অলোকসামান্য সাধুতা দর্শন করিয়া কেশববাবু এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, একদিন ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া ফুলচন্দনাদি দ্বারা পরমহংসদেবের পদপূজা করিয়াছিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে পরবর্ত্তীকালে একদিন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছিলেন যে, "কেশববাবু যদি তখন উঁহাকে (পরমহংসদেবকে) প্রকাশ্যে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে এত দিন ব্রাহ্মসমাজ উদ্ধার হইয়া যাইত।" এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া পরমহংসদেবও বলিয়াছিলেন—"আজ আমাকে কেশব পূজা ক'রেছে, কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে, পাছে উহার দলের লোকেরা টের পায়। ও যেমন দরজা বন্ধ ক'রে পূজা ক'ল্লে, তেমান ও'র দরজাও বন্ধ থাকবে।" সে যাহা হউক, ইহার পর সাধনভজনের জন্য অনেকে ব্যাকুলতা প্রকাশ করাতে, শ্রদ্ধেয় কেশববাবু যোগ ও ভক্তি সম্বন্ধে নিয়মিত উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। সাধনের জন্য কোন্নগরে মোড়পুকুর নামক গ্রামে একটী উদ্যানের মধ্যে 'সাধন কানন' স্থাপন করা হইল।

এদিকে অনেকগুলি শিক্ষপরিবারকে একসঙ্গে রাখিয়া দৈনিক উপাসনা, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, সৎপ্রসঙ্গ, সংযম ও যুক্তাহার বিহারের নিয়ম শিক্ষা দ্বারা আদর্শ ব্রাহ্ম পরিবার সংগঠন করিবার উদ্দেশ্যে, কেশববাবু গোস্বামী প্রভুর সহায়তায় কলিকাতায় 'ভারত-আশ্রম' নামে একটী আশ্রম স্থাপন করিলেন। ১২৮২ সনের মাঘোৎসবের পর, কেশববাবু সাধনের শ্রেণীবিভাগসম্বন্ধে একটী ওজস্বিনী বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহাতে তিনি এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, এই তিনের মধ্যে যাহার মনের গতি যে দিকে বেশী প্রবল, তিনি তাহাই অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিলে মুক্তির অধিকারী হইবেন। উক্ত বক্তৃতার পর, শ্রীমতী মুক্তকেশী ভাদুড়ী (গোস্বামী প্রভুর শাশুড়ী) সেবাব্রত, অঘোরনাথ গুপ্ত জ্ঞানযোগ ও গোস্বামী প্রভু ভক্তিযোগ শিক্ষার্থ সংযম ব্রত গ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্র তাঁহাদিগকে তত্তৎব্রত উদ্‌যাপন বিষয়ক বিবিধ উপাদেয় উপদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহারাও কায়মনোবাক্যে তাহা পালন করিতে লাগিলেন। এই ভাবে এক বৎসর অতীত হইলে পর, একদিন কেশববাবু গোস্বামী প্রভুকে বলিলেন— "তুমি ভক্তিযোগে সিদ্ধ হইয়াছ।" এই কথা শুনিয়া গোস্বামী প্রভু বলিলেন যে, "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে লেখা আছে যে, ভক্তির অঙ্কুর মাত্র হইলে সাধকের মধ্যে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশিত হইবে। যথা;—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥

অর্থাৎ ভাবের অঙ্কুর হইলে ক্ষমা, অব্যর্থকালত্ব, বৈরাগ্য, মানশূন্যতা,

ভগবৎপ্রাপ্তিবিষয়ে বলবতী আশা, তাঁহার অপ্রাপ্তি নিমিত্ত উৎকণ্ঠা, তাঁহার নামগানে রুচি, তাঁহার গুণবর্ণনে আসক্ত, তাঁহার বসতিস্থলে (বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিশেষতঃ তীর্থাদিতে) প্রীতি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু আমার মধ্যে ইহার অনেক গুলি লক্ষণই ত পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং আমি কিরূপে ভক্তিযোগে সিদ্ধ হইলাম?" কেশববাবু এই কথা শুনিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন।

ভারতাশ্রমে গোস্বামী প্রভু একদিন গভীর রাত্রিতে একাকী বসিয়া ব্রহ্মনাম সাধন করিতেছিলেন। নাম করিতে করিতে তন্দ্রার আবির্ভাব হইলে তিনি অনুভব করিলেন, যেন কেহ ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য দরজায় আঘাত করিতেছে। গোস্বামী প্রভু তদবস্থায় দরজা খুলিলে, একদল জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের অঙ্গের জ্যোতিতে ঘর আলোকিত হইল। তন্মধ্যে একজন আপনাকে অদ্বৈত আচার্য্য বলিয়া প্রকাশকরতঃ মহাপুরুষদিগের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক, ইনি মহাপ্রভু, ইনি নিত্যানন্দ প্রভু, ইনি শ্রীবাস', এই কথা বলিয়া তাঁহাদের কয়েকজনের সঙ্গে গোস্বামী প্রভুর পরিচয় করিয়া দিলেন এবং বলিলেন—"তোমার ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য শেষ হইয়াছে, এখন মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হও। তিনি তোমাকে নাম (দীক্ষা) দিবেন। শীঘ্র স্নান করিয়া আইস।" গোস্বামী প্রভু বিহ্বলাবস্থায় তাড়াতাড়ি নীচে গিয়া পাতকূয়ায় স্নানকরতঃ উপরে আসিলে, মহাপ্রভু তাঁহাকে দীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক সদলবলে অন্তর্হিত হইলেন। পরদিন প্রাতে শ্রীযুক্তা যোগমায়া দেবী (গোস্বামী প্রভুর সহধর্ম্মিণী) পাতকূয়ার ধারে অসময়ে সিক্ত বস্ত্র দেখিয়া গোস্বামী প্রভুকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাঁহার নিকটে পূর্ব্বরাত্রের অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। পরবর্তীকালে এই ঘটনা উপলক্ষে গোস্বামী প্রভু একদিন বলিয়াছিলেন—"কি দেখিব,

মহাপ্রভু প্রদত্ত নামটী অনেক দিন পর্য্যন্ত ধামা ঢাকাই ছিল, তখন ত আর বুঝিতে পারি নাই যে মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্। তখন ভাবিয়াছিলাম যে কতকগুলি spirit (পরলোকগত আত্মা) বোধ হয় আমাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিল আমি কেমন ব্রাহ্ম, তাহাদের কথায় বিচলিত হই কি না?"

এই ঘটনার কিছুদিন পরে গোস্বামী প্রভু ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারার্থ ৺কাশীধামে গমন করিয়া স্বর্গীয় ডাক্তার লোকনাথ মৈত্র মহাশয়ের ভবনে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময় কাশীধামের প্রসিদ্ধ মহাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সহিত গোস্বামী প্রভুর সাক্ষাৎ হইলে, উভয়ের মধ্যে যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল এবং স্বামীজি যে প্রকারে গোস্বামী প্রভুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি যথা :—"আমি যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজে ছিলাম, তখন একবার কাশীধামের বিখ্যাত ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। ঐ সময় স্বামীজি অজগরবৃত্তি অবলম্বন করেন নাই এবং ততটা স্থূলকায়ও ছিলেন না, কিন্তু মৌনী ছিলেন। আমি সেখানকার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার লোকনাথবাবুর বাসায় ছিলাম। তিনি পরম সমাদরের সহিত আমাকে রাখিয়াছিলেন। আমি পূর্ব্বেই ডাক্তারবাবুকে বলিয়াছিলাম—'দেখুন, আমি নিয়মমত আপনার বাসায় থাকিতে পারিব না, কোন্ সময় বাসায় আসি তাহার ঠিক নাই; হয়ত সমস্ত দিন না আসিয়া, অনেক রাত্রে আসিতে পারি। আমাকে বাসের জন্য একটী নির্জ্জন ঘর দিতে হইবে, এরূপ হইলে আমি আপনার নিকটে থাকিতে পারি।' ডাক্তারবাবু তাহাতেই সম্মত হইলেন। আমি প্রাতে উঠিয়া বাহির হইতাম এবং প্রায়ই ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। কোন কোন দিন একটু বেলা হইলে, স্বামীজি ইঙ্গিতে আমার ক্ষুধা লাগিয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিতেন। ক্ষুধা লাগিয়াছে বলিলে, রাস্তাতে সুবিধামত

কাহাকেও বলিতেন—'উহার জন্য কিছু খাবার আন।' অমনি তাহারা ৫।৭ জনের খাবার নিয়া আসিত। আমি বলিতাম—'এত খাইতে পারিব না, আপনি খাবেন কি?' তাহাতে তিনি স্বীকৃত হইয়া তাঁহার মুখের ভিতরে খাবার দেওয়ার জন্য বলিতেন। স্বামীজি খুব খাইতে পারিতেন। খাইতে খাইতে যখন প্রায় সমস্তই নিঃশেষ হইবার উপক্রম হইত, তখন আমি নিজের অংশ উহার ভিতর হইতে সরাইয়া রাখিতাম, এবং বলিতাম 'আমারটা ত আমি আগে রাখিয়া দেই'। ইহাতে তিনি একটু হাসিয়া মাটীতে লিখিয়া দেখাইতেন—'বাচ্চা সাচ্চা হায়।' কোন সময় হয়ত স্বামীজি নদীতে পড়িয়া ভোঁস করিয়া ডুব দিতেন, এবং মণিকর্ণিকার ঘাটে গিয়া উঠিতেন, আমি তখন গঙ্গার পার দিয়া দৌড়িয়া যাইতাম। একদিন এক কালী-মন্দিরে গিয়া, প্রস্রাব করিয়া কালীর অঙ্গে ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'প্রস্রাব গায়ে দেন কেন?' তিনি মাটীতে লিখিয়া দিলেন 'গঙ্গোদকং'। আমি বলিলাম—'কালীর গাত্রে ছিটাইয়া দিলেন কেন?' তিনি উত্তর করিলেন—'পূজা'! আমি প্রশ্ন করিলাম—'ইহার দক্ষিণা কি?' উত্তর হইল—'যমালয়', অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে যমালয়। সে সময় ঐ দেবালয়ে লোক ছিল না। পরে লোক আসিলে আমি বলিলাম যে—'উনি প্রস্রাব করিয়া কালীর গায়ে ছিটাইয়া দিয়াছেন, এবং বলেন যে উহা গঙ্গোদকং; তাহারা উহা শুনিয়া বলিল— 'ইনি ত সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর, ইঁহাকে এমন বলিতে নাই, ইঁহার প্রস্রাব যে গঙ্গোদক তাহা ঠিকই।' স্বামীজির প্রতি লোকের এরূপ প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম।

"একদিন স্বামীজি ও আমি দশাশ্বমেধের ঘাটের উপর দিয়া ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময় তিনি আমার হাত ধরিয়া মৌনভঙ্গকরতঃ বলিলেন—'আস্নান কর' এবং ধরিয়া স্নান করাইলেন। পরে বলিলেন—

'তোকে দীক্ষা দিব।' আমি বলিলাম—'হাঁ, তোমার কাছে আবার আমি দীক্ষা নিব; তুমি কখনও শিবপূজা কর, কখনও প্রস্রাব করিয়া কালীর গায়ে ছিটাইয়া দাও, এবং বল যে গঙ্গোদকং, আমি তোমার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিব না। বিশেষতঃ আমি ব্রহ্মজ্ঞানী, আমি গুরুবাদ মানি না।' তিনি হাসিয়া বলিলেন—'বাচ্চা সাচ্চা হায়।' পরে হিন্দি ভাষায় বলিলেন—'তোকে দীক্ষা দিবার আমার বিশেষ কোন গূঢ় কারণ আছে, রীতিমত দীক্ষা দিব না। গুরুগ্রহণ না করিলে শরীর শুদ্ধ হয় না, তোর গুরু আমি নহি, অন্য একজন, সময়ে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে। তবে আমি এখন তোর শরীর শুদ্ধ করিয়া দিব।' ইহার পর তিনি আমাকে ত্রিবিধ মন্ত্র প্রদান করিয়া বলিলেন—'আমার উপর ভগবানের যে আদেশ ছিল, তাহাই পালন করিলাম মাত্র।"

ইহার পরে যখন গোস্বামী প্রভু যোগদীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিবার জন্য ৺কাশীধামে গমন করেন, তখন ত্রৈলঙ্গস্বামীজির সঙ্গে দেখা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন—'কেমন ইয়াদ হায়?' গোস্বামী প্রভু ভক্তিবিহ্বলচিত্তে উত্তর করিলেন—'হুঁা মহারাজ।'

অতঃপর একদিবস ভারত-আশ্রমের জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মের প্রতি আশ্রমের অধ্যক্ষের দুর্ব্ব্যবহারে গোস্বামী প্রভুর কোমল-প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল। এই বিষয় লইয়া কতিপয় ব্রাহ্ম-প্রচারকের সঙ্গে তাঁহার বাদানুবাদ হয়। এই সকল কারণে গোস্বামী প্রভু কলিকাতা ত্যাগ করিয়া সপরিবারে কিছুদিন বাগ্-আঁচড়ায় বাস করিতে লাগিলেন। এইস্থানে একদিন তিনি নির্জ্জনে বসিয়া প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময়ে একটী জ্যোতিঃ তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিল এবং সেই সঙ্গে দৈববাণী হইল—"তুই আর আপনাকে বদ্ধ রাখিস্ না। গণ্ডির মধ্যে থাকিলে ধর্ম্ম হয় না"। অতঃপর একদিন রাত্রে পূর্ব্বোক্ত দৈববাণীর

মতপোষক একটী অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করেন। স্বপ্নটী গোস্বামী প্রভুর স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা :—

"যখন আমি বাগআঁচড়ায় ছিলাম, তখন একদিন স্বপ্ন দেখিলাম, আমি একটী ভীষণ অরণ্যের মধ্যে বাস করিতেছি। অরণ্য ঘোরতর অন্ধকার ও হিংস্রজন্তুগণের বিকট চীৎকারে পরিপূর্ণ। আমার সঙ্গের সাথী কিছুই নাই। সে অরণ্য হইতে বাহির হইবারও কোন পথ পাইতেছি না। যতই চলিতে যাই, পথহারা হইয়া কেবল ঘুরিয়া মরি এবং কণ্টকাঘাতে শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়। শ্বাপদগণ যেন প্রতিমুহূর্ত্তে আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। আমি নিরাশ্রয় হইয়া দিশাহারা হইয়াছি, এমন সময় উপরে একটী আলো দেখিলাম। রাস্তার বা দোকানের সাইনবোর্ডে যেমন একখানা হাত আঁকা থাকে, সেই আলোর মধ্যে সেইরূপ একখানা হাত আঁকা দেখিলাম। হাতের তর্জ্জনী অঙ্গুলী আমাকে এক দিক্ দেখাইয়া দিতেছে। আমি সেই সঙ্কেত অনুসারে, আঙ্গুল যে দিকে দেখাইতেছিল সেই দিকে চলিলাম। হাতখানি আমার মাথার কিছু উপরে আমার আগে আগে চলিল। এইভাবে আমি অনায়াসে অল্প সময়ের মধ্যে অরণ্য উত্তীর্ণ হইলাম। তখন সম্মুখে এক প্রকাণ্ড তরঙ্গাকুল নদী পড়িল। আমি সভয়ে নদীতীরে দাঁড়াইলাম। কিন্তু আমার পথপ্রদর্শক হাতখানি নদীর উপর দিয়া চলিল দেখিয়া, আমি সাহসের সহিত নদীতে অবগাহন করিলাম। প্রকাণ্ড নদী, অগাধ জল, প্রবল স্রোত, প্রলয় তরঙ্গ ; কিন্তু কিছুতেই আমার কিছু করিতে পারিল না। আমি আমার রক্ষাকর্ত্তা হাতের পশ্চাতে পশ্চাতে হাঁটিয়া নদী পার হইয়া গেলাম। সেই দিন হইতে আমি বুঝিয়াছি যে, অপার্থিব হস্তের ইঙ্গিতেই আমাকে চলিতে হইবে। মনুষ্যের মতে চলিতে হইবে না।" *

* নব্যভারত ১৩০৩ সন।

ভাদ্রমাসে এইস্থানে ব্রহ্মোৎসব হইলে এমন এক নৈসর্গিক প্রেমের স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছিল যে, তাহাতে বাগআঁচড়াবাসী আবালবৃদ্ধ-বনিতা ভাসমান হইয়াছিলেন। গোস্বামী প্রভু সেই স্রোতে গা ঢালিয়া প্রাণে প্রাণে অপূর্ব্ব শান্তিরস সম্ভোগ করিতেছিলেন। এমন সময় কলিকাতা হইতে প্রচারকেরা তাঁহাকে এই বলিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন যে, "তুমি শুষ্ক হইয়া মরিবে। মাতৃস্তন্য পান না করিলে (অর্থাৎ কেশব-বাবুর নিকটে না থাকিলে) বাঁচিবে কিরূপে ?" এই পত্র পাইয়া গোস্বামী প্রভু অবাক্ হইলেন। মনে মনে বলিলেন—"সে কি ? আমি নিজে ত বেশ শান্তিতে আছি। ইঁহারা আমাকে গালি পাড়িতেছেন কেন ?" এমন সময় তাঁহার নিকটে পুনরায় দৈববাণী হইল—"যদি ধর্ম্ম-জীবন চাও, আর গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করিও না।"

ইহার কিছুদিন পরে কোচবিহারের রাজার সহিত কেশববাবুর কন্যার বিবাহ লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মবিবাহ-আইন বিধিবদ্ধ হইলে, কেশববাবু বেদী হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, "এই বিধি কেবল রাজবিধি নহে, ইহা ঈশ্বরের বিধি, তাঁহার আদেশে সম্পন্ন হইয়াছে।" এই বিধি অনুসারে ব্রাহ্ম বালক ও বালিকাদিগের বিবাহের বয়স যথাক্রমে ১৮ ও ১৪ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। * কিন্তু স্বীয় কন্যার বিবাহের সময় কেশববাবু অনায়াসেই এই বিধি লঙ্ঘন করিলেন; কারণ, তাঁহার কন্যার বয়স তখনও ১৪ বৎসর হইয়াছিল না; অধিকন্তু তিনি তাঁহার এই কার্য্যকে ঈশ্বরের আদিষ্ট কার্য্য বলিয়া প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। আন্দোলনের ইহাই মূল কারণ। কেশব-বাবুর এই অন্যায় কার্য্যে সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ কলঙ্কিত হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। গোস্বামী প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি কেশব-

* Civil marriage Act. Act III of 1812.

বাবুর এই অন্যায় কার্য্যের তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। কেশববাবুর অনুগত ব্যক্তিবর্গ কেশববাবুর পক্ষ সমর্থন করিয়া ঘোর প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতে কেশববাবুর অনুগত জনৈক ব্রাহ্ম, গোস্বামী প্রভুর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী যোগমায়া দেবীকে ভয় দেখাইয়া পত্র লিখিলেন যে, গোস্বামী মহাশয় যেন কেশববাবুর বিরুদ্ধে কিছু না বলেন, অথবা তাঁহার বিপক্ষপক্ষ অবলম্বন না করেন, করিলে বিষম বিপদে ঠেকিবেন। গোস্বামী প্রভু এই চিঠি পাঠ করিয়া হাস্যকরতঃ বলিলেন—"ইঁহারা কি পাগল হইয়াছেন? কেশববাবু কি আমার সৃষ্টিকর্ত্তা, না পালনকর্ত্তা? আমি কি তাঁহাকে দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি? সত্যের অবমাননা আমি কখনই সহ্য করিতে পারিব না।" গোস্বামী প্রভুর হৃদয় এক দিকে যেমন কুসুম অপেক্ষাও কোমল ছিল—পাপীর পাপযন্ত্রণা, রোগীর আর্ত্তনাদ, শোকসন্তপ্ত ব্যক্তির শোকাবেগ, ক্ষুধার্ত্তের কাতরতা ইত্যাদি দেখিলে তিনি না কাঁদিয়া থাকিতে পারিতেন না; সেইরূপ অপরদিকে ধর্ম্মের অবমাননা, সত্যের অপলাপ, শক্তির অপব্যবহার ইত্যাদি দৃষ্টিপথে পতিত হইলে, তাঁহার চিত্ত বজ্র অপেক্ষাও কঠিন হইয়া উঠিত। তখন বন্ধুতার খাতির, স্বীয় স্বার্থের ব্যাঘাত, প্রতিষ্ঠাহানির ভয় ইত্যাদি কিছুতেই তাঁহাকে তাঁহার কর্ত্তব্যের পথ হইতে বিচলিত করিতে পারিত না। তিনি ভীমপরাক্রমে অসত্যের অন্যায়ের প্রতিবিধানকল্পে প্রাণপণে সংগ্রাম করিতেন। ভারতের যশস্বী কবি অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্রের লোকোত্তর-চরিত বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমর্হতি॥

মহৎ ব্যক্তিদিগের চিত্তকে যথাযথ বুঝিতে সক্ষম হইবে। কার?

তাহা অবস্থাবিশেষে কখনও কুসুমের ন্যায় কোমল, কখনও বা বজ্রাপেক্ষাও কঠিনবৎ প্রতীয়মান হয়।

কেশববাবুর দলীয় লোকের পূর্ব্বোক্ত পত্র পাইয়া গোস্বামী প্রভু অধিকতর তীব্রতার সহিত তাঁহার ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। এতদুপলক্ষে তাঁহাকে কেশববাবুসম্বন্ধে অনেক অপ্রিয় সত্য কথা প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। সাক্ষাৎভাবে ভগবদাদেশ শ্রবণ করিলে লোকমুখপ্রেক্ষিতা তিরোহিত হয়।

কেশববাবুর অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদকল্পে গোস্বামী প্রভু বাগআঁচড়া হইতে তাঁহার কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধুদিগের নিকটে যে সকল পত্রাদি লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কতিপয় ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"পূর্ব্বে মনে করিতাম, ব্রাহ্মসমাজ চিরশান্তিস্থান, এখানে কোনও প্রকার গোলযোগ প্রবেশাধিকার করিতে পারিবে না। এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছি। এক একবার মনে করি, ব্রাহ্মসমাজে যাহা হইবার হউক, আর কোন প্রকার আন্দোলন করিব না। কিন্তু সত্যের প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি এবং স্বদেশের দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আর স্থির থাকিতে পারি না। অন্যায় অসত্যের প্রতিবাদ না করা পাপ, সুতরাং উদাসীন থাকিতে পারি না। আমি সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বসাধারণের নিকট নিবেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।"

"কেশববাবুর সঙ্গে আমার শত্রুতা ছিল না, এখনও নাই, কেবল ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের জন্য তাঁহার কথা বলিতে হইতেছে। আমাকে লোকে অস্থির চঞ্চল প্রভৃতি বলিয়া দোষারোপ করিতেছে, তাহাতে আমি দুঃখিত নহি। যখন যাহা সত্য বুঝিব, তাহাই প্রতিপালন করিব। তজ্জন্য চিরদিন বরং অস্থির থাকিতে অভিলাষ করি। কিন্তু কোন

বিষয়কে অসত্য জানিয়াও স্থায়িভাবে তাহার অনুসরণ করাকে কপটতা মহাপাপ বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকি।"

"কেশববাবু, ব্রাহ্মবিবাহ-আইন বিধিবদ্ধ হইলে ব্রহ্মমন্দির হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, এই বিধি কেবল রাজবিধি নহে, ইহা ঈশ্বরের বিধি, তাঁহার আদেশেই সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু স্বীয় কন্যার বিবাহে কেশব বাবু সেই আদেশ লঙ্ঘন করিয়া এক নূতন আদেশ প্রচার করিলেন, যাহাতে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ কলঙ্কিত হইবে।"

"পাপ-কার্য্যকে ঈশ্বরের আদেশ বলিলে যেরূপ ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের প্রতি অপ্রেমও প্রকাশিত হয়। যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন, তিনি কি নিজের দোষ উপাস্য-দেবতার উপর স্থাপন করিতে পারেন ? কখনই না।"

"ঈশ্বরের আদেশ ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র, তাহা তাঁহারা কোন কালে অস্বীকার করিতে পারেন না। যথার্থ ঈশ্বরের আদেশকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া থাকি। ঈশ্বর সত্য, পবিত্র, অপরিবর্ত্তনীয়, তাঁহার আদেশও সত্য, পবিত্র এবং অপরিবর্ত্তনীয় হইবে। আদেশ অসত্য, অপবিত্র এবং পরিবর্ত্তনীয় বলিলে আমরা ঘৃণার সহিত তাহা পরিত্যাগ করিব।"

"হিন্দুসমাজে অতি আদরে ও সম্ভ্রমে অবস্থিতি করিতেছিলাম ; কিন্তু সত্যস্বরূপ ঈশ্বর আমার হৃদয়কে যতই সত্যের দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, ততই আমি হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলাম। মনে করিলাম, ব্রাহ্মসমাজ শান্তিনিকেতন, সেখানে অসত্য অশান্তি নাই। বাস্তবিক, ব্রাহ্মসমাজকে শান্তিনিকেতনই দেখিয়াছিলাম। তখন ব্রাহ্ম নাম শুনিবামাত্রই আনন্দ হইত। এখন বোধ হয় সে সকল স্বপ্ন। মনে হয়, দয়াময় ঈশ্বর ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত ছবি একবার প্রকাশ করিয়া

আমাদের দোষে তাহা কাড়িয়া লইয়াছেন। এখন ব্রাহ্মসমাজে শান্তি নাই, সত্যেরও সমাদর নাই। অশান্তি ও অসত্যের প্রশ্রয়স্থানকে আর ব্রাহ্মসমাজ বলিয়া গণ্য করা উচিত নহে। ব্রাহ্মসমাজ বলিতে হইলে, পূর্ব্বের আদর্শের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে হইবে।"

"ব্রাহ্মসমাজের দুর্গতি হইল কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বলিতে হইবে যে, ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের সম্মান অপেক্ষা মনুষ্যের সম্মান ও মনুষ্যের প্রতি ভালবাসা অধিক হইয়াছে বলিয়াই ঈশ্বরের সত্য ব্রাহ্মদিগের নিকট হতগৌরব হইয়াছে।"

"ঈশ্বর বলিলেন, আমার সমক্ষে আর কাহাকেও পূজা করিও না। কতকগুলি ব্রাহ্ম সে আজ্ঞা অবজ্ঞা করিয়া কেশববাবুকে অবতার মনে করিয়া পূজা করিলেন। ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল, কেশববাবু অবতার নহেন এইরূপ প্রতিবাদ দেখিয়া দুইজন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব হইয়া গেলেন।"

"পৃথিবীর সমস্ত সাধুভক্তদিগের নিকট মস্তক অবনত করিব, কিন্তু ঈশ্বরের সিংহাসনে কাহাকেও বসিতে দিব না।"

"সত্যের জন্য প্রাণপণে সংগ্রাম করিতে হইবে, কিন্তু হিংসা, দ্বেষ, নিন্দা প্রভৃতি পাপ যেন ব্রাহ্মদিগের হৃদয় কলঙ্কিত না করে।"

"বন্ধুগণ প্রাণসম ব্রাহ্মসমাজের আর দুর্গতি দেখিতে পারিব না। প্রাণ ফাটিয়া যায়, আর না, যথেষ্ট হইয়াছে; এখন ঈশ্বরের রাজত্ব বিস্তৃত হউক। ব্রাহ্মসমাজে শান্তি সদ্ভাব বিস্তৃত হউক। *

যাহা হউক, নানাপ্রকার বাদানুবাদের মধ্য দিয়া বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। কেশববাবু ব্রাহ্মমতে বিবাহ দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল না। রাজপরিবারবর্গের

* 'পূর্ব্ববঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের বিগত আন্দোলন' নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া হিন্দুমতেই বিবাহ দিতে হইয়াছিল। এই আন্দোলন উপলক্ষে দুই দলের মধ্যে যে মনোমালিন্য সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার ফল অতিশয় বিষময় হইয়াছিল। দলীয়ভাবের কি ভীষণ পরিণাম! বিদ্বেষের কি আশ্চর্য্য শক্তি! দুই দিবস পূর্ব্বে যাঁহারা গোস্বামী প্রভুকে প্রাণের বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন, তাঁহারাই এখন প্রধান শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন; এমন কি, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ গোস্বামী প্রভুর প্রাণনাশের পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াছিল। সংসারে অর্থ-সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা নহে, শুধু মতভেদই বিবাদের মূল। এক মতভেদে এতদূর হইতে পারে, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর। মতভেদের মধ্যে স্বার্থপরতা না থাকিলে বোধ হয় এত অমঙ্গল হইত না।

প্রাগুক্ত আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া গোস্বামী প্রভুর সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—"বিজয় যদিও এই সংঘর্ষে কেশববাবুকে প্রচণ্ড আক্রমণ করিয়াছিলেন, তথাপি ভবিষ্য ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, তিনি নিজের প্রবল বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া এরূপ করিয়াছিলেন; কোন স্বার্থসাধন তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। তাঁহার জীবনের সমস্ত ঘটনা সাক্ষ্য দিতেছে যে, তিনি নিষ্কাম যোগী ছিলেন। সাংসারিকতা বা আত্মোন্নতি তাঁহার কার্য্যকলাপের নিয়ন্ত্রী ছিল না।" *

* বীরপুত্রা, নব্যভারত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সংস্রব ত্যাগ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা, গুরুকরণের আবশ্যকতা উপলব্ধি, সৎগুরুর অন্বেষণে নানাতীর্থাদি ভ্রমণ।

কেশববাবুর কন্যার বিবাহের পর অধিকাংশ ব্রাহ্মগণ কেশববাবুকে ত্যাগ করিলেন। এদিকে শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী, ৺আনন্দমোহন বসু, ৺দুর্গামোহন দাস প্রমুখ আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মগণ একটী স্বতন্ত্র ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিবার সংকল্প করিলেন। ইঁহাদিগের সংকল্প অবগত হইয়া ইংলণ্ডের মিস্ কলেট নামক জনৈক ব্রাহ্মসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী ধর্ম্মপ্রাণ বিদূষী মহিলা গোস্বামী প্রভুকে অগ্রণী করিয়া নূতন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিতে পরামর্শ প্রদান করেন। এই পত্র পাইয়া নূতন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনকাঙ্ক্ষিগণ, গোস্বামী প্রভুকে কলিকাতায় আগমন করিবার জন্য বাগআঁচড়ায় পত্র লিখিলেন। এই পত্র পাইয়া গোস্বামীপ্রভু কলিকাতায় আগমন করিয়া ব্রাহ্ম সাধারণের মত অবগত হইলেন। অতঃপর ইঁহাদের উদ্যোগে ১২৮৫ সনের ৩রা জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা 'টাউন হলে' একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। এই সভাতে গোস্বামী প্রভুর প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমোদনে এবং অধিকাংশ সভ্যের সম্মতিক্রমে একটী স্বতন্ত্র ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠা মন্তব্য গৃহীত হইল। এই মন্তব্য গৃহীত হইবার পর গোস্বামী প্রভু, প্রধান আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্মতি গ্রহণ

করিয়াছিলেন এবং তিনিই নূতন সমাজের 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নামকরণ করেন।

অতঃপর গোস্বামী প্রভু ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও প্রচারক নিযুক্ত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাহার উন্নতি-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। "তাঁহার তৃষিত ব্যাকুল আত্মা, তাঁহার ভক্তি-বিনয়-মিশ্রিত মধুর চরিত্র, তাঁহার দেবদুর্ল্লভ উন্নত জীবন সকলেরই ধর্ম্মজীবনের আদর্শ ও সহায় হইয়া উঠিল। তাঁহার বাসভবন শাস্ত্রপাঠ, আলোচনা, সৎপ্রসঙ্গ, সাধুসমাগম ও কীর্ত্তনানন্দে প্রকৃত আশ্রম পদে পরিণত হইয়া উঠিল।"

গোস্বামী প্রভুর সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—"সাধু বিজয় ও অঘোর (অঘোরনাথ গুপ্ত) উভয়েই এই মহারণের পর (কোচবিহার আন্দোলনের পর) প্রকৃত সন্ন্যাসী হইলেন, উভয়ের মনে প্রগাঢ় বৈরাগ্যের ভাব উদয় হইল। দুইটী উজ্জ্বল নক্ষত্র দুইদিকে ছুটিয়া বাহির হইলেন। একটী প্রাচ্যে ও একটী প্রতীচ্যে। দরিদ্রের কুটীরে, রোগীর রুগ্ন-শয্যার পার্শ্বে, পাপী ও তাপীর শূন্য ও হতাশ হৃদয়মন্দিরে ব্রহ্মজ্যোতিরূপে তাঁহারা আবির্ভূত হইয়া, দরিদ্রের দারিদ্র্য-জনিত দুঃখ, রোগীর রোগের যাতনা, পাপীর অনুতাপজনিত তাপ এবং শোকতাপ-দগ্ধ ব্যক্তির অন্তর্দাহ বিমোচন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বোধ হইল, যেন জগতের দুঃখভার বিমোচন করিবার জন্য জগজ্জননী দুইটী জ্যোতির্গোলক ধরাপৃষ্ঠে বিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। সে জ্যোতির্ম্ময় গোলক, মানবহিতের জন্য মানবরূপ ধারণ করিয়া ভারতের—এই দগ্ধ ভারতের—প্রতিগৃহে গিয়া সন্তাপ হরণ করিয়া বেড়াইতেছেন। আপনাদের তাপহীন বিমল জ্যোতিতে ভারতবাসীর তমসাচ্ছন্ন হৃদয় আলোকিত ও স্নিগ্ধ করিতেছেন।" *

* তত্ত্বকৌমুদী।

কলিকাতায় সাধারণ ব্রহ্মসমাজ স্থাপিত হইবার পর গোস্বামী প্রভু ঢাকায় গমন করিলে, পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই সময় ব্রহ্মমন্দিরে যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইত, তাহার কতকগুলি তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। উপদেশগুলি গভীর ধর্ম্মভাবপূর্ণ এবং অবিচলিত বিশ্বাস ও অদম্য তেজস্বিতার পরিচায়কণছিল। তাহাতে লোকের মন এতদূর আকৃষ্ট হইত যে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক সাতিশয় আগ্রহসহকারে তাঁহার সেই সকল উপাসনায় যোগদান করিতে ব্রাহ্মসমাজে সমবেত হইত। অনেক সময় সমাজগৃহে স্থানের সঙ্কুলান হইত না। তথায় তাঁহার কার্য্যকলাপসম্বন্ধে সমালোচক পত্রে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল ; যথা :—"পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ঢাকা নগরীতে আগমনাবধি তত্রত্য ব্রাহ্মগণের উৎসাহ, স্ফূর্ত্তি ও নূতন জীবন লাভ হইল। পূর্ব্বে মন্দিরের আসনগুলি শূন্যপ্রায় থাকিত। বিজয়বাবুর ধর্ম্মানুরাগ, সরল ব্যবহার ও সদুপদেশে এত লোক আকৃষ্ট হইতে লাগিল যে, ব্রহ্মমন্দিরে আর লোকের স্থান হইত না। পূর্ব্ব-বাঙ্গালা বিজয়বাবুর নিকট বিশেষ ঋণী, এবং অনেকদিন হইতে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত। ছয় সাত বৎসর পরে তাঁহাকে লাভ করিয়া, পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ আগ্রহ ও যত্ন প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এখানে সর্ব্বদা বিজয়বাবুর ন্যায় একজন সচ্চরিত্র ও বিশুদ্ধমতাবলম্বী আচার্য্য থাকেন ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়।" * এইরূপে ১২৮৫ সনের আষাঢ় মাস হইতে প্রায় আড়াই বৎসর যাবত গোস্বামী প্রভু পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যরূপে ব্রাহ্মণবেড়িয়া, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ, বিক্রম-পুরের অন্তর্গত তাজপুর, পশ্চিমপাড়া, জৈনসার প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের বহুস্থানে উৎসব ও মন্দির প্রতিষ্ঠাদি উপলক্ষে গমন করিয়া, জীবন্ত উপাসনা,

* 'বীরপূজা,' নব্যভারত।

প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা ও সর্ব্বোপরি তাঁহার জীবনের মহৎ আদর্শ দ্বারা নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছিলেন।" তিনি যখন যে স্থানে গমন করিতেন, তাঁহার জীবনের অসাধারণ প্রতিভা-গুণে আকৃষ্ট হইয়া মধুলুব্ধ মক্ষিকাদলের ন্যায় শিক্ষিত অশিক্ষিত, পুরুষ রমণী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকেই, সংসারের বিবিধ বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে, তাঁহার মুখনিঃসৃত দুইটী কথা শ্রবণ করিতে আগমন করিত।

অতঃপর গোস্বামী প্রভু কলিকাতায় আগমন করিলেন। আসিয়া দেখিলেন, আচার্য্য কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে 'নববিধান' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ' নামে অভিহিত হইয়াছে। গোস্বামী প্রভুর নিকটে ব্রাহ্মধর্ম্মের এই নূতন ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত না হওয়ায়, তিনি ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই ভাবে কিয়দ্দিন কলিকাতায় অবস্থান করিবার পর, তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ও আচার্য্যরূপে হাজারিবাগ, গয়া, বাঁকিপুর, মজঃফরপুর প্রভৃতি বেহার অঞ্চলের বহুস্থানে গমনপূর্ব্বক, তত্তৎস্থানে কিছুদিন পর্য্যন্ত অবস্থানকরতঃ উপাসনা, কীর্ত্তন ও ধর্ম্মালোচনাদি করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে কয়েকমাস অতীত হইলে, তদীয় প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সন্তোষিণীর কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কন্যাটী অল্পদিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, গোস্বামী প্রভু শোকসন্তপ্তহৃদয়ে 'শোকোপহার' নামক একখানি কবিতা পুস্তক প্রণয়ন করেন। শোকসন্তপ্ত নরনারীর শোকাপনোদনের উপযোগী বহু প্রাণস্পর্শী উপদেশ ইহাতে স্থান পাইয়াছিল।

এই সময় একদিন মেছুয়াবাজার রোড দিয়া ভ্রমণ সময়ে গোস্বামী প্রভুর সঙ্গে একজন পশ্চিমদেশীয় সাধুপুরুষের সাক্ষাৎ হয়। সাধুর প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া গোস্বামী প্রভু তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলে, সাধুও

তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে সাধু-সন্ন্যাসীর উপর গোস্বামী প্রভুর তাদৃশ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল না। তিনি তাঁহাদিগকে ভণ্ড প্রতারক বলিয়াই মনে করিতেন। কিন্তু অদ্য এই সাধুর সংস্পর্শে তিনি অত্যন্ত বিমোহিত হইলেন, এবং তাঁহার প্রাণে এমন এক অপূর্ব্ব শান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন, যাহা তিনি জীবনে আর কখনও উপভোগ করেন নাই। এই মহাপুরুষের সহিত গোস্বামী প্রভু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলন, ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অনেক বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। বহুদিন পরে বঙ্গদেশে পুনরায় ধর্ম্মান্দোলনের কথা অবগত হইয়া, সাধুটী অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। গোস্বামী প্রভু সাধুকে অবসরমতে একদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া তথাকার কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করিবার জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন।

এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে একদিবস গোস্বামী প্রভু সন্ধ্যার পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে উপদেশ প্রদান করিতেছেন, এমন সময় পূর্ব্বোক্ত সাধুটী সমাজগৃহে আগমনপূর্ব্বক, এক কোণে উপবেশনকরতঃ অতিশয় মনোযোগের সহিত তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। উপাসনা সমাপ্ত হইলে তিনি বেদী হইতে অবতরণপূর্ব্বক মন্দিরের বাহিরে আগমন করিবার সময়, সাধুটী পশ্চাৎ দিক্ হইতে তাঁহার হস্তধারণ করিয়া আলাপ আরম্ভ করিলেন। গোস্বামী প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—'উপাসনা কেমন হইল'? উত্তরে সাধু বলিলেন—'বড়ী আচ্ছা, সবতো বেদকা বাণী হায়'—অর্থাৎ বড়ই উত্তম, তুমিত সমস্তই বেদের কথা বলিলে। বস্তুতঃ গোস্বামী প্রভু কখনও শাস্ত্রবাক্য অতিক্রম করিয়া কথা বলিতেন না। অধিকাংশ ব্রাহ্মপ্রচারকগণ সাধারণ বিবেকের অনুসরণ করিয়াই ধর্ম্মপ্রচার করিতেন; কিন্তু গোস্বামী প্রভু বিবেক ও শাস্ত্রবাক্য

উভয়েরই মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন। তৎকৃত "ব্রহ্মপূজা" নামক গ্রন্থ ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই গ্রন্থে তিনি মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রোক্ত পরব্রহ্মের মানসিক পূজার অংশ যথাযথ বিবৃত করিয়াছেন। সে যাহা হউক, সাধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া গোস্বামী প্রভু বলিলেন যে, উপদেশ গুলি ভাল বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণের অবস্থা উপদেশানুরূপ নহে; এই জন্য তিনি ইহা নিবারণের কোনরূপ উপায় না দেখিয়া একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া, সাধু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—'আচ্ছা তোম্ গুরু কিয়া ?' অর্থাৎ তুমি গুরু গ্রহণ করিয়াছ? গোস্বামী প্রভু বলিলেন—'না মহারাজ! আমরা গুরুবাদ মানি না।' সাধু, কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—'ওঃ এইছিওয়াস্তে সব্ বিগড় গিয়া,' অর্থাৎ 'এই জন্যই সমস্ত বিগড়াইয়া গিয়াছে অর্থাৎ সমস্ত সাধন-ভজন পণ্ড হইয়া গিয়াছে। কথাটী গোস্বামী প্রভুর হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি সাধুর বাক্য চিন্তা করিতে করিতে গুরুবাদের বিরুদ্ধে এযাবং যতপ্রকার মত পোষণ করিতেছিলেন, তাহা শিথিল হইয়া পড়িল এবং গুরুলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তখনই এই মহাপুরুষের নিকট দীক্ষাগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন—'নেহি, তোমার গুরু দোস্‌রা হ্যায়, বকৎ হোনেসে মিল্ যায়গা, ঘাবরাও মৎ'—অর্থাৎ তোমার গুরু আমি নহি, অপর একজন; সময় হইলে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে, বিচলিত হইও না। এই কথা বলিয়া সাধু স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এই সময় হইতেই গোস্বামী প্রভু দেশ-বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সৎগুরু অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এজন্য তিনি অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সৎগুরুর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাদের দলপতির

নিকটে দীক্ষিত হইয়া সাধন করিতে লাগিলেন। এই সময় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত এবং প্রচারক ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও নবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রভৃতি সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের বহুসংখ্যক ধর্ম্মপিপাসু ব্রাহ্ম, কর্ত্তাভজা গুরু গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও সভাপতি সিটি-কলেজের অধ্যক্ষ ৺উমেশচন্দ্র দত্ত এবং প্রবীণ জ্ঞানী ব্রাহ্ম ৺কালীনাথ দত্ত মহাশয়ও গুরু গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাণায়ামই কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধনের প্রধান অঙ্গ। কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা তাঁহাদের প্রাণায়ামলভ্য সাময়িক উচ্ছ্বাসেই তৃপ্ত থাকিতেন। কিন্তু প্রাণায়াম প্রকৃত সাধন নহে। ইহা সাধনের একটা বহিরঙ্গ মাত্র। যোগশাস্ত্রে অনেক প্রকার প্রাণায়ামের প্রণালী লিখিত আছে। তদনুসারে কার্য্য করিতে পারিলে, মনের স্থৈর্য্য-সম্পাদন ও শারীরিক-ব্যাধি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কোন কোন প্রাণায়াম সাধন করিলে, সাময়িক এক প্রকার আনন্দও অনুভূত হয়। অনেক নিম্নস্তরের সাধক এই আনন্দকেই শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মানন্দ বলিয়া ভুল করেন। কিন্তু ইহা বস্তুতঃ ব্রহ্মানন্দ নহে। ব্রহ্মানন্দ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ, ইহা ব্রহ্ম-কৃপাসাপেক্ষ। কোন প্রকার প্রক্রিয়া বা প্রণালী দ্বারা তাহা লাভ করা যায় না। গোস্বামী প্রভু অল্প কালের মধ্যেই কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রাণায়াম লব্ধ অবস্থার অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। এমন সময় এই সম্প্রদায়ের একজন প্রধান ব্যক্তি কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহারা এই সাধনা দ্বারা যে পরমানন্দ উপভোগ করেন, শ্রীচৈতন্য উহার ছিটা ফোঁটা পাইয়াই তদ্দ্বারা বঙ্গদেশ মাতাইয়াছিলেন। এই মতের অসারত্ব উপলব্ধি করতঃ নিতান্ত বিরক্ত হইয়া, গোস্বামী প্রভু কর্ত্তাভজাসম্প্রদায়ের সংস্রব ত্যাগ করিলেন।

অতঃপর গোস্বামী প্রভু ধর্ম্মলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া অশেষবিধ বাধা-

বিঘ্ন অতিক্রমকরতঃ অক্লান্ত পরিশ্রমসহকারে, হিংস্রজন্তু-সমাকুল বহু নিবিড় অরণ্য, অসংখ্য গিরিকন্দর পরিভ্রমণপূর্ব্বক, অঘোরী, কাপালিক, বাউল, রামাত, দরবেশী, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের নিকটে একে একে গমন করিয়া, তাঁহাদিগের উপদিষ্ট প্রণালী অনুসারে সাধন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে কিছুকাল সাধন করিয়া, যে স্থানে যে যৎসামান্য ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণের পিপাসা দূর হইল না। চাতকপক্ষী যেমন শুদ্ধ স্ফটিক জল ব্যতীত আর কিছুতেই তৃপ্ত হয় না এবং তৎপ্রাপ্তির আশায় উর্দ্ধে আকাশপানে তাকাইয়া থাকে, গোস্বামী প্রভুও সেই প্রকার পূর্ব্বোক্ত সাধনসমূহের সামান্য ফলকে তুচ্ছ বোধ করিয়া, সেই অনন্ত লীলারসময়ের প্রেম-সুধারস আস্বাদন করিবার অভিপ্রায়ে, সৎগুরুরূপী ভগবানের কৃপার প্রতি সতৃষ্ণ-নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন।

পূর্ব্বোক্ত দুর্গম স্থানসকল অতিক্রমকালে গোস্বামী প্রভুকে সময়ে সময়ে যেরূপ ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। এক সময় তিনি বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতে কোন একজন মহাপুরুষের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে গিয়া পড়িলেন। এদিকে সন্ধ্যা আগতপ্রায়; সাধুর আশ্রমেরও কোন খোঁজখবর পাওয়া গেল না। অনেক অনুসন্ধানের পর একটী পুরাতন অট্টালিকা প্রাপ্ত হইয়া, তন্মধ্যে রাত্রিযাপন করিতে মনস্থ করিলেন। গভীর রাত্রিতে ৮।১০ জন সশস্ত্র দস্যু উপস্থিত হইয়া, গোস্বামী প্রভুকে সেই স্থান হইতে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিতে বলিল। তিনি অগত্যা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া, নিকটবর্ত্তী একটী বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বলা বাহুল্য, সে অট্টালিকাটী একটী দস্যুর আড্ডা। দস্যুরা তাহাদের পাপলব্ধ দ্রব্যাদি বণ্টন করিয়া

নিদ্রা যাইবার সময় মনে করিল যে, এই ব্যক্তি আমাদিগকে চিনিতে পারিয়াছে, সুতরাং নিশ্চয়ই পুলিশে সংবাদ দিবে, অতএব উহাকে কাটিয়া ফেলাই উচিত। তাহাদিগের দলপতি বলিল—"ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়াই মনে হইল যে, উনি একজন সাধু পুরুষ। উঁহার দ্বারা আমাদের কোন অনিষ্ট হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। অতএব তোমরা এই সাধু-হত্যারূপ মহাপাপ হইতে ক্ষান্ত হও।" কিন্তু অপরাপর দস্যুরা তাহাতে নিশ্চিন্ত হইতে না পারায়, অবশেষে আগন্তুককে মারিয়া ফেলাই স্থির হইল। যমদূতের ন্যায় দুই জন দস্যু তরবারিহস্তে অগ্রসর হইতেই, গোস্বামী প্রভুর অনতিদূরে একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র দেখিতে পাইল। অতঃপর তাহারা অন্য এক পথ দিয়া ঘুরিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতে মনস্থ করিল। সে স্থানে গিয়াও দেখে যে, ঐরূপ আর একটী ব্যাঘ্র বসিয়া আছে। সুতরাং তাহারা তাঁহার বধ-বিষয়ে নিরাশ হইয়া স্বস্থানে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিষয় বর্ণন করিল। দলপতি ইহা শুনিয়া ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইল। ইহার পর হঠাৎ ভয়ানক ঝড় উপস্থিত হইয়া পুরাতন অট্টালিকার ছাদ ধসিয়া পড়িল। দলপতি কোন প্রকারে প্রাণ বাঁচাইল, কিন্তু দলস্থ অপরাপর দস্যুগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। গোস্বামী প্রভু ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারেন নাই। পরদিন প্রাতে তিনি বিন্ধ্য-বাসিনীর বাড়ীতে আগমন করিয়া তথায় অতিথি হইলেন। এমন সময় দস্যুদিগের দলপতিও সেই স্থানে উপস্থিত হইল, এবং গোস্বামী প্রভুকে চিনিতে পারিয়া, তাঁহার পায়ে পড়িয়া ক্ষমাভিক্ষা করিতে লাগিল। তিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে দস্যুপতি পূর্ব্ব রাত্রির সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিল।

২। অপর এক সময় ঐরূপ ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র-জন্তু-সমাকীর্ণ একটী নির্জ্জন প্রান্তরে গোস্বামী প্রভু একাকী একটী বৃক্ষমূলে রাত্রিযাপন

করিতেছিলেন। রাত্রি অধিক হইলে অকস্মাৎ কোথা হইতে দীর্ঘ যষ্টি-হস্তে একটী পাগলপ্রায় লোক তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে তৎসম্বন্ধে কোন উত্তর প্রদান করিল না। অতি প্রত্যূষে গোস্বামী প্রভু জাগরিত হইয়া, প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত এই অদ্ভুত ব্যক্তিকে পুনরায় দেখিতে পাইলেন না।

৩। এক সময় তিব্বতের পথে কোন বরফময় জনশূন্য প্রদেশে গোস্বামী প্রভু হিমে আড়ষ্ট হইয়া অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন সময় হঠাৎ একজন সাধু তথায় উপস্থিত হইয়া, অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত করিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করেন। পূর্ব্বোক্ত সাধুটী একবার ঢাকায় উপস্থিত হইলে, গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে অতিশয় পরিচিতের ন্যায় বিশেষভাবে সমাদর করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া গোস্বামী প্রভুর সঙ্গে তাঁহার কোথায় প্রথম পরিচয় হয়, এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি বরফান (বরফ আবৃত) প্রদেশে গোস্বামী প্রভুর বিপদের কথা সকলকে জ্ঞাপন করেন।

৪। কোন এক সময় জনৈক প্রসিদ্ধ বাউলের আশ্রমে থাকিয়া, গোস্বামী প্রভু কিয়ৎকাল তাহাদের প্রণালীমত সাধন করিয়াছিলেন। ক্রমে তাহাদের ভিতরের পৈশাচিক ব্যাপারের বিষয় অবগত হইয়া বাউল-দিগের সঙ্গ ও আশ্রম ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলে, অপরাপর আশ্রমবাসি-গণ তাহাদের গুপ্ত-কথা প্রকাশ হইবার আশঙ্কায়, তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। পরিশেষে গোস্বামী প্রভুর প্রকৃত পরিচয় পাইয়া তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিল, এবং তাহাদের গুপ্ত-সাধন ব্যক্ত না করিতে সবিনয়ে নির্ব্বন্ধাতিশয়ে অনুরোধ করিয়া সম্মানের সহিত বিদায় দিল।

৫। অপর এক সময় ৺ চন্দ্রনাথতীর্থের কোন একটী জঙ্গলের মধ্যে

গোস্বামী প্রভু দাবানলে পতিত হইয়া আশ্চর্য্যভাবে রক্ষা পাইয়াছিলেন। ঘটনাটী গোস্বামী প্রভুর স্বকথিত-বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি যথা :— "আমি ও বারদির ব্রহ্মচারী মহাশয় এক সময় চন্দ্রনাথ পাহাড়ে কিছুকাল একত্র সাধনভজন করিয়াছিলাম। সেই স্থানে একদিন হঠাৎ চারিদিকে দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ অগ্নিতে দগ্ধ হইতে লাগিল। উত্তাপ আর সহ্য করা যায় না। আমাদের কুটীরের প্রায় ২০০ হাত নীচে সমতল ভূমি ছিল। প্রথমে দেখি, একটী প্রকাণ্ড পাহাড়ীয়া সর্প লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক অদৃশ্য হইল। পরে একটী ব্যাঘ্রও ঐরূপ করিল। তৎপর ব্রহ্মচারী মহাশয় বম্ বম্ শব্দ উচ্চারণকরতঃ আমাকে পৃষ্ঠে করিয়া ২০০ হাত নীচে লাফাইয়া পড়িলেন। আমরা একটুও আঘাত পাইলাম না। মহাপুরুষদিগের কি আশ্চর্য্য শক্তি!

"ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিত প্রথম দেখা হইলে তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—"আমাকে চিনিতে পারিস্? তোর সঙ্গে আমার চন্দ্রনাথ পাহাড়ে দেখা হইয়াছিল। দাবানলে তোকে কে রক্ষা করিয়াছিল?" তখন আমার সব মনে পড়িল। * এই প্রকার কত সময় যে কত প্রাণান্তকর বিপদ হইতে, ভগবৎ-কৃপায় গোস্বামী প্রভু আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পাইয়াছেন, তাহার সমস্ত বিবরণ জানিবার উপায় নাই; কারণ, গোস্বামী প্রভুর আত্মগোপনের অদ্ভুত শক্তি ছিল। নিজের কথা নিজমুখে প্রায় প্রকাশ করিতেন না। ঘটনাক্রমে দৈবাৎ পূর্ব্ব-পরিচিত সাধু মহাত্মা-দিগের সমাগমে ও প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসুদিগের আন্তরিক আগ্রহে কখনও কোন কথা প্রকাশিত হইলে অপরে তাহা জানিতে পারিত।

* নরোত্তমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র ঘোষ রায় মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধৃত।

নবম পরিচ্ছেদ।

গয়াতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, দুইটী অদ্ভুত স্বপ্ন, পূর্ব্ব-জন্মের স্মৃতি-জাগরণ, বিষ্ণুপদের মাহাত্ম্যসূচক অদ্ভুত ঘটনা, আকাশগঙ্গা পাহাড়ে যোগদীক্ষা গ্রহণ, কাশীধামে সন্ন্যাস গ্রহণ, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের দীক্ষা পুরশ্চর্য্যার আবশ্যকতা কোথায় ? পরাধর্ম্মের জন্য অপরাধর্ম্ম ত্যাগ দূষণীয় নহে।

১৮৮৩ খৃঃ অব্দে গোস্বামী প্রভু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার-কল্পে গয়াধামে উপনীত হইলেন। তথাকার প্রসিদ্ধ উকিল গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ইঁহাদিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র বাস নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এই স্থানে প্রতিদিন স্থানীয় ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিদিগের সহিত গোস্বামী প্রভুর ধর্ম্মতত্ত্বাদি সম্বন্ধে অনেক কথোপকথন হইত। তাঁহার এই সময়ের কার্য্য-কলাপাদি সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শশীবাবু যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহার সারাংশ নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে, যথা—"এই স্থানে প্রত্যহ সায়ংকালে গোঁসাইজী গৃহের ছাদের উপরে বসিয়া ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা করিতে করিতে ধ্যানে ডুবিয়া যাইতেন। অধিকক্ষণ কথা বলিতে পারিতেন না। এই ভাবে প্রায় ২।৩ ঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইয়া যাইত। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধারণ প্রচারকদের পক্ষে এইরূপ হওয়া, স্থানীয় অপরাপর ব্রাহ্মদিগের ভালবোধ হইত না। তাঁহারা গোঁসাইজীর দ্বারা আর অধিকদিন প্রচারের আশা একরূপ পরিত্যাগ করিলেন। শ্রদ্ধেয় গোবিন্দবাবু গোঁসাইজীর প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে,

ওকালতী ব্যবসায় ছাড়িয়া সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে পড়িয়া থাকিতেন। তিনি একদিন কথাপ্রসঙ্গে আকাশগঙ্গা পাহাড়ের রঘুবর দাস বাবাজীর অশেষ গুণগ্রামের কথা ব্যক্ত করিলে, গোঁসাইজী তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। পরদিন প্রত্যূষে গোবিন্দবাবু, আমাদের চাকর নতিনীর সহিত কিছু চাউল ডাইল, ইত্যাদি দিয়া আমাদিগকে বাবাজীর আশ্রমে প্রেরণ করিলেন। সূর্য্যোদয়ের সময় আমরা আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। বাবাজী মহাশয় তখন দাঁড়াইয়াছিলেন। গোঁসাইজী তাঁহার চরণে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—'বাবাজী, মহাশয়, কি ক'রে উদ্ধার হ'ব?' তাঁহার ভাবে মুগ্ধ হইয়া বাবাজী মহাশয় সসম্ভ্রমে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—'এইছে সাধু হাম কভি নেহি দেখা। দয়াল রামজী তোমকো আলবৎ কৃপা করেগা, বৈঠো বাবা, দৈন্য ছোড় ইত্যাদি।' অতঃপর তিনি আমাদিগকে সাদরে উপবেশন করাইয়া রন্ধন করিতে গেলেন। রন্ধন শেষ হইলে অতিশয় আদরের সহিত আমাদিগকে খাওয়াইলেন। আহারান্তে বাবাজীর (রঘুবরদাস বাবাজীর) সঙ্গে গোস্বামী প্রভুর ধর্ম্মবিষয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। অপরাহ্নে আমরা তাঁহার পরামর্শে ব্রহ্মযোনি পাহাড়ে সাধুদর্শন করিতে গমন করিলাম। ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের সাধু দূর হইতে দৌড়িয়া আসিয়া গোস্বামী প্রভুকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—'আনন্দে রহ, আনন্দে রহ।' ইঁহার সঙ্গে ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক আলাপ হইল। প্রদোষে আমরা নামিয়া আসিলাম। আসিতে আসিতে পথে গোস্বামী প্রভু একটী স্থান দেখাইয়া বলিলেন—'এই স্থানে মহা-প্রেমিক শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবোদয় হইয়াছিল। তিনি কৃষ্ণবিরহে উন্মত্ত হইয়া 'কৃষ্ণরে, বাপরে, কোথা গেলিরে' বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াছিলেন।' আমি তাঁহার কাতরোক্তি শ্রবণে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলাম। 'সাধুচরিত্রমালায়'

পাঠ করিয়াছিলাম ধর্ম্মের জন্য উন্মত্ত হইতে হয়; আজ তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম। মনে হইল ইঁনি প্রকৃতই ধর্ম্মের জন্য উন্মত্ত হইয়াছেন। আর একদিন বলিলেন—'শশী আজ আমি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ভজন করিব, তুমি আমার পার্শ্বে ঘুমাইয়া থাক।' এই বলিয়া তাঁহার গাত্রবস্ত্র দ্বারা আমাকে উপাধান করিয়া দিলেন। শিশু যেমন মাতৃপার্শ্বে নির্ভয়ে নিশিযাপন করে, আমিও সেইভাবে তাঁহার পার্শ্বে নিশিযাপন করিলাম। আর এই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদসঙ্কুল সেই ভীষণ অরণ্যের পার্শ্বে, সমগ্র রজনী অটলভাবে ভয়-উদ্বেগ-বিহীন হইয়া ব্রহ্মধ্যানে অতিবাহিত করিলেন; দেখিয়া বোধ হইল, যেন শীত, বাত এবং হিংস্র জন্তুর কোন প্রকার ভয়ও তাঁহাকে বিচলিত করিতে অসমর্থ। রাত্রিশেষে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে পুনরায় আমাকে উঠাইলেন। আমরা দুইজনে নির্ঝরবারিতে স্নান করিয়া নির্জ্জন গুহা-প্রান্তে বসিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলাম। তিনি করতাল বাজাইয়া অতীব সুমধুরস্বরে গান করিলেন—

ভৈরবী—যৎ।

প্রভু হৃদিরঞ্জন মনোমোহনকারী।

(তুমি) প্রাণ রমণ হৃদি-ভূষণ পাপহরণকারী।
(আমার) সাধ সতত হয় যে মনে, ও রূপ নেহারি।
দরশন করি মোহ আঁধার নিবারি॥
(সে দিন কবে বা হবে)

এই গান করিতে করিতে তিনি অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহার সেই সময়ের প্রাণস্পর্শী উপাসনার স্মৃতি এখনও জাগরূক হইয়া

আমার মনপ্রাণ আকুলিত করিয়া তোলে। এইদিন উপাসনার সময় খুব বড় একটী সাপ তাঁহার উরুদেশে উঠিয়াছিল; কিন্তু কোন অনিষ্ট করে নাই। আপনা হইতেই নামিয়া গিয়াছিল, আর তাঁহাতেও কোনরূপ ভীতির চিহ্ন দৃষ্ট হয় নাই। গোঁসাইজীর ভক্তি অনুরাগে যেন হিংস্র জীব-জন্তুও মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যাইত, তাহাদের হিংসাবৃত্তি ক্ষণকালের জন্য বিলয় প্রাপ্ত হইত।

"ইহার পর আমাকে বলিলেন—'শশি, আমি আর কলিকাতায় যাব না। তুমি ফিরে যাও।' এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার অবস্থা দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম। গয়ার পথে যুবক নিমাইর পরিবর্ত্তন হইলে বাষ্প-রুদ্ধ-কণ্ঠে সঙ্গিগণকে বলিয়াছিলেন—'তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও, আমি আর সংসারে যাব না। আমি প্রাণেশ্বরকে দেখিতে বৃন্দাবনে চলিলাম।' ইঁনিও যেন তেমনি গয়ার পাহাড়ের নির্জ্জনতার মধ্যে ডুবিয়া একান্তমনে ব্রহ্মসাধনায় নিযুক্ত হওয়ার আশায় তথায় চির বাস-স্থান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, আর পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন—'আমি আর কলিকাতায় যাব না।'

"একদিন আমরা বুদ্ধ-গয়ায় গিয়াছিলাম। বুদ্ধের সাধন-ক্ষেত্র, নিরঞ্জনা-নদী প্রভৃতি দেখিয়া গোস্বামী প্রভু আমার নিকটে শাক্যসিংহের গুণ-কীর্ত্তন করিলেন; এবং অবশেষে নিরঞ্জনার তীরে গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিলেন। আমরা মধ্যাহ্নে আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া তাঁহার জন্য বহুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু ধ্যানভঙ্গ না হওয়ায় তিনি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে গৃহে ফিরিলেন না।

"ইহার পর তিনি একাকী আকাশগঙ্গায় যাইতেন এবং আর কলিকাতায় ফিরিবেন না স্থির করিলে, আমি শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রীমহাশয়ের (শিবনাথ বাবুর) অভিপ্রায়ানুসারে কলিকাতায় চলিয়া আসি। অবশেষে

তাঁহার পুত্রকন্যাগণ তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরাইয়া আনেন। এত সাধন-শীলতার মধ্যেও তাঁহার অপরিসীম স্নেহ সর্ব্বদা আমাকে আবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল, আমি মনে করিতাম যেন মাতৃসন্নিধানে থাকিয়া মাতৃস্নেহ ভোগ করিতেছি। শাস্ত্রীমহাশয় একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—'বিজয়বাবুর আঙ্গুল চুষিলেও ভক্তি হয়, এবং তিনি ধর্ম্মার্থে দ্বিতল ছাদ হইতেও লাফাইয়া পড়িতে পারেন।' গয়াতে কিছুদিন একত্র বাস করিয়া দেখিয়াছি, ধর্ম্মের জন্য ইঁহার অসাধ্য কিছুই ছিল না। এইরূপ লোকের জন্ম-ধারণে বসুন্ধরা পুণ্যবতী হয়।"

গয়া 'গোড় ধোয়া' নামক স্থানে স্থানীয় ব্রাহ্মগণ প্রতিবৎসর উৎসব করিতেন। একবার উৎসবের সময় গোস্বামী প্রভু আকাশগঙ্গা পাহাড়ে ৺রঘুবরদাস বাবাজী মহাশয়ের আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। উৎসবের দিন ব্রাহ্মগণ, গোস্বামী প্রভুকে উপাসনা করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। তিনি যথাসময়ে উৎসব-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া উপাসনা আরম্ভ করিলেন। দুই চারিটী কথা বলিতে বলিতেই, তাঁহার বাক্য গদগদ হইয়া যাইতে লাগিল, কথা যেন আর বলিতে পারেন না। কিয়ৎকাল পরে তিনি কথঞ্চিৎ ভাব সম্বরণ করিয়া, উপাসকমণ্ডলীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"আপনারা কেহ উপাসনা করুন, আমি আর কথা বলিতে পারিতেছি না।" এই কথা শুনিয়া আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম শ্রদ্ধেয় হরসুন্দরবাবু উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই বলিলেন—"হে প্রভো! আজ তোমার ভক্তের মুখে তোমার কথা শুনিব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহা আর ভাগ্যে ঘটিল না। তোমার ভক্তগণকে নিভৃতে তোমার অমৃত-নিকেতনে লইয়া এমন প্রেমসুধা প্রদান কর, যাহা আমাদের চর্ম্ম-চক্ষে ও কর্ণে দেখিবার কি শুনিবার ক্ষমতা নাই।"

এইরূপ অপরাপর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকগণও গোস্বামী প্রভুর তাৎকালিক

অবস্থা দর্শন করিয়া, মুক্তকণ্ঠে তাঁহার যে সকল গুণানুবাদ করিতেন, বাহুল্য-ভয়ে তাহা উল্লেখ করা হইল না।

এই সময় গোস্বামী প্রভু তিনটী অতি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। সহৃদয় পাঠকবর্গের অবগতির জন্য দুইটী স্বপ্নবৃত্তান্ত নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। কোন বিশেষ কারণে তৃতীয়টী প্রকাশ করা গেল না। গোস্বামী প্রভু স্বহস্তে স্বপ্নগুলি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

১ম স্বপ্ন, গয়া সাহেবগঞ্জ, ২৮ শে বৈশাখ ১৮০৩ শক, সোমবার অপরাহ্ন।

"আমি একটী প্রকাণ্ড নদীর তীরে বসিয়া আছি, লক্ষ লক্ষ লোক সহস্র সহস্র নৌকায় পার হইতেছে; আমাকে কেহই ডাকিতেছে না। একজন আমাকে হঠাৎ ডাকিয়া নৌকায় উঠাইল। নৌকাযোগে পারে উপস্থিত হইলে, কতিপয় পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা আমাকে একটি বাগানে লইয়া গেলেন। বাগানে সুন্দর সুন্দর পুষ্পবৃক্ষ আছে। তথাকার প্রাচীরের লতায় এক অপূর্ব্ব পুষ্প দর্শন করিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। ক্রমে আমি অচেতন হইলাম। তখন ঐ পুষ্পসকল পরমা সুন্দরী স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া আমাকে বলিল—'হে ভদ্র, তোমার হৃদয়নাথকে অন্বেষণ কর।' আমি অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া উদ্যানের চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময় একটি কুকুর ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে বলিল—'আতিথ্যস্বরূপ এই ফল ভক্ষণ কর।' আমি ফলটী ভক্ষণ করিবামাত্র কুকুরটি চলিয়া গেল। এমন সময় একটি জটাধারী মহর্ষি আমার নিকটে আসিয়া কহিলেন—'বৎস! আমার হস্ত ধারণ কর।' আমি তাঁহার হস্ত ধারণ করিবামাত্র উভয়ে আকাশপথে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম। কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ উপগ্রহ অতিক্রম করিয়া, এক জ্যোতির্ম্ময় ধামে উপস্থিত হইলাম।

সেই স্থানের জ্যোতিঃ এত অধিক যে, আমাদের চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল। আর সকল বস্তু যেন অন্ধকারে ঢাকা। ক্রমে যাইতে যাইতে একটী সুন্দর স্থানে যাইয়া দেখি, কয়েকজন মহর্ষি উজ্জ্বল তারকার ন্যায় চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া যোগাসনে বসিয়া আছেন। আমার পথপ্রদর্শক মহর্ষি আমার হস্তত্যাগ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে উপবেশন করিলেন। ঐ সাধুমণ্ডলীর মধ্য হইতে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কস্ত্বং' অর্থাৎ কে তুমি? আমি উত্তর করিলাম—'অস্তি পৃথিব্যাং ভাগীরথী তীরে শান্তিপুরনামা কশ্চিৎ জনপদঃ। তস্মিন্‌পুরে শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যনামা প্রসিদ্ধঃ সিদ্ধপুরুষোঽভূৎ। তস্য কুলে জাতঃ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীনামা অকিঞ্চনোঽহং। ভবতাম্ সমীপে সমাগতঃ। ভগবদ্দর্শনলালসকাতরতয়া মনঃপ্রাণাণি বিদীর্য্যন্তে। হে সত্তমাঃ! মাং কৃপাং কুরুত।' অর্থাৎ পৃথিবীতে ভাগীরথীতীরে শান্তিপুরনামে একটী জনপদ আছে। তথায় শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য নামে একজন প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নামক এই অকিঞ্চন তাঁহারই কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ভগবদ্দর্শনলালসার কাতরতায় মনপ্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে। সম্প্রতি আপনাদের সমীপে উপনীত হইয়াছি, আমাকে কৃপা করুন। আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই কৃপালু সাধু বলিলেন—'বৎস, তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, উপবিশ।' আমি প্রণাম করিয়া বসিলাম। সাধুগণ সমস্বরে—

ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্ব-লোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমঃ ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥ ইত্যাদি

এই স্তব করিতে লাগিলেন। স্তব পাঠ করিতে করিতে তাঁহারা নৃত্য করিতে লাগিলেন। এমন সময় ভগবানের প্রকাশ হইল। সে শোভা-

সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমি অচেতন হইলাম। চেতন হইয়া দেখি, আমি পৃথিবীর সেই উদ্যানে রহিয়াছি। তখন উচ্চৈঃস্বরে রোদনপূর্ব্বক দৌড়িতে লাগিলাম।' হায়! কেন আমি প্রভুকে দেখিয়া অচেতন হইলাম? রে প্রাণ, তুমি কেন সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলে? তখন কে যেন আমাকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—'বৎস, স্থির হও, প্রভুর চরণ ধ্যান কর, আশা পূর্ণ হইবে। প্রভু তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেন।' ইহার পরই নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল।"

১ম স্বপ্ন, ১৮৩ শক, ২রা আষাঢ়, রবিবার, গয়া, সাহেবগঞ্জ।

"মধ্যাহ্নে আহারান্তে গ্রীষ্মাধিক্যপ্রযুক্ত শরীর কিছু কাতর হইল। শয়ন করিলাম, অনেকক্ষণ নিদ্রা আসিল না। চারিটার পর হঠাৎ নিদ্রিত হইলাম। নিদ্রিতাবস্থায় দেখিলাম, কোথাকার একটী ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের আয়োজন হইতেছে। একজন বলিল, সাধারণ-সমাজকে নিমন্ত্রণ না করিলে, পরে নিন্দাভাজন হইতে হইবে। একথা শুনিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। পথের মধ্যে কতকগুলি ভদ্র-লোক দণ্ডায়মান আছেন, তাঁহার মধ্যে একজন বীরবেশী পণ্ডিত আমার সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচার আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ বিচার করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। এমন সময় একজন বলিলেন, ইঁনি ব্রহ্মজ্ঞানী। এই কথা শুনিয়া পণ্ডিত ক্রোধপূর্ব্বক আমার একটী দাঁত ভাঙ্গিয়া দিলেন। আমি ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলাম। সম্মুখের পথ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণপার্শ্বের প্রশস্ত পথে গমন করিয়া দেখি, পথে অসংখ্য বানর। প্রথমে অনেক বানর দেখিয়া মনে কিছু ভয় হইল, তথাপি সেই পথে চলিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখি, একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ 'জয়রাম শ্রীরাম' বলিতে বলিতে যাইতেছিলেন। আমিও তাঁহার পশ্চাৎ 'ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ' উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে করিতে চলিলাম। আমাকে পশ্চাতে যাইতে

দেখিয়া, সেই বৃদ্ধ এক বীরপুরুষ হইলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, 'আমাকে চেন?' আমি কোন উত্তর না দিয়া তাঁহার পশ্চাতে চলিলাম। ক্রমে আমরা উভয়ে একটী ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। চারিদিকে উদ্যান, সরোবর এবং মধ্যে চারি পাঁচটী মন্দির। ঠাকুরঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন- 'আমাকে চেন?' আমি বলিলাম 'আজ্ঞা না'। তিনি বলিলেন—'আমি বীর হনুমান।' এই কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন—'কি জন্য আসিয়াছ?' আমি বলিলাম—'আমি ব্রহ্মজ্ঞানী।' তিনি বলিলেন—'আমি কি ব্রহ্মজ্ঞানী নহি? আমি রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্রকে পূজা করি না। সেই আত্মারাম পরব্রহ্মকেই পূজা করিয়া থাকি। রমন্তি ইতি রামঃ। আত্মারাম, প্রাণারাম এই দেখ,' ইহা বলিয়া বক্ষঃস্থল চিরিয়া ফেলিলেন। দেখিলাম, তাঁহার প্রত্যেক অস্থি, মাংস ও পেশির মধ্যে, 'ওঁ রামঃ ওঁ রামঃ' এইরূপ স্বর্ণাক্ষরে লেখা রহিয়াছে। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম,—'আমায় কিছু উপদেশ প্রদান করুন।' তিনি বলিলেন—'তোমাকে যোগ দীক্ষা দিব, চল যাই,' ইহা বলিয়া হস্তে একখানি কোদালী লইয়া আমার পশ্চাৎ চলিলেন। কিছু দূর গিয়া সরোবরের তীরে একটী বৃক্ষতলে ছোট একটী কুটীর দেখাইয়া বলিলেন—'এই কুটীরে তোমার তপস্যা হইবে। কেমন হবে না?' 'আমি বলিলাম—'আজ্ঞা হবে।' তিনি বলিলেন—'দেখ, আমি মনে করিলে এক মুহূর্ত্তে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে পারি; যদি প্রয়োজন থাকে বল।' আমি বলিলাম—'আজ্ঞা ইহাতেই যথেষ্ট হইবে, আর প্রস্তুত করিতে হইবে না।' তিনি বলিলেন—'ভাল, তবে এস, উপদেশ গ্রহণ কর। 'ওঁ তৎসৎ ওঁ রামঃ' এই নামের ভাব ধ্যান কর, এবং জপ কর। সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা ব্রহ্ম; তিনি প্রাণারাম, মনআরাম,

তিনিই সত্য, ইহাই এই মন্ত্রের অর্থ। এই মন্ত্রার্থ সাধন কর।' এই মন্ত্র সাধন করিতে করিতে অনেক দিন অতীত হইল। একদিন বীর হনুমান আসিয়া বলিলেন—'তুমি সিদ্ধ হইয়াছ। তোমার শরীরের লোমকূপ দিয়া আনন্দস্রোতঃ যাইতেছে। আনন্দাশ্রু, রোমাঞ্চ অবিশ্রান্ত হইতেছে, কেমন আত্মা পূর্ণ হইয়াছে ত?' আমি বলিলাম—'সম্পূর্ণ পূর্ণ হইয়াছে।' তিনি বলিলেন—'তবে অন্য সাধনের উপদেশ গ্রহণ কর।' আমি বলিলাম—'অন্য সাধন কি?' তিনি বলিলেন—'ব্রহ্মে প্রবেশ, ইহাকেই সন্ন্যাস বলে।' আমি বলিলাম—'ব্রাহ্মধর্ম্মে সংসার-ত্যাগ নিষেধ। বিশেষতঃ আমাকে (ধর্ম্ম) প্রচার করিতে হইবে। দেশেও ধর্ম্মের অভাব।' তিনি বলিলেন—'ভাল, কিছুদিন আনন্দ-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া সর্ব্বদেশে ব্রহ্মানন্দ বিস্তার কর। পরে ব্রহ্মে প্রবেশ করিও। এস, এখন আমরা সংকীর্ত্তন করি।' ইহা বলিয়া প্রকাণ্ড বানরদেহ ধারণ করিলেন। মস্তক ও লেজ আকাশে উঠিয়াছে। চক্ষু দুইটী যেন চন্দ্র-সূর্য্য, দেখিলে ভয় হয়। তাহার লোমে ওঁ রামঃ ওঁ রামঃ, মস্তকে, চক্ষুতে, হস্তে কর্ণে, সর্ব্বশরীরে ওঁ রামঃ ওঁ রামঃ। এত উজ্জ্বল যেন ছোট ছোট ফুকো শিশির আলোর মত বোধ হইতে লাগিল। আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—'আমার বানরদেহের মুখখানি কি জান?' আমি বলিলাম 'না।' তিনি বলিলেন—'আমার মুখখানি ওঁ। এই ওঁ পুরুষ, আমার লেজ প্রকৃতি। এই জন্য লেজের দ্বারা রাবণের সর্ব্বনাশ করিয়াছি। আমার শরীরটী পুরুষ প্রকৃতি। সাধন করিলে অর্থাৎ ব্রহ্মে প্রবেশ করিলে, তুমিও বানরদেহ লাভ করিবে।' আমি বলিলাম—'মহাশয়, আমার কি লেজও হইবে।' তিনি বলিলেন—'অবশ্য।' পুরুষ প্রকৃতি এক না হইলে ব্রহ্মে প্রবেশ করিবার অধিকার হয় না। এখন কীর্ত্তন করি, ইহা বলিয়া দুইবাহু উর্দ্ধে বিস্তার করিয়া 'ওঁ রামঃ, ওঁ তৎসৎ' এই নাম গান করিতে করিতে উন্মত্ত

হইলেন। স্বর্গ হইতে দেবগণ আসিয়া এই কীর্ত্তনে যোগ দিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। গণেশ খোল ও করতাল চারিহাতে বাজাইতে লাগিলেন। নৃত্য করিতে করিতে শিবের জটা খসিয়া পড়িল। পার্ব্বতী জটা ধরিয়া ধরিয়া নাচিতে লাগিলেন। নারদ ও সরস্বতী বীণা বাজাইতে লাগিলেন। আনন্দের সীমা নাই। ইহার মধ্যে এক জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল। সকলেই করযোড়ে ব্রহ্মের স্তব করিতে লাগিলেন। আমি ব্রহ্মের জ্যোতির মধ্যে লুটাইতে লাগিলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কি করিতেছ?' আমি বলিলাম—'আমি মাখিয়া লইতেছি।' তিনি বলিলেন—'খুব মাখ, খানিকটা কাপড়ে বাঁধিয়া লও।' আমি বলিলাম—'নিরাকারকে কি রকমে বাঁধিব?' তিনি বলিলেন—'সে কাপড়ও জড় নহে। হৃদয় কাপড়।' ক্ষণকাল পরে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম অন্তর্হিত হইলেন। দেবগণ কিছুকাল কীর্ত্তন করিয়া ভক্ত হনুমানকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। হনুমান আমাকে বলিলেন—'এইখানে প্রতিদিন এইরূপ হয়। এতদিন তপস্যায় ছিলে, কিছু জানিতে পার নাই।' আমি বলিলাম—'আমার নিতান্ত অভিলাষ, আমি এখানে বাস করি। কিন্তু কেশববাবু ব্রহ্মসমাজের বড়ই অনিষ্ট করিতেছেন। তাহা নিবারণের জন্য যাইতে হইবে।' হনুমান বলিলেন—'কেশববাবু ছিলেন ভাল। এখন তিনি ভ্রান্ত হইয়াছেন। নিজে অন্ধ হইয়া অনেককে অন্ধকূপে ফেলিতেছেন। আমি যদি ব্রহ্মে প্রবেশ না করিতাম, কেশববাবুকে সংশোধন করিয়া আসিতাম। মহাভারত পড়িয়াছ ত? ভীমের অহংকার কেমন নির্ব্বিবাদে নষ্ট করিয়াছিলাম।' আমি বলিলাম—'আমি তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিব?' তিনি বলিলেন—'অসত্য নষ্ট কর, আর প্রেম কর। প্রেম, প্রেম, প্রেম।' ইহার পরই নিদ্রাভঙ্গ হইল।"

সাধন-পন্থায় কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে, সাধকের জাতিস্মরত্ব নামে একটী অবস্থা লাভ হয়। এই অবস্থা লাভ হইলে সাধকের নিজের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি জাগরিত হয় এবং অপরের পূর্ব্ব-জন্মের কথাও অবগত হইবার ক্ষমতা জন্মে। গয়াধামে অবস্থানকালে একদা রামগয়ার পাহাড়ে গোস্বামী প্রভুর হঠাৎ পূর্ব্ব-জন্মের স্মৃতি জাগরিত হয়। ঘটনাটী জনৈক লেখকের স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি যথা :—"গয়ার নিকট-বর্ত্তী এক স্থানে যাইবার ইচ্ছা মনে উদয় হয়। এই স্থানটী জঙ্গলময়। গয়া হইতে তিন ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। নাম রামগয়া। সন্ন্যাসীরা তথায় অনেক সময় আসিয়া থাকেন। নিকটে লোকেরও বসবাস আছে। গোঁসাই একটী লোক সঙ্গে ঐ স্থানে যান।

"তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল, 'আমি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নহি, অন্য কোন ব্যক্তি।' তিনি বলিলেন—'বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আমি মনের ঐ বিচিত্র ভাব দমন করিতে পারিলাম না। সেই স্থানে পৌঁছিবার পর ঐ ভাব মনে আরও প্রবল হইল। নিকটে একটী বৃক্ষতলে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানে যে দুইটী সন্ন্যাসী ছিলেন তাঁহারা কোথায় গেলেন?' ব্রাহ্মণ বলিলেন—'কিস্‌কি বাৎ পুছ্‌তে হায়?' অর্থাৎ কাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? পরে বলিলেন—'সো লোগ্ তো বহুৎ পহিলে মর্ গয়ে' অর্থাৎ সেই লোক বহুদিন পূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছে।' গোঁসাই জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই স্থানে নৃসিংহদেবের মন্দির আছে?' ব্রাহ্মণ বলিলেন—'হাঁ, মিলে গা,' অর্থাৎ আগে মিলিবে। গোঁসাই নৃসিংহদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তিনি ও আর দুইটী সন্ন্যাসী এই মন্দিরে বাস করিতেন, যে ঘরে ধ্যান, যে ঘরে শয়ন, যে ঘরে পাঠ, যে ঘরে আহার

ইত্যাদি করিতেন, সমুদয় মনে উদয় হইল। তত্রস্থ সমুদয় ঘরগুলি পর্য্যটন করিয়া দেখিলেন। তৎপরে মনে পড়িল, নিকটস্থ একটী পুষ্করিণীর তীরে তাঁহারা তিনজনে স্নান করিতেন; তিনি সেই পুকুর দেখিলেন, আর মনে পড়িল একটী বৃক্ষের গায়ে তিনি কিছু লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই বৃক্ষটী পাইলেন। বৃক্ষটী বটবৃক্ষ। যখন ছোট ছিল, তাহার ছাল কাটিয়া 'ওঁ রামঃ' এই কয়েকটী কথা লিখিয়াছিলেন;—অক্ষরগুলি এখন বাঁকা টেরা হইয়া গিয়াছে, তথাপি তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন।"

এই সময় গয়াধামের ৺বিষ্ণুপাদপদ্মের অশেষ মহিমা-ব্যঞ্জক একটী ঘটনা সংঘটিত হয়। ঘটনাটি গোস্বামী প্রভুর স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে, যথা:—"*আমি যখন গয়ায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলাম, তখন একটী আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়াছি। কোন এক বিলাত-ফেরত ব্যক্তি গয়ায় গিয়াছিলেন। একদিন তাঁহার পরলোকগত পিতা তাঁহাকে স্বপ্নে বলিলেন—'বাপু! যদি গয়ায় এসেছ, তবে আমাকে একটী পিণ্ড দিয়ে যাও।' কিন্তু তিনি ওসব বিশ্বাস করেন না। তাই উহাতে আস্থা দিলেন না। আরও একদিন স্বপ্নে ঐরূপ দেখিলেন। আমাকে একথা জিজ্ঞাসা করায় বলিলাম—'আপনার পিণ্ড দেওয়াই উচিত।' তিনি বলিলেন—'আপনি আমাকে কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিতে ব'লছেন?' আমি বলিলাম—'আপনি ত আর আপনার বিশ্বাসমত দিবেন না, তাঁহার বিশ্বাসমতে দিবেন।' তিনি তাহাতেও সম্মত হইলেন না। পরে একদিন দিনে শুয়ে আছেন, একটু তন্দ্রার মত হ'য়েছে, তখন দেখিলেন তাঁহার পিতা যোড়হাত করিয়া বলিলেন—'বাপু! আমাকে

* কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার বিপিনবিহারী মৈত্র লিখিত বিবরণ। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধৃত।

একটী পিণ্ড দিয়ে দাও।' পুনরায় ঐ ঘটনা আমাকে বলায় আমি বলিলাম—'যদি অগত্যা আপনি নিজে না দেন, তবে আপনার প্রতিনিধি ক'রে একজন দ্বারা পিণ্ড দেন'। একজন পাণ্ডাকে প্রতিনিধি করিয়া দেওয়া হইল। তাঁহাকে ল'য়ে পিণ্ডদান দেখিতে আমি বিষ্ণুমন্দিরে গেলাম। যখন পিণ্ড দেওয়া হইল, তখন বাবুটীর দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'যখন পিণ্ড দেওয়া হইল, তখন আপনি কাঁদিলেন কেন?' তিনি বলিলেন—'যখন পিণ্ড দেওয়া হইল, আমি দেখিলাম আমার পিতা অঞ্জলী ক'রে পিণ্ডগ্রহণ করিলেন, এবং পিণ্ডগ্রহণ মাত্র তাঁহার পূর্ব্বশরীর বদলাইয়া গেল, এবং একটী অভিনব উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপ জানিলে আমি নিজেই দিতাম, আমার বড় দুর্ভাগ্য যে আমি নিজ হাতে পিণ্ড দিতে পারিলাম না; ইহা বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন।" *

অতঃপর গোস্বামী প্রভু সংগুরুর অন্বেষণে তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে মুঙ্গেরে উপস্থিত হইলেন। তথায় একদিন কষ্টহারিণীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন, একটী প্রাচীন বটবৃক্ষমূলে একজন সন্ন্যাসী মুদ্রিতনয়নে, যেন তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষা করিয়াই উপবিষ্ট আছেন। সন্ন্যাসীর দেহের অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ, তাঁহার প্রশান্ত মুখকমল দর্শন করিয়া গোস্বামী প্রভু মুগ্ধ হইলেন; এবং তাঁহার নিকটে অনেক মনের কথা, প্রাণের ব্যথা প্রকাশ করিয়া বলাতে, তিনি গোস্বামী প্রভুকে সান্ত্বনা দিয়া, যাবৎ কাল সংগুরুর দর্শন না পান, ততদিন তাঁহাকে সঙ্গে রাখিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

মানুষ যত দিন আপনাকে বড় মনে করে, ততদিন সে প্রকৃত ধর্ম্ম-পথে চলিতে পারে না। ধর্ম্মলাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মিলেই চিত্তের অহঙ্কার

---

* রংপুর, সদরদীনিবাসী শ্রীযুক্ত হরলাল রায় মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধৃত।

বিনষ্ট হয়, সেই নিরহঙ্কার চিত্তেই ধর্ম্ম প্রস্ফুটিত হয়। এইরূপ অবস্থা যাহার হয়, সে ধর্ম্মের জন্য চণ্ডালের পদেও মস্তক অবনত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণবিরহকাতরা গোপিকাগণ পশুপক্ষী তরুলতার নিকটেও তাঁহাদের প্রিয়তমের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। গোস্বামী প্রভুও তাঁহার প্রাণের প্রিয়তম দেবতার বিরহে ব্যাকুল হইয়া যেখানে ধর্ম্মকথা শুনিতেন, যে প্রণালী অবলম্বন করিলে তাঁহাকে লাভ করা যাইবে মনে করিতেন, কাঙ্গালের বেশে, বিনীতহৃদয়ে সেই স্থানেই গমনপূর্ব্বক তাঁহাদের ভজন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া, সিদ্ধিলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত কঠোর সাধন করিতেন। এই প্রকারে গোস্বামী প্রভু বর্ত্তমান সময় ভারতবর্ষে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের যত প্রকার সাধনপ্রণালী প্রচলিত আছে, তাহা ক্রমে ক্রমে অনুষ্ঠানকরতঃ ঐ সকল সাধনলব্ধ অবস্থা আয়ত্ত করিয়া দেখিলেন যে, উহার কোনটিতেই পূর্ণধর্ম্ম বিদ্যমান নাই। দুই আনা, চারি আনা পরিমাণ যেখানে যাহা আছে তাহাও পরোক্ষ ধর্ম্মমাত্র, তাহাতে আত্মার পিপাসা দূর হয় না। তিনি এমন এক অমানুষিক শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যে, যে সকল সাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে সামর্থ্যবান সাধকদিগেরও অন্ততঃ দশ পনের বৎসর সময়ের আবশ্যক হয়, তাহাতে তিনি অত্যল্পকালমধ্যেই কৃতকার্য্য হইতেন। এই কারণে পরবর্ত্তীকালে গোস্বামী প্রভুর নিকটে যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত সাধক তাঁহাদের সাধনপন্থার যে কোন গূঢ় বিষয়ের প্রশ্ন করিতেন, তিনি তাহার উপযুক্ত উত্তর প্রাপ্ত হইয়া অবাক্ হইয়া যাইতেন এবং এইজন্য তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে অবতার বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। সে যাহা হউক, অতঃপর পূর্ব্বোক্ত দয়ালু সন্ন্যাসী, গোস্বামী প্রভুকে সঙ্গে লইয়া, মুঙ্গের হইতে গয়াধামে আকাশগঙ্গা পাহাড়ে ৺রঘুবরদাস বাবাজীর আশ্রমে উপনীত হইলেন। তিনি

গয়া—আকাশ গঙ্গা পাহাড়। ইহার শিখরদেশে (ক) চিহ্নিত স্থানের পশ্চাৎ ভাগে গোস্বামী প্রভু দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নিম্নে ৺ রঘুবর দাস বাবাজীর আশ্রম। আশ্রমের পশ্চাৎ ভাগে একটী গোফার মধ্যে গোস্বামী প্রভু কিয়ৎকাল নির্জ্জন সাধনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

অতিশয় আদরের সহিত এই অতিথিদ্বয়ের সেবা-শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এই আকাশগঙ্গা পাহাড়ের উপরিভাগে একটী নির্জ্জন স্থানে গোস্বামী প্রভু যোগদীক্ষা লাভ করেন।

গোস্বামী প্রভু বহুদিন হইতেই সৎগুরুর কৃপা লাভ করিবার নিমিত্ত তৃষিত চাতকের ন্যায় উৎকণ্ঠিত-চিত্তে কাল-যাপন করিতেছিলেন। এইস্থানে একদিন নির্জ্জনে বসিয়া ভগবানের ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় কয়েকটী রাখালবালক আসিয়া বলিল, পর্ব্বতের উপরে একজন মহাপুরুষ বসিয়া রহিয়াছেন। এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র গোস্বামী প্রভু কিছু সেবার বস্তু লইয়া মহাত্মার নিকটে উপস্থিত হইলেন। মহাত্মার দিব্য কান্তি, দিব্য লাবণ্য, দেহ হইতে একপ্রকার জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। তদ্দর্শনে তিনি মুগ্ধ হইলেন এবং জ্ঞানহারা হইয়া অজ্ঞাতসারে রোদন করিতে লাগিলেন। পিতা যেমন সন্তানকে ক্রোড়ে গ্রহণ করেন, মহাত্মা গোস্বামী প্রভুকে সেইরূপে গ্রহণ করিয়া শক্তি-সঞ্চার-পূর্ব্বক দীক্ষিতকরতঃ সাধন-প্রণালী শিক্ষা দিলেন (সন ১২৯০ সাল, ১৮৮৩ খৃঃ অঃ, আষাঢ় মাস)। গোস্বামী প্রভু এই অযাচিত দয়া লাভ করিয়া ভক্তিভাবে গুরুদেবকে প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিয়াই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। উঠিয়া দেখিলেন, মহাপুরুষ প্রস্থান করিয়াছেন। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার দর্শন না পাইয়া গোস্বামী প্রভু ব্যাকুল হইলেন। পরে মহাত্মা রঘুবরদাস বাবাজী মহাশয়ের নিকটে আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বিবৃত করিলে, তিনি অতিশয় হর্ষ-প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন—"তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, তুমি যোগেশ্বরের কৃপা লাভ করিয়াছ। এখন তুমি যে স্থানেই গমন কর না কেন, মহাপুরুষেরা তোমাকে সাদরে গ্রহণ করিবেন। মহাপুরুষের জন্য ব্যস্ত হইও না, প্রয়োজন হইলেই তাঁহার দর্শন পাইবে।" এই ঘটনার কয়েকদিন পরে রামশীলার পাহাড়ে গোস্বামী প্রভুর সহিত তাঁহার

গুরুদেবের সাক্ষাৎ হইলে, তিনি তাঁহাকে সান্ত্বনাপ্রদানপূর্ব্বক বলিলেন—"ঘাবরাও মৎ, ভজন কর, বকৎমে সব মিল্ যায়েগা"—অর্থাৎ ভজন কর, বিচলিত হইও না, সময়ে সকলই মিলিবে।

গয়াধামে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে দীক্ষা-প্রাপ্তির পরে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের যে প্রকার মহাভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, পূর্ব্বোক্ত মহাত্মার নিকটে দীক্ষা-প্রাপ্তির পরে গোস্বামী প্রভুর হৃদয়েও সেই প্রকার মহাভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। দুগ্ধ যেমন প্রথম উত্তপ্ত হইবার সময় এতদূর উদ্বেলিত হইয়া উঠে যে, পাকপাত্র আর তাঁহা ধারণ করিতে সমর্থ হয় না, উহা পাকপাত্র উপছাইয়া পড়িয়া যাইতে চায়, কিন্তু ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া আসিলে আর পড়ে না, পাত্রের মধ্যে জমাট বাঁধিতে থাকে; তদ্রূপ নবানুরাগীর প্রথম প্রথম ভাবের উচ্ছ্বাস এত প্রবল হয় যে, তিনি উহার বেগ ধারণ করিতে সমর্থ হন না; ভাব তাঁহাকে একেবারে বিহ্বল করিয়া তোলে, ক্রমে ভাব গাঢ় হইতে আরম্ভ হইলে আর তাদৃশ অবস্থা হয় না। সাধক তখন নিজের ভিতরেই সমস্ত চাপিয়া রাখিয়া, উহার অপূর্ব্ব আস্বাদগ্রহণে সমর্থ হন। দীক্ষাপ্রাপ্তিমাত্রেই গোস্বামী প্রভুর হৃদয়ে যে মহাভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, তিনিও তাহার আবেগ সম্বরণ করিতে পারিয়াছিলেন না। ভাবের আবেগ এতদূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, প্রায় ১৪।১৫ দিন পর্য্যন্ত তিনি একেবারে বিহ্বলাবস্থায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বিহ্বলতা সময় সময় এতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত যে, তিনি স্নানাহারাদি শারীরিক ধর্ম্ম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া দিবানিশি নামরসেই বিভোর থাকিতেন। এই সময় পূজনীয় রঘুবরদাস বাবাজী মহাশয় দুগ্ধে বিল্বপত্র সিক্তকরতঃ কোন প্রকারে তাঁহার মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া যৎকিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করাইতেন। এই অবস্থায় একদিন একটী বৃহদাকার পার্ব্বতীয় সর্প, গোস্বামী প্রভুর গায়ে উঠিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

অর্থাৎ যে যে সময় ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান উপস্থিত হয়, তখনই আমি আমাকে সৃজন করিয়া থাকি। সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতির বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপন করিবার নিমিত্ত আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

উপরে উক্ত প্রমাণ সমূহ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কোন কোন সময়ে ভগবানকেও তাঁহার নরলীলার পরিপুষ্টির জন্য, মানুষের আকার ধারণপূর্ব্বক গুটিপোকার ন্যায় আপনার মায়াজালে আপনিই বিজড়িত হইয়া, আদর্শ মানবরূপে মানুষের মধ্যে জন্মাইতে হয়। নচেৎ মানবমণ্ডলীকে আকর্ষণ করিবেন কিরূপে? এবং মায়াধীন মনুষ্যেরাই বা তাঁহাকে বুঝিতে সক্ষম হইবে কি প্রকারে? উটপক্ষী শিকারীরা যেমন মৃত উটপক্ষীর পালকাদি পরিধান পূর্ব্বক, উটপক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া তাহাদের দলে প্রবিষ্ট হয়, এবং সময় বুঝিয়া নিজমূর্ত্তি ধারণকরতঃ কৌশলে তাহাদিগকে ধৃত করে, জড়াতীত নিরাকার সচ্চিদানন্দরসবিগ্রহ ভগবান্ও সেই প্রকার মানুষের রূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া, উপযুক্ত সময়ে নিজের অলোকসামান্য গুণগ্রাম প্রকাশিতকরতঃ সুকৌশলে তাহাদিগকে আত্মসাৎ করেন। এই প্রকার আদর্শ-পুরুষকে 'মহাজন' বলা হয়। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।' এবং সাধারণ মানবগণ তাঁহারই আচরণ অনুকরণ করিয়া থাকে। বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে—'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।' বস্তুতঃ আচার ও প্রচার একাধার হইতে

উৎপন্ন না হইলে তাহা সম্যক্ ফলদায়ী হইতে পারে না; এবং বিনা সাধনেও সাধ্য বস্তু কেহ পায় না।

"সাধন বিনা সাধ্য বস্তু কেহ নাহি পায়।"

চৈতন্যচরিতামৃত।

এই সাধন বস্তুটি কি, তাহা কোন সামর্থ্যবান্ পুরুষ নিজের জীবনে অনুষ্ঠান করিয়া না দেখাইলে, অপরসাধারণের পক্ষে তাহার অনুসরণ করা একান্ত অসম্ভব। যদি কোন সময় একটী লোকও সাধন করিয়া তাহার ফলের জীবন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন, ভগবান্‌কে লাভ করিয়াছেন তাহার প্রকৃত নিদর্শন দেখাইতে সমর্থ হন, তবে সহস্র লোকের প্রাণে আশার সঞ্চার হয়; এবং সেই আশায় বুক বাঁধিয়া তাহারা তদনুষ্ঠিত পন্থার অনুসরণ করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এই জন্য লক্ষ লক্ষ লোক কলিযুগপাবনাবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অনুষ্ঠিত সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া কত কঠোর সাধনাই না করিতেছেন! মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুও, তাঁহার নিজের জীবনে স্বীয় অনুষ্ঠিত সাধনপ্রণালীর অনন্ত শান্তিময় ফলের জীবন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই সহস্র সহস্র উচ্চশিক্ষিত লোক, ধন, জন, যশোমান, কুল, শীল ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকারের লৌকিক সুখশান্তির আশায় জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক, তাঁহার উপদিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিয়া, আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন, ও অপর লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার পন্থা অনুসরণ করিবার জন্য, তাঁহার উপদেশামৃত পান করিবার নিমিত্ত অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

তারপর শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের কথা। তিনিও যে কারণে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, গোস্বামী প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের কারণও

তদনুরূপ। শ্রীগৌরাঙ্গের অলন্ত ঈশ্বরানুরাগ, অপার্থিব প্রেম, অলোক-সামান্য ভাব,কদম্ব ইত্যাদি দর্শন করিয়া শ্রীবাস, গদাধর প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন, বিভিন্ন দেশ হইতে দলে দলে লোক আসিয়া অকূল ভবসাগরের কূল পাইবার আশায় তাঁহাকে বেষ্টন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ স্বদেশবাসিগণ, এমন কি, তাঁহার সহপাঠিগণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রকৃতরূপে গ্রহণ করিতে না পারিয়া, নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত ও অবমানিত করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষী প্রবলপরাক্রান্ত কাজীর হস্তে সমর্পণ করিতেও অগ্রসর হইয়াছিল। এই কারণে শ্রীমন্ মহাপ্রভু, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত পরামর্শ করতঃ সন্ন্যাসগ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন; কারণ, তাহাহইলে তাঁহার নিন্দুকগণ অন্ততঃ সন্ন্যাসী-বুদ্ধিতেও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিবে। এই প্রকারে অপরাধ ক্ষালন হইলে, তাহাদের পরিত্রাণের পথ সুগম হইবে। বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছিল। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণকরতঃ দেশত্যাগী হইবার পর, নিতান্ত বিরুদ্ধবাদিগণও তাঁহার শ্রীপদে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। গোস্বামী প্রভুর জীবন আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ, উপবীত ত্যাগ প্রভৃতি কয়েকটি কার্য্যের জন্য তাঁহার স্বদেশবাসিগণ তৎপ্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিয়া যে গুরুতর অপরাধ সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহা ক্ষালনের সুযোগ উপস্থিত করিবার জন্যই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দৃষ্টান্তানুরূপ, ভগবদ্বিধানে স্বীয় গুরুদেবের আদেশে কঠোর সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রেও তাহার ফল তদ্রূপই হইয়াছিল। গোস্বামী প্রভু সন্ন্যাসব্রত গ্রহণানন্তর দীনহীন কাঙ্গালের বেশে, তারকব্রহ্ম হরিনামের জয়-পতাকা ধারণকরতঃ শান্তিপুরে প্রবেশ করিলে, শান্তিপুরবাসিগণ অনুতাপদগ্ধহৃদয়ে সাশ্রুনয়নে এই নবীন সন্ন্যাসীকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের পূর্ব্ব-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল।

এই স্থলে গোস্বামী প্রভুর ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ ও উপবীতত্যাগজনিত যে দুইটী কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহার স্বদেশবাসী এবং সমগ্র হিন্দুসমাজ তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিলে তাহা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রথমতঃ ব্রাহ্মসমাজে গমনের কথা বলিব। শাস্ত্রে আছে :—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

শ্রীমদ্‌ভাগবত ॥

অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এক অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বকেই তত্ত্ব বলিয়া অভিহিত করেন। এই একই অদ্বয়-তত্ত্ব আবার জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি এই ত্রিবিধ সাধনভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধভাবে সাধকের নিকটে অভিব্যক্ত হন। সাধক ও ভগবানের এই ত্রিবিধ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে সফলকাম হইতে পারেন না। গোস্বামী প্রভুও এই ব্রহ্মভাব লাভ করিবার নিমিত্ত, এবং অদ্বয় নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন যে সগুণ সাকার লীলায় প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মে না, এই তত্ত্বটী শিক্ষা দিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃত পন্থা কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। গোস্বামী প্রভু যখন উক্ত প্রণালীর মধ্যে ভুল দেখিতে পাইলেন, তন্মুহূর্ত্তেই তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন প্রণালী অবলম্বন করিতে কিঞ্চিন্মাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া, গোস্বামী প্রভু কোন অন্যায় কার্য্য করেন নাই। দ্বিতীয়— উপবীতত্যাগের কথা। এই ব্রাহ্মণ্যপ্রধান বঙ্গদেশে শান্তিপুরবাসী গোস্বামিসন্তানের পক্ষে, ব্রাহ্মণের প্রধান চিহ্ন উপবীত-

ত্যাগব্যাপার আপাততঃ অতীব গর্হিত কার্য্য বলিয়া অনুমতি হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই উপবীতত্যাগের মূলে কি মহদ্ভাব লুক্কায়িত ছিল, তাহা অতি অল্প লোকই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ।

ধর্ম্ম দুই প্রকার, অপরাধর্ম্ম ও পরাধর্ম্ম। তন্মধ্যে পরাধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। এই পরাধর্ম্ম লাভ করিবার জন্য অপরাধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পায়া যায়। সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিবার সময় প্রত্যেক সাধককেই বিরজার হোমে শিখা-সূত্র আহুতি প্রদান করিতে হয়, তাহা অধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয় না। তারপর যে ধর্ম্মের জন্য জাতি, কুল, শীল, যশ, মান প্রভৃতি বিসর্জ্জন করা না যায়, সে ধর্ম্মের গৌরব কি? গোপিকাকুল পরাধর্ম্মের জন্য পতিপুত্র পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাদের ধর্ম্মের গৌরবই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। গোস্বামী প্রভুও কোন উচ্চতর ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল হইয়া, নিজের জাত্যভিমান সম্পূর্ণভাবে ত্যাগকরতঃ, সমগ্র মানব-মণ্ডলীকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিবার অভিপ্রায়ে, জাতিচিহ্ন উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; এবং পরবর্ত্তীকালে স্বীয় গুরুদেবের আদেশে কাশীধামে সন্ন্যাসীশিরোমণি হরিহরানন্দ সরস্বতীর নিকটে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণার্থ উপনীত হইলে, তিনি লোকশিক্ষার নিমিত্ত, শিখাসূত্র বর্জ্জন-পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে পুনরায় উপবীত গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখন গোস্বামী প্রভু তাহাতে বিন্দুমাত্রও আপত্তি উত্থাপন করেন নাই।

১৩০০সনের ফাল্গুনীপূর্ণিমাতিথিতে গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসবে যোগদান করিবার জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপ উপস্থিত হইলে, তথাকার ভদ্রলোকেরা তাঁহাকে উপবীত-ত্যাগী ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া উপহাস করতঃ জন্ম-মহোৎসবে নিমন্ত্রণ না করিয়া, এবং অন্যবিধ উপায়ে অবমানিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিল। এমন সময় নবদ্বীপের 'হরিসভা' স্থাপয়িতা

পরমভাগবত ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র প্রবীণ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ৺ মথুরানাথ পদরত্ন মহাশয় এই বিষয় অবগত হইয়া, স্মৃতিশাস্ত্র হইতে কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃতকরতঃ বিরুদ্ধ পক্ষকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের জন্য, স্বকার্য্য উদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত শাস্ত্রের সাধারণ-বিধি-বহির্ভূত কোন কার্য্য করিলে, তাহা তাঁহার পক্ষে ধর্ম্মের বাধক হয় না। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, "এখন ইঁনি যে অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাহা দেবদুর্লভ। ইঁহার প্রত্যেক কার্য্যের সহিত শাস্ত্রের সম্পূর্ণ মিল আছে।" বলা বাহুল্য যে, পদরত্ন মহাশয়ের এই মীমাংসায় অপর পক্ষ আপনাপন ভুল বুঝিতে পারিয়া, গোস্বামী প্রভুর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনাপূর্ব্বক, তাঁহাকে সশিষ্যে মহোৎসবে নিমন্ত্রণকরতঃ যথোচিত মর্য্যাদাসহকারে সেবা করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রতিপন্ন হইল যে, গোস্বামী প্রভুর উপবীতত্যাগ ব্যাপার লইয়া শাস্ত্রের প্রকৃত-মর্ম্ম-গ্রহণে অক্ষম, সাধকজীবনের তীব্রব্যাকুলতা হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ, অজ্ঞ-লোকেরা এতদিন তাঁহার প্রতি যে অশ্রদ্ধা পোষণ করিয়া আসিতেছিল, তাহা নিতান্ত ভিত্তিহীন।

দশম পরিচ্ছেদ।

গোস্বামী প্রভুর গুরুদেব পরমহংসজীর পরিচয়। গুরুতত্ত্বের আলোচনা। পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেম-ভক্তি দান করিবার অধিকারী নির্ণয়। পঞ্চমপুরুষার্থ হৃদয়ে ধারণ ও সম্ভোগ করিবার ক্ষমতাশালী মহাত্মা জগতে দুর্লভ।

হিমালয়ের কোন নিভৃত স্থানে মুক্তিনাথ নামক একটী প্রসিদ্ধ স্থান আছে। ত্রিগুণাতীত সিদ্ধ-মহাত্মাগণ তথায় অবস্থান করেন। মায়াধীন জীবের সেইস্থানে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। এই সকল মহাপুরুষ-গণ একত্র হইয়া আপনাদিগের মধ্য হইতে একজনকে নায়করূপে মনোনীত করেন। তিনি ভগবানের আদেশে, অপর মহাপুরুষগণের সহায়তায় সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম্মের তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন। এই সকল মহাত্মাগণ কখনও সশরীরে, কখনও সূক্ষ্ম শরীরে, কখনও বা কোন বিশুদ্ধাত্মা ভক্তের দেহে আবিষ্ট হইয়া, দেশে দেশে, নগরে নগরে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক, ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিদিগকে ধর্ম্ম-শিক্ষা প্রদান করেন। গোস্বামী প্রভুর গুরুদেব ইঁহাদিগেরই নায়ক ছিলেন। মহাপুরুষদিগের সমাজে ইনি ব্রহ্মানন্দ পরমহংস বলিয়া পরিচিত। মানস-সরোবরের তীরে ইঁহার সাধন স্থান ছিল। ইঁনি পূর্ব্বে নানকপন্থী সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। পরমহংসাবস্থা লাভ করিবার পর, ভগবান্ দয়া করিয়া ইঁহারই উপরে

তৎকালের ধর্ম্মবিতরণের গুরুতর ভার অর্পণ করেন। ইঁনিও পরিশেষে গোস্বামী প্রভুর উপরে সেই দায়িত্বপূর্ণ গুরুভার প্রদান পূর্ব্বক, লোক-চক্ষের অন্তরালে থাকিয়া, দীক্ষা প্রদান কালে গোস্বামী প্রভুকে সাহায্য করিতেন; এবং প্রয়োজন মত কখন সূক্ষ্ম শরীরে, কখনও বা কোন মহাত্মার দেহে আবিষ্ট হইয়া গোস্বামী প্রভুর সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন। এইরূপ কোন সিদ্ধ মহাপুরুষের কৃপা ব্যতীত প্রকৃত ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

এই প্রপঞ্চ জগতের অসংখ্য কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমস্তই এক অচিন্ত্য অব্যক্ত নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। মুহূর্ত্ত কাল এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা পাইত না। বাহ্য জগতের কোনও কার্য্য যেমন নিয়ম ভিন্ন চলে না, সেইরূপ অন্তর্জগতের কার্য্যও নিয়ম ভিন্ন চলে না। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অদ্বিতীয় অধিপতি পরব্রহ্মের দর্শনের পক্ষে সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ এক অব্যর্থ নিয়ম। সমস্ত শাস্ত্রে এই সদ্‌গুরুতত্ত্বকে শ্রেষ্ঠতত্ত্ব এবং মুক্তিতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি অপরাপর তত্ত্বকে ইহারই অন্তর্ভুক্ত বলা হইয়াছে।

গুরুর্দেবো গুরুর্ধর্ম্মো গুরুনিষ্ঠা পরং তপঃ।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরং॥

গুরুগীতা।

গুরুই দেবতা, গুরুই ধর্ম্ম, গুরুনিষ্ঠাই পরম তপস্যা, গুরুদেবের উপরে আর দেবতা নাই, গুরুতত্ত্বের উপরেও আর তত্ত্ব নাই।

ভগবান্ যখন কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তিকে কৃপা করিতে ইচ্ছা করেন,

তখন তাহাকে গুরু ও অন্তর্য্যামীরূপে শিক্ষা প্রদান করেন। প্রমাণ যথা :—

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোহন্তর্ব্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্য চৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।১৭ অধ্যায়।

হে ভগবন্! ব্রহ্মবিদ্গণ আপনা কর্ত্তৃক কৃত-উপকার স্মরণপূর্ব্বক কিছুতেই আনৃণ্য প্রাপ্ত হন না, যেহেতু আপনি বাহিরে গুরুরূপে এবং অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে দেহীদিগের অশুভ বিদূরিত করতঃ স্বীয় গতি প্রদান করেন।

সৎগুরুর কৃপা ব্যতীত কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানেই কাহারও প্রকৃত নিষ্ঠা জন্মে না, এবং এই নিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবৎ প্রাপ্তির কথা দূরে থাকুক, তাহার সংসার-বাসনাই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। প্রমাণ যথা :—

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাৎ গৃহাৎ বা।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ বিনা মহৎপাদ-রজোহভিষেকং॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ৫।২০।১২ শ্লোক।

ভরত, রহূগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে রহূগণ! মহৎ-পাদরেণুর অভিষেক ভিন্ন (অর্থাৎ সদ্গুরুর আশ্রয় ভিন্ন) ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস, এই চতুরাশ্রম ধর্ম্ম দ্বারা, এবং তত্তৎ কর্ম্মের সেই সেই দেবতার উপাসনা, ও জল, অগ্নি, সূর্য্যের উপাসনা দ্বারা কখনই ভগবান্কে লাভ করা যায় না।

তথাহি—

নৈষাংমতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং।
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ৫।১১।১২ শ্লোক।

অর্থাৎ নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের পদরজে অভিষিক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত—সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ না করিলে, ভগবানের পাদপদ্মে মতি জন্মে না; এবং ঐরূপ মতি না জন্মিলেও সংসার-বন্ধন ছিন্ন হয় না।

তাই আশৈশব এত কঠোর সাধনা করিয়াও, সদ্‌গুরু লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত গোস্বামী প্রভুর প্রকৃত অবস্থা প্রস্ফুটিত হয় নাই; এবং সদ্‌গুরু লাভ হইবার পরই, তাঁহার নিকটে অনন্ত রাজ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে তিনি যোগ-সাধন নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"অতঃপর (ব্রাহ্ম-সমাজের প্রণালী অনুযায়ী সাধনে তৃপ্ত না হইয়া) আমি নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। রামাৎ, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, দরবেশ, মুসলমান ফকির এবং বৌদ্ধ যোগী সকলের নিকটেই গেলাম, কিন্তু কোথাও আমার প্রাণের পিপাসা দূর হইল না। অবশেষে ঈশ্বর-কৃপায় গয়াতীর্থে আকাশ-গঙ্গা নামক পর্ব্বতে একজন নানকপন্থী মহাত্মা কৃপা করিয়া আমাকে এই যোগধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সেই অবধি আমার জীবনে এক অপূর্ব্ব অবস্থা খুলিয়া গিয়াছে। অবশ্য আমি দেবতা হইয়া গিয়াছি বলিতে পারি না, কিন্তু এইটুকু না বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় ও অকৃতজ্ঞতা হয় যে আমার অভাব মোচন হইয়াছে, এবং আমি এক অনন্ত রাজ্যের দ্বারে আসিয়াছি, কি যে সম্মুখে দেখিতেছি, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না।"

অদ্বিতীয় পরাৎপর পরব্রহ্ম লাভের পক্ষে যে সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ একান্ত আবশ্যক একথা শিব, শুক, নারদ হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশা, মুষা, শ্রীচৈতন্য, গুরুনানক প্রভৃতি অবতার ও মহাপুরুষগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর তর্ক হইতে পারে না। এখন এই সদ্‌গুরু কে? তাঁহার লক্ষণ কি? কাঁহার নিকটে দীক্ষা-গ্রহণ করিলে জীব মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হয়? "এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে দুইটি ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়—বৈদিক ও তান্ত্রিক। বৈদিক নিয়মে বেদান্তবেত্তা, আশ্রমী অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, এই চারি আশ্রমের কোন আশ্রমে যিনি নিয়মিত আচার প্রতিপালন করেন, এমন বেদজ্ঞ ব্রহ্মবিৎ সদাচারী আশ্রমী ব্রাহ্মণ সদ্‌গুরুপদবাচ্য। বৈদিক গুরুর নিকটে কেবল ব্রাহ্মণ ওঁকার মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারেন, অন্য জাতির অধিকার নাই। দ্বিতীয় তান্ত্রিক; কলিতে যে সকল দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ বৈদিক আশ্রম ও সদাচার প্রতিপালনে অক্ষম, সেই সকল ব্রাহ্মণদিগের জন্য মহাদেব দয়া করিয়া তন্ত্র শাস্ত্রের ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি বর্ণ এবং বর্ণশঙ্কর মনুষ্যেরও অধিকার আছে। তন্ত্রশাস্ত্রের তিনটী সোপান, পশু, বীর ও দিব্য। এই ত্রিবিধ সাধনে কৃতকার্য্য হইয়া যে ব্যক্তি মন্ত্রার্থের সহিত মন্ত্র চৈতন্য করিয়াছেন, তাঁহার মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে। এই সিদ্ধ মন্ত্রের সহিত ওঁকার যুক্ত হইয়া থাকে। সিদ্ধমন্ত্রে যিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তিনিই সদ্‌গুরু। এই সদ্‌গুরু মহাদেবের আজ্ঞানুসারে সর্ব্ব-বর্ণকে ওঁকারযুক্ত মন্ত্র প্রদান করেন। তাহা সাধন করিলে নিতান্ত অশ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিও তিন জন্মে মুক্তিলাভ করেন। ইহা শিববাক্য।" *

এই স্থলে "মুক্তি" শব্দে জীবের চরম লক্ষ্য প্রেম-ভক্তির কথাই সূচিত

* মৌনী অবস্থায় গোস্বামী প্রভুর স্বহস্তলিখিত উপদেশ, শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধৃত।

হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মুক্তি শব্দ, জরামরণাদির কবল হইতে অব্যাহতি, বাসনা কামনা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ—ইত্যাদি বহু অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুক্তি, পরিত্রাণ ও জীবের চরম লক্ষ্য এবং তাহা প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধেও বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি শাস্ত্রকর্ত্তৃগণ আপন আপন শক্তি, সামর্থ্য ও অভিজ্ঞতা অনুসারে স্ব স্ব মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। সাঙ্খ্যদর্শনকার কপিলদেবের মতে প্রকৃতিপুরুষের অবিবেক হেতু জীবের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখ উৎপন্ন হয়, এবং পুনর্ব্বার প্রকৃতিপুরুষ-বিবেক হইলে উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ও তজ্জনিত এক প্রকার আনন্দের উৎপত্তি হয়। এই আনন্দকেই কপিলদেব মোক্ষ বলিয়াছেন।* মহামতি পাতঞ্জল, প্রমাণ, বিপর্য্যয়, সঙ্কল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পঞ্চবিধ চিত্তবৃত্তি নিরোধ দ্বারা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকেই মুক্তি ও মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। †

বৈশেষিক মতের প্রবর্ত্তক মহর্ষি কণাদ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও ভাবনাখ্য সংস্কার, এই নববিধ গুণবৃত্তির নাশরূপ আত্যন্তিকী দুঃখ নিবৃত্তিকেই মুক্তি ও জীবের একমাত্র সাধ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ‡ নৈয়ায়িক মতাবলম্বী মহর্ষি গৌতম, ষড়িন্দ্রিয়, ষড়বিষয়,

---

* প্রকৃতিপুরুষাবিবেকাদস্য ত্রিবিধ দুঃখোৎপাদস্তদ্বিবেকাৎ ত্রিবিধস্য দুঃখস্য প্রধ্বংসস্যাৎ। সএবানন্দপ্রাপ্তিরিত্যপচারিতঃ ইতি কপিলঃ।

শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রণীত সিদ্ধান্ত রত্ন। ১ম পাদ, ৫ সূত্র।

† পঞ্চবিধ চিত্তবৃত্তি নিরোধাদেব ধর্ম্মমেঘশব্দবাচ্যাদসম্প্রজ্ঞাত সমাধেরস্য তাবিতি পাতঞ্জলিঃ। ঐ, ৬ সূত্র।

‡ নবানাং বৈশেষিক গুণানাং প্রাগভাব সহবর্ত্তিধ্বংসো ভবেৎ স এবানন্দাবপ্তিরিতি কণাদঃ। সিদ্ধান্তরত্ন, ৭ সূত্র।

ষড়বুদ্ধি এবং সুখ দুঃখ, এই একবিংশতি প্রকার দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তিকেই মুক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। * জৈমিনি মতে বেদোক্ত শুভকর্ম্মের দ্বারা দুঃখহানি ও সুখলাভই জীবের সাধ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ‡

কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতকার ভগবান্ বেদব্যাস উহার কোনটিকেই প্রকৃত মুক্তি অথবা জীবের চরম লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কেননা, উহাদিগের কল্পিত আত্মগুণবৃত্তিধ্বংসরূপ মুক্তি প্রকৃত মুক্তি নহে, উহা অভাবাত্মক মাত্র। যেমন ভারবাহক পুরুষ ভারাপগমে আপনাকে সুখী বোধ করে, তদ্রূপ। কিন্তু ভারাপগমে দুঃখের নাশ ভিন্ন অন্য কোন স্বতন্ত্র সুখের উৎপত্তি হয় না, এবং যাহাতে পৃথক্ সুখাস্বাদ নাই, তাহা জীবাত্মার চরম লক্ষ্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না।

তারপর প্রাকৃত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, মন, বুদ্ধি এই সপ্তেন্দ্রিয় দ্বারা যে সুখ অথবা দুঃখ উদ্ভূত হয়, উহার নিত্যতা নাই। কারণ, শরীর-নাশের সঙ্গেই উহাদেরও নাশ হয়। সুতরাং ঐ সকল ক্ষণ-বিধ্বংসি পদার্থ হইতে উৎপন্ন সুখ, অবিনশ্বর জীবাত্মার চরম লক্ষ্য ও উপভোগের বিষয় কি প্রকারে হইবে?

ভগবান্ বাদরায়ণির মতে সর্ব্বেশ্বরাখ্য পুরুষোত্তমের স্বরূপের ও গুণের সজ্ঞানপূর্ব্বক পরিজ্ঞান হইলেই, আত্যন্তিকী দুঃখ নিবৃত্তি ও স্বতন্ত্র সুখ-প্রাপ্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহা লাভের একমাত্র উপায় প্রথমতঃ আত্মজ্ঞান লাভ, পরে পরমাত্মজ্ঞান লাভ। আত্মাকে জানিলেই পরমাত্মাকে জানা যায়, এবং পরমাত্মাকে জানিলেই সর্ব্বদুঃখের অবসানে নিত্যানন্দ লাভ

---

* একবিংশতিবিধস্য দুঃখস্য আত্যন্তিকী নিবৃত্তির্ভবেৎ সৈব সুখবাপ্তিরিতি গৌতমঃ। সিদ্ধান্ত রত্ন। ৮ সূত্র।

‡ বেদোক্তৈঃ শুভকর্ম্মভির্দুঃখহানিঃ সুখলাভশ্চেতি জৈমিনিঃ। ঐ।

হইয়া থাকে। যিনি সদ্‌গুরুর নিকটে শাস্ত্র হইতে আত্মতত্ত্ব অবগত হয়েন, তাঁহার দেহ দৈহিক মমতাপাশের হানি এবং তন্নাশে তদুৎপন্ন ক্লেশ সকল সমূলে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অতঃপর জন্ম-মৃত্যুরও অবসান হয়। অনন্তর উত্তরোত্তর শ্রীভগবানের ধ্যানের দ্বারা লিঙ্গ-শরীরের বিনাশ হইলে, চান্দ্রপদ ও ব্রহ্মপদের অপেক্ষায়, তৃতীয় শুদ্ধসত্ত্বময় অপ্রাকৃত ভাগবতপদ-লাভে অভিলাষ পূর্ণ হইয়া থাকে। আত্মতত্ত্বজ্ঞান পরমাত্ম দর্শনের দীপ-স্বরূপ। তদ্দ্বারা পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার সিদ্ধ হইলে, জন্মাদি বিকারশূন্যত্ব, সর্ব্বতত্ত্ব-সম্পন্নত্ব ও বিশুদ্ধত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম বিশিষ্টরূপে হৃদয়ে পরমাত্মার স্ফূর্ত্তি হয়। * বিজ্ঞানানন্দই শ্রীপুরুষোত্তমের স্বরূপ, অর্থাৎ তিনি বিজ্ঞান-স্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। 'রসো বৈ সঃ'। তিনি রসের স্বরূপ। এই রস-স্বরূপে নিমগ্ন হওয়াই অমরাত্মার চরম লক্ষ্য, এবং অহৈতুকী ভক্তিই ইহার সাধন।

জ্ঞানতঃ সুলভো মুক্তিভুক্তির্যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধন-সহস্রৈ র্হরিভক্তি সুদুর্লভঃ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব্ববিভাগ, ১ ১২ শ্লোক।

অর্থাৎ জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) হইতে মুক্তি, ও যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম হইতে ভুক্তি (বাসনাকামনার বিষয়) সহজেই লাভ হইতে পারে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তি বহু সাধন দ্বারাও দুর্লভ।

---

* কিন্তু সর্ব্বেশ্বরাভিধ্যানাত্তু পুরুষোত্তমস্য স্বরূপং তদ্গুণতত্ত্বঞ্চ পরিজ্ঞানং সজ্ঞানপূর্ব্বকং তস্মৈ কল্প্যতে। তথাহি জ্ঞাত্বাদেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যু-প্রহাণিঃ। তস্যাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবলমাপ্তকামঃ। যৎ আত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ। অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্বি[illegible] মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ। ইত্যাদি শ্রবণাৎ। সিদ্ধান্তরত্ন, ১১ সূত্র।

মুক্তির পরে যে অবস্থা, তাহাকে পঞ্চমপুরুষার্থ বলে। বেদ চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদ। পঞ্চমপুরুষার্থের কথা উপনিষদে একটীমাত্র সূত্রে উল্লিখিত আছে। যথা :—

"রসো বৈ সঃ। রসো হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।" *

কিন্তু ইহার সাধনপ্রণালী বেদের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না; তাই দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রকে পাইয়া, তাঁহার নিকটে এই অপার্থিব বস্তুলাভের প্রার্থনা জানাইলে, তিনি তাঁহাদিগকে দ্বাপরযুগের ভাবী অবতারের জন্য অপেক্ষা করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন; এবং তদনুসারে তাঁহারা গোপীরূপে গোকুলে অবতীর্ণ হইয়া, লীলারসময় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রেমভক্তি লাভপূর্ব্বক, তাঁহাকে মধুরভাবে ভজনা করিয়া মানবজীবন সফল করিয়াছিলেন। প্রমাণ যথা :—

পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমিচ্ছন্ সুবিগ্রহং॥
তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।
হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ॥

ভক্তিরসামৃতধৃত—পদ্মপুরাণের শ্লোক।

অর্থাৎ পুরাকালে দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ নয়নাভিরাম রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া, তাঁহাকে মধুরভাবে উপাসনা করিতে প্রার্থনা করেন। তদনুসারে ইঁহারা দ্বাপরযুগে গোকুলে গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন; এবং প্রেম-সেবা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া ভবার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইলেন।

* তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ৭ সূত্র।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের 'কাম' শব্দটী প্রেমের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা ;—

"সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কাম-ক্রীড়া-সাম্যে তারে কহে কাম নাম॥"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থধৃত বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্রোক্ত প্রমাণ যথা :—

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥

অর্থাৎ গোপরমণীদিগের পবিত্র প্রেমই 'কাম' এই আখ্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই নিমিত্ত ভগবৎপ্রিয় উদ্ধবাদি মহাত্মারাও ঐ প্রেম বাঞ্ছা করেন।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী 'লঘুভাগবতামৃত' গ্রন্থে ভক্ত-কবি বিল্বমঙ্গলের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা :—

সন্ত্বাবতারাঃ বহবঃ সর্ব্বতোভদ্রা পঙ্কজনাভস্য।
কৃষ্ণাদন্য কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥

অর্থাৎ পদ্মনাভ ভগবানের সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ বহু বহু অবতার আছেন সত্য, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র ভিন্ন অপর কে লতাদিকেও প্রেমদান করিতে সমর্থ? উপনিষদে আছে :—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং॥

অর্থাৎ এই আত্মাকে (পরমেশ্বরকে) বেদাধ্যয়ন, তীক্ষ্ণ মেধা অথবা তন্ত্র-মন্ত্রের দ্বারা লাভ করা যায় না। তিনি যাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই

কেবল তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। সেই সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিকে তিনি আত্মসাৎ করেন।"

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের 'বৃণুতে' শব্দটী দ্বারা ভক্তিশাস্ত্রোক্ত পুরুষার্থ শিরোমণি মধুর ভাবের কথাই সূচিত হইতেছে। এই ভাবে, বৃত-ব্যক্তি ও বরণকারীর মধ্যে কোন্ প্রকার গোপনীয় বিষয় কিছুই থাকিতে পারে না। এই জন্য মধুরভাবকে ভক্তিশাস্ত্রে দাম্পত্য-প্রণয়ের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে।

বহু যুগযুগান্তরের পরে সেই লীলারসবিগ্রহ শ্রীভগবান্ অপার করুণা-পরবশ হইয়া, গত দ্বাপরের শেষে শ্রীবৃন্দাবনধামে একবার মাত্র তাঁহার সেই ত্রিজগন্মানসাকর্ষী রসলীলা প্রকটন করিয়াছিলেন, তখন কেবলমাত্র গোপীগণই তাহা সম্ভোগ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই দেবদুর্ল্লভ মুনি-জন-বাঞ্ছিত উন্নতোজ্জ্বল রস কলিহত জীবকে দান ও তাহার সাধনপ্রণালী শিক্ষা প্রদান করাই শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য, যুগ-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন ও হরিনাম-প্রচারাদি গৌণ। প্রমাণ যথাঃ—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃপুরটসুন্দরদ্যুতি কদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

বিদগ্ধমাধব।

যে উন্নতোজ্জ্বল রসাস্বাদ হইতে জীব সুদীর্ঘকাল বঞ্চিত ছিল, সেই পরম বস্তু প্রদানার্থ করুণাপরবশ হইয়া কলিতে অবতীর্ণ, দিব্যোজ্জ্বল সুবর্ণকান্তি শ্রীহরি শচীনন্দন তোমাদের হৃদয়-কন্দরে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন।

এই পরম বস্তু পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমভক্তি সম্যক্রূপে উপলব্ধি করিবার

উপযুক্ত লোকই জগতে অতীব দুর্লভ, এবং উহা হৃদয়ে ধারণ ও সম্ভোগ করিবার অধিকারীর সংখ্যার অল্পতার ত কথাই নাই। তাই শ্রীগৌরাঙ্গদেব যখন গয়া হইতে, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সাকাসাৎ এই প্রেম-সম্পদ্ সংগ্রহ করিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার শ্রীঅঙ্গে সেই প্রেম-মহাসাগরের বাহ্য-তরঙ্গস্বরূপ অষ্ট সাত্বিক বিকারাদি দর্শন করিয়া নবদ্বীপবাসীর ভ্রম জন্মিয়াছিল। তাঁহারা ঐ সকল সাত্বিক বিকারকে বায়ুরোগের ক্রিয়া মনে করিয়া, মহাপ্রভুর রোগ উপশমের জন্য ডাবের জল ও শিবাঘৃতের ব্যবস্থা করিয়াছিল। যথা চৈতন্যভাগবতে :—

"খাইবারে দেহ ডাব নারিকেলের জল।
যাবৎ উন্মাদ বায়ু নাহি করে বল॥
কেহ বলে ইথে অল্প ঔষধে কি করে।
শিবা ঘৃত প্রয়োগে সে এ বায়ু নিস্তরে॥"

মধ্যখণ্ড, ২য় অধ্যায়।

নবদ্বীপবাসীর ঈদৃশ ব্যবহারে মহাপ্রভু এতদূর মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন যে, তিনি গঙ্গাগর্ভে আত্মবিসর্জ্জন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। যথা; চৈতন্যভাগবতে শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রতি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উক্তি :—

"কেহ বলে মহাবায়ু, বাঁধিবার তরে।
পণ্ডিত, তোমার চিত্তে কি লয় আমারে॥
হাসি বলে শ্রীবাস পণ্ডিত 'ভাল বাই'।
তোমার যে মত বাই, তাহা আমি পাই॥
মহাভক্তিযোগ দেখি তোমার শরীরে।
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে॥

এতেক শুনিলা যদি শ্রীবাসের মুখে।
শ্রীবাসেরে আলিঙ্গন কৈল বড় সুখে॥
সকলে বলয়ে বায়ু, আশ্বাসিলা তুমি।
ইথে বড় কৃতকৃত্য হইলাও আমি॥
তুমি যদি বায়ু হেন বলিতে আমারে।
প্রবেশিতাম আজি মুই গঙ্গার ভিতরে॥”

অতঃপর শ্রীবাসপণ্ডিত বহু শাস্ত্রপ্রমাণাদি দ্বারা নবদ্বীপবাসীকে বুঝাইয়া দিলেন যে, মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের ঐ সকল বিকার পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেমভক্তির বাহ্য লক্ষণ, উহা বায়ুর ক্রিয়া নহে। তাঁহার যুক্তিযুক্ত বাক্যে নবদ্বীপবাসীর ভ্রম ঘুচিল, এবং তদবধি তাহারা মহাপ্রভুকে ভক্তির চক্ষে দেখিতে লাগিল; এবং তিনিও অতঃপর নিঃসঙ্কোচে স্বীয় শক্তি বিকসিত করিয়া, তাহাদের সহযোগে হরিনামের বন্যায় দেশ প্লাবিত করিতে আরম্ভ করিলেন। নামমদিরায় সমগ্র দেশ মাতিয়া উঠিল। নাম-যজ্ঞ-ভূমি শ্রীবাস-আঙ্গিনা হইতে যে নামতরঙ্গ সমুত্থিত হইয়াছিল, উহার প্রবল প্রবাহ নবদ্বীপ ভাসাইয়া, শান্তিপুর ডুবাইয়া, বঙ্গদেশ সমাচ্ছন্ন করিয়া, বর্ষাকালীন সাগরগামী বেগবতী স্রোতস্বিনীর ন্যায়, যেন নীলাচলচন্দ্রে বিলীন হইবার বাসনায়, উড়িষ্যা অভিমুখে ধাবিত হইল। এই স্রোতের সম্মুখে যে পড়িল সে ডুবিল, যে দেখিল সে মজিল, যাহারা পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহারা হাবুডুবু খাইয়া অবশেষে উহাতেই দেহ ভাসাইয়া দিল, এবং অপর সহস্র সহস্র পাপী তাপী এই স্রোতে অবগাহন করিয়া উদ্ধার পাইয়া গেল।

সপার্ষদ নবদ্বীপচন্দ্র নীলাচলে উদিত হইলেন। তথায় আর এক নব যজ্ঞভূমি প্রতিষ্ঠিত হইল। পার্ষদবৃন্দ মহোল্লাসে অনবরত যজ্ঞাগ্নিতে

হরিনামের আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। ইহার সৌরভে দশদিক আমোদিত হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিক হইতে ভক্তনিচয় অকূল ভবসাগরের কূল পাইবার আশায়, দলে দলে আসিয়া নামমূর্ত্তি ভগবান্ গৌরচন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। উড়িষ্যার প্রবল-প্রতাপান্বিত স্বাধীন রাজা প্রতাপরুদ্র গজপতি, পাত্রমিত্রসহ মহাপ্রভুর শ্রীপদে জন্মের মত বিকাইয়া গেলেন।

মহাপ্রভু এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, অসাধারণ মহত্ব, লোকোত্তর তেজস্বিতা, অপার জীব-বৎসলতা ও সর্ব্বোপরি তাঁহার ভগবত্তা সম্বন্ধেও আর কাহারও সন্দেহ নাই। প্রবল-প্রতিভাশালী বৃহস্পতিতুল্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, জগদ্‌গুরু শঙ্করোপম সন্ন্যাসী শিরোমণি প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিরুদ্ধবাদিগণ মহাপ্রভুর শ্রীপদে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। ধর্ম্মরাজ্যে এখন নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজ করিতেছে।

কিন্তু হায়! কি দুর্দ্দৈব! এ হেন সময়েও আবার জগদানন্দাদি কতিপয় ভক্তের, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেমের বিকারের প্রতি দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইল। শ্রীরাধাভাবে-ভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গ যখন প্রেমের সাধন ও তাহার ক্রমাদি, আপনি আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য কৃষ্ণ-বিরহজনিত দশ দশা * প্রকটন করিয়াছিলেন, তখন রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদরপ্রমুখ কতিপয় অন্তরঙ্গ ভক্ত ব্যতীত অধিকাংশ ভক্তেরা উহাকে কঠিন বায়ুরোগের ক্রিয়াবিশেষ বলিয়াই সন্দেহ করিয়াছিলেন। এই বায়ুরোগ উপশম করিবার অভিপ্রায়ে, প্রিয়-ভক্ত জগদানন্দ গৌড়দেশ

---

* দশ দশার কথা ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর পশ্চিম বিভাগে, ৩য় লহরীতে উক্ত হইয়াছে; উহা যথাক্রমে এই—কৃশতা, জাগরণ, আলম্বশূন্যতা, অধৃতি, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃতি।

হইতে বহু ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক ঔষধমিশ্রিত তৈল আনিয়া মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দকে দিলে, তিনি উহা মহাপ্রভুর নিকটে উপস্থিত করিয়া বলিলেন—

"তার ইচ্ছা প্রভু অল্প মস্তকে লাগায়।
পিত্ত বায়ু প্রকোপ শান্ত হইয়া যায়॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ১২ পরিচ্ছেদ।

কিন্তু মহাপ্রভু উহা নিতান্ত অবজ্ঞার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি মনের প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া বলিলেন—

"প্রভু কহে, সন্ন্যাসীর নাহি তৈলে অধিকার।
তাতে সুগন্ধি তৈল পরম ধিকার॥"

ঐ, অন্ত্যলীলা, ১২ পরিচ্ছেদ।

ভক্তপ্রবর জগদানন্দ, এই তৈল গৌড়দেশ হইতে আনিয়াছিলেন। যাহারা ইহা সংগ্রহ অথবা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, উহা আনিবার সময় যাঁহাদের সহিত তৈলের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল, এবং যাঁহারা উহা মহাপ্রভুর নিকটে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই অল্পাধিক পরিমাণে মহাপ্রভুর দশম দশার অবস্থার প্রতি যে সন্দেহ হইয়াছিল, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কেননা, তাহাদের সন্দেহ না হইলে, তাঁহারাই জগদানন্দকে বাতুল বলিয়া উপহাস করিয়া, মহাপ্রভুর বায়ুর প্রকোপ নিবারণ করিবার জন্য তৈলদানের কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিতেন। সে যাহা হউক, ইহার কিয়দ্দিন পরে কোন কার্য্যোপলক্ষে জগদানন্দ পুনরায় গৌড়দেশ হইতে শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তনকালে, শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-গৃহে উপনীত হইলে, তিনি

একটী তরজা লিখিয়া মহাপ্রভুকে দিবার জন্ত জগদানন্দের হস্তে অর্পণ করিলেন। তরজা যথা :—

"বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ১৯ পরিচ্ছেদ।

অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ মহাপ্রভুকে কহিও, যে সমস্ত লোক বাউল অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাকে আরও কহিও, যে হাটে আর চাউল বিকাইতেছে না, অর্থাৎ তাঁহার ভাব কেহ গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। 'বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল,' অর্থাৎ তাঁহাকে বলিও যে আর প্রেম প্রচারে কাজ নাই, এখন লীলা সংবরণ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিকটে ভক্তবৃন্দ এই তরজার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন :—

"প্রভু কহে, আচার্য্য তন্ত্রের বিধি বিধানে কুশল॥
উপাসনা লাগি দেবে করে আবাহন।
পূজা নির্ব্বাহণ হইলে পাছে করে বিসর্জ্জন॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, কত কঠোর তপস্যা, কত অসাধ্য সাধনা করিয়া যে মহাপ্রভুকে অবতীর্ণ করাইলেন, সেই প্রাণের প্রাণকে হাতে পাইয়াও আজ তিনি কি কারণে এত অল্পদিনের মধ্যেই বিদায় দিতে উন্মত্ত হইয়াছেন, তাহা তৎপ্রেরিত তরজা হইতেই উপলব্ধি হইবে। বস্তুতঃই শ্রীমহাপ্রভু

অদ্বৈতপ্রভুর তরজা প্রেরণের অল্পকাল পরেই আত্ম-সঙ্গোপন করিয়াছিলেন।

তাই বলিতেছিলাম যে, পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমসম্পদ্ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি ও সম্ভোগ করিবার পাত্র জগতে অতীব দুর্লভ। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লক্ষ লক্ষ ভক্তের মধ্যে মাত্র ৩।০ জন (রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, শিখি মাইতি ও তাঁহার ভগিনী) এই শক্তি ধারণ ও সম্ভোগ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া, অন্তরঙ্গ ভক্তের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

"অন্তরঙ্গ সহিত করেন কৃষ্ণ রসাস্বাদন।
বহিরঙ্গ সহিত করেন নাম সঙ্কীর্ত্তন॥"

এই পরম বস্তুর কিঞ্চিৎ আস্বাদ মহাপ্রভুর অপরাপর কতিপয় বিশিষ্ট ভক্ত সাময়িকভাবে প্রাপ্ত হইতেন সন্দেহ নাই; কিন্তু অধিকাংশ ভক্তই নামানন্দে মগ্ন থাকিতেন। ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা নামানন্দের অধিক মাধুরী এবং নামানন্দ অপেক্ষা প্রেমানন্দের মাধুরী ততোধিক। এই প্রেম গাঢ় হইলে মান, প্রণয় ইত্যাদি রূপে আস্বাদনীয় হয়। তখন উহাকেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা বলে। মধুর ভাবেই প্রেম বস্তু প্রকৃতরূপে আস্বাদনীয় হয়। এই মধুরভাব প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মানবজীবনের চরিতার্থতা লাভ হয় না।

"প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড়খণ্ড সার।
শর্করাসিতা মিছরি শুদ্ধ মিছরি আর॥

ইহা যৈছে ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল বাড়ে স্বাদ।
রতিপ্রেমাদি তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ॥

* * *

রূঢ় অধিরূঢ় কেবল মধুরে।
মহিষীগণে রূঢ় অধিরূঢ় গোপিকানিকরে॥" ইত্যাদি।
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২৩ পরিচ্ছেদ।

জীব ভগবৎ প্রসাদে ও গুরুকৃপায় মুক্ত হইলে, শান্ত অবস্থা লাভ করেন। ইহার পর তাঁহার পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমভক্তি সম্ভোগ করিবার অধিকার জন্মে। এই সময় যদি বহু সৌভাগ্যে সদ্‌গুরু লাভ হয়, তবে তাঁহার কৃপায় সেই ভাগ্যবান্ পুরুষ ক্রম অনুসারে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি অবস্থা সম্ভোগপূর্ব্বক, পরিশেষে মধুরভাবে প্রবেশকরতঃ পরাপ্রেম লাভ করিয়া, মানবজীবন সফল করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী নিম্নলিখিতভাবে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চরসের ব্যাখ্যা ও ক্রম নির্ণয় করিয়াছেন। যথা:—

"শান্তের স্বভাব, কৃষ্ণে মমতা গন্ধহীন।
পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ॥
কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্তরসে।
পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুর জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে॥
শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সখ্যে দুই হয়।
দাস্যের সম্ভ্রম গৌরব সেবা সখ্যে বিশ্বাসময়॥
বাৎসল্যে শান্তের গুণ দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইহা নাম পালন॥

মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক্য হয়॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চগুণ॥
আকাশাদি গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
এই মত মধুর রসে সব ভাব সমাহার।
অতএবাস্বাধিক্যে করে চমৎকার॥

* * * * *

যাঁর চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম করয়ে উদয়।
তাঁর বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়॥”

বস্তুতঃ মহাপ্রভুর শেষজীবনে যে সকল অত্যদ্ভুত, অশ্রুতপূর্ব্ব, অদৃষ্টচর ভাবসমূহ প্রকটন করিতেন, সূক্ষ্মদর্শী ভক্তিশাস্ত্রবিৎ সাধনশীল ব্যক্তি ভিন্ন, অপর সাধারণের তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবারই ক্ষমতা ছিল না। তাহারা ঐ সকলকে বায়ুর ক্রিয়া মনে করিবে, আশ্চর্য্যের বিষয় কি ? মহাপ্রভুর প্রকটাবস্থায় শ্রীবাস পণ্ডিত, রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণের, এবং তাঁহার অপ্রকটের পর শ্রীরূপ সনাতন, শ্রীজীব-গোস্বামী শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ ভক্তিবিশারদদিগের, মহাপ্রভুর ভাব, শিক্ষা, ধর্ম্ম ও সাধনপ্রণালী অপর সাধারণকে বুঝাইবার ও বিশ্বাস করাইবার জন্য বিস্তর বেগ পাইতে হইয়াছিল ; এবং এতদুদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে ঐ সকলের শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া, বহুতর গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হইয়াছিল। তাই শ্রীল নরোত্তম, শ্রীনিবাস প্রভৃতি যখন শ্রীগৌরাঙ্গের অদর্শনে উন্মত্ত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন, তখন

পূর্ব্বোক্ত স্বামিপাদদিগের কৃত গ্রন্থাদিদৃষ্টে ও তাঁহাদিগের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া, মহাপ্রভুর ভগবত্তা ও তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম অতি অল্পায়াসেই তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়া শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও যে ভক্ত-বৈষ্ণবগণ এত সহজে মহাপ্রভুর তত্ত্ব, ধর্ম্ম ও সাধনপ্রণালী হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইতেছেন, তাহার কারণ পূর্ব্বোক্ত স্বামিপাদগণের বহু শাস্ত্র-প্রমাণাদি-সম্বলিত গ্রন্থরাজীর বর্ত্তমানতা। ঐ সকল গ্রন্থ না থাকিলে, বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত-সমাজও প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত একমত হইয়া মহাপ্রভুর সম্বন্ধে বলিতেন—

"শুনিয়াছি গৌড়দেশে সন্ন্যাসী ভাবক।
কেশব ভারতী শিষ্য, লোক প্রতারক॥
চৈতন্য নাম তার, ভাবকগণ লঞা।
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাইয়া॥
সন্ন্যাসী নামমাত্র, মহা ইন্দ্রজালী।
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালী॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্ষদগণের তিরোধানের পর শ্রীল নরোত্তম, শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের প্রতি গৌড়দেশে মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মপ্রচারের ভার অর্পিত হইলে, তাঁহাদের দ্বারা উক্ত ব্রত অতি সুচারুরূপে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহাদের অন্তর্ধানের পর, উপযুক্ত আচার্য্যের অভাবে নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত লোকের হাতে পড়িয়া, মহাপ্রভুর সুনির্ম্মল সার্ব্ব-ভৌমিক বৈষ্ণবধর্ম্ম দিন দিন কলঙ্কিত হইতে লাগিল, এবং এই সুযোগে অসংখ্য চতুর শাস্ত্রব্যবসায়ী, অগণ্য ইন্দ্রিয়পরায়ণ স্বার্থান্ধ ব্যক্তি, ধর্ম্মের নামে নানাপ্রকার অধর্ম্মের স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, কিশোরিসাধক প্রভৃতি শাস্ত্র ও সদাচারভ্রষ্ট মূর্খদিগের অসংখ্য দলে দেশ ছাইয়া ফেলিল। ধর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। এমন সময় ভগবদ্বিধানে, কলিপাবনাবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পদরজধূসরিত পুণ্যভূমি বঙ্গদেশে, সর্ব্বশুভঙ্কর ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইল; এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্ মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত লুপ্তপ্রায় সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ সার্ব্বভৌম-ধর্ম্মের উদ্ধার-কল্পে, তাঁহার 'অনর্পিতচরীং উন্নতোজ্জ্বল রস' প্রাক্তনকর্ম্মশীল সাধকবৃন্দকে প্রদান করিবার জন্য, ভাবী সদ্‌গুরু শ্রীমদ্‌বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু শান্তিপুরে শ্রীমদদ্বৈতবংশে আবির্ভূত হইলেন। তিনি কালক্রমে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া, সর্ব্বদেবময় স্বীয় গুরুদেবের আদেশে, সেই পরম বস্তু ধারণ ও সম্ভোগ করিবার উপযুক্ত শক্তি সঞ্চারপূর্ব্বক, সৎপাত্র বুঝিয়া সাধন প্রদান, ও আনুষঙ্গে পরম দয়াল শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রত্যাদেশক্রমে কলিহত জীবের ঘরে ঘরে তারকব্রহ্ম নাম বিতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পূর্ব্বোক্ত সাধন ও তাহার অধিকার নির্ণয়মূলক কথাপ্রসঙ্গে গোস্বামী প্রভু একদিন বলিয়াছিলেন, যথা :—"এই সাধনে বিশেষ অধিকার চাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে যে, ৮৪ লক্ষ যোনী ভ্রমণ করিয়া জীব মনুষ্য-জন্ম লাভকরতঃ প্রথমে সাতজন্ম ভূতপ্রেতাদি অপদেবতার উপাসনা করে। তৎপরে সূর্য্য-উপাসনা তিন জন্ম, গণেশ উপাসনা তিন জন্ম; পরে শক্তি-উপাসনা একশত জন্ম করিয়া, তিন জন্ম শিব উপাসনা করিলে এই অধিকার লাভ হয়। * তাই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

* ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে ৩৬ অধ্যায়ে নারায়ণ-নারদ সংবাদে ৯৫—১১২ শ্লোক।

অনেক জন্ম পর্য্যন্তং দীক্ষাহীনো ভ্রমেন্নরঃ।
তদ্ভদেবমন্ত্রঞ্চ লভতে পুণ্যশেষতঃ।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

সপ্তজন্মোপসেবানাং কৃত্বা সেবাং স্বকর্ম্মতঃ।
লভতে চ রবের্মন্ত্রং সাক্ষিণঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং॥
জন্মত্রয়ং ভাস্করঞ্চ নিষেব্য মানবঃ শুচিঃ।
লভেৎ গণেশমন্ত্রঞ্চ সর্ব্ববিঘ্নহরং পরং॥
জন্মত্রয়ং তং নিষেব্য নির্ব্বিঘ্নশ্চ ভবেন্নরঃ।
বিঘ্নেশস্য প্রসাদেন দিব্যজ্ঞানং লভেন্নরঃ।
তদা জ্ঞানপ্রদীপেন সমালোচ্য মহামতিঃ।
অজ্ঞানান্ধতমং ছিত্বা মহামায়াং ভজেন্নরঃ॥
বিষ্ণুমায়াঞ্চ প্রকৃতিং দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীং।
নানারূপাং তাং নিষেব্য জন্মনাং শতকং নরঃ॥
তৎপ্রসাদাৎ ভবেজ্জ্ঞানী জ্ঞানানন্দং সদা ভজেৎ।
কৃষ্ণজ্ঞানাধিদেবঞ্চ মহাজ্ঞানং সনাতনং।
শিবং শিবস্বরূপঞ্চ শিবদং শিবকারণং।
জন্মত্রয়ং সমারাধ্য চাশুতোষপ্রসাদতঃ।
ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং সর্ব্বং মিথ্যেব পশ্যতি।
দয়ানিধেঃ প্রসাদেন শঙ্করস্য মহাত্মনঃ।
বরদস্য বরেণৈব হরিভক্তিং লভেৎ ধ্রুবং॥
তদা নির্ব্বৃতিমাপ্নোতি সারাৎসারাং পরাৎপরাং।
যত্র দেহে লভেন্মন্ত্রং তদ্দেহাবধি ভারতে॥
তৎপাঞ্চভৌতিকং ত্যক্ত্বা বিভর্ত্তি দিব্যরূপকং।
করোতি দাস্যং গোলোকে বৈকুণ্ঠে বা হরেঃ পদং॥
মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ॥
তৎস্পর্শপূতত্তীর্থৈশ্চ সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা॥

"এই সাধন প্রথম নারায়ণ ব্রহ্মাকে, তৎপরে ব্রহ্মা নারদকে দেন। এই প্রকার গুরুপ্রণালীতে চলিয়া আসিতেছে। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর এই শক্তি। মহাপ্রভু মাত্র সাড়েতিন জনকে এই শক্তি দিয়াছিলেন। যাঁহারা এই সাধন পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মহাপ্রভুর সময়ের লোক। তখন সকলেই এই শক্তির প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে দেন নাই; তাহার কারণ এই যে, এই শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হইলে সংসারের লোক প্রায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। তাঁহাদের দ্বারা বিশেষ কোন গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হয় না। কিন্তু মহাপ্রভুর তখন সাধারণ ধর্ম্মপ্রচার, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, ভক্তিশাস্ত্র প্রচার প্রভৃতি গুরুতর কার্য্য ছিল। সেই সময় তাঁহাদের দ্বারা ঐ সকল কার্য্য করাইয়াছেন। এইবার তিনি তাঁহাদিগকে সেই শক্তি দিলেন। যাঁহারা সাধন লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে অন্য ধর্ম্মোপাসকদিগের কোন বিরোধ নাই।" *

এই সাধন কি বস্তু তাহা প্রকৃতরূপে বুঝাইয়া বলিবার সাধ্য নাই। ইহা সম্পূর্ণ অনুভবসাপেক্ষ। সদ্গুরুর কৃপায় ভগবৎপ্রসাদে যাঁহার অন্তরে এই সাধন খুলিয়া যায়, কেবলমাত্র তিনিই বুঝিতে পারেন ইহা কি বস্তু; নতুবা অপর সাধারণের পক্ষে ইহার বাহিরের প্রক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। তবে প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষদিগের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা যোগবলে, যাঁহাদের মধ্যে এই শক্তি ক্রিয়া করে, তাহা জানিতে পারেন, কিন্তু সদ্গুরুর কৃপা ভিন্ন ঐ শক্তি লাভ করিবার অধিকার আদৌ জন্মে না।

১৩০০ সনের প্রয়াগধামের কুম্ভমেলায় যোগসিদ্ধ মহাত্মা অর্জ্জুনদাস বা

---

* বনগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত হরলাল রায় মহাশয়-সংগৃহীত গোস্বামী প্রভুর উপদেশাবলী হইতে উদ্ধৃত।

ক্ষেপাচাঁদ, গোস্বামী প্রভুর নিকটে এই শক্তির প্রার্থী হইয়াছিলেন। কৈলাসপর্ব্বতবাসী ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন মহাত্মা ময়ূর-মুকট বাবাজী, মহাশয় এই বস্তুপ্রাপ্তির আশায়, কৈলাসনাথের আদেশে যোগৈশ্বর্য্য পায়ে ঠেলিয়া, কৈলাস পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনে আগমনকরতঃ গোস্বামী প্রভুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। গোস্বামী প্রভুর মধ্যে এই পরম বস্তুর প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া শ্রীবৃন্দাবনবাসী পরমভক্ত সিদ্ধ ৺গৌরশিরোমণি মহাশয়, প্রভুপাদকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"প্রভু! তুমি এ জিনিষ পেলে কোথায়? আমি সমগ্র গৌড়মণ্ডল ও ব্রজভূমি অনুসন্ধান করিয়াও ইহা কুত্রাপি প্রাপ্ত হই নাই। কচিৎ কোন স্থানে দুই একজনের নিকটে ইহার ছিটা ফোঁটা অবশিষ্ট আছে, তাহা আবার তাঁহারা কাহাকেও দান করেন না। অতএব প্রভু! তুমি আমাকে উহা প্রদান কর। আমাকে আর প্রতারণা করিও না। এই বিশেষ শক্তি ভিন্ন শ্রীবৃন্দাবনের মধুর-লীলা সম্ভোগ করিবার অধিকার জন্মে না।" বারদীর যোগসিদ্ধ লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয় এক সময় গোস্বামী প্রভুকে বলিয়াছিলেন—গোঁসাই, তুমি এ কি করিতেছ? ঋষিমুনিদিগের কলিজার (হৃদয়ের) ধন তুমি যাকে তাকে দান করিতেছ!" উত্তরে গোস্বামী প্রভু বলিলেন—"কি করিব? যাঁর শক্তি তাঁরই আদেশে দান করিতেছি, আমি নিমিত্ত মাত্র।"

পূর্ব্বকথিত পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেম-ভক্তি যিনি প্রদান করিবার শক্তি ধারণ করেন, তাঁহাকে ব্রহ্মগুরু অথবা গুরুব্রহ্ম বলে। ভগবানের অবতার-গ্রহণসম্বন্ধে যে নিয়ম, অর্থাৎ এক সময় এক ভিন্ন অনেক অবতার হন না, ব্রহ্মগুরুও তদ্রূপ এক সময় একজন ভিন্ন দুইজন আবির্ভূত হন না। "সিদ্ধ বা মহাপুরুষ হইলেই ব্রহ্মগুরু হয় না। তাঁহারা জীবকোটী, ভগবানের আবেশ। তাঁহাদের দেহ দেহী ভিন্ন। আর ব্রহ্মগুরু ব্রহ্মকোটী, স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার দেহ ও তিনি এক।"

এই ব্রহ্মগুরু অথবা সদ্‌গুরুর অসাধারণ মাহাত্ম্যসম্বন্ধে শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসে উক্ত হইয়াছে। যথা :—

"দুর্লভে সদ্‌গুরুণাঞ্চ সকৃৎসঙ্গ উপস্থিতে।
তদনুজ্ঞা যদা লব্ধা স দীক্ষাবসরো মহান্‌॥
গ্রামে বা যদি বাহরণ্যে ক্ষেত্রে বা দিবসে নিশি।
আগচ্ছতি গুরুর্দৈবাৎ যদা দীক্ষা তদাজ্ঞয়া।
যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ।
ন তীর্থং ন ব্রতং হোমো ন স্নানং ন জপক্রিয়া।
দীক্ষায়াঃ কারণং কিন্তু স্বেচ্ছা প্রাপ্তেতু সদ্‌গুরৌ॥"

দ্বিতীয় বিলাস, ১৫—১৬ শ্লোক।

অর্থাৎ সদ্‌গুরুর সঙ্গ অতিশয় দুর্লভ। একবার তাঁহার সঙ্গ উপস্থিত হইলে, তিনি যখন আজ্ঞা প্রদান করিবেন, তাহাই দীক্ষার প্রশস্তকাল জানিবে। গ্রামে, বনে, কিম্বা ক্ষেত্রে, দিবসে কিম্বা রজনীতে, যখনই দৈব-বশে গুরুদেব আগমনপূর্ব্বক আজ্ঞা প্রদান করিবেন, তখনই দীক্ষাগ্রহণ করিতে পারিবে। সদ্‌গুরুর ইচ্ছা হইলে তীর্থ, ব্রত, স্নান, হোম, জপক্রিয়া প্রভৃতি আর দীক্ষার কারণ হইবে না, অর্থাৎ সদ্‌গুরুর ইচ্ছাই দীক্ষার কারণ।

সদ্‌গুরুরমাহাত্ম্যসম্বন্ধে মহানির্ব্বাণতন্ত্রে শ্রীসদাশিবের উক্তি, যথা :—

বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ সদ্‌গুরুর্যদি লভ্যতে।
তদা তদ্বক্ত্রতো লব্ধা জন্মসাফল্যমাপ্নুয়াৎ॥
চতুর্ব্বর্গং করে কৃত্বা পরত্রেহ চ মোদতে।
স ধন্যঃ স কৃতার্থশ্চ স কৃতী স চ ধার্ম্মিকঃ॥

স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিষ্ণাতঃ সর্ব্বলোক প্রতিষ্ঠিতঃ।
যস্য কর্ণপথোপাস্ত প্রাপ্তো মন্ত্রমহামণিঃ ॥
ধন্যা মাতা পিতা তস্য পবিত্রং তৎকুলং শিবে।
পিতরস্তস্য সন্তুষ্টা মোদন্তে ত্রিদশৈঃ সহ।
গায়ন্তি গায়নীং গাথাং পুলকাঙ্কিতবিগ্রহাঃ ॥
অস্মৎকুলে কুলশ্রেষ্ঠো জাতো ব্রহ্মোপদেশিকঃ।
কিমস্মাকং গয়াপিণ্ডৈঃ কিং তীর্থৈঃ শ্রাদ্ধতর্পণৈঃ ॥
দানৈঃ কিং জপৈ র্হোমৈঃ কিমন্যৈর্বহুসাধনৈঃ।
বয়ং অক্ষয় তৃপ্তাঃ স্মঃ মৎপুত্রস্যাস্যসাধনাৎ ॥

তৃতীয় উল্লাস, ১৫-২১ শ্লোক।

অর্থাৎ বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে যদি জীব সদ্‌গুরু লাভ করেন, তবে তাঁহার মুখ হইতে নির্গত এই মন্ত্র লাভ করিলে, তৎক্ষণাৎ জন্ম সফল হয়। সেই ভাগ্যবান্ পুরুষ ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ হস্তগত করিয়া, ইহলোকে এবং পরলোকে আনন্দ ভোগ করিতে থাকেন। সদ্‌গুরুর মুখ হইতে ব্রহ্মমন্ত্র মহামণি যাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছে, তিনিই ধন্য, তিনিই কৃতার্থ, তিনিই কৃতী, তিনিই ধার্ম্মিক, তিনিই সর্ব্বতীর্থস্নাত। সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তি সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত, তিনিই সর্ব্বশাস্ত্রে নিপুণ এবং তিনিই সর্ব্বলোকে প্রতিষ্ঠিত। হে শিবে! যিনি সদ্‌গুরু হইতে ব্রহ্মমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার মাতা ধন্য, পিতা ধন্য, তাঁহার কুল পবিত্র। তাঁহার পরলোকগত পিতৃপুরুষগণ সন্তুষ্ট হইয়া, দেবগণের সহিত আনন্দ অনুভব করেন এবং তাঁহারা পুলকিতশরীরে এই গাথা গান করেন—"আমাদের কুলে উৎপন্ন পুত্র সদ্‌গুরুর নিকটে দীক্ষিত হইয়া কুল পবিত্র করিয়াছেন,

আমাদের নিমিত্ত গয়াতে পিণ্ডদানে আর আবশ্যক কি? তীর্থ-শ্রাদ্ধ ও তর্পণেই বা আবশ্যক কি? হোমেই বা প্রয়োজন কি? অন্য বহুবিধ সাধনেই বা প্রয়োজন কি? আমাদের এই কুলপাবন পুত্র সদ্গুরুর নিকটে দীক্ষাগ্রহণরূপ যে সাধন করিল, তাহাতেই আমরা অক্ষয় তৃপ্তিলাভ করিলাম।”

সদ্গুরু-মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে গুরু-গীতায় উল্লিখিত হইয়াছে, যথা;—

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকঃ।
দুর্লভোঽয়ং গুরু দেবি শিষ্য সন্তাপহারকঃ॥

শ্রীসদাশিব কহিলেন,—হে দেবি! বিশ্বধামে শিষ্যের বিত্তাপহারী গুরুর সংখ্যা নাই, কিন্তু শিষ্যের সন্তাপ দূর করিতে পারেন, ঈদৃশ গুরু অতীব দুর্ল্লভ।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যং।
একং নিত্যং বিমলমমলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি॥

যিনি পরব্রহ্মস্বরূপ, আনন্দময়, পরমসুখপ্রদাতা, জ্ঞানমূর্ত্তি, সুখদুঃখ, পাপপুণ্য ইত্যাদি দ্বন্দ্বের অতীত, আকাশবৎ নির্ম্মল, যিনি “তত্ত্বমসি” এই বেদবাক্যের প্রতিপাদ্য দেবতা, অদ্বিতীয়, নিত্য, বিমল, অমল, চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষীস্বরূপ, ভাবাতীত ও ত্রিগুণাতীত, সেই সদ্গুরুকে নমস্কার করি।

এখন এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, আমরা সচরাচর যে সকল সাধু মহাত্মা ও কুলগুরু মহাশয়দিগের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা দ্বারা কি কোন কার্য্য হয় না? এমন কথা কখনই হইতে পারে

না। এই সকল মহাত্মারা ব্রহ্মগুরুরূপী ভগবানের কার্য্যেরই সহায়তা করিয়া থাকেন। যেমন কোন বিদ্যালয়ের অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর শিক্ষকগণ, তাঁহাদের অধীনস্থ ছাত্রগণকে তত্তৎ শ্রেণীর উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিয়া, তদপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীর শিক্ষকগণের হস্তে অর্পণ করেন, এইরূপে ক্রমে উক্ত বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, প্রধান শিক্ষক যেমন তাহাদিগকে তদপেক্ষাও উচ্চ শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য কোন উচ্চতর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন, তদ্রূপ এই সকল গুরুরূপী নারায়ণগণও আপন আপন সামর্থ্যানুসারে শিষ্যগণকে তাহাদের উপযোগী শিক্ষা দীক্ষা প্রদান করিয়া, অবশেষে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতির বিশ্বপ্রেমরাজ্যে প্রবেশ করাইবার জন্য, সদ্‌গুরুরূপী বিশ্বেশ্বরের হস্তে সমর্পণ করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জগতের সমস্ত সাধু মহাপুরুষগণই ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশের পথপ্রদর্শক। ইঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া কেহই ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না।

তন্ত্রোক্ত সাধন-প্রণালী অনুষ্ঠিত হইলে, উহাতে কি প্রকার আশু ফলপ্রদান করে।". এই বলিয়া গোস্বামী প্রভুকে সঙ্গে লইয়া "বরাবর" পাহাড়ে উপনীত হইলেন। রাত্রি তখন অধিক হইয়াছে। তথায় উপনীত হইয়াই দেখিলেন, আশ্রমের দ্বারে উন্মুক্ততরবারিহস্তে একজন প্রহরী নিযুক্ত রহিয়াছেন। পরমহংসজীর সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্বেই পরিচয় ছিল। তিনি দ্বার ছাড়িয়া দিলে, গোস্বামী প্রভু গুরুদেবের সহিত ভিতরের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, দশ পনেরজন সাধক যোগাসনে উপবিষ্ট আছেন। তন্মধ্যে একটী স্ত্রীলোকও ছিলেন। কিয়ৎকাল পরে চক্রের ক্রিয়া আরম্ভ হইল। চক্রেশ্বর কিছু জল মন্ত্রপূত করিয়া উপস্থিত সকলের গাত্রে নিক্ষেপ করিবামাত্রই সকলের মনে বালকের ভাব উপস্থিত হইল, এবং তাঁহারা সকলেই উক্ত স্ত্রীলোকটীকে মাতৃভাবে দর্শন করিতে লাগিলেন। গোস্বামী প্রভুর ভিতরে বালকভাব এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, তিনি "মা! মা!" বলিতে বলিতে হামাগুড়ি দিয়া তাঁহার স্তন্য পান করিয়াছিলেন। তখন স্ত্রীলোকটী গোস্বামী প্রভুর পীঠ চাপড়াইয়া বলিলেন— "আজ অবধি তুমি জিতেন্দ্রিয় হইলে।" অতঃপর স্ত্রীলোকটী ছিন্নমস্তা-সাধনের প্রক্রিয়া দেখাইলেন। তিনি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা নিজের মস্তক ছেদন করিয়া, বামকরে ধারণ করিলেন এবং সেই ছিন্নমস্তক মুখব্যাদান করিয়া, গলদেশনির্গত রক্ত পান করিতে লাগিলেন। এমন সময় স্বয়ং চক্রেশ্বর মহাদেব তথায় প্রকাশিত হইলেন। তখন পূর্ব্বোক্ত সাধকদিগের মধ্যে কেহ স্তবপাঠ, কেহ বা পত্রপুষ্পাদি দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। এইভাবে কিয়ৎকাল অতীত হইলে পর, ছিন্নমস্তক যথাস্থানে অর্পিত হইবামাত্র দেহের সঙ্গে যুক্ত হইয়া গেল। সকলে 'জয় জয়' ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। ইত্যবসরে দেবাদিদেব মহাদেব, উপস্থিত সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তর্ধান করিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার

দর্শন করিয়া গোস্বামী প্রভু শাস্ত্রোক্ত তান্ত্রিক ক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইলেন।

অতঃপর গোস্বামী প্রভু গয়া হইতে কলিকাতায় আগমনকরতঃ পরিবারবর্গের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সংসার ত্যাগ করিবেন বলিয়া আত্মীয়গণের যে আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহা দূরীভূত হইল। এই সময় এক দিবস তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ম তদীয় চুঁচুড়াস্থ বাসভবনে গমন করিয়াছিলেন। মহর্ষি, গোস্বামী প্রভুকে দর্শন করিয়াই বলিলেন—"তোমাকে যে নূতন মানুষ দেখিতেছি। তুমি নিশ্চয় কিছু নূতন বস্তু লাভ করিয়াছ। এই দেবদুর্ল্লভ বস্তু কি প্রকারে কোথায় লাভ করিলে?" তদুত্তরে গোস্বামী প্রভু, গয়া আকাশগঙ্গা পাহাড়ে মানসসরোবরবাসী পরমহংসজীর নিকটে তাঁহার দীক্ষাপ্রাপ্তির বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া মহর্ষি পুনরায় বলিলেন—"যে অমূল্য বস্তু লাভ করিয়াছ ইহা দ্বারা তুমি ধন্য হইয়া যাইবে, উদ্ধার হইয়া যাইবে। এই দেবদুর্ল্লভ বস্তু কদাচ পরিত্যাগ করিও না। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে তোমার স্থান হইবে না, তুমি তথায় তিষ্ঠিতে পারিবে না। ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিতে হয় করিবে, তথাপি এ বস্তু কখনও ছাড়িও না।" অনন্তর মহর্ষির সঙ্গে ধর্ম্মবিষয়ের অনেক কথোপকথন হইবার পর, গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই সময় শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বহুমূত্ররোগে কাতর হইয়া কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন। গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার বাসভবনে উপস্থিত হইলে, উভয়ের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা গোস্বামী প্রভুর স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:—"কেশববাবুর মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিতে

গিয়াছিলাম। দেখিলাম যে, শরীর মৃতদেহের ন্যায় প্রভাহীন হইয়াছে। তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করাতে তিনি বলিলেন—'গোঁসাই, যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা হইল না। পথহারা হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া যখন পথের সন্ধান পাইলাম বলিয়া আশা হইতেছিল, এমন সময় এই পীড়া।' আমাকে বলিলেন—'তুমি না কি নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছ?' আমি বলিলাম—'নূতন পুরাতন কিছু বুঝি না। ভগবান্‌কে লাভ করিব বলিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি। এখন কত পরিবার ব্রাহ্মসমাজে, তখন কিছুই ছিল না। সুতরাং সামাজিক বাহিরের বিষয় লইয়া গোল করিতে আসি নাই। ভগবান্‌কে পাইলাম ইহা প্রত্যক্ষ বোধ না হইলে কিছুতেই ফিরিব না। যে কোন উপায় অবলম্বন করিতে হয় করিব। বাহিরের উপায় কিছুই নহে। মৃত্যুকালে আমি কৃতার্থ, আমার আশা পূর্ণ হইয়াছে, প্রভু তুমিই সত্য, ইহা বলিয়া মরিব, ইহাই আকাঙ্ক্ষা।' কেশববাবু বলিলেন—'এ সম্বন্ধে আমার অনেক বলিবার আছে, যদি আরোগ্যলাভ করি, তোমাকে ডাকাইব।' দুঃখের বিষয় তাঁহার লীলা সম্বরণ হইল।" *

অতঃপর গোস্বামী প্রভু এক দিবস কলিকাতা দক্ষিণেশ্বরে ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। ১৮৮৪ খৃঃ অঃ, ২৬শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার সপ্তমীপূজার দিবস সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে শ্রীশ্রী পরমহংসদেবের সহিত গোস্বামী প্রভুর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। দর্শনমাত্রেই যেন এই দুইটী মহাপুরুষ পরস্পর পরস্পরকে চিনিয়া লইয়াছিলেন, এবং উভয়ের মধ্যে গভীর আধ্যাত্মিক যোগ সংস্থাপিত হইয়াছিল। পরমহংসদেব ইতঃপূর্ব্বেই লোকপরম্পরায় গোস্বামী প্রভুর অসাধারণ ধর্ম্মানুরাগ,

* শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধৃত।

অলোকসামান্য সত্যনিষ্ঠা—ইত্যাদির কথা বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। কোন এক সময় পরমহংসদেবের একখানা হাত ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে তিনি অত্যন্ত যন্ত্রণা প্রকাশ করিতেছিলেন, এমন সময় একজন ব্রাহ্ম বলিলেন—"আপনি জীবন্মুক্ত, এই যন্ত্রণা ভুলিতে পারিতেছেন না?" তিনি উত্তর করিলেন,—"তোদের সঙ্গে কথা ব'লে ভুল্‌বো? তোদের বিজয়কে আন। তাঁকে দেখিয়া আমি আপনাকে ভু'লে যাই।"

আজ বহুদিন পরে গোস্বামী প্রভু পরমহংসদেবকে দেখিতে আসিয়াছেন। কিন্তু গোঁসাইজী আর সে মানুষ নাই, তাঁহার সে বেশ নাই, সম্পূর্ণ এক অভিনব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত, শ্রীঅঙ্গ গৈরিকবসনে সুশোভিত, করদ্বয়ে দণ্ডকমণ্ডলু বিরাজিত; যেন কাঞ্চন-নগর হইতে নদীয়ার চাঁদ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার বদনমণ্ডল ব্রহ্মজ্যোতিঃতে উদ্দীপ্ত, দৃষ্টি স্থির-নিশ্চল-নিষ্পন্দ, নয়ন-কোণে জীববৎসলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার বাণী অমৃত-শীতল-স্নিগ্ধতা-প্রক্ষিত, উপবেসন পদ্মাসনযুত, হস্তাঙ্গুলের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অনামিকা-মূল ধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে। স্নেহময়ী জননী যেমন বারিতাপ-ক্লিষ্ট, ক্রীড়ারত সন্তানদিগকে কখনো কখনো মনোমুগ্ধকর ছবি দেখাইয়া স্বীয় ক্রোড়ে আকর্ষণ করেন; অনন্ত স্নেহের আধারস্বরূপা বিশ্বজননীও যেন সেই প্রকারে তাঁহার সংসার-মোহ-নিমজ্জিত ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট সন্তানদিগকে ধর্ম্মপথে আকর্ষণ করিবার জন্য, এই শান্তিময় মোহন-শ্যাম-স্নিগ্ধ-মূর্ত্তিটী আদর্শস্বরূপে স্বহস্তে ঘটন করিয়া ৺গয়াধাম হইতে রাজধানী কলিকাতা সহরে প্রেরণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব, গোস্বামী প্রভুকে এইরূপ নবভাবে, নূতন বেশে আসিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে বসিতে আসন প্রদান করিলেন এবং কিয়ৎকাল তাঁহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া সাতিশয় হর্ষভরে বলিতে লাগিলেন—"বিজয়, তুমি কি

বাসা পাক্‌ড়েছ ? দেখ, দুইজন সাধু ভ্রমণ করিতে করিতে একটী সহরে এ'সে প'ড়েছিল। একজন হাঁ ক'রে সহরের বাজার, দোকান, বাড়ী দেখ্‌ছিল, এমন সময় অপরটীর সঙ্গে দেখা হ'ল। তখন সে সাধুটী ব'ল্লে, আমি আগে বাসা পাক্‌ড়ে, তল্পী তল্পা রেখে, ঘরে চাবি দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বেরিয়েছি। এখন সহরে রং দেখে বেড়াচ্ছি। তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছি, তুমি কি বাসা পাক্‌ড়েছ ? (মাষ্টারের প্রতি) দেখ, বিজয়ের এত দিন ফোয়ারা চাপা ছিল, এই বার খুলে গেছে।*

অপর এক দিবস গোস্বামী প্রভু স্বীয় মাতৃদেবী, শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী, সহধর্ম্মিণী ও পুত্রকন্যাদিগকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকটে উপস্থিত হন, এবং তাঁহাকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া উপবেশন করিলে, তিনি তাঁহাকে সঙ্গীয় লোকদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। গোস্বামী প্রভু একে একে সকলের পরিচয় প্রদান করিলে, পরমহংসদেব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"বটে, তুমি এতগুলি আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও ধর্ম্মের এমন উচ্চাবস্থা লাভ করিয়াছ ? তুমি তাহা হইলে জনকঋষির ধর্ম্ম যাজন করিতেছ। আমার ত ধারণা ছিল যে, তুমি সংসারে উদাসীন হইয়া কেশববাবুর সহিত বাস করিতেছ। তুমি ধন্য। তুমি যে আদর্শ দেখাইলে, জগতে তাহা দুর্ল্লভ।" অতঃপর গোস্বামী প্রভুর সহধর্ম্মিণী শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তুমি ইঁহাকে কতদিন হইল দীক্ষা দিয়াছ ? ইঁহার মধ্যে যে অতীব আশ্চর্য্য শক্তি দেখিতেছি ! সাক্ষাৎ মহাশক্তি নিকটে আগমন করিলে আমার যেরূপ অবস্থা হয়, ইঁহাকে

* রামকৃষ্ণ কথামৃত।

দর্শন করিয়াও আমার সেই প্রকার ভাব উপস্থিত হইতেছে।” ঈদৃশ কথোপকথনের পর গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি আশ্রমের শোভাদর্শনার্থ অন্যত্র গমন করিলে, পরমহংসদেব, গোস্বামী প্রভুর শ্বশ্রূমাতা শ্রীযুক্তা মুক্তকেশী দেবীকে নিকটে আহ্বানকরতঃ বলিলেন—“দেখ, তুমি নীতিপরায়ণা ব্রাহ্মিকা হ'য়ে এই ল্যাংটো পুরুষের নিকটে কিজন্য আগমন করিয়াছ?” শ্রীযুক্তা মুক্তকেশী দেবী উত্তর করিলেন—“আপনার পক্ষে আবার ল্যাংটো কাপড়-পরা কি?” পরমহংসদেব বলিলেন—“বটে, তুমি তা বুঝেছ? তবে নিকটে ব'সো।” পরে বলিলেন—“দেখ, ব্রাহ্ম-সমাজের শুক্‌নো বাঁশের মুড়ো (শুষ্ক জ্ঞান) আর কতদিন চিবাইবে? এখন ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ কর। (গোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া) যাঁহাকে তুমি জামাতা ভাবিতেছ, তিনি ভক্তির ভাণ্ডারী, তাঁহার নিকট হইতে প্রেম-ভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হও।” ইহার কিছুকাল পরে শ্রীযুক্তা মুক্তকেশী দেবী, গোস্বামী প্রভুর নিকটে যোগদীক্ষা গ্রহণ করেন।

ভক্তিভাজন পরমহংসদেব ও ঢাকা, বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়, গোস্বামী প্রভুকে অত্যধিক শ্রদ্ধা-ভক্তি ও স্নেহ-সমাদর করিতেন এবং কেহ তাঁহাদের নিকটে দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলে, তাঁহারা তাহাদিগকে গোস্বামী প্রভুর নিকটে প্রেরণ করিতেন। এক সময় গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য শ্রদ্ধেয় নবকুমার বাক্‌চি ও অপর এক সময় ফরিদপুরের অন্তর্গত সদরদীনিবাসী ৺শ্রীধর ঘোষ মহাশয় দীক্ষার্থী হইয়া পরমহংস-দেবের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে গোস্বামী প্রভুর নিকটে সাধন গ্রহণ করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে তাঁহারা গোস্বামী প্রভুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট ঢাকানিবাসী ৺শ্যামাচরণ বক্সী ও শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র রায় মহাশয় (ইঁহারা উভয়েই আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম)

দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলে, তিনিও তাঁহাদিগকে গোস্বামী প্রভুর নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তদনুসারে তাঁহারা গোস্বামী প্রভুর নিকটে সাধন গ্রহণ করেন। এতৎপ্রসঙ্গে গোস্বামী প্রভুর অন্যতম জীবনী-লেখক আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুত বঙ্কুবিহারী কর মহাশয় তদীয় গ্রন্থে যে একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে যথা :—"ব্রাহ্ম শিষ্যের উক্তি,—আমি মধ্যে মধ্যে বারদীর ব্রহ্মচারীর নিকটে যাইতাম। প্রত্যেক বার অনেক চিন্তা ও ভাব লইয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া বসিবামাত্র আমার অন্তরের গোপনীয় প্রশ্ন সকল, যাহা অন্তর্য্যামী ভিন্ন আর কেহ জানেন না, তিনি একে একে সকল গুলির উত্তর দিতেন। প্রশ্ন আমার প্রাণে, উত্তর আমার কাণে। আমি অবাক্ হইয়া থাকিতাম। একদিন ভাবিলাম, যদি ব্রহ্মচারী আমাকে দীক্ষা দেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিব। গিয়া বসিবা-মাত্র তিনি বলিলেন—'না, না, তা হ'তে পারে না। তোমার গুরু অপেক্ষা ক'রে আছেন। তিনি তোমাকে ঘর হ'তে ডেকে নেবেন।' তারপর আমি ঢাকায় গিয়া গোস্বামী প্রভুর নিকট প্রণাম করিয়া বসিবামাত্র তিনি বলিলেন—'আপনি সাধন পাবেন।' আমার সমস্ত শরীর পুলকিত হইল। পরদিন স্নান করিয়া ক্ষেত্রের ঘরে উপাসনার জন্য বসিয়া আছি, আমার মন উদ্বেগপূর্ণ, আমার ইচ্ছা, আমার দীক্ষার সময় আমার বাল্যগুরু নগেন্দ্রবাবু (তিনি তখন ঢাকায় ছিলেন) উপস্থিত থাকেন। কিন্তু বলিতে পারিলাম না। গোঁসাইজী হঠাৎ বলিলেন—'ক্ষেত্র, নগেন্দ্র-বাবুকে ডাক।' নগেন্দ্রবাবু উপস্থিত হইলেন। আমার দীক্ষা হইল। আমি যে কারণে চঞ্চল হইয়াছিলাম, গোস্বামী প্রভু তাহা দূর করিলেন দেখিয়া মনে হইল, আত্মদর্শী মহাপুরুষেরা অন্যের মন স্পষ্ট দেখিতে পান। আমার শ্রদ্ধা শতগুণে বর্দ্ধিত হইল।"

ব্রহ্মচারী মহাশয় একদিন জনৈক গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আখড়ার সেবককে গোস্বামী প্রভুকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—"তোদের গৌরাঙ্গ নিমকাষ্ঠের ও অচল, আর আমার গৌরাঙ্গ সচল।" তিনি গোস্বামী প্রভুকে 'জীবনকৃষ্ণ' বলিয়া সম্বোধন করিতেন, এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে অতিশয় সমাদর ও স্নেহ করিতেন।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয় একজন যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। ইঁহার জন্মস্থান ও পিতামাতার পরিচয়সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ পাইবার উপায় নাই। এ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি শান্তিপুরে শ্রীশ্রীঅদ্বৈতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং উপবীত গ্রহণ করিবার পরে প্রগাঢ় বৈরাগ্যবশতঃ ব্রহ্মচারী-বেশেই স্বীয় আচার্য্য গুরু ৺ভগবান্ গাঙ্গুলী ও সতীর্থ বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন; পুনরায় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। উপনয়ন গ্রহণের পর, ব্রহ্মচারী মহাশয় প্রায় ৮০ বৎসর কাল স্বীয় গুরুদেবের সহিত নানা বনে, পর্ব্বতে, তুষারাচ্ছন্ন প্রান্তরে অবস্থানপূর্ব্বক কঠোর সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মচারী মহাশয়ের আচার্য্য গুরু ৺ভগবান্ গাঙ্গুলী মহাশয় একজন অসাধারণ পণ্ডিত ও উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন। তিনি ৺কাশীধামে মণিকর্ণিকার ঘাটে যোগাসনে আসীন হইয়া দেহত্যাগ করেন। অন্তর্ধানের সময় তিনি হিতলাল নামক জনৈক প্রসিদ্ধ ব্রহ্মচারীর উপর শিষ্যদ্বয়ের ভার অর্পণ করিয়া যান। হিতলাল, সুমেরুপর্ব্বত দর্শনমানসে লোকনাথ ও বেণীমাধবকে সঙ্গে লইয়া প্রথমতঃ বদরিকাশ্রমে উপনীত হন, এবং তথায় কয়েক বৎসর অবস্থানপূর্ব্বক শরীরকে বরফাবৃত হিমালয় প্রদেশে ভ্রমণ করিবার উপযোগী করিয়া লইয়াছিলেন। পরে পাণ্ডবদিগের মহাপ্রস্থানের পথ অবলম্বন করিয়া, বহু সহস্র মাইল উত্তরে গমন করিতে

করিতে চন্দ্রসূর্য্যবিহীন এক নিবিড় অন্ধকারময় রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। এই স্থানে তাঁহারা একহস্ত পরিমিত মনুষ্যের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু বহু অনুসন্ধান করিয়াও সুমেরু-পর্ব্বতের সন্ধান না পাইয়া, হিতলাল তাহাদিগের নিকট হইতে বিদায়-গ্রহণপূর্ব্বক উদয়াচল দর্শন করিবার জন্য পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিলেন; আর হিতলালের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয় নাই। ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিতেন যে, হিতলালই কাশীর প্রসিদ্ধ তৈলঙ্গ-স্বামী।

অতঃপর ব্রহ্মচারী মহাশয় ও বেণীমাধব গাঙ্গুলী মহাশয়, অনুমান ১২৭০ সনে বরফাবৃত হিমালয়ের শৃঙ্গ হইতে বঙ্গদেশের পূর্ব্বসীমাবর্ত্তী পর্ব্বতে অবতরণ করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল বরফাবৃত প্রদেশে অবস্থান করা নিবন্ধন তাঁহাদের সর্ব্বশরীরে একপ্রকার শ্বেতবর্ণের পুরুচর্ম্ম জন্মিয়াছিল, সেই চর্ম্মের প্রভাবে তাঁহাদের উলঙ্গ-শরীরে শীতজনিত কষ্ট বোধ হইত না। এই দুইটী অসাধারণ মহাপুরুষ, চন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত একত্র আসিয়া, কোন অজ্ঞাত কারণে একজন বারদী আসিয়া অবস্থান করিলেন, অপর জন কামাখ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয় বহুদিন পর্য্যন্ত গুপ্তাবস্থায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহার অসাধারণ গুণগ্রামের কথা কেহই অবগত ছিলেন না। প্রকৃত গুণগ্রাহী, সূক্ষ্মদর্শী গোস্বামী প্রভু, ইঁহার মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়া, ধর্ম্ম-বিষয়ক কথোপকথন করিতে সর্ব্বদা ইঁহার আশ্রমে যাতায়াত করিতেন। দুইজন একত্র হইলে, উভয়ের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব ভাব ও আনন্দের স্রোতঃ প্রবাহিত হইত, যাহা দেখিয়া উপস্থিত সকলে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ব্রহ্মচারী মহাশয়ের বয়স পৌণে দুইশত বৎসর হইয়াছিল। যোগসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের পক্ষে এত দীর্ঘকাল জীবিত থাকা আশ্চর্য্যের

বিষয় নহে। ইঁহার ভুক্তাবশেষ ভোজন করিয়া বহু লোকের বিবিধ প্রকার উৎকট ব্যাধি আরোগ্য হইয়াছে। বিশাল হিন্দুসমাজের লোক গোস্বামী প্রভুকে এতদিন পর্য্যন্ত ভ্রান্ত উপবীতত্যাগী ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া উপহাস করিত। কিন্তু এখন হিন্দুসমাজভুক্ত প্রায় দুইশত বর্ষ বয়স্ক যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ ব্রহ্মচারী মহাশয়, ইঁহার অসাধারণ শক্তি ও মহত্ত্বের বিষয় মুক্তকণ্ঠে প্রচার করাতে, পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুসমাজের লোকের চমক ভাঙ্গিল, এবং তদবধি তাঁহারা তাঁহাকে মর্য্যাদা ও প্রীতির চক্ষে দর্শন করিতে লাগিলেন। মুক্তাত্মা জাতিস্মর ব্রহ্মচারী মহাশয়, এই কার্য্যের জন্যই যেন জীবনধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন ; এবং কার্য্য সমাপ্ত হইলে অচিরকালের মধ্যে যোগবলে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া প্রশান্তমনে হাসিতে হাসিতে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া, অমরধামে প্রবিষ্ট হইলেন। (১২৯৭ সন, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ)। ভারতের একটী অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল।

শ্রীশ্রীপরমহংসদেব গোস্বামী প্রভু সম্বন্ধে কিরূপ উচ্চমত পোষণ করিতেন, তাহা ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা আরও শুনিয়াছি যে, তিনি তাঁহার তিরোভাবের কিছুদিন পূর্ব্বে, অনুরক্ত সেবকদিগকে ভবিষ্যতে গোস্বামী প্রভুর অনুগত হইয়া চলিতে বলিয়াছিলেন, এবং তাঁহার তিরোভাবের পরেও তদীয় কৃপাপাত্র ঢাকা নারায়ণগঞ্জবাসী স্বর্গীয় দুর্গাচরণ নাগ এল, এম, এস, ও আমেরিকায় অবস্থানকালে স্বামী বিবেকানন্দের নিকটে ঐ কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় নাগ মহাশয়, পরমহংসদেবের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াই, গোস্বামী প্রভুর নিকটে আগমনকরতঃ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করেন। এই সময় তাঁহার ভাব দেখিয়া উপস্থিত সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ গোস্বামী প্রভুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক করযোড়ে কিছু প্রসাদ

প্রার্থনা করেন। প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি নিজকে যেন কতই কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল সদালাপের পর বিদায়গ্রহণকালে, তিনি পুনরায় গোস্বামী প্রভু ও তদীয় ভক্তবৃন্দকে সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক গাত্রোত্থানকরতঃ, গোস্বামী প্রভুর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, পিছনে হটিতে হটিতে ঘর হইতে বহির্গত হইলেন। তদবধি তিনি প্রায়ই গোস্বামী প্রভুকে দর্শন করিতে আগমন করিতেন।

ভক্তিভাজন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সঙ্গে গোস্বামী প্রভুর, দেশ, ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে এমন অনেক গূঢ় কথাবার্ত্তা হইত, যাহার মধ্যে সাধারণের প্রবেশ করিবারই ক্ষমতা ছিল না। এই জন্য পরমহংসদেবের জীবনীলেখকের মধ্যে কেহ কেহ, তাঁহার সহিত গোস্বামী প্রভুর ধর্ম্মবিষয়ের কোন কোন কথা উদ্ধৃত করিতে গিয়া বিষম ভুল করিয়াছেন। এতদ্প্রসঙ্গে গোস্বামী প্রভু পুরীধামে অবস্থানকালে একদিন বলিয়াছিলেন—"আমার ও পরমহংসদেবের মধ্যে সময় সময় ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ক যে সকল গূঢ় কথোপকথন হইত, তাহার মধ্যে সাধারণের প্রবেশ করিবারই অধিকার ছিল না। উঁহারা (জীবনীলেখকেরা) তাহা কি প্রকারে বুঝিতে সক্ষম হইবেন?" *

হুগলি-জেলার অন্তর্গত আরামবাগ মহকুমার কামারপুকুর নামক গ্রামে ১২৪১ সালের ১০ই ফাল্গুন (১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়, মাতার নাম চন্দ্রমণি দেবী। ৺চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আর্থিক অবস্থা তত স্বচ্ছল ছিল না। তিনি যজন-যাজন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইতেন, তাহা দ্বারা অতিশয় কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন; সুতরাং বালক রামকৃষ্ণের বিদ্যা-

* ঢাকা গেণ্ডারিয়াবাসী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু মহাশয়ের মুখে শ্রুত।

অভ্যাসের তাদৃশ সুযোগ ঘটে নাই। ১৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, হুগলি জেলার অন্তর্গত জয়রামবাটী নিবাসী ৺রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সারদামণি দেবীর সহিত রামকৃষ্ণদেবের উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। ঐ সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ৺রামকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতার উত্তরে দক্ষিণেশ্বরে, মাড়বারদেশীয় রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত ৺কালীকাদেবীর (আনন্দময়ী) পূজকরূপে নিযুক্ত হইয়া, তথায় বাস করিতে ছিলেন। পরমহংসদেবও জ্যেষ্ঠভ্রাতার সঙ্গে তাঁহার ভাবীলীলা-ক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বরে বাস করিতে থাকেন। ইহার ২।৩ বৎসর পরে রামকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকগমন করেন এবং পরমহংসদেব তাঁহার পদে অভিষিক্ত হন। এই সময় হইতেই মহাশক্তির কৃপায় রামকৃষ্ণদেবের জীবনে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে লাগিল। তিনি অত্যধিক আগ্রহসহকারে জনৈকা প্রসিদ্ধা ভৈরবী ব্রাহ্মণীর নিকট হইতে শক্তিপূজার মর্ম্মাদি অভ্যাস করিয়া, নবীন-উৎসাহে অকপট-হৃদয়ে জগজ্জননীর পূজায় ব্রতী হইলেন। সাধারণ পূজারীদিগের ন্যায় তিনি কেবল ফুলচন্দনাদি দ্বারা মহাশক্তির পূজা করিয়াই তৃপ্ত থাকিতেন না; পরন্তু আত্মোৎকর্ষলাভের জন্য গভীর সাধনায় মনোনিবেশ করিতেন। এই জন্য তিনি প্রাগুক্ত কালিকাদেবীর মন্দির-সংলগ্ন সুবৃহৎ উদ্যানের উত্তর-পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যে আপন বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন, এবং উহারই সন্নিকটে বহুবিস্তৃত একটী পুরাতন বটবৃক্ষতলে আসন প্রস্তুত করিয়া, যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন। সূর্য্যরশ্মিসমবায়ক কাচখণ্ড দ্বারা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত সূর্য্যের কিরণসমূহ একীভূত করিতে পারিলে যেমন সহজেই অগ্নি প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ পরমহংসজীও কঠোর সাধনা-বলে ও ভগবৎকৃপায় তাঁহার নানাদিকে বিক্ষিপ্ত স্বাভাবিক আকর্ষণ একত্রিত করিয়া সাধনার লক্ষ্যে অর্পণ করাতে, অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের

মধ্যে পূর্ণকাম হইয়াছিলেন। কামিনীকাঞ্চনের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র ভগবানে আত্মসমর্পণ করাই তাঁহার সাধনার মূলমন্ত্র ছিল।

পরমহংসদেবের কুলগুরুসংস্কার আদৌ ছিল না; সুতরাং প্রকৃত ধর্ম্মলাভার্থে সত্য উপলব্ধি করিবার জন্য যে কোন সম্প্রদায়ের লোককে উপযুক্ত বিবেচনা করিতেন, তিনি তাঁহাকেই গুরুরূপে বরণ করিয়া, অবনতমস্তকে তদুপদিষ্ট সাধনপ্রণালী গ্রহণপূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ না করা পর্য্যন্ত কঠোর সাধনা করিতেন। এই জন্য তিনি একাধিক গুরু গ্রহণ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও মহাত্মা তোতাপুরীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রকার বিবিধ সাধনপ্রণালীর মধ্য দিয়া তিনি যে সার সত্যে উপনীত হইলেন, তাহা অতিশয় উদার ও মহৎ। তিনি বলিতেন—"ভগবান্ একই বস্তু, কেবল নামে মাত্র তফাৎ। তাঁকে কেউ ব'ল্‌ছে আল্লা, কেউ ব'ল্‌ছে গড্ (God), কেউ ব'ল্‌ছে ব্রহ্ম, কেউ ব'ল্‌ছে কালী, কেউ কেউ ব'ল্‌ছে রাম, হরি, শিব—নামমাত্র ভেদ। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই ভগবান্। ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা, ভক্তের ভগবান্। আবার নানা মত, নানা পথ। সকল ধর্ম্মই সত্য, সকল পন্থাতেই তাঁহাকে পাওয়া যায়।"

চঞ্চল অন্নগতপ্রাণ কলিজীবের পক্ষে ইঁনি, নদীয়াবিহারী শ্রীমন্ মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত নাম-সাধন প্রণালীর শ্রেষ্ঠতাসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেন, এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই যে এই যুগের অবতার, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। যুগধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ যথা:— "কলিযুগে নারদীয় ভক্তি, তাঁর নামগুণকীর্ত্তন করা। অন্যান্য যুগে নানারকমের কঠোর-সাধনার নিয়ম ছিল। সে সকল সাধনে সিদ্ধিলাভ করা বড় কঠিন। এখন জীবের অল্প পরমায়ু, তাতে ম্যালোয়ারী (ম্যালেরিয়া) রোগে কাবু ক'রে ফেলে, কঠোর তপস্যা কেমন ক'রে ক'র্‌বে?"

"হাতে তালি দিয়ে সকালে ও সন্ধ্যাকালে হরিনাম করো, তা হ'লে সব পাপতাপ চ'লে যাবে।"

"ভগবানের নাম জান্তে, অজান্তে বা ভ্রান্তে যে প্রকারে হ'ক্ নিলে, তার ফল হবেই হবে।" *

বর্ত্তমান সময় অনেক উচ্চশিক্ষিত লোকের ধারণা এই যে, উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে, ভগবৎতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। কিন্তু এই ধারণা যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, তাহা পরমহংসদেবের জীবনে প্রমাণিত হইয়াছে। তদানীন্তন টোলের সামান্য শিক্ষাও তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া ছিল না। অথচ ভগবৎকৃপায় তাঁহার হৃদয়ে যে সকল গভীর হইতে গভীরতর তত্ত্বসমূহ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, উচ্চশিক্ষাভিমানী শাস্ত্রজ্ঞ বহু পণ্ডিত লোকেরও তাহা ধারণার অতীত। ভগবৎতত্ত্ব যাঁহাদের অন্তরে প্রকাশিত হয়, অপর কোন তত্ত্বই তাহাদের জানিতে বাকি থাকে না; কারণ, জগতের যাবতীয় তত্ত্বই উহার অন্তর্গত। এই ভগবৎতত্ত্ব বিদ্যাবুদ্ধির আয়ত্ত নহে, উহা সম্পূর্ণ ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ।

নয়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং॥

এই আত্মাকে (পরমেশ্বরকে) বেদাধ্যয়ন তীক্ষ্ণমেধা অথবা শ্রুতি-স্মৃতি দ্বারা লাভ করা যায় না। (সদ্‌গুরুরূপে) তিনি যাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই কেবল তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। সেই সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির নিকটে তিনি স্বকীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মগণ, পরমহংসদেবের নিকটেই সর্ব্বপ্রথম প্রকৃত ধর্ম্মের আলোক

* স্বামী ব্রহ্মানন্দ সংকলিত রামকৃষ্ণ উপদেশ।

প্রাপ্ত হন। পশ্চিমবঙ্গে রামকৃষ্ণদেব ও পূর্ব্ববঙ্গে বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয় বিরাজমান থাকিয়া, এক সময়ে সমগ্রদেশের ধর্ম্মের গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের উভয়ের সঙ্গে গোস্বামী প্রভুর গভীর আধ্যাত্মিক যোগ বিদ্যমান ছিল। ইঁহারা উভয়েই সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে গোস্বামী প্রভুকে আদর্শ সদ্‌গুরুরূপে প্রতিপন্ন করিতে প্রাণপণে কর্ম্ম করিতেন। কেহ দীক্ষার্থী হইয়া উপস্থিত হইলে, ইঁহারা তাহাদিগকে গোস্বামী প্রভুর নিকটে প্রেরণ করিতেন।

বিষ্ণু-অংশ-সম্ভূত এই ভগবৎপ্রেরিত মহাপুরুষ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-বিদ্বেষের দ্বারা ছিন্নভিন্ন ভারতবর্ষে, সুবিমল শান্তিপ্রদ অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের বীজ বপন করিয়া, ১২৯৩ সালের ৩১ শ্রাবণ, ৫২ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে নশ্বর-দেহ পরিত্যাগ করিয়া কৈবল্যধামে গমন করিয়াছেন। তদীয় অনুগত ভক্তমণ্ডলী, চিরপবিত্র জাহ্নবীতটে তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, তদীয় ভস্মাস্থি সংগ্রহপূর্ব্বক কলিকাতার উপকণ্ঠে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে সমাধিস্থকরতঃ, তাঁহার পরলোকগত পবিত্রাত্মার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ও কৃতজ্ঞতা অর্পণের উপায় করিয়া রাখিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তদীয় প্রিয় শিষ্য আমেরিকাপ্রত্যাগত শ্রদ্ধাভাজন স্বামী বিবেকানন্দ, স্বতন্ত্রভাবে তাঁহার পবিত্র নামে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বেলুড়ে, মাদ্রাজ সহরে ও কুমায়ুন জেলার অন্তর্গত মায়াবতীতে তিনটী মঠস্থাপন করিয়া, তথায় দেশের নানাবিধ লোকহিতকর কার্য্যের সূচনা করিয়া গিয়াছেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ঢাকায় অবস্থান ও জ্বালামুখী গমন। দ্বারভাঙ্গা, কোন্নগর ও কাকিনায় অবস্থান। কামাখ্যা দর্শন।

ভক্তিভাজন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পবিত্র সঙ্গ-সুখ কিয়ৎকাল উপভোগ করিয়া, গোস্বামী প্রভু কলিকাতা হইতে ঢাকায় গমন করিলেন। তাঁহার আগমনে পূর্ব্ববাঙ্গালার ব্রাহ্মগণ অত্যন্ত উৎফুল্ল ও উৎসাহিত হইলেন। পূর্ব্ববঙ্গ যেন সজীব হইয়া উঠিল। তিনি নিয়মিতরূপে ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে উপাসনা এবং ছাত্রসমাজের ভার গ্রহণ করিয়া, বক্তৃতা, আলোচনা, পাঠ, কীর্ত্তনাদি দ্বারা তাহাদিগের মধ্যে নীতি ও ধর্ম্মোন্নতির চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

গয়াধামে দীক্ষাপ্রাপ্তির পর হইতেই গোস্বামী প্রভু নির্দ্দিষ্ট সময় সর্ব্বসাধারণের কল্যাণপ্রদ সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যে অতিবাহিত করিয়া, অবশিষ্ট সমস্ত সময় নিজের সাধনভজনে ব্যাপৃত থাকিতেন।

এই সময় গোস্বামী প্রভু সাধনপথের একটী ভয়ানক বিপজ্জনক সন্ধিস্থলে উপনীত হইয়াছিলেন। সাধনভজন করিতে করিতে গুরুশক্তিবলে তাঁহার অন্তরে নামাগ্নি প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। ইহাকেই প্রকৃত পঞ্চতপা বলে। এতদ্ভিন্ন অনেক সাধক বাহিরে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া পঞ্চতপা করেন, তাহাতে আভ্যন্তরিক কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না। উহাকে বাহ্যিক পঞ্চতপা বলে। সাধনপথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, প্রত্যেক সাধকের ভিতরে নামাগ্নি জ্বলিতে থাকে, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার বিষয়-

বাসনা দগ্ধীভূত হইয়া আত্মা নির্ম্মল হয়; কারণ, বিষয়-রস একটুকুও থাকিতে ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করা যায় না। এই সময় সাধককে অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। প্রাণ সর্ব্বদা হু হু করে। সংসারের যাবতীয় সুখের বস্তুই আর সুখ দিতে পারে না—সমস্তই বিষবৎ বোধ হয়। জীবন-ধারণ বিড়ম্বনা বলিয়া মনে হয়। সাধক-জীবনে ইহা অপেক্ষা ভয়ানক অবস্থা আর নাই। এই অবস্থা উপস্থিত হইলে কোন কোন সাধক আত্মহত্যা করিয়া ফেলেন, কেহ কেহ উন্মাদ হইয়া যান এবং অধিকাংশই সাধন পরিত্যাগ করেন। কিন্তু নিতান্ত সামর্থ্যবান্ গুরু যাঁহাদিগের পিছনে থাকেন, তাঁহারাই কেবল উহার হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া উচ্চাবস্থা লাভ করেন। ধৈর্য্য ধরিয়া গুরুদত্ত নাম গ্রহণ করাই এই অবস্থা অতিক্রম করিবার একমাত্র উপায়। এতদ্ভিন্ন, যাহাকে নিজ হইতে নিকৃষ্ট মনে হইবে, এমন কোন লোকের পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে পারিলেও এই যন্ত্রণার সাময়িক নিবারণ হয়। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এই অবস্থায় নিপতিত হইয়া, জগন্নাথদেবের রথচক্রের তলে পড়িয়া দেহত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলে, অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু তাঁহাকে তৎকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করেন। রঘুনাথদাস গোস্বামী মহোদয়ও এই অবস্থায় নিপতিত হইয়া, পর্ব্বত হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তখন সনাতন গোস্বামী তাঁহাকে সান্ত্বনাপ্রদানপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিলেন।

গোস্বামী প্রভু এই অবস্থায় নিপতিত হইয়া, দিবানিশি নামাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইতে লাগিলেন। এই সময়ের কথা তিনি নিম্নলিখিতরূপে বর্ণন করিয়াছেন; যথা:—"আমার প্রাণ দিবানিশি হু হু করিয়া জ্বলিয়া যাইত। কিছুতেই সুখ পাইতাম না। আহার বিহার সমস্তই বিষবৎ বোধ হইত। অত্যন্ত গাত্রদাহ হইত, যেন ভয়ানক জ্বর হইয়াছে। এক এক সময়

যাতনা অসহ্য বোধ হইত। আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইত। এই প্রকার যাতনা ভোগ করিয়াও সাধন করিতে লাগিলাম। ক্রমে যন্ত্রণা সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিল। তখন সাধন ছাড়িয়া দিতে উদ্যত হইলাম। এমন সময় গুরুদেব আমার নিকটে প্রকাশিত হইয়া উপদেশ দিলেন—'অধীর হইও না, আমার অনুরোধে তুমি আরও কিছুদিন নাম কর, সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা চিরকালের তরে দূর হইয়া যাইবে।' পরে বলিলেন—'তুমি যদি কিছুদিন জ্বালামুখী গিয়া সাধন করিতে পার, তবে এই অবস্থা সত্বর দূরীভূত হইবে।' তদনুসারে আমি জ্বালামুখী গমন করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইলাম। কিছুদিন সাধন করিবার পর আমার যন্ত্রণার অবসান হইল, এবং প্রাণে এক অপূর্ব্ব সরস অবস্থা আগমন করিল।"

অতঃপর গোস্বামী প্রভু জ্বালামুখী হইতে ঢাকায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের প্রচারভবনে বাস করিতে লাগিলেন। এই বৎসর মাঘোৎসবের সময় গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য কাঙ্গাল ফিকির-চাঁদ (হরিনাথ মজুমদার) তাঁহার কীর্ত্তনের দলসহ ঢাকায় আগমন করিয়া গোস্বামী প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইলে, যে প্রকার ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। তাহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের চিত্তপটেই অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। উৎসবের এক দিবসের বিবরণ (১২৯৩। ১০ই মাঘ, ঢাকা) জনৈক দর্শকের স্ব-কথিত বর্ণনা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা :—"আজ সকাল বেলা সমাজে গেলাম। এবার মাঘোৎসব উপলক্ষে কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ কয়েকটী লোক সঙ্গে নিয়া ঢাকা আসিয়াছেন। আজকাল সমস্ত দেশ কাঙ্গাল ফিকিরের গানে মত্ত। প্রচার-নিবাসে তাঁহারা গান করিতেছেন, দেখিলাম ঘরটি লোকে পরিপূর্ণ। সকলে স্থির হ'য়ে চুপ করিয়া গান শুনিতেছেন, কেবলমাত্র গোস্বামী প্রভু নিজ আসনের উপর দাঁড়িয়ে রহিয়াছেন। দৃষ্টি সম্মুখের দিকে। স্থির চোক

দুটিতে পলকমাত্র নাই, নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল হইয়াছে। গণ্ডস্থল ভাসিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে। বাম হস্ত বক্ষোপরে, দক্ষিণ হস্ত ব্রহ্মতালুর উপরে করধরা রহিয়াছে। পুনঃ পুনঃ শিহরিয়া উঠিতেছেন, শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে, মাঝে মাঝে 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিতেছেন। এক একবার লাফ দিয়া উঠিতেছেন। শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় সম্মুখে দণ্ডায়মান, পাছে গোঁসাই ভাবাবেশে পড়িয়া যান। একটু পরে গোঁসাই খুব 'খল্ খল্' করিয়া হাসিতে লাগিলেন, এরূপ হাসি আর দেখি নাই, চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। ৩।৪ মিনিট খুব হাসিয়া, ডান হাত সম্মুখের দিকে আনিয়া, কি যেন কি দেখাইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন— 'ঐ দেখ, ঐ দেখ, তোমরা সকলে দেখিয়া লও, ঐ দেখ পাগলা এসেছে, পাগলা দাঁড়ায়ে র'য়েছে, দেখ পাগলা যেতে চায়।' দুচার পা অগ্রসর হ'য়ে খুব উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—'ধর ধর ধর! না আবার ফিরেছে, তোমরা দেখ, পাগলা এদিকে আস্‌ছে। ঐ দেখ, ও বাব্বা! কত বড় গরু! ওটা কেমন দেখ! বা! কপালের উপর একটা চোক্! সেটার জ্যোতিঃ কত! উঃ সূর্য্যের মত! সূর্য্যই কি? * * * উঃ কত বড় দুটা শিং। হা হা হা, ঐ দেখ নন্দী ভৃঙ্গী! মনে ক'রেছিলাম ও দুটা কিছু নয়। ঐ দেখ পাগ্‌লার সঙ্গে ওরা এদিকে আস্‌ছে। (খুব উচ্চৈঃস্বরে হঠাৎ চীৎকার করিয়া) জয় মা! জয় মা! ঐ দেখ তোমরা সকলে দেখ, মা এসেছেন, ধন্য মা! ধন্য মা! জয় মা!' এই বলিয়া লাফাইতে লাগিলেন ও উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—'বল জয় মা, জয় মা, ধন্য জননী!' এই বলিয়া ঝাঁপ করিয়া মাটিতে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করিয়া লুটাইতে লাগিলেন; তখনই আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া সম্মুখে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া বলিতে লাগিলেন—'অহো, অহঃ, কত যোগী, কত ঋষি মায়ের চারিদিকে নাচিতেছেন। উঃ, কত লোক, ঐ দেখ ব্যাস, বাল্মীকি, নারদ; আরো কত, নাম বলা যায় না। অহো,

বাড়ীর সম্মুখটা ভ'রে গেল। তাঁহারা কত আনন্দ ক'চ্ছেন। ঐ সঙ্গে সকলেই আছেন, আমার পরিচিত লোকও আছেন। দেখ তামাসা দেখ, মা সকলের সঙ্গে নাচ্‌ছেন, আর এদিকে আসছেন। মা যে আমাকে ডাকছেন?' এই বলিয়া নাচিতে লাগিলেন, সাষ্টাঙ্গ দিলেন, কতক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, গণ্ডস্থল বাহিয়া অবিরল অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল, আর ক্ষণে ক্ষণে উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন। সমস্ত লোক বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া আছে, গোঁসাই সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন।

"আহারান্তে ১৷৹টার সময় আবার সমাজে গেলাম। আশ্চর্য্য দৃশ্য সাধনের অনেক লোক, ব্রাহ্মগণ ও ফিকিরচাঁদ কয়েকটি লোক সহ আহার করিতেছেন। কুঞ্জবাবু (বারদীর কুঞ্জলাল নাগ, এম্, এ) গান ধরিলেন ও খোল বাজাইতে লাগিলেন। তাঁহার বাহ্য-জ্ঞান নাই। খোলে আজ কত অদ্ভুত রকম শব্দ বাহির হইতেছে, গানের ত কথাই নাই। যাঁহারা আহার করিতে বসিয়াছিলেন, দু'চার গ্রাস খেতে না খেতে বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন। কারো অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা বহিতেছে, কারো শরীর কাঁপিতেছে, কারো ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছে, চারিদিকে আনন্দের ফোয়ারা ছুটিল। উচ্ছিষ্ট থালা ও পাতার উপর কেহ কেহ গড়াইতে লাগিলেন। শুধু গোঁসাই দণ্ডায়মান। কতক্ষণ পরে গোস্বামী প্রভু বসিলেন, মাতালের মত এদিক ওদিক ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে সকলেরই জ্ঞান হ'ল, গানও থামান হ'ল, চারিদিক নিস্তব্ধ! কিছুক্ষণ পরে গোঁসাই বলিলেন—'অতলস্পর্শ মহাসাগরের এক গণ্ডূষ মাত্র জলে আজ গিয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু সাগরের ভয়ানক ঢেউ, এক ধাক্কাতে আবার তীরে আনিয়া ফেলিয়াছে, অহো! এই মহাসাগরে যাঁরা গিয়া পড়িয়াছেন, তরঙ্গের সঙ্গে তাঁহারা কতই আনন্দ লাভ করিতেছেন—ইত্যাদি।" *

* শ্রীযুক্ত—রায় মহাশয় সংগৃহীত বিবরণ।

এই উৎসবের উপাসনাসম্বন্ধে ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন—"বিজয়কৃষ্ণ, বেদীর উপর বসিয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়া সাশ্রু-নয়নে 'মা, মা' ধ্বনি করিতেছেন, আর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শত শত উচ্ছ্বসিত হৃদয় হইতে 'মা, মা' ধ্বনি বিনিঃসৃত হইয়া উপাসনা-মন্দিরকে প্রতি-ধ্বনিত করিতেছে। সে দৃশ্য কখনও ভুলিব না। মর্ত্ত্যে সেই যে কৈবল্যধাম দেখিয়াছি, তাহা কখনও ভুলিব না।" অপর এক দিবস বেদী হইতে উপাসনাকালে গোস্বামী প্রভু মস্তকের উপর বাহু সঞ্চালন করতঃ, "এই যে আমার মা! এই যে আমার মা!" ইত্যাকার শব্দ এমন গম্ভীরভাবে উচ্চারণ করিয়াছিলেন যে, তৎশ্রবণে উপাসকমণ্ডলীর মধ্য হইতে এক মহাক্রন্দনের রোল উত্থিত হইয়াছিল। নিতান্ত পাষাণ-হৃদয়ও সে দিন বিগলিত হইয়াছিল। ঐ দিবসের কথাপ্রসঙ্গে স্বর্গীয় নগেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন যে, "সেই দিন তাঁহার (গোস্বামী প্রভুর) ভাবদর্শনে উপাসক ও উপাসিকার প্রাণে এমন প্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল যে, ব্রাহ্মসমাজের অনেক মহিলা তাঁহাকে নবজাত শিশুজ্ঞানে আহ্লাদ করিয়া দুগ্ধের টাকা দিয়াছিলেন।"

এই বৎসরের উৎসবসম্বন্ধে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে, যথা:— "গোঁসাইজী আজ বেদীতে বসিলেন, উদ্বোধন হইতেই আজ সকলের ভিতরে আশ্চর্য্য এক শক্তি খেলিতে লাগিল। চারিদিকে কান্নার রোল উঠিল, মহোৎসবে আজ সকলে মাতিল। সঙ্গীতের সময় সকলে মিলিয়া সংকীর্ত্তন করিলেন, ভাবে মত্ত হইয়া বহু বালক-বৃদ্ধ আজ বেহুঁস হইয়া পড়িল। সকলের চীৎকারে, হুঙ্কারে ও উচ্ছ্বাসের ধ্বনিতে মন্দির পরিপূর্ণ হইল। ডাক্তার রায় (P. K. Roy) এবং আরও ২।৩ জন লোক গোলমাল থামাইতে চেষ্টা করিলেন। গোঁসাইএর উচ্ছ্বাসে গোলমাল

আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে গোঁসাইজী বেদী হইতে নামিয়া, হস্তস্পর্শ দ্বারা সকলকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। গোঁসাইজীর হস্তস্পর্শ মাত্র সকলে স্থির হইলেন। যাঁহারা সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিলেন, জ্ঞান লাভ করিলেন, যাঁহারা চীৎকার করিতেছিলেন শান্ত হইলেন, যাঁহারা নাচিতেছিলেন, বসিয়া পড়িলেন। অদ্ভুত দৃশ্য!! এ দৃশ্য আর ব্রাহ্ম-মন্দিরে কখনও কেহ দেখেন নাই, ঐ দিনের উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল।

"ধর্ম্মজীবন দৃঢ়তার সহিত অবলম্বন না করিলে টিকে না। পরমেশ্বর ব'লে আমরা চারি প্রকারে ডাকি, পরমেশ্বরের নিকট আমার কোন আশা নাই, বাসনা নাই, গতিও চাই না, মুক্তিও চাই না, তাঁকে না ডাকিয়া থাকিতে পারি না তাই ডাকি, এইরূপ ভাব হইতে তাঁকে ডাকা—ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

দ্বিতীয়তঃ—অভাববোধে পরমেশ্বরকে ডাকা। কোন বিষয়ে অভাব বোধ হইলেই তাহা পূরণ করিবার ইচ্ছা জন্মে, ইহা সকলেরই স্বাভাবিক। আমাদের অভাব কেহ পূরণ করিতে সমর্থ জানিলেই ব্যাকুল হ'য়ে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করি। এরূপ অভাব পূরণার্থ ভগবান্‌কে ডাকা, ইহাও মন্দ নয়, তবে বিশেষ ভালও নয়; কারণ, অভাবে পড়িয়া ডাকিলাম, অভাব দূর হইলে তাঁহার সহিত সম্পর্ক না থাকারই কথা। প্রায়ই এরূপ দেখা যায়, রোগ হইতে মুক্তিলাভের জন্য ডাকিলাম, ব্যারাম গেল, আর ভুলিলাম। মুক্তির জন্য ডাকিলাম, মুক্ত হইলাম, আর তাঁকে ডাকার জন্য প্রয়োজন নাই; ব্যাকুলভাবে ডেকে অভাব পূরণ হইল, আর সেরূপ ডাকার উৎসাহ হয় না; যদি কৃতজ্ঞতা থাকিয়া যায় তবেই মঙ্গল, না হ'লে সমস্তই বৃথা।

তৃতীয়তঃ—জিজ্ঞাসুভাবে ভগবান্‌কে ডাকা। শুনিতে পাই, ধর্ম্ম

বড়ই আশ্চর্য্য জিনিষ, আচ্ছা দেখি না কেন কি প্রকার? ধর্ম্ম করিলে, ঈশ্বরকে ডাকিলে কোন কোন যন্ত্রণায় না কি ক্লেশ বোধ হয় না, ভিতরের সকল আশাই না কি একেবারে মিটিয়া যায়, ভাল দেখি না, সত্যই তাই কি না? হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষা না কি ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাল, আচ্ছা, দিনকতক সমাজে গিয়া দেখি না কেন? লোকে ধর্ম্মের জন্য এত করিতেছে, হয়ত ইহার মধ্যে কিছু থাকিবে, তাই একবার চেষ্টা ক'রে দেখা যাক্। এই দলের লোকই আজকাল বেশী। ইহারা কোন দলই লাভ করিতে পারে না, কারণ ইহাদের প্রার্থনা উপাসনা—ইত্যাদি ধর্ম্মকর্ম্ম সমস্তই সন্দেহে পরিপূর্ণ, ঈশ্বরকে পরীক্ষা করিতে ইহারা আসেন, এই প্রকার প্রার্থনা নিকৃষ্ট। ইহাতে ফললাভ করা একরূপ অসম্ভব।

চতুর্থতঃ—অনুকরণ, যাহারা ঈশ্বরের নাম লয়, লোকে তাদের কেমন ভাল লোক বলিয়া সম্মান ক'চ্ছে; আমার বিশ্বাস নাই বা থাকুক, ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিলে দুজনে লোকে যদি সম্মান করে, ভাল বলে, ক্ষতি কি? ঈশ্বরের নাম লওয়া একটা বেশী কিছু নয়, লওয়া যাক্না কেন, লোকে সম্মানলাভের জন্য কত করে, আমি যদি একটু অনুকরণ করিয়া, দু'চারটা লম্ফ ঝম্ফ দিয়া সে সম্মান পাই, লাভ বই লোকসান কি? এই ভাবে ঈশ্বরের নাম লওয়া অতি নিকৃষ্ট।"

ঢাকার উৎসবের পর গোস্বামী প্রভু কলিকাতা হইতে দ্বারভাঙ্গা গমনপূর্ব্বক তথাকার ব্রহ্মোৎসবে যোগদান করিলেন। উৎসবান্তে তিনি কিয়ৎকাল স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ দত্তের বাসায় অবস্থান করিয়া-ছিলেন। এই স্থানে হঠাৎ তাঁহার কঠিন উদরীরোগ উপস্থিত হয়। রোগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া শেষসীমায় উপনীত হইল। আত্মীয়স্বজন জীবনরক্ষাবিষয়ে হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন। দুই জন ডাক্তার একযোগে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, রোগীর অন্ত্রাদি পচিয়া গিয়াছে, অর্দ্ধ ঘণ্টার

মধ্যেই প্রাণবায়ু নির্গত হইবে। এই অভিমত প্রকাশ করিয়া তাঁহারা প্রস্থান করিলেন। রোগীর চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী জানিয়া, শ্রদ্ধেয় রাধাকৃষ্ণবাবু রোগীর শয্যাপার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক একতারা সংযোগে ধীরে ধীরে নাম গান করিতে লাগিলেন। গান ক্রমশঃই জমাট বাঁধিয়া উঠিল। এমন সময় গোস্বামী প্রভু ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলনপূর্ব্বক উঠিয়া বসিলেন এবং কীর্ত্তনের তালে তালে মস্তক ঢুলাইতে লাগিলেন; অবশেষে দণ্ডায়মান হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া সকলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কীর্ত্তন শেষ হইলে গোস্বামী প্রভু আসনে উপবেশন করিলে, একজন চিকিৎসক বলিলেন—"গোস্বামী মহাশয়, আপনি আমাদের অভিমান চূর্ণ করিয়াছেন। আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্র আপনার নিকট হার মানিয়াছে।"

এদিকে ঢাকাতে গোস্বামী প্রভুর জীবনসংশয় রোগের সংবাদ উপস্থিত হইলে, তদীয় শিষ্য স্বর্গীয় শ্যামাচরণ বক্সী মহাশয়, যোগসিদ্ধ বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া স্বীয় গুরুদেবের প্রাণ ভিক্ষা করেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহার গুরুনিষ্ঠা পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন—"তুমি তোমার গুরুর জন্য কি স্বার্থ ত্যাগ করিতে পার?" উত্তরে বক্সী মহাশয় বলিলেন যে, তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারেন, সম্প্রতি তাঁহার জীবনের অর্দ্ধেক পরমায়ু দান করিতেছেন। তিনি ইহাদ্বারা তাঁহার গুরুদেবের জীবন রক্ষা করুন। ত্রিকালজ্ঞ ব্রহ্মচারী মহাশয়, বক্সী মহাশয়ের এবম্বিধ গুরুনিষ্ঠা দর্শনপূর্ব্বক কিয়ৎকাল সমাধিস্থ থাকিয়া পরে অতিশয় হর্ষপ্রকাশকরতঃ বলিলেন—"তোমার গুরুদেব এখন দেহত্যাগ করিবেন না। তাঁহার জীবনের অনেক কার্য্য অবশিষ্ট রহিয়াছে।" এদিকে দ্বারভাঙ্গায় গোস্বামী প্রভুর কন্যা শ্রীমতী

শান্তিসুধা, গোস্বামী প্রভুর পার্শ্বে ব্রহ্মচারী মহাশয়কে দর্শন করিয়া বিস্ময়ে অভিভূতা হইয়াছিলেন।

শ্রদ্ধেয় বক্সী মহাশয় একজন অতি উচ্চদরের সাধক ছিলেন। অথচ ইঁহার মত বিনয়ী ও নিরভিমানী লোক প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত গাঁওদিয়া গ্রামে ইঁহার জন্মস্থান। ইনি বংশে ব্রাহ্মণ, কিন্তু সকল শ্রেণীর ছোট বড় সকল লোককেই নমস্কার করিতেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কেহ তাঁহাকে পূর্ব্বে নমস্কার করিতে পারিত না। কোন পরিচিত লোক আগমন করিতেছেন দেখিলেই, বক্সী মহাশয় দূর হইতেই, তিনি নমস্কার করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে অভিবাদন করিতেন।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত এই লক্ষণগুলি ইঁহার অন্তরে যেরূপ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, সচরাচর কুত্রাপি সেরূপ দৃষ্ট হয় না। গুরুকৃপায় ইঁনি অচির-কাল মধ্যেই মুক্তাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। গোস্বামী প্রভু প্রদত্ত সাধন-প্রণালীর অমৃতময় ফলের ইঁনি জীবন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যতদিন জীবিত ছিলেন, দরিদ্রতাজনিত ক্লেশ অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছেন। অর্থাভাবপ্রযুক্ত প্রয়াগে কুম্ভমেলায় সাধুমণ্ডলী দর্শন করিতে পারিলেন না বলিয়া, একদিন তিনি বিষণ্নমনে কাল কাটাইতেছেন, এমন সময় এক অভাবনীয় ঘটনা সংঘটিত হইল, ঢাকায় থাকিয়াই তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

শ্রদ্ধাভাজন বক্সী মহাশয় যখন যেখানেই অবস্থান করিতেন, স্বীয় গুরুদেবের সঙ্গসুখ প্রতিদিন সম্ভোগ করিতেন। তাঁহার দীনতায় পাষাণহৃদয়ও বিগলিত হইত। এক দিন তিনি কোনও বৈষ্ণব পর্ব্ব উপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ শ্রবণ করিতে একস্থানে গমন করেন। তথায়

বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির জন্য পৃথক্ আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। সকলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণদিগের আসনে উপবেশন করিতে অনুরোধ করাতে তিনি বলিলেন—"আমি অসবর্ণ বিবাহ করিয়াছি, সুতরাং পতিত, আমি আপনাদের একাসনে বসিবার অযোগ্য।" এই বলিয়া এক কোণে গিয়া বসিলেন। তাঁহার দীনতাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর হৃদয় সিক্ত হইল। একদিন তাঁহার একজন গুরুভ্রাতা বলিলেন—"বক্সী মহাশয়, আপনার ক্রোধ জন্মাইতে পারে বোধ হয় এমন লোক জগতে নাই।" তদুত্তরে তিনি বলিলেন—"সে কি? আমি যে অত্যন্ত ক্রোধী, বোধ হয় জন্মান্তরে দুর্ব্বাসা ছিলাম।" এই সর্ব্বলক্ষণান্বিত গুরুগতপ্রাণ মহাপুরুষ, গোস্বামী প্রভুর তিরোধানের কিয়ৎকাল পরেই স্বীয় নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়া অমরধামের যাত্রী হইয়াছেন।

দ্বারভাঙ্গায় অবস্থানকালে গোস্বামী প্রভু এক দিবস তাঁহার গুরুদেব পরমহংসজীর নিকট স্বীয় সাধনলব্ধ কতিপয় অবস্থার কথা জ্ঞাপন করিয়া, তাহার যথার্থতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। পরমারাধ্য পরমহংসজী মুখে কোন কথা না বলিয়া, গোস্বামী প্রভুকে "হঠযোগ দীপিকা" ও "বিচারসাগর" নামক দুইখানি গ্রন্থ পাঠ করিতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন—"এই গ্রন্থদ্বয় এই স্থানেই (দ্বারভাঙ্গায়) ৫৲ টাকা মূল্যে ক্রয় করিতে পারিবে।" আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অনেক অনুসন্ধানের পর স্থানীয় একটী দোকানে দুইখানি মাত্র গ্রন্থই পাওয়া গিয়াছিল এবং বিক্রেতা গ্রন্থের মূল্য পাঁচ টাকাই চাহিয়াছিল। গোস্বামী প্রভু অতিশয় আগ্রহ সহকারে উক্ত গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিয়া যখন দেখিলেন যে, উক্ত গ্রন্থলিখিত সকল অবস্থার সহিত তাঁহার সাধনঘটিত অবস্থার সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে, তখন তাঁহার সকল সংশয় দূর হইল।

অতঃপর গোস্বামী প্রভু দ্বারভাঙ্গা হইতে ক্রমান্বয়ে মতিহারী, মজঃফরপুর, মুঙ্গের, জামালপুর প্রভৃতি স্থানে গমন করতঃ, আর্য্যধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ ও কলিযুগে তারকব্রহ্ম হরিনাম কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া, অবশেষে হুগলী জেলার থৈপাড়া গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় কিছু দিন অবস্থান করিয়া কোন্নগরের উৎসবে গমন করেন। এই সময়ে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকনিবাসে ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সপরিবারে অবস্থান করিতেছিলেন। গোস্বামী প্রভুর আগমনে শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রবাবুপ্রমুখ আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মগণ অতীব আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল। এই স্থানে অবস্থানকালে যে কয়েকটি আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রবাবুর সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া মাতঙ্গিনী দেবীর বর্ণিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। গোস্বামী প্রভুর অন্যতম সেবক শ্রীযুত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঘটনা কয়েকটী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেবী বলিয়াছেন :—(১) "আমরা যখন কোন্নগর ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারক-নিবাসে ছিলাম, তখন গোস্বামী মহাশয় এক দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার সঙ্গে শ্রীশ্রীধর ঘোষ, শ্রীযুত শ্যামাকান্ত পণ্ডিত, নবকুমারবাবু ও মহেন্দ্র মিত্র মহাশয় ছিলেন (ইঁহারা সকলেই গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য)। তিনি আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। একটী কুকুর, তার পা দুখানা একেবারে ভাঙ্গা, ছেচ্ড়ু দিতে দিতে গোঁসাইকে পরিক্রমণ করিয়া, তাঁহার পায়ের নিকটে আসিয়া পড়িয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, পুনরায় কুক্কুরটা অতি ক্লেশে সমস্ত ঘর পরিক্রমণ করিয়া রাত্রিতে দেহ রাখিল। এই দেহ পরে গঙ্গায় দেওয়া হয়।"

২। "সেই দিন রাত্রে স্বপ্নে আমার বালগোপালরূপ দর্শন হইল।

গোপালের সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার, পায়ে নূপুর, আঙ্গিনায় দৌড়িয়া বেড়াইতেছেন। আমি ঐ রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ধরিবার জন্য ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। পরে ধরিয়া ফেলিয়া মুখচুম্বন করিতে লাগিলাম। ঐ স্বপ্ন দেখিয়া আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল, এই গোঁসাই সেই গোপাল। আমি এই ভাবে এত অস্থির হইলাম যে, গোঁসাই পায়খানায় যাইতেছেন, আমি তাঁহাকে শৌচ করাইয়া দিতে চাহিলাম। ইহাতে তিনি করযোড়ে বলিলেন—'মা, মাপ কর, তুমি জন্মে জন্মে কতবার এইরূপ আমাকে করিয়াছ।' আমি ঐ ভাবেই বিভোর। সকালে চা খাইবার সময় আমি নূতন কাজলপাতা কিনিয়া আনিয়া কাজল তৈয়ার করিলাম। স্বহস্তে যাইয়া গোপালের চক্ষে কাজল দিলাম এবং মাথায় চূড়া বান্ধিয়া দিলাম। তাহার পর ছোট ধামাতে মুড়ি মুড়্কি ও কিছু মিষ্ট দিলাম। তখন ভাবাবেশে গান আসিল :—

কীর্ত্তন—একতালা।

"দেখ সবে আসি, যত নদেবাসী
আমার গৌরাঙ্গ চাঁদে।
গোরা প্রভাতে উঠিয়া, অঞ্চল ধরিয়া
'ননী দে মা' বলে কাঁদে।
: (ননী কোথা বা পাব)
আমি নহি আভীরিণী কোথা পাব ননী,
পড়িনু বিষম ফাঁদে॥"

এই গান গাহিতে গাহিতে জ্ঞানহারা হইয়া গোপালের মুখচুম্বন করিতে লাগিলাম ও বুকে ধরিয়া নিজকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতে লাগিলাম। গোঁসাইকে অঞ্জন পরাইয়া দিবার সময় তিনি বলিলেন—"মা, আমাকে

ভাল ক'রে জ্ঞানাঞ্জন পরাইয়া দাও, যেন সর্ব্বত্র তোমার ভুবনমোহিনী রূপ দেখিয়া কৃতার্থ হ'তে পারি।"

৩। "আমাদের বাসায় একটী ঝি ছিল। আমি ঐ ঝির দীক্ষার জন্য করযোড়ে গোঁসাইএর নিকট বলিলাম—'গোঁসাই, তুমি ত কত পতিতকে উদ্ধার করিয়াছ, ইহাকে দয়া কর।' গোঁসাই সম্মত হইলেন এবং উহাকে দীক্ষা দিলেন। যেই দীক্ষা হইল, অমনি অজ্ঞান হইয়া ভাবের তরঙ্গে গড়াগড়ি দিতে লাগিল, লজ্জা সরম দূরে গেল—ভাবে উন্মাদিনী। সে প্রায় মাসেক পর্য্যন্ত এই ভাবে ছিল। ক্ষণে ক্ষণে অজ্ঞান হইত ও উন্মত্তের ন্যায় চলিত ফিরিত। ইহার দীক্ষাব কালে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, গোঁসাই দয়ার অবতার হইয়া পতিতকে উদ্ধার করিতেছেন। তখন আমি ভাবাবেশে গান ধরিলাম :—

কীর্ত্তন—একতালা।

"ভবপারে যেতে ভয় কি আছে রে।
ঐ দেখ নামতরি ল'য়ে হরি নাবিক সেজেছে।
(পারের ভয় নাই, নাই রে)
ঐ দেখ পতিতপাবন দয়াল হরি
কাণ্ডারী সেজেছে।"

আমি ভাবে অধীর হইয়া পড়িয়াছি। এই অবস্থায়ই শ্রীমতী কুসুম (শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী) ও আমাকে পাক করিতে হইল। কুসুম আমার বাল্যসহচরী ও গোস্বামী প্রভুর মন্ত্রশিষ্যা। কখন আমি পাক করিতেছি, কুসুম কীর্ত্তনে আবিষ্ট হইতেছে, আবার কখন আমি আবিষ্ট হইতেছি, কুসুম পাক করিতেছে। দাইল ভাজিয়া তখনই তৈয়ার করিয়া ভুলিয়া ভুঁষি সহ খিচুড়ী পাক করিলাম। খিচুড়ী

আবার পোড়া লাগিয়াছে। ভোগের সময় আমি গোঁসাইকে বলিলাম—'পাকের সময় তুমি আমাকে বিহ্বল করিলে, আমি ভূঁষি সমেত খিচুড়ী পাক করিয়াছি, তাহাও আবার পোড়া লাগিয়াছে। এখন ভাল মন্দ আমি জানি না।' তখন গোঁসাই জড়ভরতের গল্প করিয়া বলিলেন—'এই খিচুড়ী স্বয়ং গোলোকের লক্ষ্মী পাক করিয়াছেন, ইহা সুধা হইতেও সুমিষ্ট হইয়াছে। আপনি বিহ্বল ছিলেন তাতে আর কি হ'য়েছে?'

"গোঁসাইএর কৃপাপ্রাপ্ত পূর্ব্বোক্ত ঝিকে দেখিয়া জগন্নাথঘাটের একজন সাধু সাষ্টাঙ্গে প্রণামকরতঃ বলিয়াছিলেন—"মা! এ জিনিষ তুই কোথায় পে'লি? এ যে দেখিতেছি তোর প্রতি সদ্‌গুরুর কৃপা হ'য়েছে।"

"আর একবার গোঁসাই আমাদের কাঁসারিপাড়ার বাসায় আসিয়াছিলেন। তিনি আসিবার কিছুক্ষণ পরেই ঝাঁকে ঝাঁকে শিষ্যমণ্ডলী আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ইঁহারা যে কি করিয়া এত শীঘ্র টের পাইলেন, ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। গোঁসাই আসিবার দিন-দুই পরে আমার ইচ্ছা হইল, আমি কৃষ্ণ-গোপালের ভোগ দেই। আমি যোড়হাতে গোঁসাইএর অনুমতি লইলাম। মণি ও বৃন্দাবন বাবু (গোস্বামী প্রভুর শিষ্যদ্বয়) ভোগের সমস্ত জিনিষপত্র সংগ্রহ করিয়া দিলেন। আমি রাত্রি চারিটার সময় উঠিয়া স্নান করিয়া ভোগ রসুই করিতে লাগিলাম। এই সময় এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। কলেতে চাউল ধুইতেছি, দেখি ঐ সকল চাউল "হরে কৃষ্ণ" "হরে কৃষ্ণ" ধ্বনি করিতেছে। ভাজা ভাজিতেছি, উহা হইতেও "হরে কৃষ্ণ" "হরে কৃষ্ণ" ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। ভাত টক্‌বক্ করিয়া ফুটিতেছে, শুনিতেছি "হরিবোল" "হরিবোল"। যেদিকে যাইতেছি কেবল শুনিতেছি "হরিবোল" "হরিবোল"। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি আকুল হইলাম। উপরে যাইয়া আমি গোঁসাইকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই যে সব হরিধ্বনি শুনিয়া আমি উন্মত্তবৎ

হইয়াছি এ সব কি ? গোঁসাই বলিলেন—"আপনি কৃষ্ণ-গোপালের ভোগ দিবেন, তাই সমস্ত দেবতারা আনন্দে হরিধ্বনি করিতেছেন। আপনার দিব্য কর্ণ খুলিয়া গিয়াছে, তাই ঐ সব ধ্বনি শুনিতেছেন।" পরে ভোগ পারশ করিলাম। ভোগ বেশ করিয়া বাটীতে বাটীতে সাজাইয়া গোঁসাইকে জানাইলাম এবং বলিলাম—"দেখুন, হরিধ্বনি শুনিয়া শুনিয়া আমি মাতোয়ারা হইয়া ভোগ রসুই করিয়াছি, এখন ভাল মন্দ আমি কিছু জানি না।" গোঁসাই বলিলেন—"কৃষ্ণ-গোপাল খাইবেন বলিয়া উহা স্বয়ং গোলোকের লক্ষ্মী রসুই করিয়াছেন, উহা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে, উহার অপূর্ব্ব আস্বাদ হইয়াছে।" পরে ধূপ ধূনা দিয়া গোঁসাইকে আহ্বান করিলাম। তিনি আসনে বসিয়া করযোড়ে চক্ষু মুদিলেন, কিছুক্ষণ পরে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। অতঃপর আমি কিছু প্রসাদ পাত্র হইতে লইয়া তাঁহার মুখে দিলাম। তিনি তখন ভাবে মাতোয়ারা হইয়াছেন, চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ঐ স্বয়ং জগন্নাথদেব এই ভোগ গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন। ঐ স্বয়ং বৃন্দাবনচন্দ্র বৃন্দাবন হইতে আসিয়াছেন। ঐ শচীনন্দন! ঐ শ্রীনিত্যানন্দ! ঐ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র! ঐ তেত্রিশ কোটি দেবতা প্রসাদ পাইতে উপস্থিত হইয়াছেন! এই প্রসাদের তুলনা নাই, যে স্থানে এই প্রসাদ পড়িবে সেই স্থানই ধন্য হইবে।" আমি ঐ সময় দেখিতে পাইলাম, সহস্র সহস্র কোটি কোটি কাল মাথা এই প্রসাদের চতুর্দ্দিকে জড় হইয়াছে। গৃহস্থিত সমস্ত ভক্তবৃন্দ, গোঁসাইএর নিকট আসিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিতেছেন, তিনিও সকলকে খাওয়াইতেছেন। এমন সময় আমি একখানা অপূর্ব্ব গৌরবর্ণ হস্ত ঐ পাত্র হইতে, ভোগ গ্রহণ করিতেছে দেখিলাম, দেখিয়াই আমি চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলাম—"এ কাঁহার হস্ত, এ কাঁহার হস্ত"। গোঁসাই চীৎকার করিয়া বলিলেন—"শচীনন্দন, শচীনন্দন"। আমি ঐ হস্ত

জড়াইয়া ধরিতে গেলাম, কিন্তু পারিলাম না ; অন্যের হস্ত ধরিয়া ফেলিলাম। ইহার পরই আমি অজ্ঞান হইয়া গেলাম। পরে শুনিলাম, ঐ গৃহে খোল আসিল, করতাল আসিল। আমাকে ঘেরিয়া ঘেরিয়া অনেক কীর্ত্তন হইল, কিছুতেই আমার জ্ঞান হইল না। পরে গোঁসাই আমার কর্ণে হরিনাম দিয়া, মাথায় হাত বুলাইয়া, পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া আমাকে চেতন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে আমি এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া গোঁসাইকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন—"আপনি যথার্থই শচীনন্দনের হস্ত দর্শন করিয়াছিলেন। আপনি অতিশয় পুণ্যবতী, তাই এ সকল দর্শন পাইয়াছেন।"

স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একস্থলে বলিয়াছিলেন যে—"গোস্বামী মহাশয় একদিন জনৈক ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিকে সাধন দিতেছিলেন। আমি সেই স্থানে উপস্থিত ছিলাম। ক্ষণকাল পরে দেখিতে পাইলাম, গোস্বামী মহাশয়ের ঠিক পশ্চাৎ ভাগে একটী দিব্যকান্তিধারী মহাপুরুষ বিরাজ করিতেছেন। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট ইঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে, "ইনি আমার গুরুদেব। সাধন দিবার সময় আমাকে সাহায্য করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আপনি ভাগ্যবান্, তাই তাঁহার দর্শন পাইয়াছেন।"

এইরূপ গোস্বামী প্রভুর শিষ্য ভিন্ন অপরাপর অনেক মহানুভব ব্যক্তিগণ তাঁহার অসাধারণ মহত্ত্বসূচক অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল না।

অতঃপর গোস্বামী প্রভু কোন্নগর হইতে কলিকাতা হইয়া শান্তিপুর গমন করিলেন। তথায় কিছু দিন অবস্থানপূর্ব্বক খুলনা জেলার অন্তর্গত বাগেরহাট গমন করেন। এই স্থানে "মানুষের প্রাণ অনন্তকেই চায়" এই বিষয়ে একটী অতীব হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদানকরণানন্তর, পল্লীতে

অতঃপর রাজা বাহাদুরের উদ্যোগে একটী বিরাট নগরকীর্ত্তন বাহির করা হইল। প্রায় ২৪।২৫ দলে বিভক্ত হইয়া কীর্ত্তনকারিগণ যখন ৮০টী মৃদঙ্গ ও ততোধিক করতাল সহযোগে গগনভেদীস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে নগর পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন সমগ্র কাকিনা সহরটী একেবারে তোলপাড় হইয়া উঠিয়াছিল। গোস্বামী প্রভু মহাভাবে বিভোর হইয়া সিংহবিক্রমে দোর্দ্দণ্ড নৃত্যে মেদিনী কম্পিতকরতঃ অগ্রসর হইলে, চতুর্দ্দিক হইতে অসংখ্য লোক তীরবেগে কীর্ত্তনের মধ্যে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া, ধূলায় অবলুণ্ঠিত ও অশ্রুজলে ধরা অভিষিক্ত করিতে লাগিল। একদল বালক গোস্বামী প্রভুকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে করিতে গমন করিতেছিল। তিনি ভাবাবেশে তাহাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যেমন একবার হাত তুলিতেছিলেন আবার নামাইতেছিলেন, তখন বালকের দল কুহকাবিষ্ট কাষ্ঠপুত্তলিকার মত তাঁহার হস্তের তালে তালে নাচিতে লাগিল, আর সহরবাসী মহানন্দে নাচিয়া পুষ্পবর্ষণের ন্যায় তাঁহাদের উপরে হরিরলুট ছড়াইয়া উচ্চ হরিধ্বনিতে দশদিক প্রকম্পিত করিতে লাগিল। এই মহাসংকীর্ত্তনে কাকিনাবাসী বহু নাস্তিকের আস্তিক্য-বুদ্ধি জাগরিত হইয়াছিল, কাকিনা সহর ধন্য হইয়াছিল।

কাকিনা ছাত্রসমাজের উৎসবের দিন রাত্রিতে গোস্বামী প্রভুর উপাসনা করিবার কথা ছিল। অপরাহ্নে স্থানীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে এক সংকীর্ত্তনে যোগদান করিবার জন্য লইয়া গেল। তিনি সংকীর্ত্তনে বিহ্বল হইয়া আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। ক্রমে রাত্রি হইল, কিন্তু তাঁহার চৈতন্য হয় না। ছাত্রসমাজ হইতে কয়েকজন লোক তাঁহাকে ডাকিতে আসিয়া তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ফিরিয়া গেল। তখন ছাত্রদিগের মধ্যে কেহ কেহ গোস্বামী প্রভুকে মিথ্যাবাদী বলিয়া গালি দিতে

লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই গোস্বামী প্রভুর চৈতন্য হইলে, তিনি অতি দ্রুতপদে উপাসনাগৃহে উপনীত হইলেন; এবং উপাসনা আরম্ভ করিয়াই বলিতে লাগিলেন—"মা! একি দেখিতেছি! আমাকে যে লোকে গালি দিয়াছে, সেই সকল আঘাতের চিহ্ন তোমার শরীরে দেখিতেছি। এখন আমি তোমাকে পূজা করিব কি কাঁদিব?" বলা বাহুল্য, যাহারা ইতঃপূর্ব্বে গোস্বামী প্রভুর প্রতি অযথা দোষারোপ করিয়াছিল, তাহারা ঐ কথা শুনিয়া ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিল।

এই উৎসবে গোস্বামী প্রভু শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জনবাবুর দ্বারা বক্তৃতা করাইয়াছিলেন। তিনি পীড়িতাবস্থায় ৫।৬ দিন শয্যাগত থাকিয়া সেই দিন মাত্র পোড়ের ভাত খাইয়াছেন। এতদবস্থায় সমাগত পঞ্চসহস্রাধিক লোকের সমক্ষে তাঁহাকে প্রায় তিন ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার প্রাণস্পর্শী ওজস্বিনী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া স্বপক্ষ বিপক্ষ সকলেই সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিল। রাজাবাহাদুর বলিয়াছিলেন—"আমি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া এরূপ বক্তৃতা শ্রবণ করিতে পারি।" শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জনবাবু বলিয়াছেন—"আমার দাড়াইবার মতন পায়ে বল ছিল না, বক্তৃতা করিবার উপযুক্ত শক্তি কণ্ঠে ছিল না। কি বলিব কিছুই স্থির ছিল না। হঠাৎ কোথা হইতে শক্তি আসিল। ভূতাবিষ্টের মত বলিয়াছিলাম, উহাতে আমার কোনই কর্ত্তৃত্ব ছিল না।" বস্তুতঃ এই উৎসবে সাধুমহাপুরুষদিগের কৃপায় কাকিনাবাসী আবালবৃদ্ধ-বনিতার প্রাণমন খুলিয়া গিয়াছিল। বাদকের বাদ্যযন্ত্র, গায়কের কণ্ঠ, বক্তার বক্তৃতাশক্তি—সমস্তই যেন দৈববল প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কাকিনা হইতে গোস্বামী প্রভু, তদীয় সহধর্ম্মিণী শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী ও কতিপয় শিষ্যসমভিব্যাহারে কামাখ্যা পরিদর্শন করিবার জন্য ধুবড়ী হইয়া কামাখ্যায় উপনীত হইলেন।

দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা শুনিয়া সতী দেহ ত্যাগ করিলে, সতীপতি মহাদেব সতীর অপমানজনিত ক্রোধে অধীর হইয়া যজ্ঞ পণ্ড করেন; এবং দক্ষরাজকে সংহার করিয়া, সতীদেহ স্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া প্রলয় তাণ্ডব করিতে থাকেন। তাহাতে ধরাতল রসাতলে যাইবার উপক্রম হইলে, তন্নিবারণকল্পে দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য, ব্রহ্মাদি দেবতাদিগের প্রার্থনায় স্বয়ং বিষ্ণু চক্র দ্বারা সতীদেহ ৫১ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত করেন। সতীদেহের সেই সকল অংশ যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, তাহা মহাতীর্থে পরিণত হইয়া পীঠ-স্থান আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে। কামাখ্যাপর্ব্বতে যোনীর অংশ নিপতিত হইয়াছিল বলিয়া, ইহাকে যোনীপীঠ বলে। * পুরাণে বর্ণিত আছে যে, অম্বুবাচীর সময় ধরিত্রীদেবী রজস্বলা হন; এবং এই সময় এই পীঠস্থানে তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জন্য প্রতিবৎসর অম্বুবাচীর সময় এই স্থানে বহু ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি সমবেত হইয়া পীঠস্থান দর্শন ও স্পর্শন করিয়া পবিত্র হইয়া থাকেন।

অম্বুবাচীর সময় একদিন রাত্রে গোস্বামী প্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া একাকী পীঠস্থান দর্শন করিবার জন্য তীরবেগে মন্দিরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। এই সময় রাত্রে কাহাকেও মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দেওয়া

* যোনীপীঠং কামগিরৌ কামাখ্যা তত্রদেবতা।
যাত্রান্তে ত্রিগুণাতীতা রক্ত পাষাণরূপিণী।
যাত্রান্তে মাধবসাক্ষাদুমানন্দোঽথ ভৈরবঃ।
সর্ব্বত্র বিরলা চাহং কামরূপে গৃহে গৃহে।
গৌরীশিখরমারুহ্য পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।

তন্ত্র-চূড়ামণি।

হয় না। এই জন্য মন্দিরের দ্বারে সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত থাকে। কিন্তু গোস্বামী প্রভু ভাবাবেশে হেলিয়া দুলিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন দেখিয়াও কেহ তাঁহাকে বাধা দিল না। তিনি অনায়াসে অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক 'বম্ বম্' শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে পীঠস্থান পরিক্রমণ করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন, এমন সময় অনুভব করিলেন, যেন পিচকারীর ধারার ন্যায় কোন তরল পদার্থ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বর্ষিত হইল। কিন্তু মন্দিরাভ্যন্তরে তখন অন্ধকার থাকা প্রযুক্ত ইহার কোন কারণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেন না। স্বীয় বাসভবনে আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার সমস্ত বসন-ভূষণ রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া আছে। এই ঘটনা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পুরাণবর্ণিত অম্বুবাচীর সময় ধরিত্রী-দেবীর রজস্বলা হওয়ার কথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণীকৃত হইল।

অতঃপর গোস্বামী প্রভু এই স্থানের তাৎকালিক প্রসিদ্ধ সাধু শ্রীমৎ নিত্যানন্দ স্বামী ও অচলানন্দ তীর্থাবধূতকে দর্শন করিলেন। ইঁহারা উভয়েই পরম সাধুপুরুষ। ইঁহাদের সহিত গোস্বামী প্রভু নানাপ্রকার ধর্ম্মালাপ করিয়া পূর্ণানন্দভৈরব দর্শন করিলেন। গৌহাটীর নীচে ব্রহ্মপুত্র নদের গর্ভে পূর্ণানন্দভৈরবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। স্থানটীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতীব মনোহর, সাধনভজনের বিশেষ অনুকূল। বহুলোক এই স্থানে সাধন করিয়া সফলকাম হইয়াছেন।

কামাখ্যা পর্ব্বতের শিখরদেশে ৺ ভুবনেশ্বরীর মন্দির বিরাজিত। এই স্থানে একদিবস ভুবনেশ্বরীর প্রকাশ দেখিয়া গোস্বামী প্রভু মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

কামাখ্যা পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী গৌহাটী নগরে গোস্বামী প্রভু বাস করিতেন। এই নগর হইতে তিন ক্রোশ দূরে বশিষ্ঠাশ্রম অবস্থিত। এই স্থানে বশিষ্ঠদেব সিদ্ধিলাভ করেন। ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র এই আশ্রমে

উপনীত হইয়া আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। মন্দিরের নিকট দিয়া একটী পার্ব্বত্য জলস্রোতঃ খরবেগে প্রবাহিত হইতেছে। তাহাতে অর্দ্ধ-জলমগ্ন অনেক প্রস্তরখণ্ড বিদ্যমান আছে। ইহার উপরে বসিয়া সমাগত ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ ভজন করেন। সাধনের এমন নির্জ্জন, প্রাকৃতিক শোভা-পরিপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক স্থান হিমালয়ের নীচে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। একজাতীয় পোকা অবিশ্রান্ত ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় একপ্রকার শব্দ করিতেছে। গোস্বামী প্রভু অনেক সময় এই নির্জ্জন আশ্রমে আসিয়া সমস্ত দিন সাধনভজনে অতিবাহিত করিতেন, এবং সায়ংকাল উপস্থিত হইলে সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। এই প্রকারে কিয়ৎকাল কামাখ্যায় অবস্থান পূর্ব্বক তথাকার সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান সকল দর্শন করিয়া গোস্বামী প্রভু সপরিবারে ঢাকায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মার্থীদিগকে দীক্ষাদান।

ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংঘর্ষ এবং প্রচারক পদত্যাগ।

গোস্বামী প্রভু যোগসাধন গ্রহণানন্তর ভগবৎকৃপায় যোগমার্গের প্রবর্ত্তক, সাধক ও মুঞ্জনসিদ্ধ, এই তিনটি অবস্থা অতিক্রম করিয়া, চতুর্থ যুক্তসিদ্ধ অবস্থায় উপনীত হইলে, তদীয় গুরুদেব মানসসরোবরবাসী পরমহংসজীর আদেশে, সকল সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্ম্মপিপাসুব্যক্তিগণকে তাঁহাদের প্রার্থনায় যোগদীক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সাধন-প্রণালী ব্রাহ্মসমাজের প্রণালী হইতে স্বতন্ত্র এবং উহার কোন কোন অঙ্গ নির্জ্জনে অনুষ্ঠান করিতে হয়, এই কারণে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে গোস্বামী প্রভুর নূতন সাধন-প্রণালী সম্বন্ধে গোপনে গোপনে অল্পাধিক পরিমাণে আলোচনা হইতে লাগিল। পরে ফরিদপুরের অন্তর্গত মাণিকদহ অবস্থান কালে, গোস্বামী প্রভুর ভক্তি ও অনুরাগ দর্শনে মোহিত হইয়া স্থানীয় জমিদার ৺ বিপিনবিহারী রায় মহাশয় সস্ত্রীক ও অপরাপর কতিপয় ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা, গোস্বামী প্রভুর নিকটে যোগদীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহাতে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রকাশ্যে আন্দোলন হইতে লাগিল। পূর্ব্ববাঙ্গালার প্রধান প্রধান ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের সন্দেহ নিরসনার্থে, গোস্বামী প্রভুকে তাঁহার যোগসাধনপ্রণালী সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অভিপ্রায় করিলেন। গোস্বামী প্রভু তাহাতে সর্ব্বান্তঃকরণে সম্মতি প্রদান করিলে, ব্রাহ্মগণ একত্র হইয়া গোস্বামী প্রভুকে অন্যূন ত্রিশটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনিও একে একে তাঁহাদের সমুদয় প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিলে, তাঁহারা অতীব সন্তুষ্ট হইলেন, এবং আন্দোলন কিছু দিনের জন্য বন্ধ হইল। গোস্বামী প্রভুর

অন্যতম শিষ্য ৺ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রশ্নোত্তরগুলি সংগ্রহ করিয়া 'যোগসাধন' নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন।

এই সময় গোস্বামী প্রভু, ৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে, মহিলাদিগের ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় স্বীয় জীবন-কাহিনী অবলম্বনে, যোগতত্ত্ববিষয়ক বহু সারগর্ভ উপদেশাবলী, 'আশাবতীর উপাখ্যান' নামক প্রবন্ধে ধারাবাহিকরূপে বিবৃত করিয়াছিলেন। উহা পৃথক্ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

অতঃপর গোস্বামী প্রভু কলিকাতায় আগমন করিলে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত অনেক ব্রাহ্ম তাঁহার নিকটে যোগদীক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া তত্রস্থ প্রধান প্রধান ব্রাহ্মদিগের মনে ভয়ানক আশঙ্কার উদয় হইল, পাছে কালক্রমে সমস্ত ব্রাহ্মগণই ব্রাহ্মসমাজের সাধনপ্রণালী পরিত্যাগ করিয়া 'যোগসাধন' গ্রহণ করেন। তাঁহারা গোস্বামী প্রভুর আচরণের মধ্যে অনেক দোষ দর্শন করিতে লাগিলেন। গোস্বামী প্রভু গোপনে সাধন প্রদান করেন, তাঁহার নিকটে রাধা-কৃষ্ণ ও শ্যামা-বিষয়ক গান হয়, তিনি দেবপ্রতিমার নিকটে প্রণাম করেন, তাঁহার বাসভবনে হিন্দুদেবদেবীর মূর্ত্তি রাখা হয়, এই সকল কার্য্য, অধিকাংশ ব্রাহ্মদিগের নিকটে ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ বিবেচিত হওয়াতে, তাঁহারা তাহার ঘোর প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া গোস্বামী প্রভু ১৮০৮ শকের ১০ই চৈত্র সাধারণব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নিকট প্রচারকার্য্যের ত্যাগপত্র প্রেরণ করেন, কিন্তু কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনুরোধে ঐ পত্র প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন। ইহাতে আন্দোলন প্রশমিত হইল না। অধিকন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দুইজন সভ্য, গোস্বামী প্রভুর কার্য্যের অতি তীব্র প্রতিবাদ করিয়া, দুইখানি পত্র কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় দাখিল করেন। উক্ত পত্র পাইয়া কার্য্য-

নির্ব্বাহক সভা একটী সব্ কমিটি গঠন করিয়া তাহার উপর গোস্বামী প্রভুর মত ও সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার ভার অর্পণ করেন। কমিটীর সভ্যগণ ১৮০৯ শকের ৩০শে বৈশাখ সিটি কালেজে একটী সভা আহ্বানপূর্ব্বক, গোস্বামী প্রভুকে তাঁহার কার্য্যপ্রণালীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের উত্তর প্রদান করিবার জন্য সংবাদ প্রেরণ করেন। গোস্বামী প্রভু তদুত্তরে সভ্যগণকে জানাইলেন যে, ঐরূপ ভাবে তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহার উত্তর দিতে প্রস্তুত নহেন। তবে যদি বন্ধুভাবে কেহ তাঁহার বাটীতে আসিয়া ঐ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তাহার উত্তর প্রদান করিবেন। সভ্যগণ অগত্যা গোস্বামী প্রভুর বাসভবনে আগমন করিলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে গোস্বামী প্রভুর সাধনপ্রণালীসম্বন্ধে অনেক কথোপকথন হইল। অতঃপর তাঁহারা একটী দীর্ঘ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নিকট প্রেরণ করিলেন। তন্মধ্য হইতে স্থূল বিষয়গুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে, যথা :—

"গোস্বামী মহাশয়ের সাধনপ্রণালী বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইলে, ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত আরাধনা, প্রার্থনা প্রভৃতি তিষ্ঠিতে পারিবে না। এই সাধন বালক ও পৌত্তলিকদিগকে দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে, সাধন করিতে করিতে কালে সত্য প্রকাশিত হইবে। এ মত ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে অত্যন্ত অকল্যাণকর। ইহাতে লোকে ব্রাহ্মসমাজের দিকে অগ্রসর হইবে না। গোস্বামী মহাশয় বলেন যে মানুষ গুরু নাই, গুরু একমাত্র পরমেশ্বর। কিন্তু সাক্ষাৎভাবে তাঁহাদের মধ্যে গুরুবাদ না থাকিলেও, পরোক্ষভাবে তাঁহাদের মধ্যে গুরুবাদ প্রচার হইতেছে। তাঁহার আশাবতীর উপাখ্যান গুরুবাদের সমর্থন করিতেছে। গোস্বামী মহাশয়ের নিকট রাধাকৃষ্ণের ছবি থাকে। রাধাকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

থাকিলেও, তাহা দ্বারা বৈষ্ণবসমাজের মহা অনিষ্ট সাধন হইয়াছে; সুতরাং তাহা একেবারে বর্জ্জন করা উচিত। গোস্বামী মহাশয় বলেন, ভগবানকে কালী, দুর্গা, আল্লা সকল নামেই ডাকা যায়। এ মত ব্রাহ্মগণ মারাত্মক মনে করেন। বিজয়বাবু বলেন, পরলোকগত সাধুগণ তাঁহার নিকট আগমন করেন। জীবিত সাধুগণ সূক্ষ্মদেহে এবং যোগবলে স্বদেহে তাঁহার নিকট আসিয়া থাকেন। একটী বৃক্ষ দেখিয়া বলিয়াছেন, এই বৃক্ষে একটী আত্মা আছে। বৃক্ষের তলে কীর্ত্তন কর, তাহা হইলে সে উদ্ধার হইয়া যাইবে। তাঁহার গুরুদেবও তাঁহার নিকট আগমন করেন। একটী জন্মজড় বালক দেখিয়া বলিয়াছিলেন, ইহার দেহে একটী যোগিনী বাস করিতেছে, সে ছাড়িয়া গেলে এ ভাল হইবে, এ সকল তাঁহার কোন প্রকার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বশতঃ হয় কি না তাহা বলিতে পারি না। তবে এই দ্বার দিয়া অনেক কুসংস্কার ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইতে পারে।"

সব্‌কমিটির এই মন্তব্য প্রেরিত হইবার পূর্ব্বেই গোস্বামী প্রভু প্রচারকের পদত্যাগ করিয়া এক খানি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং তৎপরে "ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের প্রতি নিবেদন" নামে একখানি পৃথক্ পত্র মুদ্রিত করিয়া ব্রাহ্মসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিলেন। পত্রখানি যথাযথ উদ্ধৃত করা যাইতেছে, যথা :—

ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের প্রতি নিবেদন।

"যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। ইহাতে দলাদলি নাই। এজন্য আমি যেখানে সত্য পাই এবং সত্য বুঝি, তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আশঙ্কা করিতেছেন যে, আমার কার্য্যে তাঁহাদের ক্ষতি হইবে। অতএব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুদিগকে সুখী করিবার জন্য আমি তাঁহাদের সঙ্গে সমস্ত বাহ্যিক সম্বন্ধ

পরিত্যাগ করিলাম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, নববিধান সমাজ, আদি সমাজ, হিন্দু সমাজ, খৃষ্টীয় সমাজ, মুসলমান সমাজ, আমি সকল সমাজের দাসানুদাস। আমার কোন সম্প্রদায় নাই অথচ সকল সম্প্রদায়ই আমার; যেখানে যতটুকু সত্য, সেইখানে আমার ব্রাহ্মধর্ম্ম। এখন হইতে এই সারসত্য সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিব।

এই অসীম বিশ্বরাজ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, আনন্দশক্তি মঙ্গলস্বরূপ, অজর, অমর, নিত্য, একমাত্র অদ্বিতীয় পবিত্রস্বরূপ। তিনি নিরাকার, অর্থাৎ তাঁহার কোন জড়ীয় রূপ নাই। তিনি সকলের স্রষ্টা, কোন সৃষ্ট বস্তুর মত তিনি নহেন। তিনি স্বতন্ত্র, কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা হয় না।

তিনি এক মাত্র অদ্বিতীয়, জগতে দুইজন ঈশ্বর নাই, তিন জনও নাই, অথবা অনেক ঈশ্বর নাই। যে কোন মনুষ্য জগদীশ্বর বলিয়া যে কোন নামে তাঁহাকে ডাকে, সে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে ডাকে। আর দ্বিতীয় যখন নাই, তখন অন্য ঈশ্বর কোথা হইতে আসিবে?

পরমেশ্বরের কোন নির্দ্দিষ্ট নাম নাই। নানা দেশের লোক আপন আপন ভাষায় এক একটী নাম করিয়া ডাকিয়া থাকে। সৃষ্টিকর্ত্তাকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্ম বল, খোদা বল, আল্লা বল, হরি বল, রাম বল, কালী বল, কৃষ্ণ বল, দুর্গা বল, তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষতি নাই। কেহ বলেন, লোকের মনে ভ্রান্তি জন্মাইতে পারে, এ কথা ঠিক নহে। কারণ, হরি শব্দে সিংহ, অশ্ব, বানর এবং পাপহরণকারী পরমেশ্বর এই সমস্তগুলি বুঝাইয়া থাকে। কেহ যদি ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া গদগদভাবে ডাকিতে ডাকিতে অশ্রুপাত করে, তখন এমন কোন লোক নাই যে বলিবে, এ লোকটা বানর প্রভৃতি পশুগুলাকে ডাকিয়া কাঁদিতেছে। বিশেষতঃ মানুষের ভ্রম হইলে বা ক্ষতি কি? আমাদের উদ্ধারকর্ত্তা মনুষ্য

নহেন। আমার দেবতা অন্তর্য্যামী ; তিনি জানিলেই হইবে। তুমি যে নামে ভগবান্‌কে লাভ কর, সেই নাম তোমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ। অন্যে যে নামেই ডাকুক, তাহাতে আপত্তি কি ?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঈশ্বরের জড়ীয় রূপ নাই। এজন্য তাঁহাকে নিরাকার বলি। কিন্তু তাঁহার নিরাকার সচ্চিদানন্দ রূপ আছে। যাহা জ্ঞানচক্ষে দর্শন করা যায়। যেমন জ্ঞানচক্ষু আছে, সেইরূপ জ্ঞানকর্ণ আছে। জ্ঞাননাসিকা, জ্ঞানরসনা আছে, যাহাতে শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন অনুভব হয়। জ্ঞানচক্ষে ইহলোক ও পরলোকে যাহা কিছু সত্য আছে, তাহা প্রত্যক্ষ করা যায়। সাধন দ্বারা জ্ঞানচক্ষু বিকসিত হইতে পারে ; অনেকেরই হয়। পরমেশ্বর এক, তাঁহার প্রদত্ত মানবীয় ধর্ম্মও এক। যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম। সত্যধর্ম্মে দল নাই, সম্প্রদায় নাই। মনুষ্যের ভ্রমপ্রমাদে দলাদলি সৃষ্ট হয়। প্রকৃত ধর্ম্মে দল নাই।

ঈশ্বরকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা, তাঁহার উপাসনা। তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসিলে, তবে তাঁহার প্রিয়কার্য্য করা যায়। আমি যদি তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসি, তাহা হইলে যে কেহ তাঁহাকে ভালবাসেন, তাঁহার পূজা অর্চ্চনা করেন, তিনিই আমার পরম আত্মীয় বন্ধু ; এজন্য যেখানে তাঁহার পূজা অর্চ্চনা হয়, সেই স্থানেই গমন করি। যেখানে তাঁহার নাম কীর্ত্তন হয়, সেই স্থানেই উপস্থিত হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করি। আমার প্রভুকে পূজা করিতেছে, কত আনন্দ! আনন্দ ধরে না। এজন্য শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, খৃষ্টান, মুসলমান সকল স্থানে প্রভুকে অন্বেষণ করি। কত বৃক্ষতলে, কত পর্ব্বতে, নদীগর্ভে, দেবমন্দিরে, মস্‌জিদে, গির্জ্জায়, আমার প্রভুকে প্রত্যক্ষ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণ একটী আধ্যাত্মিক রূপক। উপাসনা ও

যোগের এরূপ উচ্চভাব আর আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। রাধা ভক্ত, কৃষ্ণ উপাস্য-দেবতা, পরমেশ্বর। বুদ্ধ, যিশুখৃষ্ট, মহম্মদ, শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীর, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ, জনক প্রভৃতি মহাত্মাগণ আমাদের ভক্তির পাত্র। উপাসনার কালে ঈশ্বরের মধ্যে তাঁহাদিগকে দেখা যায়।

পরমেশ্বরই একমাত্র গুরু। তিনি গুরু হইয়া সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। জল, বায়ু, বৃক্ষ, লতা, অগ্নি, নদী, পর্ব্বত, গ্রহ, উপগ্রহ, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য সকলেরই মধ্য দিয়া সেই জগদ্‌গুরু শিক্ষা দিতেছেন। যখন যে বস্তুর মধ্যে শিক্ষা পাই, সেই বস্তুকেই ভালবাসি, ভক্তি করি। পিতা, মাতা, উপদেষ্টা প্রভৃতি গুরুজনকে ভক্তি করা প্রয়োজন। তাঁহাদের চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে ধর্ম্মলাভ হয়। কোন মনুষ্যকে ঈশ্বর-জ্ঞানে কি তাঁহার অবতার কি মধ্যবর্ত্তীরূপে প্রার্থনা করিলে অধোগতি হয়। নিজের অহঙ্কার নষ্ট করিতে হইলে, নরনারীমাত্রেরই পদধূলি গ্রহণ করা বিশেষ উপায়।

অহঙ্কার নষ্ট না হইলে ধর্ম্মের অঙ্কুর বাহির হয় না। পরমেশ্বর প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে জ্ঞান-প্রেম-শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। আত্মার সহিত পরমাত্মার জ্ঞান-প্রেম-শক্তির যোগ করাকেই যোগসাধন বলে। এই যোগসাধন করিলে মনুষ্যের দিব্যদৃষ্টি প্রস্ফুটিত হয়। ইহাকেই "করতলন্যস্ত আমলকবৎ" বলিয়াছেন। এ অবস্থা হইলে সংশয় থাকে না। এজন্য প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়াছেন :—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

কলিকাতা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারনিবাস।
৩১শে বৈশাখ, শক ১৮০৮।

নিবেদক—
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি কখনই কোন সমাজবিশেষের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিতে পারেন না। ব্রাহ্মসমাজে যে সকল লোক প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং এখনও যাঁহারা প্রবেশ করিতেছেন, তাঁহাদের সকলের জীবনের আদর্শ এক নহে। কেহ কেহ হিন্দুসমাজে কুসংস্কার ও দুর্নীতির প্রসার দেখিয়া ঐ সমাজ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কেহ কেহ পাশ্চাত্য সভ্যসমাজের অনুকরণে হিন্দুসমাজকে গঠন করিবার অভিপ্রায়ে, জাতিভেদ পরিত্যাগ, বাল্যবিবাহ প্রথার উচ্ছেদ, বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলন প্রভৃতি আদর্শ লইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন; আবার কেহ কেহ সমাজে ও দেশে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা সংস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আর এক দল ঈশ্বরোপাসনায় আত্মপ্রত্যয়ই (Intuition) যথেষ্ট এবং পৌত্তলিকতা, অবতারবাদ ও পৌরহিত্যপ্রথা সমাজের অকল্যাণকর, এই ভাব লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। আর একদল, পাশ্চাত্যশিক্ষালাভার্থ ও বিষয়কর্ম্মের অনুরোধে, বিদেশগমনে বাধ্য হইয়া অন্যত্র আশ্রয়াভাবে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করেন না, কেহ কেহ ভগবান্ একজন পুরুষ (Personal God) এই তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না, কেহ কেহ ইহা স্বীকার করিয়াও প্রার্থনা ও উপাসনার আবশ্যকতা বোধ করেন না। আর একদল মানবাত্মার অমরত্ব ও ক্রমোন্নতিতে বিশ্বাস করেন না, জন্মান্তর কি লোকান্তর ত দূরের কথা। এই প্রকার বিভিন্ন প্রকৃতির লোক লইয়া ব্রাহ্মসমাজ গঠিত। সুতরাং যাঁহারা ভগবান্‌কে পাইবার আশায় ব্যাকুলপ্রাণে এই ধর্ম্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছেন এবং অধিকাংশ সভ্যের মতে আপনাকে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা যে উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত হইবেন, ইহা বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। জড়জগতে দিনের পর দিনে অভিনব বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহ

আবিষ্কৃত হইতেছে, আর আধ্যাত্মিক জগতে নূতন সত্য সাধকের নিকটে প্রকাশিত হইতে পারে না, এ অতি অদ্ভুত কথা! বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারে যোগ্যতা জন্মে, এই বিশ্বাসেই সমস্ত নূতন সমাজে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিকরাজ্যে প্রবেশের দ্বার মস্তিষ্ক নহে, উহা হৃদয়। মস্তিষ্কে সংসার ও হৃদয়রাজ্যে আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ বিরাজ করে। ঐ তত্ত্বসমূহ লাভ করিবার জন্য প্রকৃত সাধকহৃদয়ে নূতন ইন্দ্রিয় প্রস্ফুটিত হয়। বাক্যচাতুরী ও পূর্ব্বসংস্কার ঐ রাজ্যের সীমান্তেও পৌছিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবানের অবতার কি না, ইহা নির্ণয়ার্থ তদানীন্তন কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি হাতচালারূপ ভৌতিকক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে আমরাও, সাধকবিশেষ প্রকৃত সত্য লাভ করিতেছেন কি না, তাহা স্থির করিবার জন্য অপরাবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত-মণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি। স্থিরচিত্ত, ধীরবুদ্ধি ব্যক্তিমাত্রেই এইরূপ বিচারের অসারত্ব সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। জন্মান্তরের সুকৃতি লইয়া যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম-প্রবণতা দৃষ্ট হয় সত্য; কিন্তু আধ্যাত্মিকরাজ্যের বিধিমার্গ অবলম্বন না করিলে হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটিত হয় না, নূতন সত্যলাভ জীবনে আর ঘটে না। ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা ব্যয় করার ন্যায় পূর্ব্বার্জ্জিত সাধনসম্পত্তি খোয়াইয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। মনোমুখী উপাসনা মায়ার এক চক্র হইতে অপর চক্রে উন্নীত করে, মায়াজাল উত্তীর্ণ হইয়া শুদ্ধ-সত্য দর্শন করিতে দেয় না।

সে যাহাহউক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক গোস্বামী প্রভুর পদত্যাগ-পত্র গৃহীত হইলে, শ্রীযুক্ত কালীনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কতিপয় বিশিষ্ট ব্রাহ্ম, আপনাদের নাম স্বাক্ষর করিয়া এই মর্ম্মে

একখানি পত্র প্রকাশিত করেন যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে গোস্বামী প্রভুর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা উচিত হয় নাই, এবং তাঁহার অবলম্বিত মত যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী, এ কথা সাধারণ ব্রাহ্মগণ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র তত্ত্ব-কৌমুদীতে ঐ সময় যে সকল মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্য হইতে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা :—

"সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ বিস্তৃত এবং প্রচারক-সংখ্যা যেরূপ অল্প, তাহাতে গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় একজন প্রচারককে নিজ পদ হইতে অপসৃত হইতে দেওয়া কি সুখের ব্যাপার? যাঁহার ন্যায় ব্রাহ্ম-সমাজের সেবা আর কেহ করেন নাই, যিনি ব্রাহ্মপ্রচারকদিগের আদর্শ-স্বরূপ ছিলেন, যিনি ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য চিরদিনের মত দেহের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াছেন, যিনি সমস্ত দিন অনাহার ও পথশ্রমের পর মৃৎপিণ্ড মাত্র আহার করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, যিনি বিশ্বাস, নিষ্ঠা, আধ্যাত্মিকতার আদর্শস্থল, তাঁহাকে সহজে ও অক্লেশে কে ছাড়িয়া দিতে পারে? গোস্বামী মহাশয়ের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের এই সংস্কার যে, তিনি যেখানেই থাকুন তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিকতা ও প্রবল নিষ্ঠা দ্বারা বিশেষভাবে ধর্ম্মভাব প্রচারিত হইতেছে ও হইবে।" *

"কিরূপে সত্যের হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিয়া ঈশ্বরের সেবা করিতে হয়, ইহার দৃষ্টান্ত আমরা যেমন তাঁহার (গোস্বামী প্রভুর) নিকট পাইয়াছি, এমন অতি অল্প স্থানেই দেখিয়াছি। তাঁহার ন্যায় কুসংস্কার ও অসত্যের প্রতিবাদ কে করিয়াছে? তিনিই ত সর্ব্বপ্রথমে প্রতিবাদ করিয়া ভারত-

* তত্ত্বকৌমুদী, ১৮০৮ শক, ১লা মাঘ।

বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করেন, তিনি বর্দ্ধিতকীর্ত্তি কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠনে সহায়তা করেন। আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার প্রতি তাঁহার এই এক মাত্র দাওয়া নহে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির প্রতি সাধক নাম প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তিনি তন্মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি।" †

---

† তত্ত্বকৌমুদী, ১৮০৯ শক, ১লা পৌষ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—— ০০ ——

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের পদে প্রতিষ্ঠা। পদ্মানদী ভ্রমণকালে গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব। চাঁচুরতলা কালী বাড়ীতে আকাশ হইতে পুষ্পবর্ষণ। কলিকাতার ন্যায় পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে আন্দোলন। প্রচারকনিবাস ও ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ।

কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গোস্বামী প্রভুকে পরিত্যাগ করিলেও পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। তিনি তথাকার আচার্য্যের পদে মনোনীত হইয়া প্রচারনিবাসে অবস্থান পূর্ব্বক নিয়মিত উপাসনা, আলোচনা, নাম কীর্ত্তনাদি দ্বারা সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। বহু স্থান হইতে বিবিধ সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্ম্মপিপাসু লোক দলে দলে আসিয়া তাঁহার নিকটে যোগদীক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্ববাঙ্গালা প্রচারনিবাসে অবস্থানকালে গোস্বামী প্রভু বেদী হইতে যে সকল বক্তৃতা ও উপদেশ প্রদান করিতেন, তাহার কতকগুলি, তদীয় অন্যতম শিষ্যদ্বয় স্বর্গীয় শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া পরবর্ত্তী সময়ে 'বক্তৃতা ও উপদেশ' নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

ঢাকা অবস্থানকালে গোস্বামী প্রভু, মৈমনসিংহ, বর্দ্ধমান, ধুবড়ী, বাঁকিপুর, মোকামা, দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম প্রচারার্থ সময় সময় গমন করিতেন। ইদানীং শ্রীমন্ মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম তারক-ব্রহ্ম হরিনামকীর্ত্তন ও তাহার মাহাত্ম্য প্রচারই গোস্বামী প্রভুর জীবনের প্রধান ব্রত হইয়াছিল। যে স্থানেই যাইতেন বক্তৃতা ও উপদেশের সঙ্গে তিনি নাম কীর্ত্তনের বিশেষ ব্যবস্থা করিতেন, কোন কোন স্থলে নগর-কীর্ত্তন বাহির করিতেন। গোস্বামী প্রভু ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার প্রতি হিন্দু সাধারণের যে শ্রদ্ধার অভাব জন্মিয়াছিল তাহা এখন অবধি ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইতে লাগিল। বৈষ্ণবগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহার কীর্ত্তনে যোগ দান করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে গোস্বামী প্রভু নানা স্থানে নাম মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া ১২৯৪ সনের আষাঢ় মাসে ঢাকায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এই সময় দারুণ ম্যালেরিয়া রোগে গোস্বামী প্রভুর শরীর ভগ্ন হইলে, তিনি চিকিৎসকগণের ব্যবস্থায় বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিবার নিমিত্ত কিয়ৎকাল পদ্মাগর্ভে নৌকাতে বাস করেন। এই স্থানে এক দিবস তিনি সত্যবাক্যের মহিমা ও ৺ গঙ্গাদেবীর আবির্ভাববিষয়ক একটী প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ করিলে, তদীয় অল্পবয়স্কা কন্যা শ্রীমতী প্রেমসখী তাঁহার নিকটে আবদার করিয়া গঙ্গাদেবীর প্রকাশ দর্শন করিতে অভিলাষ করিলেন। গোস্বামী প্রভু ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাঁহাকে একটী নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। তিনি আহ্লাদের সহিত একটী মেটে বাসনে করিয়া কিছু খাদ্য বস্তু গোস্বামী প্রভুর হস্তে প্রদান করিলে, গোস্বামী প্রভু নৈবেদ্য হস্তে করিয়া স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। এমন সময় দিব্য লাবণ্যযুক্ত, দিব্য ভূষণে বিভূষিত একখানি পরম সুন্দর হস্ত পদ্মাগর্ভ হইতে উত্থিত হইল। গোস্বামী প্রভু সেই হস্তে নৈবেদ্যটী

অর্পণ করিবামাত্র নৈবেদ্যসহ হস্ত জলমগ্ন হইল। শ্রীমতী প্রেমসখী তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন।

এই সময় তিনি এক দিবস চাঁচুরতলা কালীবাড়ী দর্শন করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলে যে একটী অতীব আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা গোস্বামী প্রভুর নিজের কথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—"ঢাকায় অবস্থান কালে একবার চাঁচুরতলা কালীবাড়ী গিয়াছিলাম। সেখানে যাহা দেখিয়াছি জীবনে সম্বল হইয়া রহিয়াছে। সেখানে যাইয়া আমরা অনেকেই প্রথমে জগদ্ধাত্রী-মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। কিন্তু পুরোহিত বলিলেন—'এখানে কোন বিগ্রহ নাই, ঘট স্থাপন মাত্র আছে।' পরে তাহাই দেখিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানে কীর্ত্তন হয়? পুরোহিত বলিলেন—'মহাশয়, আমরা জীবনে কখনও কীর্ত্তন শুনি নাই।' তাঁহার বাড়ী দূরে, তাই চাউল কলা যাহা পাইয়াছিলেন তাহা লইয়া, একটু আলো দেখাইয়া বেলা থাকিতে তিনি বাড়ী চলিয়া গেলেন। তারপর রাত্রিতে একদল কীর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পরে ঢেপের খৈয়ের মত একরূপ ছোট ছোট ফুল অজস্র পড়িতে আরম্ভ করিল। সমস্ত স্থান ফুলে সাদা হইয়া গেল। তাহার অদ্ভুত সৌরভ। তথাকার লোকেরা বলিল, যে গাছটী হইতে ফুল পড়িল তাহা কেহ চিনে না এবং ঐ গাছে কেহ কথনও ফুল ফুটিতে দেখে নাই। ঐ সময় অতি সুমিষ্ট স্বরে একরূপ পাখীর গানও শ্রুত হইয়াছিল। কীর্ত্তনকারীরা বলিল—'আজ আমরা সকলে গান করিতেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ সকলের মনে হইল, মায়ের বাড়ী গিয়া গান করি। এই কথা এক সময় সকলের মনে হওয়াতে কাহারও আপত্তি হইল না। তাই এখানে আজ কীর্ত্তন করিতে আসিয়াছি।" *

* ঢাকা, নারায়ণগঞ্জের উকিল শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র দে মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধৃত।

আকাশ হইতে পুষ্পবর্ষণের কথা শাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। আজ এই কলিযুগে তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া উপস্থিত সকলে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। ৺ শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঐ অপূর্ব্ব ফুলের কিছু সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া-ছিলেন। পরে ঢাকায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে অনেকে তাহা দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

অতঃপর পদ্মার উৎকৃষ্ট জল বায়ুর গুণে গোস্বামী প্রভুর শরীর সুস্থ হইলে, তিনি লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়কে দর্শন করিবার জন্য বারদী গমন করেন। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সমীপবর্ত্তী হইয়াই তাঁহার শরীরের প্রতি লোমকূপে দেবতার প্রকাশ দর্শন করিয়া গোস্বামী প্রভু অতীব বিস্মিত হইয়াছিলেন।* মহামতী বিদুরের কুটিরে শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলে তিনি যেমন আত্মহারা হইয়া যাইতেন, গোস্বামী প্রভু, ব্রহ্মচারী মহাশয়ের আশ্রমে আগমন করিলে তিনিও তদ্রূপ আনন্দে আত্মহারা হইতেন। তিনি তাঁহার 'জীবন-কৃষ্ণ'কে কি খাওয়াইবেন, কি দিবেন এই ভাবিয়াই অস্থির হইয়া পড়িতেন। আজ বহুদিন পরে গোস্বামী প্রভুকে পাইয়া ব্রহ্মচারী মহাশয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি করিয়া গোস্বামী প্রভু ও তাঁহার সঙ্গীয় লোকদিগের সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। পরে নিভৃতে গোস্বামী প্রভুর সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক অনেক কথোপকথন হইল। অতঃপর গোস্বামী প্রভু ঢাকায় প্রত্যাগমন করিয়া প্রচারক-আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এই স্থানে অবস্থানকালে এক দিন গোস্বামী প্রভু শৌচক্রিয়া

---

* কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ, ৪র্থ ভাগ, ৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সমাপনান্তর গৃহের বারাণ্ডায় আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার ঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। তাঁহাকে গৃহে না দেখিয়া কে দরজা বন্ধ করিয়া নিজের কাজে চলিয়া গিয়াছে। দরজা বন্ধ দেখিয়া তিনি তাঁহার নিজের কন্যার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। নিকটে কেহ ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার ডাকের উত্তর দিবে কে? ইতিমধ্যে হঠাৎ দরজা খুলিয়া গেল। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন তথায় কেহ নাই, তবে দরজা খুলিল কে? অনুসন্ধান করিয়া গোস্বামী প্রভু যখন জানিলেন যে, দরজা খোলা দূরে থাকুক, তাঁহার ডাক পর্য্যন্ত কেহ শুনিতে পান নাই, তখন তিনি ভাবে গদগদ হইয়া "মা, এই বুঝি তোর রামপ্রসাদের বেড়া বাঁধা," এই কথা বলিয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন।

গোস্বামী প্রভু একবার উদ্ধারণ দত্তের পাটবাটী দর্শন করিতে সপ্তগ্রাম গিয়াছিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন মন্দিরের দরজা বন্ধ রহিয়াছে। পূজারিকে দরজা খুলিয়া বিগ্রহ দর্শন করাইতে বলিলে তিনি অস্বীকার করিলেন। এমন সময় কবাট হঠাৎ আপনা হইতেই উন্মুক্ত হইল। পূজারি ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গোস্বামী প্রভুর নিকট কাকুর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

অপর এক সময় ভক্তিভাজন রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের আগ্রহে গোস্বামী প্রভু তাঁহার সহিত কলিকাতার নিকটবর্ত্তী এড়িয়াদহে, গৌরভক্ত গদাধর দাসের পাটবাড়ী দর্শন করিতে গমন করেন। তথায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মূর্ত্তি স্থাপিত আছেন। উভয়ে মন্দিরের নিকট গিয়া দেখেন দ্বার বন্ধ, নিকটে পূজারি নাই। গোস্বামী প্রভু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে বসিলেন, আর পরমহংসদেব গান করিতে লাগিলেন। এমন সময় হঠাৎ মন্দিরের দরজা খুলিয়া গেল। এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দর্শন করিয়া পরমহংস মহাশয় অতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রয়াগের কোন

দেবালয়েও একদিন ঐরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। গোস্বামী প্রভুর সঙ্গিগণ তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

অতঃপর গোস্বামী প্রভু ঢাকা হইতে সপরিবারে শান্তিপুর গমন করেন। এদিকে তাঁহার সঙ্গে ব্রাহ্ম-সাধারণের মতভেদ উপস্থিত হইলে যে তুমুল আন্দোলনের রোল উত্থিত হইয়াছিল, তাহা এখন পর্যান্ত প্রশমিত হয় নাই। ক্রমে ঢাকার ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও কেহ কেহ প্রচারকনিবাসে গোস্বামী প্রভুর কার্য্যকলাপের মধ্যে ত্রুটী দর্শন করিতে লাগিলেন। ৶ নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়-প্রমুখ কতিপয় ব্রাহ্মের প্রেরণায় পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রচারকনিবাসের জন্য গোস্বামী প্রভুর প্রচারপ্রণালীর প্রতিষেধক কতিপয় নিয়ম প্রস্তুত করিয়া তাঁহার নিকট শান্তিপুর প্রেরণ করেন। উক্ত নিয়মাবলী প্রাপ্ত হইয়া তিনি পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষ মহাশয়কে নিম্নলিখিত পত্র লিখিলেন, যথা :—

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার—

আপনার পত্র এবং পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত প্রচারক-নিবাস সম্বন্ধে পাণ্ডুলিপি পাঠ করিলাম। এ বিষয়ে আমি অধিক কিছু লিখিতে চাহি না, তবে এইমাত্র বলিতেছি যে, আমি যে নিয়মে প্রচারক-নিবাসে চলিয়া থাকি, আমার বিশ্বাস মতে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের প্রতি-বন্ধকতা করে না। বরং এই প্রণালীতে সার্ব্বভৌমিক বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে।

আপনারা যদি আমার প্রচার প্রণালী মনোনীত না করেন, আপনাদের বিশ্বাস মত নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে পারেন। কিন্তু উক্ত নিয়মাবলীতে সম্মত হইয়া আমি প্রচারনিবাসে বাস করিতে পারি না। সুতরাং আমাকে ভিন্ন বাসা করিয়া থাকিতে হইবে। ভিন্ন বাসা করিলেই

যে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যোগ থাকিবে না, তাহা নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার আমার জীবনের ব্রত। যেখানে থাকি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াই জীবন শেষ করিব। আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন আমার জীবনের ব্রত পালন করিয়া যাইতে পারি।

২৫শে কার্ত্তিক, ১৮০৯ শক
কলিকাতা।

নিবেদক
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

গোস্বামী প্রভুর এই পত্র পাইয়াও তাঁহার বিরুদ্ধবাদী ব্রাহ্মদিগের মনস্তুষ্টি জন্মিল না। তাহাদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া কার্য্যনির্ব্বাহকসভা গোস্বামী প্রভুর নিকট তাঁহার প্রচারনিবাসের কার্য্যকলাপের জন্য কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয় এই সকল গোলযোগের বিষয় অবগত হইয়া গোস্বামী প্রভুকে ব্রাহ্মসমাজের সংস্রব ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিলেন। এমন সময় এক দিবস শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু স্বপ্নযোগে গোস্বামী প্রভুকে ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। অতঃপর তিনি স্বীয় গুরুদেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়া চিরকালের জন্য ব্রাহ্মসমাজের সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন। পত্র, যথা :—

"সত্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারি তাহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্ঞানে পালন করিয়া থাকি। আমার কার্য্য লইয়া কেহ প্রতিবাদ করিয়া আলোচনা করিলে তাহার উত্তর দিতে ইচ্ছা হয় না। কারণ পরমেশ্বর সত্যস্বরূপ, সত্যই তিনি। সুতরাং সত্য অজর, অমর। যাহা সত্য তাহা প্রতিষ্ঠিত হইতেই হইবে। অসত্য বায়ুরাশিতে মিলিয়া যাইবে।

"যাঁহারা আমার কার্য্য লইয়া আন্দোলন করিতেছেন, আমার ভ্রম

বাহির করিতে চেষ্টা করিতেছেন, আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদের সহিত প্রণাম করি। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন আমি যেন চিরদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।" *

এই প্রকারে গোস্বামী প্রভুর সহিত বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের চিরবিচ্ছেদ সংঘটিত হইল বটে, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে তাঁহার সম্পূর্ণ যোগই রহিল। তিনি বাধা হইয়া ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা পুনরুদ্ধার কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন না। এই ব্রহ্মবিদ্যা নিজে অনুশীলন করিয়া অপরকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এবং প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানীর আদর্শ জনসমাজে প্রদর্শনার্থ ভগবান্ গোস্বামী প্রভুকে ব্রাহ্মসমাজে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এতদিনে তাঁহার সেই কার্য্য পরিসমাপ্ত হইল, তিনিও ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিলেন।

গোস্বামী প্রভুর ব্রাহ্মসমাজের সংস্রব পরিত্যাগের কথা অবগত হইয়া বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিয়াছিলেন—"কাকের বাসায় কোকিল কত দিন থাকে ?"

স্বীয় কুলাধিদেবতা ৺ শ্যামসুন্দর বাল্যকাল হইতে কিরূপে গোস্বামী প্রভুকে বিবিধ উপায়ে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও প্রচারকার্য্যে সাহায্য করিতেন তাহার উল্লেখ ইতঃপূর্ব্বে অনেক স্থলে করা হইয়াছে। একদিন তিনি ভাবে বিহ্বল হইয়া বলিতে লাগিলেন—"শ্যামসুন্দর, তুমি এমন, তবে কেন আমাকে শুষ্ক মরুভূমির ভিতর দিয়া আনিলে ?" উত্তর পাইলেন, "ইহার গভীর উদ্দেশ্য আছে, সময়ে জানিতে পারিবে।" আমরা মুখে বলি জীবন বৃথা গেল, কিন্তু হরিনামামৃতের স্বাদ যাঁহারা একবার পাইয়াছেন, তাঁহারা ধর্ম্মবিষয়ক তর্ক ও বাদানুবাদকেও সময়ের অপব্যবহার বলিয়া

* পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যবিবরণ হইতে উদ্ধৃত।

ক্ষুণ্ণ ও বিষণ্ণ হন। নিদ্রায় অভিভূত করিলে তাঁহারা কাঁদিয়া ফেলেন। সে অবস্থার কথা কে যথাযথ বর্ণন করিবে? তথায় সংসারের অবস্থা সমূহের সমস্তই বিপরীত। জীবনের যে অংশ তর্ক ও বাদানুবাদে কাটিয়াছে তাহা উল্লেখ করিয়া গোস্বামী প্রভু অনেক সময়ে দুঃখ প্রকাশ করিতেন। নিদ্রার বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "পূর্ব্বে রাত্রি জাগিয়া সাধন করিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সময়ে সময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। এখন শয়ন করিতে হইবে একথা ভাবিলেও কান্না পায়।" তিনি দিবানিশি ভগবৎ প্রেমরসে বিভোর হইয়া থাকিতেন। ব্রাহ্ম সাধারণ তাঁহার ক্রিয়া মুদ্রা সম্পূর্ণরূপে বুঝিবে ইহা অসম্ভব।

তারপর, ব্রহ্মজ্ঞানই জীবের চরম লক্ষ্য নহে। ইহার পরেও উচ্চতর অবস্থা আছে। ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট ভগবান্ সর্ব্বভূতে এক অখণ্ড সত্তারূপে প্রতিভাত হন মাত্র, কিন্তু তাঁহার সচ্চিদানন্দরূপ, তাঁহার অপ্রাকৃত লীলার বিষয়, তিনি কিছুই অবগত হইতে পারেন না। যে সাধক সর্ব্ব-ভূতে ভগবৎসত্তা উপলব্ধি করিয়াও তৃপ্ত না হইয়া তাঁহার সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাহেন, তাঁহাকে যোগমার্গ অবলম্বন করিতে হয়। এই যোগ হঠযোগ নহে। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ।

"সংযোগঃ যোগো ইত্যুক্তঃ জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।"

অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগকে যোগ বলে। এই অবস্থায়ও তৃপ্ত না হইয়া যিনি ভগবানের সহিত পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু প্রভৃতি নিকটসম্বন্ধ স্থাপনের অভিলাষী হন, তাঁহাকে ভগবদ্ভাবে অর্থাৎ লীলারাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। ইহার পন্থা ভক্তি। সাধন পথের এই কয়েকটী স্তরও আবার ক্রম-অনুসারে লাভ করিতে হয়। ক্রম-অনুসারে না হইলে ইহার সম্যক্ ফল পাওয়া যায় না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে আছে :—

"জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্, ত্রিবিধ প্রকাশে॥"

গোস্বামী প্রভুও ব্রহ্মজ্ঞান লাভে তৃপ্ত না হইয়া যোগমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক কঠোর সাধন করতঃ, গুরুকৃপায় পরব্রহ্মকে আত্মার আত্মারূপে প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু এ অবস্থাতেও তাঁহাকে অধিকদিন তৃপ্তি প্রদান করিতে পারিল না। পরে সেই পরমাত্মার সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া, ভক্তিমার্গে চলিতে চলিতে ভক্তাধীন ভগবানকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতঃ, লীলারাজ্যে প্রবেশপূর্ব্বক পরাশান্তি লাভ করিয়াছিলেন। এবম্প্রকার মহাপুরুষের স্থান আর অধিক দিন ব্রাহ্মসমাজে হইবে কিরূপে?

———

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ত্রিতত্ত্বের সমালোচনা ও গোস্বামী প্রভুর জীবনে তাহার অভিব্যক্তি। অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান ও সগুণ সাকারলীলা।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

শ্রীমদ্‌ভাগবত, (১।২।১১)।

তত্ত্ববিদ্‌গণ একমাত্র অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই একই তত্ত্ব—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ আখ্যায় অভিহিত হয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের অন্যতম আচার্য্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তৎ-প্রণীত 'ষটসন্দর্ভ' নামক গ্রন্থের 'তত্ত্বসন্দর্ভে' অদ্বয়তত্ত্ব, 'পরমাত্মসন্দর্ভে' পরমাত্মতত্ত্ব ও 'ভগবৎসন্দর্ভে' ভগবত্তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্ব, ভগবত্তত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উহার পৃথক নির্দ্দেশের আবশ্যক বোধ করেন নাই। আমরা এইস্থলে শ্রীমদ্‌ভাগবদ্-প্রতিপাদিত উক্ত ত্রিতত্ত্ব, গোস্বামী প্রভুর জীবনে কিপ্রকার অভিব্যক্ত হইয়াছিল তাহার অনুশীলনপ্রসঙ্গে, ব্রহ্মতত্ত্বটীও সংক্ষেপে পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। কারণ এই ত্রিতত্ত্বের উপরেই গোস্বামী প্রভুর ধর্ম্মজীবন প্রতিষ্ঠিত। এই বিষয়টী সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে না পারিলে তাঁহার বহু বিচিত্রতাময় ধর্ম্মজীবনের মধ্যে প্রবেশ করিবার আর অন্য উপায় নাই।

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং ॥"

এই "জ্ঞান" শব্দে, যাহা চৈতন্যস্বরূপ তাহাই জ্ঞান, 'জ্ঞান উঁহার আছে' এই অর্থে "অর্শাদিভ্য অচ্" প্রত্যয়যোগে ব্যুৎপত্তি নির্দ্ধারিত হওয়ায়, আধার—আধেয়ের অভেদে জ্ঞানস্বরূপ বলা হইয়াছে। "অদ্বয়" শব্দ 'একেবারে দ্বিতীয় রহিত' এই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই ; কিন্তু যাঁহার সদৃশ দ্বিতীয় বস্তু নাই, তাহাই অদ্বয়, অর্থাৎ বস্ত্বন্তরের অথবা শক্ত্যন্তরের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই যাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে তাহাই অদ্বয়, ইহা বুঝিতে হইবে। "আত্মনৈব সিদ্ধং খলু স্বয়ং সিদ্ধমুচ্যতে।" এতাদৃশ স্বয়ং সিদ্ধ তাদৃশবস্তু অর্থাৎ চেতনবস্তু জীব-চৈতন্য ও অতাদৃশ বস্তু অর্থাৎ প্রকৃতি কালাদি-লক্ষণ জড়বস্তু ; এখানে জীবে চেতনধর্ম্ম বিদ্যমান্ থাকিলেও, উক্ত জীব-চৈতন্য স্বয়ং সিদ্ধ নহে, কারণ উহা পরমাত্মার চেতনের অধীন, এবং অতাদৃশ-প্রকৃতিকালাদিলক্ষণ জড়বস্তুর অভাবেই শ্রীভগবানের অদ্বয়ত্ব নির্ণীত হইয়াছে, কেননা উহাদের পরস্পর আশ্রয়ভূত শ্রীভগবানের সত্ত্বা ব্যতীত উহাদের উপলব্ধি হয় না, সুতরাং উহারা যে স্বয়ং সিদ্ধ নহে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অতএব তাদৃশ ও অতাদৃশ হইতে বিলক্ষণ স্বশক্ত্যেকসহায় অনির্ব্বচনীয় ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন শ্রীভগবানই এখানে 'অদ্বয়জ্ঞান' শব্দে অভিহিত হইয়াছেন, এবং পরমসুখস্বরূপ পরমপুরুষার্থের দ্যোতকতাপ্রযুক্ত ঐ জ্ঞান তত্ত্ব আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। * দীপাদি জ্যোতিঃপদার্থ যেমন জ্যোতি-স্বরূপ হইয়াও জ্যোতিষ্মান্, তদ্রূপ এই পরমতত্ত্ব জ্যোতিস্বরূপ হইয়াও উক্ত অনির্ব্বচনীয় নিজশক্তিবলে জ্যোতিষ্মান্। তাঁহাকে পরমসুখস্বরূপ বলিবার

---

* জ্ঞানং চিদেকরূপং। অদ্বয়ত্বঞ্চাস্য স্বয়ং সিদ্ধ-তাদৃশাতাদৃশ তত্ত্বান্তরভাবাৎ স্বশক্ত্যেকসহায়ত্বাৎ, পরমাশ্রয়ং তং বিনা তাসামসিদ্ধত্বাচ্চ। তত্ত্বমিতি পরমপুরুষার্থ-তাদ্যোতনয়া পরমসুখরূপত্বং তস্য বোধ্যতে। অতএব তস্য নিত্যত্বঞ্চদর্শিতম্ ॥

তত্ত্বসন্দর্ভ।

হেতু এই যে তাঁহার উপাসনায় সর্ব্বপ্রকার সুখই প্রাপ্ত হওয়া যায়, অর্থাৎ জ্ঞানী কেবল জ্ঞানের দ্বারা যে ব্রহ্মসুখানুভবরূপ মুক্তিলাভ করেন, তাঁহাকে উক্তরূপে পাইবার ইচ্ছা করিলে, তাহা হইতেই সেই আনন্দ লাভ হয়। যোগী ধ্যানের দ্বারা পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারে যে আনন্দ লাভ করেন, তাহাও তাঁহার নিকট হইতে পাওয়া যায়; কিন্তু যাঁহারা কেবল জ্ঞানী বা যোগী, তাঁহারা তাঁহাদের সাধন হইতে সেই অনির্ব্বচনীয় ভগবৎ-প্রেমের আস্বাদনে সক্ষম হন না, সুতরাং ব্রহ্ম ও পরমাত্মার মূল যে শ্রীভগবান্ তাহা ইহা হইতেই সুস্পষ্টরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং ব্রহ্মোপাসক জ্ঞানী অপেক্ষা পরমাত্মোপাসক যোগী শ্রেষ্ঠ, এবং পরমাত্মোপাসক যোগী অপেক্ষা শ্রীভগবানের ভক্ত-উপাসক শ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাতেই উক্ত হইয়াছে যথা :—

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী, জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যোশ্চাধিক যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগীনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মেযুক্ততমো মতঃ॥"

(৬অ, ৪৬—৪৭)

তত্ত্ববেত্তা যোগী, তপস্বিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও। আবার যোগিগণের মধ্যে যিনি মদ্‌গতচিত্ত হইয়া কেবল আমাকে আরাধনা করিয়া থাকেন তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

"অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান তিন তার রূপ॥"

শ্রীচরিতামৃত।

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত এই ত্রিতত্ত্বকে চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমদ্ কবিরাজ গোস্বামী সূর্য্যের সহিত উপমা দিয়াছেন। সূর্য্যের তেজের সহিত ব্রহ্মতত্ত্বের, প্রতিবিম্বের সহিত পরমাত্মতত্ত্বের ও সূর্য্যের বিগ্রহের সহিত ভগবত্তত্ত্বের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে ; এবং ব্রহ্মতত্ত্বকে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি, পরমাত্মতত্ত্বকে শ্রীকৃষ্ণের অংশ বা প্রতিবিম্ব এবং ভগবত্তত্ত্বকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন।

"ব্রহ্ম আত্মা ভগবান অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা, অংশ, স্বরূপ, তিন বিধেয় চিহ্ন ॥

*　*　*　*

তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল।
উপনিষদ্ কহে তারে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল ॥
চর্ম্ম চক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ
জ্ঞানমার্গে লইতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ।

*　*　*　*

অন্তর্যামী যারে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেহো গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয়।

*　*　*　*

অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ প্রকাশে ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ।

যেমন প্রকৃত সূর্য্য দেখিতে হইলে সূর্য্যের কিরণ ও প্রতিবিম্ব না দেখিয়া তাহাকে দেখা যায় না, কোন ব্যক্তির অঙ্গকান্তি এবং মুখচ্ছবি না দেখিয়া তাহাকে দেখা যাইতে পারে না, সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্বের উপলব্ধি ব্যতিরেকে ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইতে কাহারও অধিকার

জন্মে না। ইহা আধ্যাত্মিক জগতের এক অনতিক্রমনীয় নিয়ম। ব্রহ্ম আত্মা, ভগবান্ সেই এক অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বেরই ক্রমবিকাশ মাত্র।

"প্রকাশ বিশেষে তেহো ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, আর স্বয়ং ভগবান॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

এই ত্রিবিধ তত্ত্ব আবার ত্রিবিধ সাধনদ্বারা লাভ করিতে হয়।

"জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান, ত্রিবিধ প্রকাশে॥
জ্ঞান, যোগমার্গে তারে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম, আত্মারূপে তারে করে অনুভব॥
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

জ্ঞান, যোগ, এবং ভক্তি পরস্পর পরিপন্থী। দ্বিতীয়টী প্রথমটীর অনুপূরক এবং তৃতীয়টী দ্বিতীয়টীর পরিপূরক। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বস্তুর তত্ত্ব প্রকাশিত না হয় ততক্ষণ জ্ঞানপন্থা। ইহা প্রকৃতিসিদ্ধ। অজ্ঞাতকে জ্ঞাত করাইবার জন্য, অচেনাকে চিনিবার জন্য যেমন স্বতঃই একটী প্রয়াস হয়, এই জ্ঞানপন্থাও সেইরূপ স্বাভাবিক। ইহাতে সমস্ত সৃষ্টিতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। আমি কে? আমার স্বরূপ কি? পরমেশ্বরের স্বরূপ কি? তাঁহার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ—ইত্যাদি সমস্ত বিষয় অন্তরে উপলব্ধি হয়। এই অবস্থায় জীব দেখিতে পায় যে এক অব্যক্ত অখণ্ড চৈতন্য ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। তাঁহারই শক্তিতে আমার হস্ত পদ চলিতেছে, মুখ বাক্য উচ্চারণ করিতেছে, কর্ণ শব্দ শ্রবণ করিতেছে

ইত্যাদি। আমি কিছুই নহি, কিছুই আমার নয়। তিনিই সব, তাঁহারই সব। আমি দ্রষ্টামাত্র। এই প্রকার উপলব্ধিকে ব্রহ্মসত্বার উপলব্ধি অথবা ব্রহ্মজ্ঞান বলে। ইহাই জ্ঞানযোগের চরমাবস্থা। এই ব্রহ্মসত্বার উপলব্ধি ব্যতীত প্রকৃত ভগবদুপাসনার আরম্ভই হয় না।

ইহার পরে যোগের অবস্থা। এই যোগ হঠযোগ নহে। ইহা জীবাত্মাতে সাক্ষাৎ পরমাত্মার দর্শন। এই পরিদৃশ্যমান্ জগতে মানুষ সাধারণতঃ নিতান্ত নশ্বর স্ব স্ব স্থূল দেহকেই 'আমি' বলিয়া বুঝিতেছে এবং ইহারই পরিপোষণ ও পরিতোষণের নিমিত্ত, সত্যাসত্য, পাপ পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, অহোরাত্র মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া পরিশ্রম করিতেছে; কিন্তু দেহাতিরিক্ত যে প্রাণ, জীবনীশক্তি, আত্মা বর্ত্তমান, যাহা দেহ অপেক্ষাও প্রিয়তর এবং যাহা অনন্তকাল স্থায়ী, তাহার পরিপোষণ ও পরিতোষণের জন্য জগতে অতি সামান্য আয়োজনই দৃষ্ট হয়।

কিন্তু ভগবৎ কৃপায় যখন জীবের নিকট তাহার স্থূলদেহের অতিরিক্ত সূক্ষ্মদেহ প্রকাশ পায়, তখনই তাহার 'এই দেহই আমি নহি' এই ধাঁধা ঘোচে। ইহাই যোগের প্রথম স্তর। সূক্ষ্মদেহেরও অতিরিক্ত জীবের আর একটী দেহ আছে, তাহাকে কারণদেহ বলে। স্থূল দেহ চক্ষে দেখা যায়, কিন্তু সূক্ষ্মদেহ ও কারণদেহ দেখা যায় না। গুটিপোকা যেমন কোষ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আবদ্ধ হয়, আত্মাও সেইরূপ পঞ্চকোষে আবদ্ধ থাকে। পঞ্চকোষ যথা :—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ। আত্মা যে পর্য্যন্ত পঞ্চকোষে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ তাহাকে জীবাত্মা বলে। এই অবস্থায় কখনও সুখ কখনও দুঃখ। পঞ্চকোষ ভেদ হইলে তখন উহাকে আত্মা বলে। ইহার পরেও আত্মার বাসনা থাকে। কারণদেহে জীবে আমিত্বের অভিমান হইলে স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ উপাধানের খোলসের ন্যায় প্রতিভাত হয়। এই

পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সীমা অর্থাৎ মহামায়ার রাজ্য। ইহার পরে জীবের শুদ্ধ আত্মস্বরূপ প্রকাশ হয়।

"ব্রহ্মের স্বরূপ যৈছে জ্বলন্ত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ তৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥"

চৈতন্যচরিতামৃত।

কারণদেহ ভেদ হইলে জীবাত্মা কারণসমুদ্রের অর্থাৎ বিরজার পরপারে ব্রহ্মলোকে উপনীত হয়। এই আত্মার যিনি প্রাণরূপী আশ্রয় তাঁহাকে পরমাত্মা বলে। জীব এই স্তরে আসিলেই ব্রহ্মকে প্রাণের প্রাণরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। স্থূলদেহীর যেমন দেহ ও প্রাণে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, একটীর অভাবে অন্যটী তিষ্ঠিতে পারে না, আত্মা ও পরমাত্মারও ঈদৃশ স্বাভাবিক সম্বন্ধ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এ সম্বন্ধ নিত্যসিদ্ধ।

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
সূর্য্যাংশ কিরণ যেন অগ্নি জ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয়॥
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি জীবশক্তি আর মায়াশক্তি॥
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ।
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য় ॥
চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২০শ পরিচ্ছেদ।

যে প্রণালী অথবা উপায় দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার উক্ত নিত্য সম্বন্ধ অথবা সংযোগ পুনঃ সংঘটিত হয়, তাহাকেই প্রকৃত যোগ বলে। অতএব যোগ জ্ঞানের অনুপূরক। ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে পরমাত্ম তত্ত্ব, সেই "সত্যং জ্ঞান মনন্তং" ব্রহ্মের অধিকতর নৈকট্য ও ঘনীভূত অবস্থা।

ইহার পর ভক্তির রাজ্য। একই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব সত্ত্বারূপে প্রাণরূপে উপলব্ধিকৃত হইলেও, যখন আত্মিক ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিচয় অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীভগবানকে অধিকতর গাঢ়রূপে সম্ভোগ করিবার জন্য অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় ক্ষোভিত হইয়া উঠে, তখন সগুণ ব্রহ্মের লীলা-নিকেতন পরব্যোমধাম প্রকাশিত হয়। এই অবস্থায় জীব সগুণ সাকারলীলা বুঝিতে সক্ষম হয়, এবং অনন্ত বৈকুণ্ঠ, কৈলাস, দ্বারকা, মথুরাদি চিণ্ময়ধাম সকলে, অনন্ত ঐশ্বর্য্য লীলারসানন্দ আস্বাদন করিতে করিতে, শুদ্ধ মাধুর্য্য-রসামৃত-পরিপূরিত অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবন ধামে উপনীত হয়। ইহাই অবিমিশ্র প্রেমের রাজ্য—শ্রীশ্রীহ্লাদিনী মহাশক্তির অবিরল আনন্দ-রসমাধুরীর অফুরন্ত ক্রীড়াভূমি।

"সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনুসম।
উপর্য্যধো ব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম ॥
* * *
বৈকুণ্ঠের ভূমি বারি সকলি চিণ্ময়।
মায়িক ভূতের তথি প্রবেশ না হয় ॥"
শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—এই যে ত্রিতত্ত্বের বিষয় সংক্ষেপে আলোচিত হইল, ইহা সেই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বেরই ক্রমবিকাশ মাত্র, এ কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

"অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ তিন তার রূপ॥
* * *
প্রকাশ বিশেষে তিঁহ ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম পরমাত্মা আর স্বয়ং ভগবান্॥
* * *
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্, ত্রিবিধ প্রকাশে॥"

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

এই সাধন বস্তুটী সম্পূর্ণ ক্রমসাপেক্ষ্য। ক্রম অনুসারে না হইলে এই তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে উপলব্ধ হইতে পারে না। ব্রহ্মসত্ত্বা উপলব্ধি না করিয়া কেহ যোগতত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারেন না; এবং জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ, নিত্যসিদ্ধ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত, অদ্বয় নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণ সাকারলীলা সম্ভোগ করিবার অধিকার জন্মে না। এই সম্বন্ধে গোস্বামী প্রভুর উপদেশ যথা:—"ক, খ, অভ্যাস করিয়া পড়িতে শিখিলাম, পরে যে পুস্তক পড়ি প্রত্যেকের মধ্যে ক, খ, আছে দেখিতে পাই। ক, খ ত্যাগ করিয়া পড়িতে পারি না। ধর্ম্মসম্বন্ধেও সেইরূপ। এক একটী প্রণালী ধরিয়া চলিতে হইবে। প্রথমে 'এই দেহই আমি' এই জ্ঞান ভেদ করিয়া শরীরতত্ত্ব জানিবার জন্য প্রাণায়াম, ন্যাস, মুদ্রা ইত্যাদি করিতে হয়। যিনি তাহা না করেন, তিনি দেহ ও আত্মা যে কি পদার্থ তাহার প্রত্যক্ষ-জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। পরে সৃষ্টিতত্ত্ব জানিলে তখন ব্রহ্মজ্ঞান

লাভ হয়। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে, আর সমস্ত কিছু নহে, ব্রহ্মই সব, এইরূপ বোধ হয়। ইহার পরে আমি এবং ব্রহ্ম এক, কি ভিন্ন, ইহা জানিবার জন্য যোগ অভ্যাস করা আবশ্যক। এ যোগ প্রাণায়াম প্রভৃতি নহে, আত্মাতে পরমাত্মার দর্শন। যথার্থ যোগসাধন হইলে, ভগবান্ কিরূপে জগতে বিরাজ করেন, তাহা প্রত্যক্ষ হয়। তখন ইহলোক পরলোক এক হয়। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ এইরূপে ক্রম অনুসারে সাধনের অবস্থা লাভ করিয়াছেন। ক্রম অনুসারে না হইলে যেটুকু সাধন করিবে তাহারই ফল পাইবে, পরের অবস্থা বুঝিতে পারিবে না। এখন সমস্ত বিশৃঙ্খল, কিছুই প্রকৃতরূপে হয় না। মৃত্তিকায় বীজ রোপণ করিলে অঙ্কুর হয়, ইহা কৃষকের গুণ নহে। সাধন সম্বন্ধেও তদ্রূপ"। *

আধুনিক ইংরাজীশিক্ষিত এক সম্প্রদায়ের লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, সাকার উপাসনা অতি নিকৃষ্ট, অজ্ঞ প্রবর্ত্তক সাধকদিগের জন্যই ইহার ব্যবস্থা এবং ব্রহ্মজ্ঞানই জীবের চরম লক্ষ্য, ইহার উপরে আর উচ্চতর অবস্থা নাই। কিন্তু এই মত সর্ব্বাংশে শাস্ত্র-যুক্তির অনুকূল নহে। তবে ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধি ব্যতিরেকে, অদ্বয় নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে, পার্থিব কামনামিশ্রিত সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাই, নানাপ্রকার সাকার দেবদেবীর উপাসনায়, এবং ক্রমশঃ পৌত্তলিকতায় পরিণত হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু ক্রম অনুসারে হইলে এমনটা ঘটিতে পারে না।

তীব্র ব্যাকুলতাদ্বারা সেই মায়া-মনুষ্যরূপী ভগবানের দর্শন কোন কোন ভক্তের ভাগ্যে ঘটিয়াছে, শাস্ত্রে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়; কিন্তু অদ্বয় নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের উপলব্ধি ব্যতীত, সেই সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্মের পরাতত্ত্ব লাভ হইয়াছে এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।

* মৌনী অবস্থায় গোস্বামী প্রভুর স্বহস্তলিখিত উপদেশ।

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দো সর্ব্বকারণকারণং॥"

ব্রহ্মসংহিতা, ৫।২।

সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনিই সকলের আদি, তাহার আদি কেহই নাই। তিনি গোবিন্দ এবং সর্ব্বকারণের কারণ অর্থাৎ সর্ব্বকারণীভূতা মায়ারও কারণ।

এই সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ বস্তুটী কি? তাঁহার দর্শনে জীবের কি অবস্থা লাভ হয়, ঋষিরা তৎসম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন যথা :—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

উপনিষৎ।

সেই পরাৎপরের দর্শনে হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ মায়াজাল দূরীভূত হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং সর্ব্বপ্রকার প্রারব্ধ অপ্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

স্বরূপতত্ত্বের প্রকাশ ব্যতীত শুধু ব্যক্তিরূপ অর্থাৎ মৎস্য, কূর্ম্ম, নৃসিংহাদিরূপ বিগ্রহমূর্ত্তির প্রকাশ দ্বারা, অদৃষ্টপূর্ব্বতাহেতু সাধকের একপ্রকার বিস্ময় ও আনন্দ জন্মে বটে, কিন্তু সচ্চিদানন্দঘনের প্রকাশ দ্বারা যেরূপ হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয় এবং সর্ব্বসংশয় দূরীভূত হইয়া জীব পরমানন্দের অধিকারী হয়, ব্যক্তিরূপের প্রকাশের দ্বারা সেরূপ হয় না। অদ্বয় নির্গুণ ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধি ব্যতিরেকে যাঁহারা কেবল ঐ ব্যক্তিরূপের (রামকৃষ্ণাদি বিগ্রহের) উপাসনা করেন, তাঁহাদের নিকট ঐ প্রকারের দর্শন একটা উচ্চ অবস্থা হইতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রে উহাকে পরাৎপর পরব্রহ্মের উপাসনা না বলিয়া দেবতা উপাসনা বলা হইয়াছে, যে উপাসনা দ্বারা পরাতত্ত্ব লাভ হইতে পারে না।

"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবোমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমং ॥"

গীতা, ৭৷২৪ শ্লোক।

অবিবেকী মানবগণ আমার অব্যয় অত্যুত্তম পরমাত্মস্বরূপ না জানিয়া আমাকে ব্যক্তিরূপে অর্থাৎ মৎস্য, কূর্ম্ম, নৃসিংহাদিরূপে পরিব্যক্ত বলিয়া মনে করে।

কিন্তু যাঁহারা অতুল ব্রহ্মানন্দের অধিকারী, তাঁহাদের নিকট ব্যক্তিরূপ ভগবানের প্রকাশে এমন আনন্দাধিক্য হয় না, যাহার জন্য তাঁহারা ব্রহ্মানন্দ পরিত্যাগ করিয়া উহাতে আকৃষ্ট হইতে পারেন। পরন্তু ব্রহ্মানন্দের সম্ভোগ ব্যতীত শুধু মানবীয় জ্ঞান, বুদ্ধি ও চিন্তাদ্বারা শ্রীভগবানের ব্যক্তিরূপ ভিন্ন সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহস্বরূপের দর্শনে জীব কখনও অধিকারী হইতে পারে না।

"অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ মানুষীং তনুমাশ্রিতং।
পরং ভাবো মজানন্তো মমভূতমহেশ্বরং ॥"

গীতা, ৯৷১১।

আমি ভূতসমূহের মহেশ্বর, আমার এই পরতত্ত্ব না জানিয়া মূঢ়জনেরা আমাকে মনুষ্য-শরীরধারী বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকে।

"মায়াহ্যেষা ময়াসৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্ব্বভূত গুণৈর্যুক্তো নৈবত্বং জ্ঞাতুমর্হসি ॥"

লঘু ভাগবতামৃতধৃত শান্তিপর্ব্বের মোক্ষধর্ম্মের ৪০৫ শ্লোক।

হে নারদ, সমস্ত ভূতের গুণযুক্ত অর্থাৎ শব্দস্পর্শাদি যুক্তরূপে আমাকে যে দেখিতেছ, ইহা আমার সৃষ্ট মায়া। আমাকে এই প্রকারে জানা তোমার উচিত নহে।

"মদ্রূপমদ্বয়ং ব্রহ্ম মধ্যাদ্যন্তবিবর্জিতং।
স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়ং॥"

উক্ত গ্রন্থধৃত বাসুদেবোপনিষৎ, ৩৫।

আমার আদি, মধ্য ও অন্তশূন্য স্বপ্রকাশ ও সচ্চিদানন্দ অব্যয় এবং অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ (ভক্তেরা) ভক্তিদ্বারা জানিতে সমর্থ হয়।

এই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব সচ্চিদানন্দঘন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রাকৃত মন, বুদ্ধি ও চিন্তাদ্বারা অবধারণ করা যায় না। প্রাকৃত চক্ষু তাঁহার রূপ দর্শনে, প্রাকৃত কর্ণ তাঁহার বাণী শ্রবণে কখনও সমর্থ হয় না।

"রূপীতি হেতো দৃশ্যতঃ যথৈব প্রাকৃতো জনঃ।
তথাসৌ দৃশ্যত ইতি ত্বয়া মাস্মবিচার্য্যতাম্॥"

উক্ত গ্রন্থধৃত বাসুদেবাধ্যায়ে।

অর্থাৎ প্রাকৃত ব্যক্তির রূপ যেমন নয়নগোচর হয়, তদ্রূপ ভগবানের রূপও প্রাকৃত চক্ষুর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, হে নারদ, তুমি এরূপ মনে করিও না।

ভূত, প্রেত, যক্ষ, রক্ষ, দেবতা, গন্ধর্ব্বাদি কতিপয় মায়াধীন জীবেরও প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য রামকৃষ্ণাদি রূপ ধারণ করিবার শক্তি আছে। সুতরাং তাদৃশ রূপের প্রকাশ দ্বারা সরলমতি সাধকগণের আত্মপ্রতারিত হওয়ার বিস্তর সম্ভাবনা আছে। বর্ত্তমান সময়েও ঈদৃশ ঘটনা বিরল নহে। শ্রীবৃন্দাবনে কোন সময় নারায়ণস্বামী নামক জনৈক প্রেতসিদ্ধ ব্যক্তি তদীয় বশীভূত প্রেত দ্বারা একটী চতুর্ভুজ কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখাইয়া গোস্বামী প্রভুকে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

স্বরূপতত্ত্বের প্রকাশ ব্যতীত শুধু রামকৃষ্ণাদি ব্যক্তিরূপ বিগ্রহমূর্ত্তির

প্রকাশ দ্বারা সরলমতি প্রবর্ত্তক সাধকদিগের অনেকস্থলে উপকার অপেক্ষা অপকারের সম্ভাবনাই অত্যধিক।

উক্ত আলোচনা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, অদ্বয় নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের উপলব্ধি ব্যতীত সগুণ সাকার লীলাতত্ত্বে প্রবেশ করা অসম্ভব। কতিপয় দৃষ্টান্ত দ্বারা এই জটিল বিষয়টী আরও পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সসৈন্য রথী মহারথী সকলেই দর্শন করিয়াছিলেন। যদি তজ্জাতীয় দর্শনের দ্বারা ভগবত্তার স্ফূর্ত্তি হইত, তবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেরই সূচনা হইতে পারিত না। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধবিমুখ অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করাইয়াছিলেন, কুরুসভায় বন্ধনোদ্যত দুর্য্যোধনকেও তাহাই দেখাইয়াছিলেন। সেই বিরাট-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সমাগত ঋষিমুনিগণ তাঁহাকে পরমপুরুষ বলিয়া কতই স্তবস্তুতি করিলেন, কিন্তু কি দুর্দ্দৈব! দুর্য্যোধনের উহা ভেল্কি বলিয়া ধারণা হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবনাথ বলিয়া প্রসিদ্ধ। মহামতি পাণ্ডবেরাও তাঁহাকে ভগবদ্বুদ্ধিতে দর্শন করিতেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহাদের যেরূপ শোক, মোহ, ভয়, ত্রাস ইত্যাদি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ" ইত্যাদি ঋষিকথিত লক্ষণের সহিত পাণ্ডবদিগের চরিত্রের সামঞ্জস্য দেখা যায় না। বিশেষতঃ কুরু-ক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন আপনাকে জ্ঞাতিবধ-পাপযুক্ত মনে করিয়া তাহা ক্ষালন করিবার জন্য আকুল হইলেন, তখন মহাত্মা ভীষ্ম, পুরোহিত ধৌম্য, মহর্ষি বেদব্যাস প্রভৃতি তাঁহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিয়াছিলেন যে, যাঁহার নাম স্মরণে মহাপাতকী উদ্ধার হয়, সেই ভগবান্ স্বয়ং তোমাদের কাণ্ডারী, তাঁহার ইচ্ছাতেই সমস্ত হইয়াছে,

ইহাতে চিন্তা করিবার কি আছে—ইত্যাদি। কিন্তু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ঈদৃশ প্রবোধবাক্যদ্বারা প্রবুদ্ধ হইলেন না। তিনি উক্ত পাপাপনোদনমানসে ও অক্ষয় স্বর্গলাভাকাঙ্ক্ষায়, অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান জন্য শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, এবং তিনিও তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া ঐ প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণরূপে ভগবত্তার উপলব্ধি হইলে, মহামতি যুধিষ্ঠিরের কি এবম্প্রকার সংশয় উপস্থিত হইতে পারিত?—কখনই না।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাধামের ঐশ্বর্য্যের কথা অবগত হইয়া দেবর্ষি নারদের বিস্ময় জন্মিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় প্রকাশমূর্ত্তিতে গুরুবর্গ, পিতা, মাতা, সখা ইত্যাদি এবং ষোড়শ সহস্র মহিষীগৃহে সর্ব্বক্ষণ বিরাজ করিতেন। দেবর্ষি এই সকল লীলা দর্শনমানসে দ্বারকাপুরীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা দেবর্ষি যথাযোগ্য পূজিত হইয়া সুখে সমাসীন হইলে. শুদ্ধসত্ত্ব বসুদেব তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"পুত্র-দিগের নিকটে পিতার আগমনের ন্যায়, অল্পবুদ্ধি ক্ষুদ্র ব্যক্তিদিগের নিকটে মহাত্মাগণের আগমনের ন্যায়, আপনার আগমন সর্ব্বপ্রাণীর মঙ্গলের নিমিত্তই হইয়া থাকে। দেবচরিত্র ভূতগণের পক্ষে দুঃখের এবং সুখের নিমিত্তও হয়, কিন্তু ভবাদৃশ অচ্যুতাত্মা সাধুগণের চরিত্র কেবল সুখের নিমিত্তই হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্, যাহা শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিলে মানবগণ সমস্ত ভয় হইতে মুক্তিলাভ করে, আমি আপনাকে সেই ভগবদ্ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমি নিশ্চয়ই দেবমায়ায় মোহিত হইয়া সেই মুক্তিপ্রদ পুরাণপুরুষকে পুত্ররূপে পাইবার জন্য পূজা করিয়াছিলাম, কিন্তু মোক্ষলাভের জন্য নহে। হে সুব্রত, এখন আপনাদিগকে সহায় করিয়া বিবিধ ব্যসনস্থান, সর্ব্বত্র ভয়সমন্বিত সংসার হইতে অনায়াসে সাক্ষাৎ মুক্তি পাইতে পারি, আমাকে তদুপযোগী শিক্ষা প্রদান করুন।"

এই প্রশ্নের স্থান, কাল ও পাত্র এই তিনটী বিষয় চিন্তা করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। স্থান দ্বারকাপুরী, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণৈশ্বর্য্য বিকাশ করিয়া বিরাজমানা। কাল—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রকট লীলায় বর্ত্তমান এবং সুধর্ম্মা নামক সভাতে উদ্ধবাদি সহ নানা ধর্ম্মতত্ত্বাদি আলোচনা করিয়া থাকেন। পাত্র—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব, যিনি পুত্রের অপার ঐশ্বর্য্যের বিষয় অবগত হইয়া, যমালয় হইতে মৃত পুত্রদিগকে আনয়ন করিয়াছিলেন। আজ তিনিই কি না ধর্ম্মজিজ্ঞাসু হইয়া মোক্ষ-লাভের আশায় নারদের শরণাপন্ন হইলেন? এই বিষয়টী চিন্তা করিলে

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে।"

এই ঋষিবাক্যের গভীরতা বিশেষরূপে উপলব্ধি হইবে। বস্তুতঃ অদ্বয় নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের উপলব্ধি ব্যতীত সগুণ সাকারতত্ত্ব বুঝিবার অধিকার জীবের আদৌ জন্মিতে পারে না। যে সকল ঋষিরা পূর্ব্বজন্মে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাহারাই শ্রীবৃন্দাবনলীলাতে গোপীদেহ প্রাপ্ত হইয়া "অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ববস্তু" ব্রজেন্দ্রনন্দনকে সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমিচ্ছন্ সুবিগ্রহং॥
তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্না সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।
হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তো ভবার্ণবাৎ॥

পদ্মপুরাণ। *

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা

* এই শ্লোকের অনুবাদ পূর্ব্বে একস্থানে প্রদত্ত হইয়াছে।

হে নারদ, সমস্ত ভূতের গুণযুক্ত যে আমাকে দেখিতেছ, এ আমার সৃষ্ট মায়া। আমাকে এইপ্রকারে জানা তোমার উচিত নহে। আমার আদি-মধ্য-অন্ত শূন্য, স্বপ্রকাশ সচ্চিদানন্দ অব্যয় এবং অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ ভক্তিদ্বারা জানিতে সমর্থ হয়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, কলিপাবনাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষ কৃপাপাত্র এবং তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের আদর্শ-শিক্ষাগুরু ভক্তশিরোমণি শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর চরিত্রে এইরূপ বিরুদ্ধভাব কি প্রকারে সম্ভবে? তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত আচরণ দ্বারা মাধ্বগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী, ব্রজবিহারী দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ কি তত্ত্ব, এবং অদ্বয় নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের উপলব্ধি ব্যতীত সগুণ সাকার লীলা সম্ভোগ করিবার অধিকার জন্মে না, এইদুইটি তত্ত্বই সাধারণ মানব-মণ্ডলীকে শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

আমরাও যে মহাপুরুষের ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ কিঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাঁহার জীবনের পূর্ব্বাপর ঘটনা প্রণিধান পূর্ব্বক আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, তাঁহার সুবিশাল হিন্দুসমাজের আশ্রয় পরিত্যাগকরিয়া ক্ষুদ্র ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যও ঐরূপই ছিল। কারণ, ব্রাহ্মসমাজের অপর সাধারণের ন্যায়, তিনি হিন্দু-সমাজে ধর্ম্মসম্বন্ধে কিছু ধরিবার ছুঁইবার না পাইয়া, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার জীবন আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার কুলাধিদেবতা ৺শ্যামসুন্দর (শ্রীকৃষ্ণ) যাঁহার ভগবত্তা উপলব্ধি করিবার জন্য কত মহা মহা যোগিগণ যুগযুগান্তর হইতে অরণ্যে, নির্জ্জন গিরিকন্দরে, কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত রহিয়াছেন, কত সংসারবিরাগী নিষ্কিঞ্চন মহাত্মা-গণ, স্ব স্ব ধর্ম্মপন্থা অনুসারে মন্দিরে, মস্‌জিদে, নির্জ্জনে, তীর্থপ্রান্তে আজন্ম প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াও, যাঁহার জাগ্রৎ জীবন্ত সত্ত্বা উপলব্ধি

করিতে সমর্থ হইতেছেন না, সেই রাধারমণ শ্যামসুন্দর অতি শিশুকাল হইতেই, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, গোস্বামী প্রভুর সহিত কত ক্রীড়া কৌতুক করিয়াছেন, কত ভয়ানক ভয়ানক বিপদাপদ হইতে অলৌকিক ভাবে রক্ষা করিয়াছেন, জীবনের কত কঠোর পরীক্ষার সময় সৎপরামর্শ দিয়া তাহা হইতে উত্তীর্ণ করিয়াছেন, তাহার কতিপয় ঘটনা গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে বিবৃত করা হইয়াছে।

গোস্বামী প্রভু যোগপন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক, তাহাতে সিদ্ধকাম হইয়া যখন ভক্তিরাজ্যে প্রবেশকরতঃ, সগুণ সাকার লীলাতত্ত্ব সম্ভোগ করিতে-ছিলেন, সেই সময় একদিবস ৺ শ্যামসুন্দর সচ্চিদানন্দঘনরূপে প্রকাশিত হইলে, তিনি বলিলেন—"শ্যামসুন্দর, তুমি যদি তাহাই হইলে, তবে আমাকে এত ঘুরাইলে কেন?" উত্তরে শ্যামসুন্দর গুরুগম্ভীরস্বরে বলিলেন— "আমিই তোকে ব্রাহ্মসমাজে নিয়াছিলাম, আবার আমিই তোকে ফিরাইয়া আনিয়াছি। তোকে ব্রাহ্মসমাজে প্রেরণ করিবার আমার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, তাই এখন ফিরাইয়া আনিলাম।" এখন এই বিশেষ উদ্দেশ্য কি? এ সম্বন্ধে গোস্বামী প্রভুর প্রমুখাৎ সময় সময় যে সকল কথা শুনিয়াছি, তাহাতে সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়াছি যে, অদ্বয় নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের উপলব্ধি ব্যতীত সগুণ সাকার লীলায় প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মে না, এই তত্ত্বটী পরিস্ফুট করা তাঁহার ব্রাহ্মসমাজে গমন করিবার প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল।

এই অদ্বয় নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের উপলব্ধি ব্যতিরেকে সগুণ সাকার উপাসনা করিতে গিয়া আমাদের দেশের ভগবদ্বিগ্রহাদি পূজা ক্রমশঃ সকাম দেবদেবীর উপাসনায়, এবং অবশেষে একেবারে পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারে পরিণত হইয়াছিল। এমন সময় 'মঙ্গলময়ের' শুভ ইচ্ছায়, কলিহতজীবের বহু সৌভাগ্যে, ব্রহ্মবিদ্যার পীঠস্থান পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে

প্রায় ৪০০ শত বৎসর পরে আবার ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইল। তাৎকালিক প্রচারকগণের অদম্য উৎসাহে, গোস্বামী প্রভুর সিংহ হুঙ্কারে এবং জাগ্রৎ জ্বলন্তজীবনাদর্শে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্রহ্মনামের বিজয়ভেরী বাজিয়া উঠিল, এবং বহুস্থানে ব্রহ্মজ্ঞানের বীজ রোপিত হইল। প্রবীন শিক্ষিত-সমাজ এবং নবীন বিদ্যার্থীবর্গের মধ্যে এই ব্রহ্মজ্ঞান অগ্নির ন্যায় প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত ভ্রম কুসংস্কার দগ্ধ করিতে লাগিল। গোস্বামী প্রভুর সেই সিংহহুঙ্কার—"হে অমৃত সন্তানগণ, উত্তিষ্ঠ, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত"—ইত্যাদি বাণী যাহাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, সেই প্রেম-গদগদ অভয়-অমৃত-পরিপূরিত, জ্বলন্ত-জাগ্রত-বিশ্বাস-প্রদীপ্ত গুরু-গম্ভীর আহ্বান-ধ্বনি যাঁহাদিগের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইল, তাহারাই দুশ্ছেদ্য সমাজবন্ধন, দুস্ত্যজ্য আত্মীয়-স্বজনের মায়ামমতা এবং দুর্ল্লঙ্ঘ্য জাতিকুলমান তৃণতুচ্ছবৎ পরিত্যাগ করিয়া, দলে দলে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিজয়পতাকা-মূলে সমবেত হইতে লাগিল; মানব-সমাজ যুগযুগান্তের ধর্ম্মাধর্ম্মের বিধিনিষেধের অচ্ছেদ্য শৃঙ্খল হইতে পরিমুক্ত হইয়া, এক অতৃপ্ত আশা ও অদম্য আকাঙ্ক্ষা লইয়া, কোন এক অমর রাজ্যে প্রবেশ করিতে ধাবিত হইল।

ব্রাহ্মধর্ম্মের এই নূতন বন্যাপ্রভাবে ভারতের দিগ্‌দিগন্ত পরিপ্লাবিত হইল বটে, কিন্তু প্রকৃতির নববর্ষাস্নাত বন্যাবারি যেমন নানাবিধ আবর্জ্জনারাশি কুড়াইয়া লইয়া প্রবাহিত হয়, এবং স্থানে স্থানে উহার অংশবিশেষ পুঞ্জীকৃত হইয়া স্রোতের গতি মন্দীভূত অথবা দিক্ পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের তরুণ সাধনা-স্রোতঃ ও সেই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ, স্বার্থপরতা, প্রতিষ্ঠা, সদলপ্রিয়তা প্রভৃতি সত্যের অবরোধকারী খুঁটিনাটি সংমিশ্রিত হওয়ায়, স্রোতের গতি মন্দীভূত ও দিক্ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

জীব যে পর্য্যন্ত ভগবৎসত্ত্বায় ডুবিতে না পারে, সেই পর্য্যন্ত কিছুতেই আমিত্ব বা স্বামিত্ব বিসর্জ্জন দিতে পারে না। জীবনের যে মুহূর্ত্তে যতটুকু সময়ের জন্য এই ভগবৎসত্ত্বা প্রাণে অবতীর্ণ হয়, মধুপ্রাপ্ত মক্ষিকার ন্যায় জীব ততক্ষণ আপনাকে ভুলিয়া তাহাতেই অনুপ্রাণিত হইয়া ডুবিয়া থাকে। এই ব্রহ্মসত্ত্বা যাঁহার জীবনে যত ঘনীভূতভাবে উপলব্ধিকৃত হয়, প্রকৃত নির্ভরশীলতা, ধ্যানপরায়ণতা, অন্তর্দ্দর্শিতা প্রভৃতি তাহারই ততোধিক লাভ হয়, এবং প্রচার অপেক্ষা আচার, বাক্য অপেক্ষা কার্য্য, তাঁহাতেই ততোধিক দৃষ্ট হয়।

গোস্বামী প্রভু এই প্রকারে সত্ত্বারূপে প্রাণরূপে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবান্ কিরূপে ক্রমশঃ আত্মস্বরূপ প্রকাশ কারেন, কি প্রকারে সেই পূর্ণপুরুষকে লাভ ও সম্ভোগ করিতে হয়, এবং এই অবস্থা লাভ হইলে সাধকের শারীরিক মানসিক কি প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা স্বয়ং আচরণ করিয়া, জাগতিক জীবনিচয়কে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ যে এক অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত এবং জ্ঞান, যোগ, ও ভক্তি এই ত্রিবিধ সাধন দ্বারা ত্রিবিধরূপে সাধকের নিকটে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, তাহা আপনি সাধন করিয়া অপর সাধারণকে তাহার পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

ব্রাহ্ম সন্ ব্রহ্মতত্ত্বং কথিতুমুপনিষৎ সঞ্চয়ৈর্জ্ঞানগম্যং
যোগী সন্ আত্মতত্ত্বং যতিগণবিদিতং যোগগম্যঞ্চ শেষে।
ভক্ত সন্ প্রেমতত্ত্বং পরমিত ভগবত্তত্ত্বমেতৎ ত্রিতত্ত্বং
ত্রিপ্রত্যবস্থা গত সন্ স্ফুটমিহ বিজয় দর্শয়ামাস সদ্যঃ॥ *

* যশোহর জেলার অন্তর্গত কালিয়াগ্রামনিবাসী, গোস্বামী প্রভুর অনুরক্ত ভক্ত স্বর্গীয় পণ্ডিত আনন্দনাথ দাসগুপ্ত কবীন্দ্রশেখরকৃত শ্লোক।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক উপনিষদোক্ত জ্ঞানগম্য ব্রহ্মতত্ত্ব, পরে যোগপন্থা গ্রহণ করিয়া যতিগণবিদিত যোগলভ্য আত্মতত্ত্ব এবং অবশেষে ভক্তিপন্থা আশ্রয় করিয়া ভগবত্তত্ত্ব নামক পরাতত্ত্ব (প্রেমতত্ত্ব)—এই তিনটী তত্ত্ব যথাক্রমে জ্ঞান, যোগ, ও ভক্তি এই ত্রিবিধ সাধন দ্বারা লাভ করিয়া ধর্ম্মার্থী সাধুসজ্জনদিগকে পরিস্ফুট রূপে তাহার পন্থা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীমদ্ কবিরাজ গোস্বামী উক্ত ত্রিতত্ত্ব-লাভের ক্রম অতি সুন্দররূপে প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন যথাঃ—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥
মালী হইয়া সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ কল্প-বৃক্ষে করে আরোহণ॥"

অর্থাৎ জীব কর্ম্মবশতঃ বহু যোনী ভ্রমণ করিয়া গুরুরূপী শ্রীকৃষ্ণের (সদ্গুরু অথবা ব্রহ্মগুরুর) প্রসাদে ভক্তিলতার বীজ (সশক্তিক নাম অথবা মন্ত্র) প্রাপ্ত হয়। মালী যেমন বীজ রোপণ করিয়া অঙ্কুরিত হইবার জন্য তাহাতে জলসেচন করে, সেইরূপ সেই ভাগ্যবান্ জীব গুরুপ্রদত্ত বীজ (সশক্তিক নাম) হৃদয়ক্ষেত্রে ধারণ করিয়া, তাহাতে প্রতিনিয়ত ভগবন্নাম-কীর্ত্তন ও লীলাশ্রবণরূপ বারি সেচন করিতে থাকে। ইহাতে ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ পত্রপল্লবে বর্দ্ধিত হয়। এইরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডভেদ (জ্ঞান তত্ত্ব, পঞ্চকোষ ভেদ) করতঃ ব্রহ্মলোক পার

হইয়া মায়ার পরপারে, বিরজাতে উপনীত হয় (কারণদেহ ভেদ করিয়া শুদ্ধ আত্মস্বরূপে প্রবিষ্ট হয়—যোগতত্ত্ব)। পরিশেষে বিরজা ভেদ করিয়া প্রকৃতির পরপার পরব্যোমে (ভগবতত্ত্বে—ভক্তিরাজ্যে) উপনীত হয়। ভক্ত যখন অপ্রাকৃত চিন্ময়দেহে ঐ পরব্যোম ধামস্থিত অনন্ত বৈকুণ্ঠ, দ্বারকা, মথুরা ইত্যাদি স্থান সকল পরিভ্রমণপূর্ব্বক, তত্তৎলোকের ঐশ্বর্য্যলীলা-রসাদি সম্ভোগ করতঃ, উহার পরিতৃপ্তিতে তাঁহার শুদ্ধ মাধুর্য্য-রসতৃষ্ণা উদ্রিক্ত হয়, 'তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন'—তখন তদুপরে স্থিত চিন্ময় গোলোকধামে, প্রেমের রাজ্যে ('রসঃ বৈ সঃ'রসের সায়রে) রসরাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পদকল্পতরু প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সকল আশা চরিতার্থ হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত উক্ত পদ কয়েকটীতে এক অসাম্প্রদায়িক পূর্ণ ধর্ম্মপন্থার প্রসস্ত রাজপথ চিত্রিত রহিয়াছে। যুগে যুগে, কল্পে কল্পে, সমস্ত ঋষিমুনিগণ এই পথে গমন করিয়া পরবর্ত্তী সাধকদিগের জন্য তাঁহাদের শ্রীচরণ-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই পথের কথাই বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বসুদেব-নারদ-সংবাদে শ্রীভগবান্ ও উদ্ধবের কথোপকথনে এই পথের কথাই বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। ভগবান্ শাক্যসিংহ সিংহবিক্রমে এই পথের কথাই ঘোষণা করিয়াছেন। কলিপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অগাধ শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া সারভূতরূপে এই শিক্ষাই শ্রীরূপসনাতনকে দান করিয়াছিলেন ; সদ্গুরুর অবতার শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুও তাঁহার ধর্ম্মজীবনে এই তত্ত্বের সাধন ক্রম-অনুসারে অতি উজ্জলরূপে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বাপর সমগ্র জীবন ও তত্ত্বোপদেশ সকল নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে এই কথা সুস্পষ্ট রূপে প্রতিপন্ন হইবে। "সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম।" সত্যের স্বরূপ কি সত্তের ভিত্তি কোথায় ? কিরূপে তাহা ক্রম অনুসারে একটী একটী করিয়া লাভ করিতে হয় ; এবং সত্য প্রকাশিত

হইলে চরিত্রে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায়, গোস্বামী প্রভুর সাধকজীবন তাহাঁর একখানি সমুজ্জ্বল চিত্র। পুরুষার্থশিরোমণি প্রেমমহারত্ন লাভের ক্রম এবং প্রেমাঙ্কুর উৎপন্ন হইলে সাধকের কি অবস্থা লাভ হয়, তৎসম্বন্ধে গোস্বামী প্রভু সাধারণতঃ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে যে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া উপদেশ দিতেন, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। শ্লোক দুইটী এই :—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গ অথভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাশক্তিস্ততোভাবস্ততঃ প্রেমেভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

প্রথমে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস। শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গ (সদ্গুরু) লাভ হয়। তারপর সদ্গুরু লাভ হইলে, ভজন ক্রিয়া আরম্ভ হয়। পরে গুরূপদেশমত সাধন ভজন করিতে করিতে অনর্থ নিবৃত্তি, অর্থাৎ অসৎ ক্রিয়া কাপট্যাদি দূরীভূত হয়। তদনন্তর সাধ্য বিষয়ে নিষ্ঠা জন্মে। এই নিষ্ঠা হইতে রুচি অর্থাৎ ভগবদ্গুণ লীলাদিতে আন্তরিক প্রীতি উৎপন্ন হয়। রুচি হইতে ইষ্ট বিষয়ে তীব্র আশক্তি জন্মে। এই আশক্তি হইতে চিত্তে ভাব অর্থাৎ রতির অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। অতঃপর এই রতি গাঢ় হইলে তাহাই প্রেম নামে অভিহিত হয়।

২। ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধসমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আশক্তিস্তৎগুণাখ্যানে প্রীতিস্তৎবসতি স্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাস্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তির হৃদয়ে ভাবের অঙ্কুর মাত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার অন্তরে এই সকল অনুভাবের উদয় হয়। যথা :—ক্ষান্তি—প্রতিকারের ক্ষমতাসত্ত্বেও ক্ষমা করা। অব্যর্থকালত্ব—অর্থাৎ বৃথা সময় নষ্ট না'করা। বিরক্তি—বিষয়ভোগে স্পৃহাশূন্যতা। মানশূন্যতা—সকল প্রকার অভিমান ত্যাগ। আশাবন্ধসমুৎকণ্ঠা—ভগবৎ লাভ বিষয়ে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে এবং তাঁহাকে পাইবার জন্য সমধিক উৎকণ্ঠা উপস্থিত হয়। তাঁহার নামগানে সর্ব্বদাই রুচি জন্মে, গুণকথনে আশক্তি ও তাঁহার বসতিস্থল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, বিশেষভাবে তীর্থাদিতে প্রীতি জন্মে।

পরিশেষে অদ্বয় নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান ও সগুণ সাকার লীলা সম্বন্ধে গোস্বামী প্রভুর স্বমুখনিঃসৃত একটী উপদেশ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে। উপদেশ যথা :—"ব্রহ্ম অদ্বয়, যত কিছু দেখা যাচ্ছে—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ—সমস্তই সেই অদ্বয় ব্রহ্মের পরিণাম। ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নাই। তাই শ্রুতি বলেছেন :—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ ব্রহ্ম, তদ্বিজিজ্ঞাসু।"

অর্থাৎ যাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে, যাহাদ্বারা জীবিত রয়েছে, প্রলয়ে যাহাতে প্রবেশ করিবে, তিনি ব্রহ্ম তাঁহাকে জান। এই অদ্বয় নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। এই নির্গুণ অদ্বয়তত্ত্ব স্ফুর্ত্তি না হ'লে কি সগুণ সাকার লীলা বুঝিবার সাধ্য আছে? তাই শ্রীমদ্ভাগবতে বলেছেন :—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

"এই অদ্বয় নির্গুণ পরব্রহ্ম আবার সগুণ সাকাররূপে লীলা করেন। তিনি অযোধ্যায় দশরথের ঘরে রামরূপে লীলা করিয়াছিলেন। কাক ভূষণ্ডের সন্দেহ হইল, সেই নির্গুণ পরব্রহ্ম কি দশরথ-তনয় রামচন্দ্র? ইহা ভাবিয়া রামচন্দ্রকে পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রামচন্দ্র হাতে করিয়া খাবার খাইতেছিলেন, তাহা হইতে কণিকা কণিকা মাটীতে পড়িতেছে, আর ভূষণ্ড খুটিয়া খুটিয়া খাইতেছেন। তখন রামচন্দ্র তাহাকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইলে, ভূষণ্ড পলায়নপর হইলেন। কিন্তু হস্ত তাহার পিছনে পিছনেই ছুটিল। ভূষণ্ড সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিলেন, কিন্তু হস্ত আর পিছন ছাড়ে না। অবশেষে পুনরায় দশরথের আঙ্গিনায় উপস্থিত। ভূষণ্ডকে দেখিয়া রামচন্দ্র হাসিলেন। তখন ভূষণ্ড দেখেন যে, শ্রীরামচন্দ্রের মুখের মধ্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, লোক-লোকান্তর চৌদ্দ ভুবন সমস্ত বর্ত্তমান। কত ব্রহ্মাণ্ডে কত রামলীলা হইতেছে। নিজকে পর্য্যন্ত একস্থানে দেখিলেন। এই সকল দেখিয়া ভূষণ্ড বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। রামচন্দ্র আবার একটু হাসিলেন। এত প্রত্যক্ষ করিয়াও ভূষণ্ড বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তখন রামচন্দ্র কৃপা করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব এবং সগুণ সাকার-লীলাতত্ত্ব তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন। ভূষণ্ড তখন সমস্ত বুঝিতে সক্ষম হইলেন। এই অদ্বয় নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের উপলব্ধি ব্যতীত কি সগুণ সাকার লীলা বুঝিবার সাধ্য আছে?"

---

* নারায়ণগঞ্জের উকিল শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দে মহাশয় সংগৃহীত গোস্বামী প্রভুর উপদেশাবলী হইতে উদ্ধৃত।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ঢাকা এক্রামপুরে ধূলট উৎসব। গেণ্ডারিয়া আশ্রম স্থাপন। শ্রীমান্ যোগজীবন ও শ্রীমতী শান্তিসুধার বিবাহ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত গোস্বামী প্রভুর ধর্ম্মপ্রসঙ্গ। জনৈক শক্তিশালী মহাপুরুষ কর্ত্তৃক মহর্ষির শক্তিসঞ্চার

গোস্বামী প্রভুর সহধর্ম্মিণী শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী পুত্রকন্যাদিসহ এযাবৎ ঢাকায় প্রচারক-নিবাসেই বাস করিতেছিলেন। এদিকে গোস্বামী প্রভু কলিকাতা হইতে স্বীয় গুরুদেবের আদেশে, পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্ম-সমাজের কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে, উক্ত সমাজের সংস্রব পরিত্যাগসূচক এক পত্র লিখিয়া, স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে পৃথক পত্র দ্বারা প্রচারকনিবাস পরিত্যাগ করিতে উপদেশ করিলেন। তদনুসারে তিনি সে স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক এক্রামপুরের ২৪নং বাটী ভাড়া করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। গোস্বামী প্রভুও কলিকাতা হইতে আগমনপূর্ব্বক আর প্রচারকনিবাসে পদার্পণ না করিয়া, এক্রামপুরের বাসাতেই উপস্থিত হইলেন; এবং এই স্থানে অবস্থানকরতঃ শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, নিঃসঙ্কোচে স্বীয় ধর্ম্ম যাজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইলেও তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া, ব্রাহ্মসমাজের লোক সর্ব্বদাই গোস্বামী প্রভুর নিকটে যাতায়াত করিতেন। উৎসবাদির সময় মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্মগণ ঢাকায় আসিয়া সমাজের উপাসনার পর দলে দলে গোস্বামী প্রভুর আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার সুমধুর প্রাণস্পর্শী ধর্ম্মকথা শুনিয়া প্রাণ মন জুড়াইয়া যাইতেন।

একরামপুরে গোস্বামী প্রভুর বাসভবনের নিকটে একটী কদম্ববৃক্ষ ছিল। কথিত আছে যে, কোন সময় কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র প্রভুপাদ বীরভদ্র গোস্বামী এই বৃক্ষমূলে একটী আশ্রম স্থাপন করিয়া কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তদবধি এই স্থানটী 'বীরভদ্রের আসন' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। গোস্বামী প্রভু অনেক সময় এই বৃক্ষমূলে উপবেশনপূর্ব্বক ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন থাকিতেন।

এই বৎসব মাঘ মাসের সপ্তমী তিথিতে গোস্বামী প্রভু একরামপুরস্থ স্বীয় বাসভবনে শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর জন্মমহোৎসব সম্পন্ন করিতে মনস্থ করেন। এই উৎসবকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ 'ধূলট' উৎসব বলিয়া থাকেন। উৎসবের শেষদিন বৈষ্ণবগণ নগরকীর্ত্তনে বহির্গত হইয়া পরস্পরের গাত্রে ধূলি নিক্ষেপপূর্ব্বক আনন্দ করিয়া থাকেন। এই ধূলি বর্ষণ হইতে 'ধূলট' নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

পরমদয়াল শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে ও পতিতপাবন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ঐ মাসের শুক্ল ত্রয়োদশী তিথিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; এবং কলিপাবনাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মাঘী-পূর্ণিমাতে কাঞ্চননগরে (কাটোয়ায়) শ্রীপাদ কেশব ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই পরমপবিত্র দিনত্রয়ের স্মরণার্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ধূলট উৎসব করিয়া থাকেন। অদ্বৈত প্রভুর জন্মোপলক্ষে শান্তিপুরে, নিতাইচাঁদের জন্মোপলক্ষে শ্রীপাট অম্বিকাকালনায় এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ উপলক্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপে ও কাটোয়ায় প্রতি বৎসর ধূলট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মসমাজ হইতে বহির্গত হইয়া এইবার প্রথম গোস্বামী প্রভু ঢাকা সহরে ধূলট উৎসব করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। একরামপুরের ভগবদ্ভক্ত ৺বঙ্কবিহারী দাস ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মালাকার মহাশয় অতীব আগ্রহসহকারে উৎসবের সমস্ত

আয়োজন করিয়া দিয়াছিলেন। উৎসবের শেষ দিন প্রাতে অনুমান ৭ ঘটিকার সময় এক বিরাট নগরকীর্ত্তন বাহির করা হইয়াছিল, এবং কীর্ত্তনে নিম্নলিখিত গানটী গীত হইয়াছিল। যথা :—

কীর্ত্তনের সুর—একতালা।

"হরি ব'লব মুখে যাব সুখে ব্রজধাম।
কলিতে তারকব্রহ্ম হরিনাম।
এনাম শিব জপেছেন পঞ্চমুখে
নারদ করে বীণায় গান।
এবার গুরুনামে দিয়ে ডঙ্কা
রাধানামে দাও বাদাম॥"
(কলিতে তারকব্রহ্ম হরিনাম)

মৃদঙ্গ করতালের সুমধুর ধ্বনি-সহ এই গান করিতে করিতে, নামরসে উন্মত্ত ভক্তমণ্ডলী যখন মহাভাবে মাতোয়ারা গোস্বামী প্রভুকে বেষ্টনপূর্ব্বক, পূর্ব্বোক্ত কল্পতরু হইতে রাজপথে বহির্গত হইলেন এবং চতুর্দ্দিক হইতে হরিনামের জয়ধ্বনি উচ্চনাদে সমুচ্চারিত হইতে লাগিল, তখন উপস্থিত অনেকের মনে হইতে লাগিল, চারিশতবর্ষ পরে আবার বুঝি শচীমায়ের অঞ্চলের নিধি নিমাইচাঁদ সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া কলিকলুষ-নাশন সংকীর্ত্তন যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গোস্বামী প্রভু প্রতি পদবিক্ষেপেই সমাধিস্থ হইয়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন। এই কারণে কীর্ত্তনের গতি মন্দীভূত হইয়া ১০ মিনিটের রাস্তা অতিক্রম করিতে প্রায় ৩ ঘণ্টা লাগিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে রাজপথ লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। নানা স্থান হইতে বহু সংকীর্ত্তনের দল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাতে যোগদান করিল। প্রাণ-উন্মাদকারী খোল করতালের উচ্চ-

ধ্বনিতে ও তারকব্রহ্ম হরিনামের সিংহনাদে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত ও ঢাকা সহর টলমল করিতে লাগিল। গোস্বামী প্রভু ভাবাবেশে দুইবাহু উত্তোলনপূর্ব্বক প্রেমদাতা নিতাইচাঁদের ন্যায় হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে নাচিতে উপস্থিত নরনারীকে নামামৃত বিলাইতে লাগিলেন। তিনি যখন যেদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তখন সেই দিকের লোকসমূহ ভাবতরঙ্গে মাতিয়া উঠিতে লাগিল। এই দিন ঢাকা সহরের উপর দিয়া হরিনামের এমন এক প্রবল বন্যা বহিয়া গিয়াছিল, যাহাতে হাবুডুবু খাইয়া বহুলোক দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়াছিল। এমন কি, যে পথ দিয়া কীর্ত্তন গিয়াছিল, উহার উভয়পার্শ্বস্থ বাটীসমূহের স্ত্রীলোকগণ পর্য্যন্ত ভাবে উন্মাদিনী হইয়া চীৎকারকরতঃ, কেহ জানালা দরজা ভগ্ন করিয়া, কেহ বা ছাদের উপর হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক, কীর্ত্তনের মধ্যে আগমন করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন; তখন তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনগণ অতি কষ্টে তাঁহাদিগকে তৎকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। গোস্বামী প্রভুর চতুর্দ্দশবর্ষীয় শিষ্য শ্রীমান্ অশ্বিনীকুমার মিত্র, হরিনামের তীব্র মদিরায় উন্মাদ হইয়া কিছুদিন পর্য্যন্ত পথে পথে হরিধ্বনি করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এই অবস্থায় ইনি উন্মত্তের ন্যায়, 'কৃষ্ণ কৈ? হা কৃষ্ণ, কোথায় কৃষ্ণ, কৃষ্ণকে এনে দিলি না' ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক কখনও ক্রন্দন কখনও বা অসহ্য যন্ত্রণাসূচক ভাব প্রকাশ করিতেন। কোন কোন সময় একটী প্রাচীন মন্দিরের পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক আপন মনে গান করিতেন। সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সময় পুরাতন মন্দিরের চূড়া আশ্রয় করিয়া যে সকল শুক (টীয়া) পক্ষী বাস করিত, তাহারাও ভয় উদ্বেগ বিবর্জ্জিত হইয়া, শ্রীমান্ অশ্বিনীকুমারের সুমধুর গানে আকৃষ্ট হইয়া, নিম্নে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে বসিয়া গান শুনিত। গোস্বামী প্রভু তাঁহার এই সকল অবস্থার বিষয় অবগত হইয়া বলিয়া-

ছিলেন—"ইহার অবস্থা খুলিয়া গিয়াছে, এখানে বৈষ্ণবমণ্ডলী থাকিলে ইহাকে কত আদর যত্ন করিতেন—ইত্যাদি।" এই দিবসের কীর্ত্তন সম্বন্ধে তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, "আজ যখন আমারা কীর্ত্তন করিতে বহির্গত হই, তখন দেখিলাম দলে দলে দেববৃন্দ কীর্ত্তন করিতে করিতে আকাশ হইতে ভূতলে অবতরণপূর্ব্বক আমাদের কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন, ইহার পরের কীর্ত্তনের ব্যাপার সম্বন্ধে আমি কিছুই অবগত নহি।" এই মহা-সংকীর্ত্তন উৎসবে ঢাকাবাসী ব্রাহ্ম ও হিন্দুগণ, গোস্বামী প্রভুর অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়া একেবারে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

অতঃপর গোস্বামী প্রভু তদীয় ঢাকাবাসী শিষ্যমণ্ডলীর অনুরোধে, গেণ্ডারিয়ার নির্জ্জনপ্রান্তে একটি আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক, ১২৯৫ সনের ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী তিথিতে তথায় প্রবেশ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। আশ্রমস্থ একটী প্রাচীন আম্রবৃক্ষতলে গোস্বামী প্রভুর নির্জ্জন সাধনের জন্য দুইটী প্রকোষ্ঠযুক্ত মৃত্তিকা-প্রাচীর-বেষ্টিত একখানি ভজন-কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহার এক প্রকোষ্ঠে গোস্বামী প্রভুর নির্জ্জন সাধন ও অপর প্রকোষ্ঠ শাস্ত্রপাঠ, কীর্ত্তন ও ধর্ম্মালোচনার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই আশ্রমে শিষ্যগণপরিবেষ্টিত হইয়া, গোস্বামী প্রভু দিবানিশি সাধনভজনে অতিবাহিত করিতেন। বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে দলে দলে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিবর্গ এইস্থানে আগমনকরতঃ গোস্বামী প্রভুর নিকটে সাধন গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন বহুস্থান হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুভক্তগণ সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতে উপস্থিত হইতেন।

গোস্বামী প্রভুর সাধনপ্রণালী, সাধনের নিয়ম, সাধন প্রদান করিবার অধিকার ও উহা গ্রহণের উপযুক্ততা, গুরুকরণের আবশ্যকতা, শক্তি-

১। গোস্বামীপ্রভুর সাধন-কুটির।

২। আমবৃক্ষ। ইহার মূলে গোস্বামী প্রভুর আসন। এই বৃক্ষ হইতে মধু-
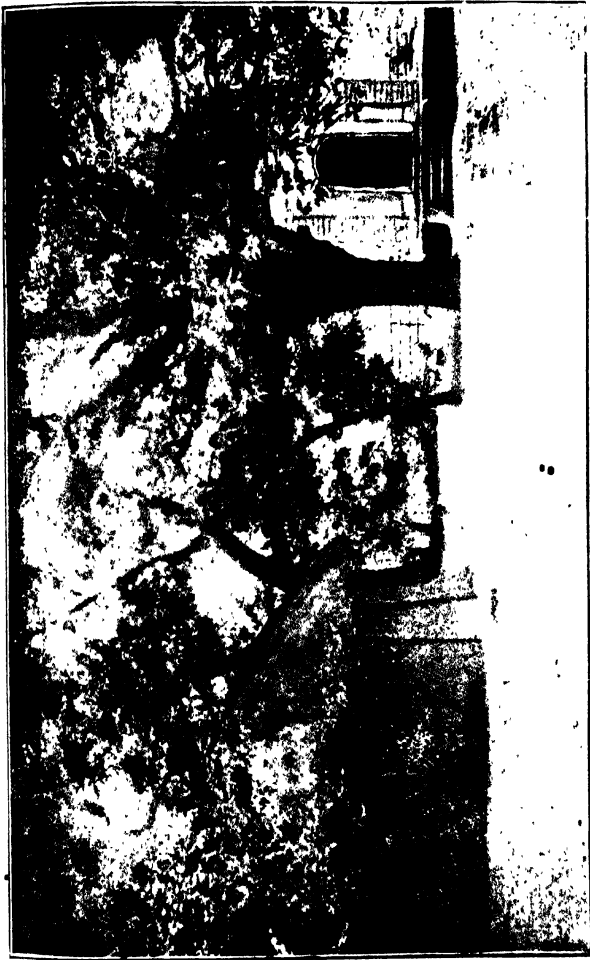
৩। শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবীর অস্থি-সমাধির উপর ৮ নাম-ব্রহ্মের

সঞ্চার—ইত্যাদি অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি, তৎপ্রণীত 'যোগ-সাধন সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্নোত্তর' ও 'আশাবতীর উপাখ্যান' নামক গ্রন্থদ্বয় হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

প্রশ্ন—আপনার সাধন-প্রণালী কি ?

উত্তর—ইহাতে বাহিরের কোন অবলম্বন নাই। ইহা কোনরূপ প্রক্রিয়াও নহে। কেবল অবিশ্রান্ত এক অব্যক্ত শক্তিশালী প্রার্থনা। অনেকে ইহাকে অজপা সাধন বলিয়া থাকেন। কারণ, ইহাতে অবিশ্রাম সাধন করিতে হয়।

প্রশ্ন—প্রাণায়াম সাধন কি না ?

উত্তর—প্রাণায়ামকে সাধন বলে না। ইহাকে ভূতশুদ্ধি বলিয়া থাকে। কারণ, ইহাদ্বারা শরীর শুদ্ধ হয় এবং তাহার সহিত মনও কিঞ্চিৎ একাগ্রতা লাভ করিয়া থাকে। ইহা বাহিরের অবলম্বন মাত্র। যেমন খোল, করতাল, সঙ্গীত, স্তব, স্তুতি প্রভৃতি বাহিরের অবলম্বন দ্বারা সাধনের কিঞ্চিৎ সাহায্য হয়, প্রাণায়ামেও তদ্রূপ হইয়া থাকে। যে সকল স্থলে সাধকের শরীর সুস্থ ও নিষ্পাপ আছে, সেখানে প্রাণায়ামের প্রয়োজন নাই।

প্রশ্ন—সাধন গ্রহণের উপযুক্ততা কি ?

উত্তর—ইহাতে পাণ্ডিত্য, বিদ্যাবুদ্ধি চাহি না ; ধনী দরিদ্র, বিদ্বান মূর্খ, স্ত্রী পুরুষ, হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান ব্রাহ্ম, পৌত্তলিক বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন যে কেহ বর্ত্তমান অবস্থায় তৃপ্ত না হইয়া যোগপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হন, এবং যতদিন প্রকৃত অবস্থা লাভ না করেন, ততদিনের জন্য সাধন সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি তাঁহার বিবেকবিরুদ্ধ না হইলে প্রতিপালন করিতে প্রতিশ্রুত হন, তিনিই এই সাধন গ্রহণ করিতে পারেন।

প্রশ্ন—গুরু না পাইলে কি ধর্ম্মলাভ করা যায় না ?

উত্তর—না, গুরু না পাইলে ধর্ম্মলাভ হয় না। ক খ শিখিতে গুরুর প্রয়োজন; অঙ্ক, ভূগোল, জ্যোতিষ শিখিতে গুরুর প্রয়োজন; কৃষি, বাণিজ্য শিখিতে গুরুর প্রয়োজন; রন্ধন প্রভৃতি গৃহকার্য্য শিখিতে গুরুর প্রয়োজন; কেবল ধর্ম্ম শিখিতে গুরুর প্রয়োজন নাই, ইহার অপেক্ষা আশ্চর্য্যের কথা আর নাই। যদি বল ধর্ম্ম আমার মধ্যেই আছে, তাহা আবার কাহার নিকট শিক্ষা করিব? তবে ক খ প্রভৃতি সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয় ত পড়িয়া আছে, শিখিলেই হয়; তজ্জন্য অন্যের খোসামোদ করা হয় কেন? বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে খনিতে রোগের ঔষধ আছে, তাহা শিখিবার জন্য কবিরাজের শিষ্য হয় কেন? যাহার জলপিপাসা হয়, সে ব্যক্তি কোদাল খন্তা লইয়া কূপ অথবা পুষ্করিণী খনন করিতে প্রবৃত্ত হয় না; যেখানে জলাশয় আছে, সেইখানে জলপাত্র লইয়া জল গ্রহণ করে। তদ্রূপ সেই জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ স্বয়ং গুরুশক্তিরূপে সর্ব্বভূতে বিরাজ করিতেছেন। যেখানে যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছেন, সে স্থান হইতে সেইরূপ শিক্ষা লাভ করিয়া থাকি। যেখানে প্রেমভক্তি বিশ্বাস পবিত্রতারূপ ধর্ম্মরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, সে স্থান হইতে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। ধর্ম্ম একটা প্রণালী নহে, মত নহে, দল অথবা সম্প্রদায় নহে। স্বয়ং ভগবানই ধর্ম্ম। সেই পরাশক্তি ভগবতী বিশ্বজননী স্বয়ং ধর্ম্ম। ধর্ম্ম বাক্য নহে, শক্তি। ধর্ম্ম মত নহে, কিন্তু সম্ভোগের বস্তু। যিনি এই পরাশক্তিকে দেখাইয়া দেন, অন্তরে জানাইয়া দেন, তিনিই গুরু। যিনি যে বিষয়ের শিক্ষা দেন, তিনি সেই বিষয়ের গুরু। সকলের পদানত হইয়া পদধূলি লইতে লইতে অহঙ্কার নষ্ট হইয়া হৃদয় বিনীত হয়। হৃদয় এরূপ বিনীত না হইলে গুরুদর্শন হয় না।

প্রশ্ন—নিজে নিজে ঈশ্বরের নাম লইলে কি ধর্ম্ম হয় না?

উত্তর—হইবে না কেন? পুষ্করিণী কাটিয়া জল পান করার মত।

পিপাসায় প্রাণ যায়, নিকটে পুষ্করিণী, তাহাতে জল পান না করিয়া পুষ্করিণী খনন করিয়া জল পান করিলে যেরূপ সুবুদ্ধির কার্য্য হয়, তদ্রূপ। বিশেষতঃ ঈশ্বরের নাম অক্ষর নহে, স্বয়ং ঈশ্বরই নাম। তিনি শক্তি, নামও শক্তি। আমি যে নাম করি, তাহাতে যদি শক্তি না থাকে, নাম স্পর্শমাত্র যদি প্রেম ভক্তি পবিত্রতা প্রাণে ভোগ না করি, তবে তাহা ঈশ্বরের নাম নহে, কয়েকটী অক্ষর। এ বিষয়ে একটী পৌরাণিক আখ্যায়িকা বলি, শ্রবণ কর :—

এক ব্রাহ্মণ বেদব্যাসের নিকট উপস্থিত হইয়া অনেক স্তবস্তুতি করিলেন। ব্যাস বলিলেন, "হে বিপ্র! তুমি কি জন্য আমার নিকট দৈন্য প্রকাশ করিতেছ, আমি তোমার কি উপকার করিব?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "হে পরাশরপুত্র! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। আমি তোমার শরণাগত, আমার উপকার কর। আমাকে এমন কিছু শিখাইয়া দাও যে, আমি যথেচ্ছ গমনাগমন করিতে পারি।" ব্রাহ্মণের এই দৈন্যোক্তি শ্রবণপূর্ব্বক মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিল্বপত্রে কিছু লিখিয়া দিয়া বলিলেন, "হে দ্বিজ! এই বিল্বপত্রে যাহা লিখিয়া দিলাম, তাহা দেখিও না। ইহা হস্তে রাখিয়া যথা ইচ্ছা গমন করিতে পারিবে। এই পত্র হস্তে থাকিতে তোমার স্বৈরবিহারে কেহই বাধা দিতে পারিবে না।" ব্রাহ্মণ সেই পত্র লইয়া পরমানন্দে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে লাগিলেন। কখন ইন্দ্রলোকে, কখন চন্দ্রলোকে, কৈলাসে, বৈকুণ্ঠে মনের সাধে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন দেখিলেন, পত্রটী শুকাইয়া গিয়াছে। মনে করিলেন পত্রটী শুষ্ক হইল, কখন চূর্ণ হইয়া যাইবে; অতএব ইহাতে যাহা লেখা আছে তাহা একটা নূতন পত্রে লিখিয়া লই। পত্রটী খুলিয়া দেখেন, 'ওঁ রামঃ!' আবার ব্যাসের হস্তাক্ষরও ভাল নহে, হিজিবিজি। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ হাস্য করিয়া বলিলেন, "ও হরি! এই সঙ্কেত!

ওঁ রামঃ !!! লেখারও শ্রী দেখ! দূর হউক, শুষ্ক পত্রটা রাখিয়া আর লাভ কি? আমার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর, মুক্তার মত।" ইহা বলিয়া একটা বিল্বপত্রে দিব্য অক্ষরে 'ওঁ রামঃ' লিখিলেন, শুষ্ক পত্র কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ স্বহস্তলিখিত পত্রটী হস্তে লইয়া মনে করিলেন, মন চল একবার কাশী যাই। ওঃ এ কি, উঠি না কেন? অনেক চেষ্টা করিলেন, সমস্ত বিফল হইল। কাশী যাওয়া হইল না। তখন ঘৃণা লজ্জা ও দুঃখে অবসন্ন হইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। আর কোন উপায় না দেখিয়া, পুনায় ব্যাসের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিষয় বর্ণন করিলেন। ব্যাস কহিলেন, "হে বিপ্র! তোমার অবিশ্বাস তোমাকে নষ্ট করিয়াছে। আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, এই পত্রের মধ্যে কি আছে তাহা দেখিও না। আমি বহুকাল গুরুসেবাপূর্ব্বক তাঁহার কৃপা লাভ করি। সেই গুরুদত্ত শক্তি হৃদয়ে ধারণ করিতে করিতে, সেই শক্তি আমার দেবতা-রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। তাঁহারই কৃপায় ও বরে আমি তাহা সঞ্চারণ করিতে পারি। এজন্য আমার লিখিত নামে সেই শক্তি বর্ত্তমান ছিল। সেই শক্তি প্রভাবেই তুমি যথেচ্ছ ভ্রমণ করিয়াছ। 'ওঁ রামঃ' এই কটা অক্ষরের কোন মূল্য নাই। এজন্য তোমার হস্তাক্ষর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারে নাই।" ব্রাহ্মণ অনেক রোদন করিলেন, কিন্তু ব্যাস-দেব অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে, সময় হয় নাই বলিয়া আর শক্তি-সঞ্চার করিলেন না।

প্রশ্ন—এই সাধন দিবার অধিকার কোন ব্যক্তিবিশেষে নিবদ্ধ কি না?

উত্তর—এরূপ কখনই সম্ভবে না। ভগবানের সত্য ধর্ম্ম যিনি যে পরিমাণে প্রাণে লাভ করিবেন, তাঁহার সেই পরিমাণে পরোপকার করিবার শক্তি জন্মে। কিন্তু অন্যের ধর্ম্ম-চক্ষু খুলিয়া দিতে, অন্যের যোগ-শক্তি প্রস্ফুটিত করিয়া দিতে যে শক্তি আবশ্যক, সেই শক্তি যিনি লাভ করেন

নাই, তিনি কখনও এই সাধনে অপরকে দীক্ষিত করিতে অধিকারী নহেন। যোগের চারিটি অবস্থা—(১) প্রবর্ত্তক। (২) সাধক। (৩) যুঞ্জন-সিদ্ধ। (৪) যুক্ত-সিদ্ধ। প্রবর্ত্তক অবস্থার মধ্যে ধর্ম্মের প্রাথমিক কয়েকটী ভাব মাত্র উন্মেষিত হয়। যথা ঃ—দীনতা, বৈরাগ্য, প্রেম, পবিত্রতা ; তৎপরে সাধক-অবস্থায় ভগবানের আবির্ভাব অল্পে অল্পে প্রকাশ পাইতে থাকে এবং সেই অবস্থার শেষভাগে সুস্পষ্ট ব্রহ্মদর্শন লাভ হয়। তাহার পর, যুঞ্জন যোগীদিগের অবস্থা। তাঁহারা প্রায়ই ঈশ্বরসহবাসে থাকেন ও বিবিধ সত্যলাভে জীবন কৃতার্থ করেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে ইঁহাদেরও বিচ্ছেদ হয়। সেই সময় অত্যন্ত ক্লেশে থাকেন। ইঁহাদেরও মধ্যে বিচ্ছেদের মুহূর্ত্তে পাপ প্রবেশ করিয়া সর্ব্বনাশ করিতে পারে। অবশেষে ঈশ্বরের কৃপায় যাঁহারা অবিচ্ছিন্ন যোগের অবস্থায় থাকিয়া, সেই পূর্ণ পরমেশ্বরে প্রতিনিয়ত অবস্থিতি ও বিচরণ করেন, তাঁহাদিগকে যুক্তযোগী কহে। ইহাই প্রকৃত সিদ্ধাবস্থা। যোগশিক্ষা করিতে হইলে এইরূপ কোন সিদ্ধযোগীর নিকটই দীক্ষা লাভ করা উচিত। কিন্তু যে সকল যোগীর সহিত কোন সিদ্ধমহাপুরুষের সাক্ষাৎ যোগ আছে, তাহাদিগকে যদি ঐ মহাত্মারা অপরের মধ্যে শক্তি-সঞ্চারের শক্তি দিয়া দীক্ষিত করিতে আদেশ করেন, তাহা হইলেও সেইরূপ ফল লাভ করা যায়। নতুবা যার তার কাছে দীক্ষিত হওয়া যৎপরোনাস্তি অকর্ত্তব্য। যে অন্ধ, সে অপরকে পথ দেখাইবে কি ? যে একশত টাকার অধিকারী, সে দানছত্র খুলিলে চলিবে কেন? যাঁহার শক্তি অনন্তশক্তিমান্ পরমেশ্বরে যুক্ত হইয়াছে, তিনিই শক্তির অনন্ত প্রস্রবণ লাভ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন অন্য কাহারও যোগদীক্ষা দিবার অধিকার নাই। এইরূপ নিম্নাবস্থার লোকের নিকট দীক্ষা লওয়াতেই আমাদের দেশে গুরুবাদের ভয়াবহ অত্যাচার ও ঘৃণিত পাশবাচারসমূহ প্রচারিত হইয়াছে।

প্রশ্ন—সাধনসম্বন্ধে নিয়মগুলি কি ?

উত্তর—সাধনের নিয়ম দুই জাতীয়—বিশেষ ও সাধারণ। বিশেষ নিয়ম এই যে, (১) ইহাতে কোন সম্প্রদায় নাই। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, নানকপন্থী ইত্যাদি পৃথিবীতে যত বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে, তাহাদের সকলেরই মধ্যে সত্যধর্ম্ম বিদ্যমান আছে; সেই সত্য সর্ব্বত্র হইতে গ্রহণ করিতে হইবে ও যেখানে কিছু সত্য পাইবে, তাহারই নিকট মস্তক অবনত করিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবে। জগতের সমস্ত সাধু মহাত্মাদিগকেই সত্যের প্রচারক জ্ঞানে সরল ও অবিমিশ্র শ্রদ্ধা করা চাই যিনি যাহা নিজের প্রাণে সত্য বুঝিবেন, কোন দলের বা লোকের অনুরোধে বা ভয়ে তাহা অবলম্বন করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। অথবা এই সাধন অবলম্বীরা কোন স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গড়িতে পারিবেন না। (২) ইহাতে মানুষ বা অন্য কিছু অবলম্বন নহে। ঈশ্বর স্বয়ংই ইহার একমাত্র গুরু এবং সমস্ত পদার্থ এবং মনুষ্য সাধারণভাবে গুরু বা উপদেষ্টা। যেমন চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি ঈশ্বর প্রদত্ত, কিন্তু কোন কারণে ঐ শক্তি অবরুদ্ধ হইলে মনুষ্যের সাহায্য আবশ্যক হয়, এখানেও সেইরূপ। স্বয়ং পরব্রহ্মই ইহার একমাত্র অদ্বিতীয় লক্ষ্য ও গম্যস্থল এবং সত্যই ইহার একমাত্র পথ। (৩) দেহ ও মন সর্ব্বতোভাবে পবিত্র রাখা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ বিবিধ উপায়ে শারীরিক সুস্থতা রক্ষা না করিলে সাধন হয় না এবং কোনও প্রকার পাপকার্য্য বা কুচিন্তা এমন কি, মন্দ কল্পনা পর্য্যন্ত মনে উদয় হইলে সাধনের বিশেষ ক্ষতি হয়। (৪) দিবানিশি অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করা আবশ্যক। জীবনের যে সকল কর্ত্তব্য, তাহা সম্পন্ন করিবার উপযুক্ত সময় নির্দ্ধারণ করিয়া, অবশিষ্ট—সমস্ত সময় সাধনে ব্যাপৃত থাকা আবশ্যক। এইগুলি সকলের অবশ্য প্রতিপালনীয়

বিশেষ নিয়ম। তদ্ভিন্ন কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে যথা ঃ—(১) মাংসভক্ষণ নিষেধ। তবে শরীর রুগ্ন হইলে চিকিৎসকের ব্যবস্থা-মতে নিতান্ত আবশ্যক যদি হয়, তবে খাইতে পারেন। মাংসের উগ্রকারিতা শক্তিবশতঃ উহা চিত্তসংযমের বিরোধী, এজন্য যোগ-সাধকেরা চিরকাল মাংসভোজন নিষেধ করেন। কিন্তু মৎস্যের সে দোষ নাই বলিয়া উহা নিষিদ্ধ নহে। যাঁহারা জীবহিংসা অবৈধ মনে করেন, তাঁহারা দুইই ত্যাগ করিতে পারেন। (২) অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজন নিষেধ। কেননা, ইহাদ্বারা নানাবিধ রোগ সংক্রামিত হইতে পারে। তবে পিতামাতা গুরুজনের কিম্বা কোন বন্ধু আদর করিয়া কিছু দিলে তাহা, এবং ধর্ম্মাত্মা সাধুদিগের ভুক্তাবশেষ ভোজনে শ্রদ্ধা হইলে, তাহা গ্রহণে অনিষ্ট নাই বরং উপকার হয়। এরূপ স্থলে প্রেমের প্রবল স্বাভাবিকী শক্তিতে রোগাদি নিবারণ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ কোথায় খাওয়া উচিত কোথায় নয়, ইহা স্থির করা কঠিন বলিয়া উক্ত নিয়ম অবধারিত হইয়াছে। আর ইহাতে যখন বিবেকের কোন হানি নাই, তখন ঋগ্বেদের সময় হইতে যে সাধন চলিয়া আসিতেছে, তাহার বহু শতাব্দীর পরীক্ষিত নিয়ম বলপূর্ব্বক বৃথা ভঙ্গ করিবার প্রয়োজন কি? (৩) যাহাদের শরীর শুদ্ধ নয়, তাহাদের পক্ষে শরীর সংশোধনের জন্য প্রথম প্রথম কিছুদিন প্রত্যহ দুইবার প্রাণায়াম অর্থাৎ ভূতশুদ্ধি আবশ্যক। অন্যত্র যে সকল স্থলে শরীর সুস্থ আছে, তাহাদের তাহা আবশ্যক নাই। (৪) স্ত্রীলোক ও পুরুষে স্বতন্ত্র গৃহে সাধন করা আবশ্যক। তবে যেখানে সেরূপ সুবিধা নাই, তথায় অতি সতর্ক হওয়া উচিত, যেন পরস্পর স্পর্শ না হয়। ইহা ঋষি ও পরমহংস-দিগের অতি আদরের পবিত্র সাধন। কোনরূপে ইহার মধ্যে অপবিত্রতার লেশ মাত্র প্রবেশ না করে। যতদিন সাধক পবিত্র স্বরূপে নিমগ্ন

হইয়া আপনার প্রবৃত্তিনিচয়কে সম্পূর্ণ শাসনাধীনে আনিতে না পারেন, ততদিন চরিত্রস্খলনের কিঞ্চিন্মাত্র সম্ভাবনার মধ্যেও তাঁহার থাকা বিধেয় নহে।

প্রশ্ন—সাধনের ভিতরের তত্ত্ব ভাষায় প্রকাশ করা যদি অসম্ভব হয়, তবে আপনি আর এক জনকে কিরূপে সেই সাধন দিয়া থাকেন?

উত্তর—কথায় সাধনের বাহিরের প্রক্রিয়া ও নিয়মাবলী বুঝাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে, ভিতরকার তত্ত্ব অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত জাগ্রত প্রার্থনা উপদেশ দ্বারা শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু যেমন শরীরে শরীরে, মনে মনে, স্বাভাবিক সম্বন্ধ ও সহানুভূতি আছে, তদ্রূপ আত্মায় আত্মায়ও সহানুভূতি (Sympathy) লক্ষিত হয়। ব্রাহ্মসমাজে এরূপ দৃষ্টান্ত সর্ব্বদাই পাওয়া গিয়া থাকে। আচার্য্য যখন বেদী হইতে উপাসনা করেন, তখন যদি কোন দিন তাঁহার সত্যভাবে উপাসনা হয়, সেই দিন উপাসকদিগের প্রাণ স্পর্শ করে, নতুবা অন্য দিন নীরস ও প্রাণবিহীন হইয়া কথা মাত্র শুনিয়া তাঁহারা উঠিয়া যান। ইহার কারণ কি?—ঐ আধ্যাত্মিক সহানুভূতিই ইহার মূল। যেরূপ আচার্য্যের সত্য প্রার্থনা উপাসকদিগের প্রাণ স্পর্শ করে ও তাঁহাদের প্রাণেও জাগ্রত প্রার্থনার উদয় করিয়া দেয়, সেইরূপ অপরদিকে উপাসকদিগের মধ্যে যদি কাহারও প্রাণে বাস্তবিক সত্য প্রার্থনা জাগ্রত হয়, তাহা হইলেও ঐরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। হয় ত, আচার্য্য নীরসভাবে শুষ্ক কতক গুলি কথা মাত্র উচ্চারণ করিতেছিলেন, কাহারও প্রাণ ভিজিতে ছিল না, হঠাৎ ঐ সৌভাগ্যবান্ উপাসকের জীবন্ত প্রার্থনার ভাব আধ্যাত্মিক সহানুভূতি বশতঃ, আচার্য্যের এবং অনেক উপাসকের প্রাণে সংক্রামিত হইয়া, তাঁহাদিগকে একেবারে বিহ্বল করিয়া তোলে। এই নিয়মানুসারেই প্রতি বৎসর উৎসবাদিতে এইরূপ ঘটনা অনেক দেখা যায়।

এখন বুঝা যাইবে যে, কেহ প্রকৃত ব্যাকুলতার সহিত ঐ প্রার্থনার অবস্থা আপনার প্রাণে অবতীর্ণ করিবার জন্য ইচ্ছুক হইলে, কোন জাগ্রত-শক্তিশালী পুরুষ নিজের ইচ্ছাশক্তিতে ভগবানের কৃপাসম্ভূত নিয়মানুসারে নিজের আভ্যন্তরীণ প্রার্থনার অবস্থা তাঁহার প্রাণে সংক্রামিত করিয়া দিতে পারেন। বস্তুতঃও তাহাই হয়; যিনি নিতান্ত ব্যাকুলপ্রাণে প্রার্থী হন, আমি সমস্ত প্রাণের সহিত তাঁহার সম্মুখে প্রার্থনা করি। এবং এই সময়ে আমার পূজনীয় গুরু শ্রীযুক্ত পরমহংস বাবাজী সাহায্য করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি হইলে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঐ ব্যক্তির হৃদয়ে সেইরূপ প্রার্থনা জাগ্রত হয় এবং তাহার অন্তর্নিহিত যোগশক্তি প্রস্ফুটিত হয়। তাহা তিনি ভিন্ন বাহিরের অন্য কেহই বুঝিতে পারে না। এই অবস্থাকে যোগীরা সঞ্চারের অবস্থা কহেন। তাহার পর হইতে যিনি যে পরিমাণে ব্যাকুলতা ও নিষ্ঠার সহিত এই সাধন করিতে থাকেন, তিনি ততই গভীর হইতে গভীরতর তত্ত্ব সকল প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য্য হন। ক্রমশঃই নূতন নূতন রাজ্য সকল তাঁহার অন্তরিন্দ্রিয়ের গোচর হইতে থাকে। সে সকল অবস্থা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার উপায় নাই। অবশেষে সকল আশা চরিতার্থ হয়। আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়, অনন্ত উৎস খুলিয়া যায়, এবং ব্রহ্মকৃপায় সাধনের উচ্চ অবস্থায় যোগ আরম্ভ হয় ও অনন্তকাল চলিতে থাকে।

প্রশ্ন—বহুকাল তপস্যা করিয়া ঋষিরা যে ধন প্রাপ্ত হইতেন, এক্ষণে গৃহস্থ আশ্রমে থাকিয়া আমরা কিরূপে তাহার আশা করিতে পারি?

উত্তর—যদি আমাদিগকে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় যোগপথে চলিতে হইত, তাহা হইলে যুগযুগান্তরেও হয়ত কোন গৃহস্থ সিদ্ধাবস্থা লাভ করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কয়েকজন সিদ্ধ মহাত্মা পৃথিবীর বর্ত্তমান সময়ের ধর্ম্মসম্বন্ধে অবনতি দেখিয়া, তাহা দূর করিবার

জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তাঁহারাই দেশবিদেশে ভ্রমণ করিয়া, উপযুক্ত ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিদিগকে এই সাধন শিক্ষা দিতেছেন, এবং আপনাদের দীর্ঘকাললব্ধ বহুদর্শিতাবলে যথাসাধ্য সাক্ষাৎসম্বন্ধে সাহায্য করিতেছেন। যেমন, যদি কেহ স্বীয় প্রযত্নে ও গবেষণাবলে আজ মহাত্মা ইউক্লিডের জ্যামিতির সত্যসমূহ পুনরায় নূতনরূপে আবিষ্কার করিতে চাহেন, তবে সহস্র বৎসরেও পারেন কি না সন্দেহ। অথচ এতাদৃশ গুরুতর ব্যাপার বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পর্য্যন্ত উপযুক্ত শিক্ষকের উপদেশানুসারে অতি অল্প দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতেছে; সেইরূপ সংসারের বিবিধ উৎপাত ও ব্যাঘাত সত্ত্বেও তাঁহাদের আধ্যাত্মিক সহায়তা লাভ করিয়া, অল্পকালমধ্যেই কয়েকজন গৃহস্থ কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং অনেকেই হইবেন, সন্দেহ নাই।

প্রশ্ন—যোগপথাবলম্বী ব্যক্তিগণ প্রায়ই ভাবপ্রিয় ও কার্য্যবিমুখ এ কথা সত্য কি না?

উত্তর—ইহা অপেক্ষা ভ্রম আর কিছুই হইতে পারে না। যোগীদিগের সংবাদপত্র নাই, বক্তৃতা নাই, বাহ্য কোন চিহ্নের দ্বারা তাঁহাদের কার্য্যের সংবাদ প্রকাশিত হয় না। তাঁহারা প্রায়ই গোপনে, নির্জ্জন-কাননে কিংবা গিরি-কন্দরে বাস করেন; যখন লোকালয়ে আসেন, তখনও সচরাচর সাধারণ লোকের সহিত দুই চারিটা কথা বলিয়া চলিয়া যান; এই সকল কারণে যদি কেহ মনে করেন যে, তাঁহারা অলসপ্রকৃতি ধ্যানপরায়ণ, সংসারবিমুখ ভিক্ষুকমাত্র, তাহা হইলে তাহাদের ঘোরতর অপরাধ হয় মনে করি। যদি একটী সপ্তাহ কোন প্রকৃত যোগীর সহবাসে কাটান যায়, তাহা হইলে বুঝা যায় যে, তাঁহারা কিরূপ পরোপকারী, সংসারের কল্যাণের জন্য কত চিন্তা করেন ও কিরূপ ভয়ানক ত্যাগস্বীকার করিয়া জনসমাজের দুঃখদূর ও সুখবৃদ্ধির চেষ্টা পান এবং কেমন অদ্ভুত

নিয়মবশে ঈশ্বরের কৃপায় এবং নিজেদের শক্তিবলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হন। যাঁহারা জীবনে কখনও কোন যোগীর সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, কখনও কোন মহাত্মার সঙ্গলাভে জীবন সার্থক করেন নাই, কেবল কতকগুলা ভণ্ড অলস ও ব্যবসায়ী সন্ন্যাসী মাত্র দেখিয়া যোগীদর্শনের জ্ঞান পাইয়াছেন মনে করেন, তাঁহারা যোগি-চরিত্রের অদ্ভুত রহস্য কি বুঝিবেন? তাহাদের এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবারই অধিকার নাই। যে দেশের ঋষিরা কবি, ঋষিরা দার্শনিক, ঋষিরা সাহিত্যলেখক, ঋষিরা বিজ্ঞান প্রভৃতির আবিষ্কর্ত্তা, ঋষিরা জ্যোতির্ব্বিদ্, ঋষিরা গণিতশাস্ত্রের উদ্ভাবক, ঋষিরা দৈহিক যন্ত্রবিজ্ঞান ও আয়ুর্ব্বেদের সৃষ্টিকর্ত্তা, ঋষিরা ব্যবস্থাপক ও রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধারক, যে দেশের ঋষিরাই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী যাবতীয় বিষয়ের আদি মধ্য অন্ত, সেই দেশে যে আজ যোগ, তপস্যা ও আলস্য এক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য ও দুঃখজনক ব্যাপার আর কি হইতে পারে? যে দেশে জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহাযোগিগণ জন্মগ্রহণ করিয়া, সংসার ও ধর্ম্ম যে একই বস্তু এই মহাসত্যের পরিষ্কার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, যে দেশের তপস্যাগ্রগণ্য বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, গুরুনানক, কবীর ও শ্রীচৈতন্য সকলেই জনসমাজে পরম মঙ্গল সংসাধনের জন্য আপন আপন সুখ ও সচ্ছন্দতা, শান্তি ও সমাধি, সমস্ত জীবনই উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, অদ্যাপি যে দেশের আধ্যাত্মিক অবনতি ও নৈতিক পাশবাচার দূর করিবার জন্য কত কত সিদ্ধ মহাপুরুষগণ অরণ্যের বা পর্ব্বতগুহার নির্জ্জনসাধন ত্যাগ করিয়া, অনাহার অনিদ্রা প্রভৃতি শত ক্লেশ উপেক্ষাকরতঃ দূরদূরান্তর পদব্রজে পরিভ্রমণ করিতেছেন; এবং বিদিশাতে ধর্ম্মপিপাসু জনগণের অন্ধকারময় জীবনাকাশে প্রেম, পবিত্রতা ও সত্যধর্ম্মের জ্যোতিঃ সমুদিত করিয়া, জলকষ্টপীড়িত লোকদিগের ক্লেশ

বিদূরিত করিয়া, অন্নকষ্টে মৃতপ্রায় সহস্র সহস্র দরিদ্র লোকের সাহায্যার্থে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা পর্যান্ত সংগ্রহ ও ব্যয় করিয়া, এবং রুগ্নকে ঔষধ, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা, অজ্ঞানকে জ্ঞান, হতাশকে আশা দিয়া প্রতিদিন এই হতভাগ্য দেশে পুনরায় সৌভাগ্যলক্ষ্মী আনয়ন করিবার জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া বেড়াইতেছেন, হায়! সেই দেশের লোক হইয় চক্ষু থাকিতে আমরা অন্ধের ন্যায় চীৎকার করিতেছি, যোগে আলস্য ও কর্ম্মবিমুখতা আনিয়া দেয়। লজ্জার কথা, ক্ষোভের কথা, অজ্ঞতার কথা। যাঁহাদের ষড়ৈশ্বর্য্যশালিত্ব, যাঁহাদের মহত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক বীরত্বের কিছুমাত্র আভাস পাইয়া, ইউরোপ আমেরিকা স্তম্ভিত ও বিস্ময়ে স্তব্ধ, যাঁহাদের দুই চারিটা কথার প্রতিধ্বনি Emerson Carlyle প্রমুখ পাশ্চাত্য যোগিগণের নিকট পাইয়া উনবিংশ শতাব্দী তাঁহাদের উপাসনা করিতেছে এবং যে মহাত্মাদিগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা Jesus Christ এবং মহম্মদ এই দুই সহস্র বৎসর পৃথিবীর অধিকাংশ মানবমণ্ডলীকে পরিচালিত করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদেরই সন্তান হইয়া অন্ধ যে আমরা ইংরাজদিগের যৌবনসুলভ চপলতা দেখিয়া ভ্রান্ত হইয়াছি ও যোগকে আলস্য মনে করিতেছি, ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি হইতে পারে?

বস্তুতঃ যোগে আলস্য আনে না, বরং ঠিক তার বিপরীত। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম এই তিনের এককালীন সামঞ্জস্যীভূত উন্নতিই যোগের ফল। পরমেশ্বর রসের স্বরূপ, রস যেমন উদ্ভিদের দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এককালে তাহার মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা ও পত্র সর্ব্বত্র সমভাবে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করে, মানবাত্মায় পরমাত্মার আবির্ভাব হইলেও সেইরূপ তাহার সমস্ত ভাব একসঙ্গে সমভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আংশিক উন্নতি ইহার বিরুদ্ধ। তিনি পূর্ণ, সেই পূর্ণ-আদর্শ প্রাণে

অবতীর্ণ হইলে অপূর্ণতা কি সঙ্কীর্ণতা তথায় স্থান পায় না। প্রকৃত উন্নতি লাভ করিলে কার্য্য করিতেই হইবে। তবে কার্য্য সকলের একরূপ কথনই হইতে পারে না। সকলেই প্রচার কি বক্তৃতা বা সংবাদপত্র প্রকাশ ও পুস্তক প্রণয়ন করিবে, নতুবা তাহাদিগকে ক্রিয়াশীল বলিব না, ইহা অজ্ঞের কথা। সকলকেই ধর্ম্মপরায়ণ যোগী হওয়া চাই, অথচ সাংসারিক নানাকর্ম্মে বিভক্ত হইতে হইবে। বক্তৃতা করা কাহারও কার্য্য, পুস্তক লেখা অপরের কার্য্য, কেহ বা কৃষিকার্য্য করিবে, কেহ বিচারপতি হইবে, কাহাকে জমিদারী দেখিতে হইবে, কাহাকেও স্বদেশ-রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে হইবে, অন্য কেহ বা কেবল নির্জ্জনে বসিয়া সাধন করিবেন ও অপর সকলকে আপনার ধর্ম্মজীবনের অমূল্য সত্যসমূহ বিরলে শিক্ষা দিবেন। সুতরাং দেখা গেল যে, যোগ সকলের সাধারণ ভিত্তিভূমি। তাহার উপর দণ্ডায়মান হইয়া যাহার যেরূপ সুবিধা, তিনি সেইরূপ উপায়ে মানবজাতির কল্যাণের জন্য জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন।

এই প্রকার দিবানিশি সদালাপ, ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ও ভজনানন্দাদি দ্বারা আশ্রমটী পরিপূর্ণ থাকিত। আশ্রমের কোন নির্দ্দিষ্ট আয় ছিল না। অযাচিত দান দ্বারাই ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। অতিথি অভ্যাগত, দর্শক উপাসক প্রভৃতি যখন যাঁহারা উপস্থিত হইতেন, সকলেই আশ্রমে আহারাদি করিতেন। গোস্বামী প্রভুর সহধর্ম্মিণী, তাঁহার শাশুড়ী ও শিষ্যগণ স্বহস্তে রন্ধন করিয়া তাহাদিগকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইতেন। অতিথি অভ্যাগতের সংখ্যা অত্যধিক হইলেও আশ্রমে কখনও অন্নাভাব হয় নাই। ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন :—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং॥

অর্থাৎ যাঁহারা অন্যচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমাকেই চিন্তা করেন, সর্ব্বদা আমার উপাসনায়ই নিযুক্ত থাকেন, সেই নিত্যযুক্ত পুরুষদিগের যোগ (ধনাদি লাভ) ও ক্ষেমের (তাহা পরিরক্ষণের) ভার আমিই বহন করিয়া থাকি।

গোস্বামী প্রভুর জীবনে উক্ত শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতা যেরূপ পরিস্ফুট হইয়াছিল, অতি অল্পসংখ্যক সাধুর জীবনেই তদ্রূপ দৃষ্ট হয়। সময়ের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধেও গোস্বামী প্রভু যেরূপ জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, সেইরূপ বর্ত্তমান যুগে আর কোন মহাত্মা দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। গোস্বামী প্রভু শৌচাদিক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া পাঠ, পূজা, কীর্ত্তন, সাধন, ভজন, আহার—ইত্যাদি সমস্ত কার্য্যই নিয়মিতরূপে সম্পন্ন করিতেন।

তিনি অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক আশ্রমস্থ পক্ষীদিগকে স্বহস্তে চাউল ইত্যাদি আহার্য্য বস্তু প্রদান করিতেন। পরে স্বীয় সাধনকুটীরে গিয়া ভজন করিতেন। কিয়ৎকাল সাধন করিয়া চা পান করিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকল্পে যশোহর, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ী প্রভৃতি বহু অস্বাস্থ্যকর স্থানে ভ্রমণ করাতে দারুণ ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি প্রত্যহ প্রাতে একবার করিয়া চা পান করিতেন। চা পান শেষ হইলে, গেণ্ডারিয়াবাসী শ্রদ্ধেয় কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয় (ঢাকা, কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান সহকারী শিক্ষক) কুটীরে তাঁহার নিকটে শ্রীমদ্ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা পাঠ করিতেন। এই সময় গোস্বামী প্রভু পাঠ শুনিতে শুনিতে দুই হস্তে করধারণ করিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসে স্বীয় গুরুদত্ত নাম সাধন করিতেন। এই সময় তাঁহার বদনারবিন্দ ব্রহ্মজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত, দৃষ্টি স্থির, নিশ্চল হইয়া যাইত এবং অধরকোণে অপূর্ব্ব মাধুরীময়

হাসি ফুটিয়া উঠিত। এই অবস্থায় তিনি অনেক সময় সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। যখন সমাধিসাগরের অবিরাম অন্তর্মুখীন স্রোতবেগে তদীয় কমল-নয়ন দুইটী ধীরে ধীরে অস্তোন্মুখ রবির ন্যায় নিমীলিত হইয়া যাইত, তখন মস্তকটী মৃত-মনুষ্যের ন্যায়, কখনও বক্ষোপরে বিলম্বিত, কখনও বা স্কন্ধোপরে দক্ষিণে বামে হেলাইয়া পড়িত। এই সমাধি-সাগর-নিমজ্জিত, নীরব-নিস্পন্দ, স্থির-ধীর প্রশান্ত মূর্ত্তি যখন যে স্থানে বিরাজ করিত, তখন সেই স্থানই এক অপার্থিব গভীর নিস্তব্ধতায় পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। তথায় সংসারের কোলাহল প্রবেশ করিতে সমর্থ হইত না, ঋষি-শক্তির এক অপূর্ব্ব স্পন্দনে, সরল-পিপাসিত চিত্ত নিবাত-নিষ্কম্প-দীপশিখার ন্যায় স্থির ও নিশ্চল হইয়া পড়িত। গোস্বামী প্রভুর এই অবস্থার কথা উপলক্ষ করিয়া কোন সময় ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন—"ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার আর কি করিব? গোসাইঁজীকে একখানা চৌকিতে (কাষ্ঠাসনে) বসাইয়া দ্বারে দ্বারে দেখাইলেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার হয়।" সে যাহা হউক, শ্রদ্ধেয় কুঞ্জবাবুর পাঠ শেষ হইলে, গোস্বামী প্রভু নিজে গুরু নানকের গ্রন্থসাহেব, মহাত্মা তুলসীদাসের হিন্দি রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি শাস্ত্র অপূর্ব্ব সুর করিয়া পাঠ করিতেন। তাঁহার সেই মহা আকর্ষণময় অমৃত-শীতল-স্নিগ্ধতাপূর্ণ শাস্ত্রপাঠ যিনি শ্রবণ করিতেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। এমন কি, বনের পশু পক্ষী পর্য্যন্ত ভয়োদ্বেগ-বিবর্জ্জিত হইয়া নিকটে বসিয়া নিবিষ্ট-মনে তাঁহার পাঠ শ্রবণ করিত। * একাদশ ঘটিকার সময়

* শ্রীবৃন্দাবনে ও পুরীধামে কয়েকটী বানরকে, গোস্বামী প্রভুর পাঠের সময় তাঁহার আসনের কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থানপূর্ব্বক পাঠশ্রবণ করিতে তাঁহার শিষ্যদিগের অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

গেণ্ডারিয়া আশ্রমের যে আম্রবৃক্ষের তলাতে গোস্বামী প্রভু পাঠ পূজা করিতেন,

পাঠ শেষ করিয়া স্নানাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। অতঃপর উপস্থিত অতিথি অভ্যাগত ও শিষ্যদিগের সহিত এক পংক্তিতে হবিষ্যান্ন ভোজন করিতেন। ভোজনান্তে মুখবাস গ্রহণপূর্ব্বক ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতেন। সুস্থশরীরে তিনি কখনও দিবসে নিদ্রা যাইতেন না। বিশ্রামান্তে তিনি স্বীয় সাধনকুটীরের সমীপবর্ত্তী আম্রবৃক্ষের নিম্নে উপবিষ্ট হইয়া কখনও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সাধন করিতেন, কখনও বা শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। অপরাহ্নে এই স্থানে তাঁহার নিকটে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বহু ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি সমবেত হইয়া ধর্ম্মালাপ করিতেন। তিনি দিবসের অধিকাংশ সময় শাস্ত্রাদি পাঠে অতিবাহিত করেন কেন, এই কথা এক দিন তাঁহার জনৈক শিষ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, বাহিরের সহিত যোগ রাখিবার জন্যই তাঁহাকে এত অধিক সময় পাঠাদিকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, নচেৎ আভ্যন্তরিক আকর্ষণে আত্মস্থ করিয়া তাঁহার বাহিরের কার্য্যকলাপাদি বন্ধ করিয়া দেয়। সন্ধ্যার পরে কুটীরে সংকীর্ত্তনে যোগদান করিতেন। এই সময় কীর্ত্তনে তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত পাঁচটী গান ক্রমান্বয়ে গীত হইত; যথা :—

১। ললিত—ঠুংরি।

হরিছে লাগি বহ রে ভাই ;
তেরা বনতবনত বনি যাই॥
ওঙ্কা তারে, বঙ্কা তারে, তারে সুধনকসাই,
শুয়া পড়ায়েকে গণিকা তারে, তারে মিরাবাই।

উহার শাখায় বসিয়া সময় সময়, কয়েকটী শালিক পক্ষীকে, ও নিম্নে একটী কুকুরকে তাঁহার পাঠের সময় উপস্থিত হইয়া পাঠ শ্রবণ করিতে, গেণ্ডারিয়াবাসী শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

দৌলত দুনিয়া, মাল খাজানা, বেনিয়া বয়েল চড়াই,
এক বাতমে ঠাণ্ঠা লাগে, খোজ খবর নাহি পাই।
এইছে ভক্তি, কর ঘট ভিতর, ছোড় কপট চতুরাই,
সেবা বন্দন, আউর দীনতা, সহজে মিলয়ে রঘুরাই ॥

২। খাম্বাজ—যৎ।

ঠাকুর, এইছে নাম তুহার।
প্রভুজী, এইছে নাম তুহাব ॥
পতিত অপবিত্র লিয়ে কর আপনার, সকল করত নমস্কার ॥
জাত বরণকো, পুছত নাহি, যাচত চরণার বার।
সাধুসঙ্গ, নানক বুধ পাই, হরিকীর্ত্তন জীউ আধার ॥

৩। খাম্বাজ—একতালা।

সদায় হরিবোল, মধুর হরিনামের নাই তুলনা।
যদি বিষয়েতে সুখ হত রে, তবে লালাজী ফকির হতো না।
নামে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল রে, তারে যমদূতে ছুঁতে পেল না।
(মধুর হরিনামে রে)
নামে জগাই মাধাই ত'রে গেল রে, ভবে অপার নামের মহিমা।
(হরিনামের গুণে রে)
নামে রূপসনাতন ফকির হল রে, (ভবে) কি দিব নামেব তুলনা ॥

৪। কীর্ত্তনের সুর—একতালা।

নাচে আর হরি বলে গৌরনিতাই।
গৌরনিতাই নাচে অদ্বৈত গোঁসাই।
(হরিবোল ব'লে রে)

(আমরা) এমন দয়াল ঠাকুর আর দেখি নাই।
(গৌরনিতাই এর মত রে)
(সীতানাথের মত রে)

৫। কীর্ত্তনের সুর—একতালা।

তোরা কে নিবি লুট লুটে নে, নিতাইচাঁদের প্রেমের বাজারে।
হাটের রাজা নিত্যানন্দ, পাত্র হ'লেন শ্রীচৈতন্য,
মুন্সিগিরি দিলেন অদ্বৈতেরে,
হরিদাস খাদাঞ্চি হ'য়ে লুট বিলাল সবারে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, তাঁরা ভেবে নিরন্তর,
ধ্যান করিয়ে না পেলেন যাঁহারে,
নারদ ঋষি মগ্ন হ'য়ে বীণাযন্ত্রে গান করে॥ ইত্যাদি।

কীর্ত্তনান্তে গোস্বামী প্রভু হরির লুট বিতরণপূর্ব্বক তাঁহার বাসগৃহে (আশ্রমের পূর্ব্বভিটার গৃহে) আগমন করিয়া শিষ্যদিগের সহিত একত্র হইয়া সাধন করিতেন। অনন্তর ৯ ঘটিকার সময় তাহাদিগের সহিত একত্রে রুটি, ডাইল তরকারী ইত্যাদি ভোজন করিতেন। রাত্রের আহারের পর গোস্বামী প্রভু কুটীরে গিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ভজন করিতেন এবং অধিকাংশ সময় ভগবানে যুক্ত হইয়া উপবিষ্ট অবস্থায় সমাধিসাগরে নিমগ্ন থাকিতেন। এই সময় শ্রদ্ধেয় কুঞ্জবাবু প্রভৃতি ২।১ জন শিষ্য তাঁহার সেবার জন্য কুটীরে উপস্থিত থাকিতেন। রাত্রি ২।৩ ঘটিকার পরে তিনি অল্প সময়ের জন্য বিশ্রাম করিতেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে তাঁহার নিদ্রা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তখন সমস্ত রাত্রিই ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করিতেন।

এইরূপে গোস্বামী প্রভু তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ নিয়মিতরূপে দিবানিশি ঘড়ি ধরিয়া সম্পন্ন করিতেন। বিশেষ কারণ ব্যতীত কখনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইত না। এই প্রকারে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে একটী আনন্দের হাট বসাইয়া, গোস্বামী প্রভু সশিষ্যে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। অতঃপর মাঘ মাস আগমন করিলে শুভ সপ্তমী তিথিতে তিনি মহাসমারোহের সহিত শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর জন্মমহোৎসব সম্পন্ন করেন।

ফাল্গুন মাসে গোস্বামী প্রভুর একমাত্র পুত্র প্রভুপাদ যোগজীবন গোস্বামী ও কন্যা শ্রীমতী শান্তিসুধাদেবীর উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত রুকুণী গ্রামবাসী মৈত্রবংশোদ্ভূত শ্রীযুক্ত জগৎবন্ধু মৈত্রের সহিত শ্রীমতী শান্তিসুধার এবং তদীয় ভগ্নী শ্রীমতী বসন্তকুমারী দেবীর সহিত শ্রীমান্ যোগজীবনের শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়।

বিবাহ উপলক্ষে, গয়া আকাশগঙ্গাপর্ব্বতবাসী মহাত্মা রঘুবর দাস বাবাজী মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন। ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাই হইতে অন্ধসাধক ভক্তপ্রধান পরশুরাম উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং ব্রাহ্মসমাজের বহুলোকও সানন্দে উৎসব-কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন।

বিবাহের পরদিবস সকালবেলা শ্রীনাম কীর্ত্তন হইয়াছিল। কীর্ত্তনে মহাভাবের এক অপূর্ব্ব শক্তি বিকশিত হইয়া, উপস্থিত নরনারীবৃন্দকে অভিভূত করিয়াছিল। গোস্বামী প্রভু নাম-মদিরায় মত্ত হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য ও তারকব্রহ্ম হরিনামের উচ্চনিনাদে দশদিক প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী, না জানি কি ভাবে বিভোর হইয়া, সঙ্কোচ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তবৃন্দের কপালে ফুলি দিতে

দিতে গোস্বামী প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইলে, জনৈক শিষ্য ভাবে মগ্ন হইয়া 'জয় রাধারাণী' 'জয় ব্রজেন্দ্রনন্দন' বলিয়া গভীর নিনাদ করিয়া উঠিলেন। এই ধ্বনি শ্রবণমাত্র জননী যোগমায়া, কৃষ্ণপ্রেমে অবশ হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় গোস্বামী প্রভুর বামপার্শ্বে তদবস্থায় দণ্ডায়মানা রহিলেন, এবং গোস্বামী প্রভুও সমাধিস্থ হইয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এমন সময় ঢাকা মুড়াপাড়া নিবাসী শ্রদ্ধেয় চিন্তাহরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ শুকশারীর গান ধরিয়া দিলেন, যথা :—

কীর্ত্তনের সুর।

শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
শারী বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ॥
নইলে শুধুই মদন।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধ'রেছিল।
শারী বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল॥
নইলে পারবে কেন।
শুক বলে আমার কৃষ্ণের চূড়ায় ময়ূরপাখা।
শারী বলে আমার রাধার নামটি তাহে লেখা॥
নইলে পাখীর পাখা। ইত্যাদি।

তাঁহার গান শেষ হইতে না হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক পরম শ্রদ্ধাস্পদ ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া মাতঙ্গিনী দেবী রাধাপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া একটী কলসী কাঁকে করতঃ, গোপীভাবে অদ্ভুত নৃত্য করিতে করিতে দুই জনের পদধৌত করিতে লাগিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত গান করিতে লাগিলেন; যথা :—

খাম্বাজ—একতালা।

হরি ব'লব আর মদনমোহন হেরিব গো।
যাব ব্রজেন্দ্রপুর গোপীপায় হব নূপুর,
(আমি) রাঙ্গা পায়ে রুণুঝুণু বাজিব গো।
তোমরা সব ব্রজবাসী আমায় কর এই আশিষি,
(আমি) নিতুই নিতুই শ্যামের বাঁশী শুনিব গো॥

ইঁহাদিগের গানে, শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে এক অপূর্ব্ব ভাব সঞ্চারিত করিয়া দিল। কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত সকলেই নীরব নিস্পন্দ! কেহ যেন আর মরজগতে নাই, কোথায় কোন এক অনৈসর্গিক রাজ্যে অবস্থান করিতেছেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। এমন সময় অন্ধভক্ত পরশুরাম, প্রেমনেত্রে গোস্বামী প্রভুর দিকে দৃষ্টিপাতকরতঃ তাঁহার পদতলে নিপতিত হইলেন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অশ্রুকম্প পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাব মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিল এবং 'এই কৃষ্ণ,' 'এই মাধব' 'কেমন চূড়া!' 'কেমন বনমালা!' 'গোঁসাই, তুমি আমাকে এতদিন চিনিতে দেও নাই', 'ধন্য ধন্য'—ইত্যাদি অদ্ভুত বাক্য এমন সতেজে, এমন গদগদভাবে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন যে, দর্শকমণ্ডলী উহা শ্রবণ করিয়া একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন, অনেকে প্রেমবিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

কীর্ত্তনান্তে অন্নমহোৎসব আরম্ভ হইল। সকলেই আনন্দে দিশাহারা। আপনা ভুলিয়া সকলেই যেন অপরকে সুখী করিবার জন্যই ব্যস্ত। নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত বিচার নাই, স্থানাস্থান বিচার নাই, যাঁহার যেস্থানে সুবিধা হইতেছে; তিনি সেই স্থানেই আহার করিতে বসিলেন। আশ্রমবাসীরা সানন্দচিত্তে তাঁহাদিগকে আহার্য্য বিতরণ করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে সমস্ত দিবসই মহোৎসব চলিল। সন্ধ্যার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রবাবুপ্রমুখ কতিপয় ব্রাহ্ম, আহার করিতে বসিলেন। এই সময় দধি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে শুনিয়া, স্বর্গীয় নগেন্দ্রবাবু উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—"গোঁসাই, দই না খাইয়া উঠ্‌ব না, যে স্থান হইতে পার দই আনিয়া দিতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া গোস্বামী প্রভু, শ্রীমতী যোগমায়া দেবীকে দধির ভাণ্ড আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। তিনি সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন যে, "একটী হাঁড়ীর তলাতে যৎসামান্য দধি আছে, এত লোকের মধ্যে তাহা আনিয়া কি হইবে?" গোস্বামী প্রভু পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করাতে, তিনি ভাণ্ডটী আনিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। গোস্বামী প্রভু স্বীয় গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া দধি পরিবেশন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"যে যত পার খাও।" কিন্তু দধি আর ফুরায় না! ইহা দেখিয়া নগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি অবাক্ হইয়া রহিলেন; এবং কিয়ৎকাল পরে ভাবে বিহ্বল হইয়া সর্ব্বাঙ্গে সেই দধি লেপন করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে একটী আনন্দের রোল উত্থিত হইল। পরে গোস্বামী প্রভু বলিলেন—"আপনারা যোগের ঐশ্বর্য্যের কথা বিশ্বাস করেন না, তাই গুরুজী দয়া করিয়া কিঞ্চিৎ দেখাইলেন, কিন্তু এ সমস্ত যোগের অতি সামান্য ফল।"

এই সময় গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য, শান্তিপুরনিবাসী ৺ লাল-বিহারী বসু (লালজী) গেণ্ডারিয়া আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম তখন অনুমান ১৪।১৫ বৎসর হইবে। ইঁহার পিতৃদেবের নাম ৺ রামগোপাল বসু। গুরুকৃপায় সাধনগ্রহণের পর অল্প সময়ের মধ্যেই লালজী অতি উচ্চাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভূত ভবিষ্যৎ দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছিল। তিনি যাহার সম্বন্ধে যে কথা বলিতেন, তাহা ঠিক্ ঠিক্ মিলিয়া যাইত। মহাভাবে মাতোয়ারা হইয়া লালজী

যখন গোস্বামী প্রভুর সঙ্গে সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিতেন, তখন তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে যে অপূর্ব্ব শোভা হইত, তাহা বর্ণনাতীত; তাহা যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদেরই চিত্তপটে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। গোস্বামী প্রভুর মহত্ত্ব ও অসাধারণত্ব তিনিই সর্ব্বপ্রথম অপরাপর শিষ্যমণ্ডলীর গোচরে আনয়ন করেন। একবার শান্তিপুর অবস্থানকালে, কি প্রকারে তিনি সমস্ত দেবতা ও অবতারগণকে ক্রমান্বয়ে তিন দিন পর্য্যন্ত গোস্বামী প্রভুর দেহ হইতে আবির্ভূত হইয়া পুনরায় তাহাতেই লয় হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, কেমন করিয়া গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে তাঁহার দেহ হইতে বাহিরকরতঃ সত্যলোক, তপলোক প্রভৃতি স্থান দর্শন করাইয়া পুনরায় স্বদেহে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলেন, এই সমস্ত কথা লালজী কোন কোন সময়ে স্বীয় অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগের নিকটে প্রকাশ করিতেন।

এই অল্পবয়স্ক বালক এতদূর তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন, শাস্ত্রের জটিল তত্ত্ব সকলের এমন সুন্দর মীমাংসা করিতে পারিতেন যে, বড় বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণও তাহা দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতেন। তাঁহার কথাবার্ত্তায়, আচারব্যবহারে প্রকাশ পাইত যেন, পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের সমস্ত তত্ত্বই তিনি 'করতলন্যস্ত আমলকবৎ' প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন।

গোস্বামী প্রভু লালজীকে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বলিতেন। অনেকে এই মহাপুরুষে বালগোপাল মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন। এই মুক্তাত্মার পুনরায় দেহধারণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি একদিন বলিয়াছিলেন—"ভারতবর্ষে অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের বীজ বপন করিবার জন্য আমার ইচ্ছা হওয়ায় এই দেহ ধারণ করিতে হইয়াছে।" তখন তাঁহাকে বলা হইল—"আপনি ঐ কার্য্য করিলেন কৈ?" তদুত্তরে লালজী বলিলেন—"ইতঃপূর্ব্বেই ঐ ধর্ম্মের বীজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কর্ত্তৃক উপ্ত হইয়াছে। সুতরাং আমার জীবনের আর কোন কার্য্য নাই,

এখন আমি চলিয়া যাইব।" এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে এই অদ্ভুত যুবক স্ব-ইচ্ছায় নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করতঃ আত্মীয় স্বজনকে কাঁদাইয়া অমর ধামে গমন করেন।

পুত্র কন্যার বিবাহান্তে গোস্বামী প্রভু কলিকাতায় আগমন করতঃ সুকিয়াষ্ট্রীটস্থ একটী ভাড়াটিয়া বাসায় বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময় একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়কে দর্শন করিবার জন্য গোস্বামী প্রভু শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে পার্কষ্ট্রীটস্থ তাঁহার আলয়ে গমন করেন। তিনি সশিষ্যে মহর্ষিকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিলে মহর্ষিও তাঁহাদিগকে অতীব সমাদরে গ্রহণ করিলেন। সকলে উপবিষ্ট হইলে মহর্ষি গোস্বামী প্রভুকে বলিলেন—"আজ তোমাকে দেখিয়া আমার পূর্ব্বকালের ঋষিদিগের কথা মনে হইতেছে। তাঁহারা যেমন সশিষ্য কোথাও গমন করিতেন, তুমিও অদ্য সেইরূপ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে এখানে আগমন করিয়াছ। তুমি যে জন্য ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলে তাহা সুসিদ্ধ হইয়াছে। তুমি ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছ। ইঁহারাও (শিষ্যগণ) তোমার প্রসাদে ভগবান্‌কে লাভ করিয়া ধন্য হইবেন। তুমি অতি সুপাত্র ও উচ্চ অধিকারী। ধর্ম্মের জন্য সৎকুলে জন্মগ্রহণ, সৎশিক্ষা, সৎসঙ্গ ও সৎসাধন, এই চারিটী বিশেষ প্রয়োজন। সর্ব্বোপরি ভগবানের কৃপা। এই সকল তোমার সমস্তই হইয়াছে। তুমি উৎকৃষ্ট অদ্বৈতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভ করিয়াছ, সৎসঙ্গ ও সৎসাধন যথেষ্ট করিয়াছ। তুমি ত ব্রহ্মদর্শন করিবেই। তুমিই ধন্য! তুমিই ধন্য!" এই বলিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন, যথা :—

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
নৃত্যন্তে স্বর্গে পিতরস্তু তেষাং, যেষাং কুলে বৈষ্ণবনামধেয়ঃ॥"

গোস্বামী প্রভু সলজ্জ ভাবে উত্তর করিলেন—"আপনিই ত আমার পথপ্রদর্শক—আদিগুরু।" মহর্ষি বলিলেন—"হাঁ, পাঠশালার গুরুর ন্যায়। এখন তুমিই আমার গুরুস্থানীয় হইয়াছ।" গোস্বামী প্রভুর শিষ্যগণ মহর্ষিকে নমস্কার করিলে তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"তোমরা ধর্ম্মার্থী হইয়া ইঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ। কখনও ইঁহাকে পরিত্যাগ করিও না। তোমরা মনে করিও না যে, ইঁহার সহিত তোমাদের কেবল মাত্র ইহকালের সম্বন্ধ। ইঁনি অনন্তকাল তোমাদিগকে হাতে ধরিয়া ধর্ম্মপথে লইয়া যাইবেন। তোমরা ইঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া অনন্তকাল ধর্ম্মরাজ্যে অগ্রসর হইবে।"

অতঃপর একদিন কতিপয় বিশিষ্ট ব্রাহ্মের সহিত ধর্ম্মালোচনা-প্রসঙ্গে গোস্বামী প্রভু বলিলেন যে, ব্রহ্ম দর্শনের পক্ষে সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ একান্ত আবশ্যক। এই কথা শুনিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক ৺শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন যে, "মহর্ষি ব্রহ্ম দর্শন লাভ করিয়াছেন, তিনি ত গুরু গ্রহণ করেন নাই।" তদুত্তরে গোস্বামী প্রভু বলিলেন—"কে বলিল মহর্ষির সদ্‌গুরু লাভ হয় নাই? মহর্ষি নিশ্চয়ই সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ করিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ মহর্ষির নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি গুরু গ্রহণ করিয়াছেন কি না? মহর্ষি তাঁহাকে এই প্রশ্ন করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, গোস্বামী প্রভুর সহিত তাঁহার সদ্‌গুরুর আবশ্যকতা সম্বন্ধে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। মহর্ষি প্রথমতঃ গুরুকরণের কথা অস্বীকার করিলেন। পরে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—"হাঁ, হইয়াছে, গোস্বামী মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহাই সত্য। আমি একদিন হিমালয়ের কোন নির্জ্জন স্থানে একাকী বসিয়া ব্রহ্মধ্যান করিতেছিলাম। হঠাৎ চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখি যে,

অনতিদূরে অপর একটী পাহাড়ের শৃঙ্গ হইতে একজন মহাপুরুষ আমার দিকে চাহিয়া আছেন। তাঁহার চক্ষুর উপর আমার দৃষ্টি পড়া মাত্রই তাঁহার চক্ষু হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ আমার শরীরে প্রবেশ করিল এবং আমার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চ দিয়া উঠিল। তদবধি আমার ভিতরে ধর্ম্মভাব সকল প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বে শাস্ত্র পড়িয়া কতক গুলি ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলাম মাত্র, কিন্তু তাহা প্রাণে সুস্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করিতে পারিতাম না।" আমরা শুনিয়াছি গোস্বামী প্রভু গয়া হইতে যোগদীক্ষা গ্রহণানন্তর উচ্চাবস্থা লাভ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, এক দিবস মহর্ষি তাঁহার নিকটে নিজের আধ্যাত্মিক দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করেন। তাহা শ্রবণ করিয়া গোস্বামী প্রভু মহর্ষিকে কৃপা করিবার জন্য শক্তিশালী জনৈক মহাপুরুষকে অনুরোধ করেন। তিনিই এক দিবস অলক্ষিতভাবে মহর্ষিকে উল্লিখিত প্রকারে শক্তি সঞ্চার করিয়া গিয়াছিলেন। *

* প্রভুপাদ যোগজীবন গোস্বামী মহাশয়ের মুখে শ্রুত।

করাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। গোস্বামী প্রভু তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব স্মৃতিশাস্ত্র হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ হইতে দেখাইয়া দিলেন যে, তুলসী ও রুদ্রাক্ষ মালা একত্র ধারণ শাস্ত্র বিরুদ্ধ নহে, অধিকন্তু জপের জন্য রুদ্রাক্ষমালা শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, * এবং ভেক ধারণ প্রথা শাস্ত্রে নাই, অবস্থা বিশেষে সন্ন্যাস গ্রহণই শাস্ত্রসম্মত। তারপর গৌরিক-বসন ও দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ যদি বৈষ্ণব-শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইত তাহা হইলে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু উহা কখনই ধারণ করিতেন না, এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন। গোস্বামী প্রভুর এই সিদ্ধান্তে বিরুদ্ধবাদিগণ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল, এবং শ্রীশ্রীগোবিন্দজিউর

যে কণ্ঠলগ্ন তুলসী নলিনাক্ষমালা,
যে বা ললাটফলকে লসদূর্দ্ধপুণ্ড্রাঃ।
যে বাহুমূলে পরিচিহ্নিত শঙ্খচক্রা,
স্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি॥

হরিভক্তিবিলাস-ধৃত নারদসংহিতার শ্লোক। চতুর্থবিলাস—১২৩ শ্লোক।

পদ্মাক্ষৈশ্চাপি রুদ্রাক্ষৈর্বিদ্রুমৈর্ম্মণিমৌক্তিকৈঃ।
পুত্রবীজময়ী মালা সা শস্তা জপকর্ম্মণি॥

ঐ গ্রন্থ, ১৭ বিলাস, ৩৬ শ্লোক।

এতদ্ভিন্ন শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর রুদ্রাক্ষ মালা ধারণের কথা উল্লিখিত আছে যথা :—

কণ্ঠে শোভাকরে বহুবিধ দিব্য হার।
মণিমুক্তা প্রবালাদি যত সর্ব্বসার।
রুদ্রাক্ষ বিডাক্ষ দুই সুবর্ণরজতে।
বাঁধিয়া পরিলা গলে মহেশের প্রীতে॥

অন্ত্যখণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

সেবায়েত গোস্বামীদিগের সহায়তায় তাঁহাকে অবমানিত করিবার জন্য সঙ্কল্প করিল। কিন্তু মানুষ যাহা ইচ্ছা করে তাহাই কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না। মানুষের ক্ষুদ্র ইচ্ছাশক্তির উপরেও আর একটী মহাশক্তি কার্য্য করিতেছে, সেই শক্তিকে অতিক্রম করিবার ক্ষমতা মানুষের নাই। এই সকল ষড়যন্ত্রকারীদিগের অভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত হইতে পারিল না। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র অন্যরূপ ব্যবস্থা করিলেন। ষড়যন্ত্রকারীদিগের নেতা গোবিন্দজীর সেবায়েত সেই রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন যে, একটী ভীমকায় বরাহ তাঁহার বক্ষঃস্থলে উপবেশন পূর্ব্বক তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিতেছে—"কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা, তাঁকে (গোস্বামী প্রভুকে) তোরা অপমান করিবি? জানিস সে কে? যে গোবিন্দজীকে তোরা পূজা করিস্ সেই গোবিন্দজী ও তিনি অভিন্ন। যদি মঙ্গল চাস তবে এখনই তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর।" এই বলিয়া বরাহমূর্ত্তি অন্তর্দ্ধান করিলেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে দলপতি মহাশয় তাঁহার সমস্ত বক্ষে দন্তাঘাতের চিহ্ন দর্শন করিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই তিনি গৌর শিরোমণি মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তিনি করুণাপরবশ হইয়া তাঁহাকে নানাপ্রকার সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক গোস্বামী প্রভুর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে উপদেশ করিলেন। পরদিন গোস্বামী প্রভু গোবিন্দজীউ দর্শন করিবার জন্য উপস্থিত হইলে, দলপতি স্বয়ং গোবিন্দজীর প্রসাদী মালা তাঁহার গলদেশে অর্পণ করিয়া পূর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

এদিকে ভেকধারী পণ্ডিতম্মন্য বাবাজী মহাশয়গণ গোস্বামী প্রভুকে তাহাদের মতানুযায়ী চালাইবার চেষ্টা করিতে ক্ষান্ত হইল না। তাহারা তাঁহাকে নানাপ্রকারে ভেক্ধারণ করাইবার জন্য জেদ করিতে

লাগিল। এই কথা অবগত হইয়া এক দিবস গৌর শিরোমণি মহাশয় গোস্বামী প্রভুকে নিভৃতে বলিলেন—"প্রভু, আপনি যাহা বলিবেন, যেরূপ আচরণ করিবেন, কালে তাহাই শাস্ত্র সদাচার বলিয়া গৃহীত হইবে। অতএব আপনি কখনও এই সকল অজ্ঞলোকদিগের কথানুযায়ী কার্য্য করিবেন না। উহারা শাস্ত্র মানে না, সদাচারও জানে না, কেবল আপনাদের মতানুযায়ী কার্য্য করিয়া তাহাই লোকসমাজে শাস্ত্র সদাচার বলিয়া প্রচার করে।" পরম শ্রদ্ধাস্পদ ভবিষ্যদ্দর্শী শিরোমণি মহাশয় কথাপ্রসঙ্গে আরও বলিলেন যে—"অতি শীঘ্রই বঙ্গদেশে অবতার অবতার করিয়া এক মহা হুজুগ উঠিবে। অনেক ধর্ম্মধ্বজী লোক আপনাদিগের মধ্যে কেহ বা মহাপ্রভুর, কেহ বা নিত্যানন্দ প্রভুর অবতার বলিয়া ঘোষণা করতঃ সরলবিশ্বাসী অজ্ঞলোকদিগকে প্রতারণা করিতে চেষ্টা করিবে। আপনি ঐ সকল ভণ্ডলোকদিগের কথায় কর্ণপাত করিবেন না। এযুগে তাঁহাদের আর অবতার হইবে না। তাঁহারা অদ্যাপি সাধারণ লোক-চক্ষুর অগোচরে থাকিয়া কার্য্য করিতেছেন।" এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন, যথা :—

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥"

সত্যসঙ্কল্প এই মহাপুরুষের বাক্য সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। বিগত দশবৎসরের মধ্যে আমরা ঐরূপ ৫।৬টী কপট অবতারের উত্থান-পতন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

একদিবস নগরকীর্ত্তন হইতেছিল। গোস্বামী প্রভু শৌচাগার হইতে কীর্ত্তনের ধ্বনি শ্রবণ করতঃ আত্মহারা হইলেন, এবং জলশৌচ না করিয়াই কীর্ত্তনের মধ্যে উপস্থিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তন শেষ হইলে প্রসাদ বিতরণ করা হইল। তিনি প্রসাদ পাইলেন। পরে স্বীয়

আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় পথিমধ্যে মনে হইল যে, তিনি শৌচ না করিয়াই কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। এই কথা মনে হইলে তিনি নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় গৌর শিরোমণি মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া সমস্ত কথা প্রকাশ করিলেন। শিরোমণি মহাশয় তাহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"প্রভো! ঠিক্ হইয়াছে, আপনি যে ব্রাহ্মসমাজে গিয়াছিলেন তাহার কার্য্য নিষ্ফল হয় নাই; কারণ ব্রহ্মজ্ঞানী না হইলে ভক্তির অধিকারী হয় না। এই জন্য মহাপ্রভু আপনাকে ব্রাহ্মসমাজে লইয়া গিয়াছিলেন। যে কার্য্য সত্যভাবে করা হয় তাহা কখনও নিষ্ফল হয় না।"

এই সময় একদিন শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভু গোস্বামী প্রভুর নিকটে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে তিলক ধারণের প্রণালী দেখাইয়া দিয়াছিলেন। ঘটনাটী গোস্বামী প্রভুর স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা:—"ধর্ম্মের জন্য ভেক ধারণ প্রথার কোন প্রয়োজন আছে কি না জিজ্ঞাসা করায়, শিরোমণি মহাশয় আমাকে বলিলেন—'ভেকের কোন দরকার নাই, ইহা কোন শাস্ত্রীয় ব্যাপার নহে, তবে অনেকে অনুরাগে উহা গ্রহণ করিয়া থাকেন।' শিরোমণি মহাশয়ের কথা শুনিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য একদিন আমি, এক অদ্ভুত রকমের তিলক করিলাম। লাল, সাদা, কালো প্রভৃতি নানা রংএ কপাল চিত্রিত করিয়া তাঁহার নিকটে গেলাম। শিরোমণি মহাশয় আমাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন—'প্রভো! অন্য কেহ হইলে আমি বলিতাম না, কিন্তু আপনি আচার্য্যসন্তান, তাই বলিতেছি আপনি ঐরূপ তিলক কখনও করিবেন না, উহাতে বড়ই কষ্ট পাই।' আমি হাসিয়া বলিলাম—'তবে কিরূপ তিলক করিব?' শিরোমণি মহাশয় বলিলেন—'আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করেন? সীতানাথ অদ্বৈতপ্রভুকে ভাবুন, তিনিই বলিয়া দিবেন।' তাঁহার কথা শুনিয়া আমি চলিয়া

আসিলাম। সেই দিন রাত্রিতে আমি ৺ রাধাদামোদরের কুঞ্জে বসিয়া আছি। গভীর রাত্রে বাস্তবিকই অদ্বৈত প্রভু, আরও কয়েকজন তাঁহার সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; আমাকে বলিলেন—"তোমার এ সমস্তের (তিলক ধারণের) কিছুই দরকার নাই, তবে যদি একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই দেখ আমি যেরূপ তিলক করিয়াছি, ঠিক ঐরূপ তিলক করিও।' আমি তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলাম—'আপনি অপেক্ষা করুন, আমি আগে তিলক করিয়া লই। এই বলিয়া ধুনির ভস্ম লইয়া কমণ্ডলুর জল দ্বারা (অদ্বৈত প্রভুর তিলকের অনুরূপ) তিলক করিলাম। অদ্বৈত প্রভু তিলক দেখিয়া বলিলেন—'ঠিক হইয়াছে।' এই বলিয়া তিনি অদৃশ্য হইলেন। তৎপর দিবস আমি সেই তিলক লইয়া শিরোমণি মহাশয়ের নিকট গেলাম। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—'প্রভো! আপনি এই তিলক কোথায় পাইলেন?' আমি পূর্ব্বরাত্রের ঘটনা বলিলাম। তাহা শুনিয়া শিরোমণি মহাশয় ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে ভাব সম্বরণ করিয়া বলিলেন—'প্রভো! অতি উত্তম হইয়াছে। শ্রীঅদ্বৈতবংশধরগণ এইরূপ তিলকই ধারণ করিয়া থাকেন। *

অপর এক দিবস গোস্বামী প্রভু শিরোমণি মহাশয়ের কুঞ্জে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাকে মহাসমাদরের সহিত বসিবার আসন প্রদান করিয়া বলিলেন—"প্রভো! আজ একটী বিশেষ কথা আছে। সেদিন দয়া ক'রে কয়েকজন বৈষ্ণব এখানে এসেছিলেন। তাঁহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে অমুকস্থানে শ্যামা পূজা হইবে তাহাতে তাহারা যোগদান করিতে পারেন কি না?" গোস্বামী প্রভু বলিলেন—"আপনি কি বল্লেন?"

* শ্রীযুক্ত——রায় মহাশয় সংগৃহীত বিবরণ

শিরোমণি—বল্লাম আপনারা কাহার ভজনা করেন? তাঁহারা বল্লেন—কেন? শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ভজনা করি।

গোস্বামী প্রভু—তারপর আপনি কি বল্লেন?

শিরোমণি—বল্লাম, কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় কি? তারা বল্লেন, গোপীর অনুগত হ'য়ে ভজন কর্‌তে হবে। আমি বল্লাম, গোপীর অনুগতি, তা বেশ। গোপীরা কি ক'রে কৃষ্ণ পেয়েছিলেন? বনে গিয়ে কাত্যায়নীর পূজা করে ত? যদি তাই হয় তবে শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য বৈষ্ণবের শ্যামা পূজার বাধা কি?

গোস্বামী প্রভু উত্তর করিলেন—আপনি ঠিক্ ব'লেছেন।

এক দিন শিরোমণি মহাশয়ের কুঞ্জে পাঠ হইতেছিল। তাঁহার ছেলেদের মধ্যে একজন পাঠ করিতেছিলেন। এমন সময় গোস্বামী প্রভু তথায় উপস্থিত হইলেন। শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে সসম্ভ্রমে বসিতে আসন দিয়া বলিলেন—প্রভো! আজ আর একটা কথা আছে।

গোস্বামী প্রভু—কি কথা?

শিরোমণি—আজ এদের (ছেলেদের দেখাইয়া) গর্ভধারিণী এসেছেন। তিনি এখানে থাকিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু বৈষ্ণবেরা ইহাতে বিশেষ আপত্তি কচ্ছেন, কারণ আমি ভেখাশ্রিত, তাতে প্রকৃতি রাখা।

গোস্বামী প্রভু—তাতে আপনি কি ব্যবস্থা করেছেন্?

শিরোমণি—আমার এখানে দয়া করে অনেকেই আসেন। কত পুরুষ কত স্ত্রীলোক আসেন, থাকেন। তাহাতে ওকে যদি নিষেধ করি তবে পূর্ব্বের সম্বন্ধটিত রয়ে গেল। আমি যখন ভেখাশ্রয় করেছি এ আশ্রমে সকলেরই সমান অধিকার। তাই নিষেধ করি কেমন করে?

গোস্বামী প্রভু উত্তর করিলেন—ইহা পূর্ণ সত্য।

অপর এক দিবস গোস্বামী প্রভু, ভক্তিভাজন গৌর শিরোমণি,

সর্ব্বদা মাটিতে মিশিয়া থাকিবে। নিজ নিন্দা কিংবা নিজের সম্বন্ধে কিছু ঘটিলে "তৃণাদপি সুনীচেন", কিন্তু যখন দেবনিন্দা, গুরুনিন্দা প্রভৃতি শুনিবে তখন বজ্র অপেক্ষা কঠিন হইতে হইবে।' মহাপুরুষের বাক্য শুনিয়া আমি ললিতা দাস বাবাজীর জন্য ব্যথিত হইলাম। এদিকে ললিতা দাস স্বপ্নে দেখিলেন কে যেন তাঁকে বলিতেছে—'ওরে পাপীষ্ঠ, তুই সাধুবাক্য অবহেলা করিয়াছিস্, এই পাপ শূল বেদনারূপে প্রকাশিত হইয়া তিন দিন মধ্যে তোকে বিনষ্ট করিবে।' স্বপ্ন দেখিয়া বাবাজী ভীত হইয়া শিরোমণি মহাশয়কে সমস্ত বিষয় জানাইল। শিরোমণি মহাশয় বলিলেন, 'যখন তিনি আসিবেন তখন ক্ষমা চাহিও।' তৎপর দিবস আমি যাইয়া উপস্থিত হইতেই বাবাজী অতি কাতরভাবে আমার নিকট ক্ষমা চাহিল। আমি বলিলাম—'বাবাজী, আপনি বলিবার পূর্ব্বেই আমি আপনার জন্য মহাপুরুষের নিকটে ক্ষমা চাহিয়াছি, কিন্তু তিনি ক্ষমা করিলেন না, আমি কি করিব? অতঃপর সত্য সত্যই তিন দিনের মধ্যে দারুণ বেদনায় বাবাজীর মৃত্যু হইল। তাঁহার সঙ্গীয় বৈষ্ণবী চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।" তখন জানিলাম বৈষ্ণবী তাঁহার ভগ্নী!" * শাস্ত্রে আছে যে মহামতি উদ্ধবের ন্যায় ভাগবতগণ, এমন কি, ব্রহ্মাদি দেবতারাও তরু গুল্মলতা হইয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে বাস করিতে অভিলাষ করেন, † এই বৃক্ষরূপী মহাপুরুষের ঘটনাটি হইতে এই বাক্যের সত্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে।

---

* শ্রীযুক্ত—রায় মহাশয় সংগৃহীত গোস্বামী প্রভুর উপদেশাবলী হইতে উদ্ধৃত।

† আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং ;
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাং ॥
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ৪৭ অ, ৫৪ শ্লোক, উদ্ধবস্তোত্র।

অপিচ—তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্ গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকং।

একদিন গোস্বামী প্রভু শ্রীযমুনার তীরে একাকী ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময় উজ্জ্বল গৌরবর্ণবিশিষ্ট দীর্ঘকায় একজন মহাপুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পুরুষপ্রবর ভূমি হইতে অর্দ্ধহস্ত পরিমিত উচ্চে শূন্যের উপর দিয়াই গমন করিতেছিলেন। তাঁহার পদযুগল একেবারেই ধরাতল স্পর্শ করিতেছেনা দেখিয়া, গোস্বামী প্রভু বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মহাপুরুষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া আপনাকে নিমাই পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন। পরিচয় পাইয়া গোস্বামী প্রভুর বাক্যস্ফুরণ হইল না, কেবল চরণ-তলে পড়িয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে আবেগ একটু শিথিল হইলে বলিলেন—"ঠাকুর বড় ঘুরিয়াছি।" তিনি উত্তর করিলেন—"তোদের কুলেরই এই রীতি।" তখন গোস্বামী প্রভু বলিলেন—"আপনি দয়া করিয়া পুনর্ব্বার প্রকাশিত হউন, কলির মলিন জীব উদ্ধার করুন।" শ্রীশ্রীমহাপ্রভু উত্তর করিলেন—"প্রকাশ হইবার দিন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, (এখন) প্রকাশ হইলে কেহ আমাকে বিশ্বাস করিবে না।" এই কথা উল্লেখ করিয়া গোস্বামী প্রভু পরবর্ত্তী সময়ে এক দিন বলিয়াছিলেন—"আমার বোধ হয় মহাপ্রভুকে তখন তেমন ভাবে দরদ করিবার কেহ ছিল না, থাকিলে তিনি আরও কিছুদিন থাকিতেন।" সে যাহা হউক অতঃপর গোস্বামী প্রভু, মহাপ্রভুকে কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার ধর্ম্ম কি?" মহাপ্রভু গম্ভীরস্বরে নিম্নলিখিত শ্লোকটী উচ্চারণ করিলেন, যথা :—

যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ
স্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ১৪ অ, ৩২ শ্লোক, ব্রহ্মাস্তোত্র।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

এই সময় শ্রীবৃন্দাবনের একটী বহু প্রাচীন সমাধি যমুনাগর্ভে নিপতিত হইবার উপক্রম হইলে, কয়েক জন ভক্ত বৈষ্ণব তাহা রক্ষা করিবার জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন যে সমাধির অর্দ্ধেক পরিমাণ ইতিমধ্যেই ধসিয়া পড়িয়াছে। সমাধি সম্পূর্ণ রক্ষা করিবার আর উপায় নাই। অতঃপর উহার অভ্যন্তরে অনুসন্ধান করিয়া এক খণ্ড অস্থি প্রাপ্ত হইলেন। অস্থিখণ্ড পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলেন যে তাহাতে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।" এই শ্লোকটি অতি সুস্পষ্ট ভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া উপস্থিত সকলেই অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, এবং কি প্রকারে ঈদৃশ অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হইতে পারে, তাহার মীমাংসার জন্য গৌর শিরোমণি মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি অস্থিখণ্ড দেখিয়া অতিশয় হর্ষ প্রকাশ করতঃ বলিলেন যে, "এই অস্থিখণ্ড যাঁহার, তিনি একজন অতিশয় উচ্চস্তরের মহাপুরুষ ছিলেন। শ্বাসে প্রশ্বাসে তাঁহার গুরুদত্ত নাম অভ্যস্ত হইয়াছিল। সেই নাম শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত শিরায় শিরায় প্রবিষ্ট হইয়া রক্ত মাংস ভেদ করতঃ অস্থি স্পর্শ করিয়াছিল। তাহাতেই এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইয়াছে। অতঃপর মহাসমারোহের সহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে অস্থিখণ্ডকে সমাধিস্থ করা হইল। পরবর্ত্তীকালে গোস্বামী প্রভুর দেহেও এইরূপ অনেকানেক লক্ষণ অধিকতর উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঢাকা গেণ্ডারিয়া আশ্রমে অবস্থানকালে তাঁহার অঙ্গে 'হরি,' 'কৃষ্ণ' 'রাধা' প্রভৃতি নাম আপনা আপনিই অঙ্কিত হইত, এবং কিছুক্ষণ থাকিয়া আবার বিলীন হইয়া যাইত। অঙ্গে সরু লৌহশলাকা

অনেকক্ষণ চাপিয়া রাখিলে যেরূপ চিহ্নিত হয়, নামের অক্ষর গুলি সেইরূপ ভাবে প্রকাশিত হইত। এই অবস্থা ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া গোস্বামী প্রভুর পরিধেয় বস্ত্রে, উপবেশনের আসনে, এমন কি গেণ্ডারিয়া আশ্রমস্থ যে আম্রবৃক্ষের মূলে তিনি অনেক সময় সাধন ভজন করিতেন, সেই বৃক্ষে পর্য্যন্ত ভগবানের বিভিন্ন নাম এবং সময় সময় দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রকাশিত হইত। পরিধেয় বস্ত্রের ও আসনের চিত্রগুলি দেখিলে মনে হইত, যেন কোন সুকোমল হস্ত অতিশয় সন্তর্পণে বস্ত্রের অংশ বিশেষ কুঞ্চিত করিয়া নামের অক্ষর ও দেবদেবীর মূর্ত্তি গুলি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। যখন ঐ সকল চিত্রগুলি একবার প্রকাশিত হইত, তখন হাজার চেষ্টা করিয়াও তাহা বিলুপ্ত করিতে পারা যাইত না। বস্ত্রখানি প্রসারিত করিয়া অথবা বসিয়া মাজিয়া ছাড়িয়া দিবামাত্রই পুনরায় চিত্র গুলি প্রকাশিত হইত। অনেক সময় গোস্বামী প্রভুর বসিবার আসনের উপর ছোট বড় নানাবিধ অতি সুস্পষ্ট পদচিহ্নও পতিত হইত।

কলিকাতায় হারিসন রোডের ৪৫ নং ভবনে অবস্থানকালে শ্রীমান্ পান্নালাল ঘোষ নামক গোস্বামী প্রভুর জনৈক শিষ্য কিছু দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ অপরাহ্ণে তাঁহার নিকটে মহাভারত পাঠ করিতেন। এই সময় যে দিবস যে অধ্যায় পঠিত হইত, সেই দিনই বর্ণিত বিষয়ের চিত্র গোস্বামী প্রভুর বসিবার আসনে প্রকাশিত হইত। এই অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিতেন, তাঁহারা সকলেই আত্মহারা হইয়া যাইতেন। গোস্বামী প্রভুকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি শ্রীবৃন্দাবনধামের পূর্ব্বোক্ত নামাঙ্কিত অস্থিখণ্ডের কথা উল্লেখ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, "প্রকৃত শ্বাসপ্রশ্বাসে গুরুদত্ত নাম অভ্যস্ত হইলে এইরূপ অবস্থা হয়। এইরূপে সাধকের দেহটী পর্য্যন্ত নামের মন্দির হইয়া যায়। তখন রক্ত-মাংসের প্রত্যেক পরমাণুতে পরমাণুতে নাম উজ্জ্বল রূপে জ্বলিতে থাকে।

সেই নাম ক্রমশঃ শরীর ভেদ করিয়া বাহিরে প্রকাশিত হয়। এই জন্ম মহাত্মারা এই অবস্থা গোপন করিবার জন্য সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন ও কেহ কেহ সর্ব্বদা গাত্রে আবরণ ব্যবহার করেন। ঈদৃশ মহাপুরুষেরা যে বৃক্ষতলে উপবেশন করেন তাহাতে পর্য্যন্ত নাম, নামের প্রতিপাদ্য মূর্ত্তি ইত্যাদি প্রকটিত হয়।" এই বলিয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনের একটা কেলিকদম্ব বৃক্ষের কথা উল্লেখ পূর্ব্বক বলিলেন যে, তাহাতে 'হরি' 'কৃষ্ণ' 'রাধা' 'রাম' প্রভৃতি অসংখ্য নাম বৃক্ষের ত্বকে স্বাভাবিক অক্ষরে প্রকটিত হইয়া আছে। * শ্রীবৃন্দাবনের কালীয় হ্রদের তীরে এই বৃক্ষটি এখনও বর্ত্তমান। কথিত আছে, ভগবান্ যশোদানন্দন কালীয় নাগ দমন করিবার সময় এই বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক জলাশয়ে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন।

সংসারের অধিকাংশ কার্য্যের মধ্যেই কৃত্রিমতা দৃষ্ট হয় সত্য, কিন্তু ধর্ম্ম-রাজ্যে কৃত্রিমতার মাত্রা যেরূপ অত্যধিক পরিমাণে প্রসারিত হইতেছে, এমন আর কুত্রাপি দেখা যায় না। এই সময় শ্রীবৃন্দাবনে নারায়ণস্বামী নামক একজন নামজাদা সাধু বাস করিতেন। ইনি প্রেতসিদ্ধ ছিলেন। প্রেতগণ ইচ্ছামত নানারূপ দেবদেবীর মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে। স্বামীজী তাহার প্রেতের সাহায্যে নানাপ্রকার বুজরুকি দেখাইয়া অজ্ঞ সরলবিশ্বাসী লোকদিগের নিকট হইতে বিস্তর অর্থ ও যশঃ উপার্জ্জন করিতেন। কিন্তু অধর্ম্ম ভণ্ডামী চিরকাল গোপন থাকে না। একদিন না একদিন তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে; ইহা ভগবদ্বিধান। এই বিধান বিদ্যমান না থাকিলে এত দিন পৃথিবী হইতে ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইত।

একদিন নারায়ণস্বামী, গোস্বামী প্রভুর প্রভাব অবগত না হইয়া

* এতদ্ভিন্ন দুষ্টলোকেরা যাত্রিদিগকে ভুলাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্ম কোন কোন বৃক্ষে ছুরিকাদ্বারা এক প্রকার নাম অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু সেই সকল খোদিত অক্ষর হইতে পূর্ব্বোক্ত স্বাভাবিক অক্ষরগুলি সম্পূর্ণ পৃথক্; দৃষ্টি মাত্রেই উভয়ের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়।

তাঁহাকে বলিলেন—"আপনি কি সাধন-ভজন করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতেছেন? আমার শিষ্য হউন, একদিনের মধ্যেই ভগবান্ দর্শন করাইয়া দিব। আপনি অমুক দিন অমুক সময় আমার আশ্রমে উপস্থিত হইলে আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিব।" গোস্বামী প্রভু কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে স্বামীজীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী তাঁহাকে যথাস্থানে একখানি বসিবার আসন প্রদানপূর্ব্বক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতে অনুরোধকরতঃ বলিলেন—"কিয়ৎকালের জন্য ভগবানের নাম করিতে বিরত থাকিও।" ইতঃপূর্ব্বেই স্বামীজীর সততার প্রতি গোস্বামী প্রভুর সন্দেহ জন্মিয়াছিল। এখন নাম করিতে নিষেধ করাতে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইল; তত্রাচ স্বামীজীর কার্য্যের রহস্য ভেদ করিবার জন্য তাঁহার আদেশানুরূপ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। কিন্তু নাম ত্যাগ করিবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। কারণ, বহুদিন হইতেই তাঁহার গুরুদত্ত নাম শ্বাসপ্রশ্বাসে চলিত। সে যাহা হউক, অল্পক্ষণ পরে স্বামীজী বলিলেন—"দেখ, এই যে ভগবান্ প্রকাশিত হইয়াছেন।" গোস্বামী প্রভু চাহিয়া দেখিলেন, সত্য সত্যই একটী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এই মূর্ত্তি দর্শন করিয়াও তাঁহার মানসিক কোন ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল না, বরং মনে এক প্রকার অস্বাভাবিক জ্বালা উপস্থিত হইল। ইহাতে তিনি স্বামীজীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—"একি! সচ্চিদানন্দবিগ্রহদর্শনে আমার যে প্রকার আনন্দ উপস্থিত হয়, প্রাণে যেরূপ অপার্থিব শান্তিস্রোতঃ প্রবাহিত হয়, এই মূর্ত্তি দেখিয়া তাহা হইতেছে না কেন? সুতরাং আমার মনে হয় এ সমস্ত ভৌতিক কাণ্ড। আপনি আমাকে প্রতারণা করিতে চেষ্টা করিতেছেন।" এই কথা বলিতেছেন এমন সময় পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণুমূর্ত্তিধারী প্রেত নাকিস্বরে বলিয়া উঠিল—"আমাকে কাহার নিকট উপস্থিত করিয়াছিস্? এ যে

ভক্ত, আমি আর তিষ্ঠিতে পারিতেছি না।” এই কথা বলিয়া প্রেত অন্তর্দ্ধান করিল, স্বামীজার ভণ্ডামিও প্রকাশিত হইয়া পড়িল। অতঃপর স্বামীজী, গোস্বামী প্রভুর পদতলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনাকরতঃ এই কথা প্রকাশ না করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। স্বামীজী পুনর্ব্বার কাহাকেও প্রেত দ্বারা প্রতারণা করিবেন না এই প্রতিজ্ঞা করিলে, তিনি তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। শুনিয়াছি, স্বামীজী এই ঘটনার পর হইতে পূর্ব্বোক্ত ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া সত্যধর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

পশ্চিমাঞ্চলের অনেক সাধুর এইরূপ প্রেতসিদ্ধি, কর্ণপিশাচসিদ্ধি এবং অনেক মুসলমান ফকিরের পৈরীসিদ্ধি থাকে। ইহারা এই সকল অপদেবতাদ্বারা নানা প্রকার বুজরুকী দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করে। কেহ কেহ বা স্বরোদয়সাধন অভ্যাসপূর্ব্বক লোকের দুই চারিটা মনের কথা বলিয়া শ্রদ্ধা আকর্ষণকরতঃ সুযোগ উপস্থিত হইলে তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কর্ণপিশাচসিদ্ধ ব্যক্তিগণ একটী লোক দেখিয়া তাহার সাতপুরুষের নাম বলিয়া দিতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত সিদ্ধির একটীও ধর্ম্মের সহায়তা করে না, বরং তাহা হইতে বিচ্যুত করে। শাস্ত্রে আছে যে, তামসিক প্রকৃতির লোকসমূহ এই সকল সিদ্ধি লইয়া থাকে এবং ইহাতে তাহাদিগের সাত জন্ম পর্য্যন্ত ভগবদ্ভজন হয় না। * এই সকল নরপিশাচগণের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য

* যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তমসা জনাঃ॥ গীতা।
সপ্তজন্মোপদেবানাং কৃত্বা সেবাং সকর্ম্মতঃ।
লভতে চ রবের্মন্ত্রং সাক্ষিণঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ৩৬ অধ্যায়।

গোস্বামী প্রভু প্রায়ই প্রকৃত সাধুর কয়েকটী লক্ষণের কথা উল্লেখ করিতেন। তাহা এই:—(১) প্রকৃত সাধু কখনও আত্মপ্রশংসা করেন না। (২) পরনিন্দা করেন না। (৩) কোন প্রকার বুজরুকী দেখান না। (৪) কাহারও বিশ্বাসে আঘাত দিয়া কথা বলেন না। (৫) কাহাকেও বুদ্ধিভেদ জন্মাইয়া আপনার মতে টানিতে চেষ্টা করেন না। (৬) তিনি সর্ব্বদা ভগবানে নির্ভর করিয়া থাকেন। (৭) অনাহারে প্রাণ গেলেও কাহারও নিকট কিছু যাচ্ঞা করেন না। এবং (৮) তিনি সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে শাস্ত্র ও সদাচারের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলেন। এই সকল লক্ষণগুলির উপর দৃষ্টি রাখিয়া সাধুসঙ্গ করিলে প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

গোস্বামী প্রভু শ্রীবৃন্দাবনধামে অবস্থানকালে অনেক সময় অনেক অপরিচিত সাধু মহাত্মা তাঁহার সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতে আগমন করিতেন। তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে কোন কোন সময় এমন গভীরভাবের কথোপকথন হইত যে, তন্মধ্যে সাধারণে প্রবেশ করিতে পারিত না। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মহাপুরুষগণও ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া এইরূপ অনেক সময় তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতেন। একদিবস জনৈক অপরিচিত সাধু, গোস্বামী প্রভুর নিকটে আগমনকরতঃ কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন—"বহুকাল তপস্যা করিয়া আমি একটী অতীব আশ্চর্য্য মন্ত্রশক্তি লাভ করিয়াছি। ইহা দ্বারা ইচ্ছামাত্রে অভীপ্সিত বস্তু লাভ করিতে পারা যায়। আমি দেহত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তোমাকে সেই শক্তি প্রদান করিতে অভিলাষ করি। সমস্ত সংসারে অন্বেষণ করিয়াও এই শক্তি ধারণ করিবার উপযুক্ত লোক আমার চক্ষে পড়িল না।" তদুত্তরে গোস্বামী প্রভু বলিলেন—"আমাকে ক্ষমা করুন। যোগৈশ্বর্য্যে আমার কিঞ্চিন্মাত্র আবশ্যকতা নাই।" এই উত্তরে নিরস্ত না হইয়া সাধুটী

গোস্বামী প্রভুকে একটী মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বহুদিবস গত হইলে এক দিন গোস্বামী প্রভুর মনে হইল, সাধুর বাক্য সত্য কি না, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি? মনে মনে এইরূপ আলোচনা করতঃ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তিনি গোবিন্দজীর মালাপ্রসাদ স্মরণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ একজন বাবাজি দরজায় আঘাত করিয়া "মহারাজ, মহারাজ" বলিয়া ডাকিতে লাগিল এবং দরজা খুলিবামাত্র গোবিন্দজীর মালাপ্রসাদ গোস্বামী প্রভুকে প্রদান করিল। তিনি কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর কখনও ঐ মন্ত্র ব্যবহার করিবেন না। ঘটনাটী সামান্য বটে, কিন্তু সমসাময়িক সাধুসজ্জনের গোস্বামী প্রভুর প্রতি অটল গভীর শ্রদ্ধার ইহা একটী প্রমাণ।

অপর এক দিবস কোথা হইতে তিনজন অপরিচিত সাধু হঠাৎ আশ্রমে উপনীত হইলেন। গোস্বামী প্রভু তাঁহাদিগকে দর্শনকরতঃ সসম্ভ্রমে স্বীয় আসন হইতে উত্থিত হইয়া, যথাযোগ্য সম্মানসহকারে বসিতে আসন প্রদান করিলেন। তাঁহারা আসনে উপবিষ্ট হইয়া গোস্বামী প্রভুকে তাঁহার গাত্রাবরণ উন্মোচন করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনিও স্বীয় গাত্রের আলখেল্লা খুলিয়া রাখিলেন। অতঃপর সাধুগণ কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত গোস্বামী প্রভুর আপাদমস্তক নিরীক্ষণপূর্ব্বক কোন প্রকার বাক্যালাপ না করিয়াই ভক্তিভরে প্রণামকরতঃ আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এতদ্দর্শনে গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য প্রেমিক ভক্ত ৺ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় (ছোট সতীশ) কৌতূহলপরবশ হইয়া সাধুত্রয়কে অনুসরণকরতঃ রাস্তায় বহির্গত হইলেন, এবং কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কোথা হইতে কি জন্য আসিয়াছিলেন, এবং গোস্বামী মহাশয়ের শরীরেই বা কি দেখিলেন, বিশেষ কোন প্রতি-

বদ্ধকতা না থাকিলে বলিতে আজ্ঞা হউক।" এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা বলিলেন—"ভগবৎলক্ষণের সীমা ইঁহাতে দৃষ্ট হইল। বর্ত্তমান সময় ইঁহারই উপরে সমস্ত ভার।"

এই স্থলে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ হইতে মহাপুরুষের লক্ষণ উদ্ধৃত করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। লক্ষণ যথা :—

"পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্ব-পৃথুগম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্॥

সামুদ্রকে তৃতীয় শ্লোকঃ।

অর্থাৎ যে ব্যক্তির নাসিকা, হস্ত, হনু (গণ্ডের উর্দ্ধভাগ), নয়ন ও জানু এই পঞ্চ দীর্ঘ; ত্বক, কেশ, অঙ্গুলীর পর্ব্ব, দন্ত ও রোম এই পঞ্চ সূক্ষ্ম; নয়নের প্রান্তভাগ, চরণতল, করতল, তালু, ওষ্ঠাধর, জিহ্বা ও নখ এই সপ্তস্থান রক্তিমাযুক্ত; বক্ষঃস্থল, স্কন্ধ, নখ, নাসা, কটিদেশ ও মুখ এই ছয়টী স্থান সমুন্নত; গ্রীবা, জঙ্ঘা ও লিঙ্গ এই তিনটি অঙ্গ খর্ব্ব; কটিদেশ, ললাট ও বক্ষঃস্থল এই তিনটী বিশাল এবং নাভি, স্বর ও বুদ্ধি এই তিনটী গাম্ভীর্য্যযুক্ত, এইরূপ অসাধারণ বত্রিশটী লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে হইবে, ইনি "মহাপুরুষ"। গোস্বামী প্রভুর শ্রীঅঙ্গে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সমূহ পূর্ণরূপে বিদ্যমান ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া উল্লিখিত মহাপুরুষগণ ও তদীয় সূক্ষ্মদর্শী শিষ্যাদিগের মধ্যেও কেহ কেহ একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" নামক গ্রন্থে পূর্ণপুরুষের যে সকল আভ্যন্তরিক লক্ষণের বিষয় বিবৃত আছে, তাহাও তাঁহাতে পরিলক্ষিত হইত বলিয়া নিম্নে প্রসঙ্গতঃ তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে; যথা :—

"অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসাযুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ।
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ম্বদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ।
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকাল সুপাত্রজ্ঞ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্বশী।
স্থিরোদান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ।
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ।
প্রতাপী কীর্ত্তিমান রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান।
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রাইব পঞ্চাশদ্দুর্বিগাহা হরেরমী॥
জীবেষেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়াক্বচিৎ।
পরিপূর্ণতয়াভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে॥

পূর্ণপুরুষের অসাধারণ গুণসমূহ যথা :—সুরম্যাঙ্গ (সুগঠনযুক্ত অঙ্গ), সর্ব্বসল্লক্ষণযুক্ত, রুচির (সৌন্দর্য্য দ্বারা নয়নানন্দকারী), তেজস্বী, বলীয়ান্, বয়সান্বিত (বার্দ্ধক্যেও যিনি যুবার ন্যায়), বিবিধ অদ্ভুত ভাষাজ্ঞ, * সত্য-

* গোস্বামী প্রভু কাকিনা অবস্থান কালে তথাকার রাজা বাহাদুর মহিমারঞ্জন রায়, সকল দেশের ভাষা না জানিয়া কি প্রকারে তত্তদঞ্চলের সাধুমহাত্মাদিগের কথা বুঝিতে পারেন, এই কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি বলিয়াছিলেন যে, "যাঁহার জ্ঞান অনন্তজ্ঞানের সহিত যুক্ত হয় তাঁহার কিছুই জানিতে বাকী থাকে না।"

বাক্য (যাহার বাক্য মিথ্যা হয় না), প্রিয়ম্বদ (অপরাধীজনের প্রতিও যিনি সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করেন), বাবদূক (শ্রবণপ্রিয় ও অর্থ-পরিপাটিযুক্ত বাক্য যিনি বলেন), সুপণ্ডিত, বুদ্ধিমান্, প্রতিভাধুক্ত, বিদগ্ধ (শিল্প বিলাসাদিতে যুক্তিযুক্ত), চতুর (এককালে অনেক কার্য্যের সমাধানকারী), দক্ষ (দুঃসাধ্য কার্য্য শীঘ্র সম্পাদনকারী), কৃতজ্ঞ, সুদৃঢ়ব্রত, দেশকালসুপাত্রজ্ঞ (যিনি দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করেন), শাস্ত্রচক্ষুঃ (যিনি শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম করেন), শুচি (পাপনাশক ও বিশুদ্ধ), বশী (জিতেন্দ্রিয়), স্থির (ফলোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত যিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না), দান্ত (ক্লেশ সহিষ্ণু), ক্ষমাশীল, গম্ভীর (যাঁহার মনোগত ভাব অতিশয় দুর্ব্বোধ), ধৃতিমান্ (যে ব্যক্তি নিরাকাঙ্ক্ষ ও ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও শান্ত), সমঃ (রাগ ও দ্বেষ হইতে বিমুক্ত), বদান্য (দানবীর অর্থাৎ অতিশয় দাতা), ধার্ম্মিক (যে ব্যক্তি স্বয়ং ধর্ম্ম যাজন করেন ও অপরকে ধর্ম্ম যাজন করান), শূর, মান্যমনকৃৎ (মান্য ব্যক্তিকে মানদানকারী), বিনয়ী, দক্ষিণ (স্বীয় সুস্বভাব দ্বারা কোমলচরিত্র), হ্রীমান্ (লজ্জাশীল), শরণাগতপালক, সুখী, ভক্তসুহৃৎ, প্রেমবশ্য, করুণ (পরদুঃখ সহ্য করিতে অক্ষম), সর্ব্বশুভঙ্কর (সর্ব্বসাধারণের হিতকারী), প্রতাপী, কীর্ত্তিমান্, রক্তলোক (সমস্ত লোকের অনুরাগভাজন), সাধুসমাশ্রয় (সাধু সজ্জনের পক্ষপাতী), সর্ব্বারাধ্য, সমৃদ্ধিমান্, বলীয়ান্, ঈশ্বর (স্বতন্ত্র ও দুর্ল্লঙ্ঘ্যাজ্ঞ অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না), পুরুষোত্তমের এই পঞ্চাশৎ গুণ। ইহা সমুদ্রের ন্যায় দুর্ব্বিগাহ্য। এই সমস্ত গুণ যদি জীবগণের থাকা সম্ভব হয়, তবে যে যে জীব ভগবানের অনুগৃহীত, সেই সকল জীবে বিন্দু বিন্দু রূপে অবস্থিতি করে; কিন্তু পুরুষোত্তম ভিন্ন অন্য কুত্রাপি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না।"

এই সময় শ্রীশ্রীঅদ্বৈতবংশাবতংস সূক্ষ্মদর্শী পরমভাগবত প্রভুপাদ ৺নীলমণি গোস্বামী মহোদয় শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেন। তিনি তাৎকালিক অপরাপর বাবাজী মহাশয়দিগের ন্যায় গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন না। গোস্বামী প্রভুর প্রকৃত পরিচয় পাইয়া ইঁনি তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন। প্রভুপাদ নীলমণি গোস্বামী মহোদয় এক দিবস গোস্বামী প্রভুর জনৈক শিষ্যের নিকট তৎসম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে, যথা :—"প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আমার সঙ্গে একবার দেখা করিতে আসেন এবং ভিন্ন আসনে বসিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি কিন্তু বিজয়ের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া সবিস্ময়ে বলিলাম—"কি বিজয়, আমার নিকটও তোমার অনাত্মীয় পর পর ভাব? তুমি যে আমাদের বংশের পরশমণি! আমি কি তা জানি না? এ মণির সংস্পর্শে জগতের জীব ধন্য হইবে, কৃতার্থ হইবে। আর যে সকল ব্যক্তি, তুমি ব্রাহ্মধর্ম্মে গিয়াছিলে বলিয়া ঘৃণা বা উপেক্ষা করিবে, তাহারা নিশ্চয়ই তোমাকে চিনিতে পারে নাই। তুমি কি অপূর্ব্ব রত্ন! অথবা তাহাদের বড়ই দুর্ভাগ্য যে, তাহারা এমন পরশমণির সংস্পর্শ করিয়া জীবন ধন্য করিতে সক্ষম হইল না। আমরা কিন্তু তোমাকে আমাদের বংশে পাইয়া যথার্থই ধন্য হইয়া গেলাম। তাঁহারা আরও ধন্য যাঁহারা এ মণির সংস্পর্শ করিয়াছে। আমি কায়মনোবাক্যে তাঁহাদিগকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছি।" এই বলিয়াই আমি বিজয়ের হাত ধরিয়া আমার নিজের আসনে আনিয়া বসাইলাম সে যে কি ভাব, যিনি চোখে দেখিয়াছেন তিনিই বুঝিয়াছেন। কিন্তু তখনকার সেই ভাব লিখিয়া বা বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। অসম্ভব, অসম্ভব! যেন সেই পুরাকালের ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ঋষি ধীর-মধুর ভাষায় কত আলাপই না করিলেন। আশ্চর্য্য এই যে, সাধারণ কথায়ও যেন ভক্তির প্রস্রবণ খুলিয়া পড়িতেছে! আজি কালিকার দিনে

তেমন সুমধুর সুললিত, তেমন অমিয়া-পরিপূরিত ভাষা, যে ভাষা শুনিয়া ত্রিতাপে সন্তাপিত ও সংক্ষোভিত চিত্তেও শান্তি ও বিমলানন্দ প্রদান করিতে পারিয়াছে, আরত সেই ভাষা শুনিতে পাওয়া যায় না! যাক্ সে কথা।

"ইহার পরে আমরা পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা করিতে চলিলাম। সঙ্গে সেই ভক্তির ভাণ্ডার বিজয়! মন্থর গতি। কি ধ্যান কি ভাবে বিভোর অথচ চলিতেছে। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই আমরা শুনিতে পাইলাম—এক সুললিত সুমধুর অনির্ব্বচনীয় "হরি সংকীর্ত্তন।" তেমন পীযূষ-পরিপূরিত সুরতান-লয়-সংযুক্ত সুমধুর "হরিনাম" আর কখনও শুনি নাই, জীবনে আর কখনও শুনিব বলিয়া আশাও নাই। বোধ হয়, বিজয়ের সঙ্গে পরিক্রমার্থ বহির্গত হওয়াতে এইরূপ অমৃতময় হরিনাম শ্রবণ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম। এদিকে যেমন হরিনাম সংকীর্ত্তন শ্রবণ, অমনি বিজয় সেই দিকে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিলেন, আমরাও পিছু পিছু ছুটিলাম। কিন্তু বিজয় যেন মদমত্ত করির ন্যায় ছুটিয়া আমাদিগের অপেক্ষা কিছু অগ্রগামী হইয়া পড়িলেন এবং কীর্ত্তনের একটু নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন এক অপূর্ব্ব লোকললাম দিব্যকান্তি মহাপুরুষ, ভাবে বিভোর হইয়া "হরিনাম" কীর্ত্তন করিতেছেন। যেই আমরা সকলে সম্মুখীন হইয়া পড়িলাম অমনি মহাপুরুষটী অন্তর্হিত হইলেন। তখন বিজয় ও আমরা সকলে মহাপুরুষটী যে স্থানে বসিয়া কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তথায় যাইয়া দেখি এক অনতি উচ্চ শুষ্ক বৃক্ষের কাণ্ড।" বিজয় উহা দেখিয়া তাঁহার নিজের হাতের যষ্টির দ্বারা এই বৃক্ষের চারিদিকে মৃত্তিকায় গর্ত্ত করিয়া রাখিলেন। পরদিন বিজয় পুনরায় যাইয়া দেখিলেন, সেই বৃক্ষের চিহ্ন মাত্রও নাই, কিন্তু যষ্টির গর্ত্তগুলি যেমন তেমনই রহিয়াছে। বিজয় কিছুদিন পরে অনেকের অনুরোধে প্রকাশ করেন, যে একটী মহাপুরুষ ৺বৃন্দাবনধামে এই প্রকার

গুপ্তভাবে থাকিয়া সাধন ভজন ও লীলাময়ের লীলা গান করিয়া থাকেন।" *

শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমণের সময় উপস্থিত হইলে, গোস্বামী প্রভু কতিপয় শিষ্যসহ পরিক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন। চৌরাশি ক্রোশব্যাপী ব্রজমণ্ডলস্থিত মধুবন, বেহুলাবন, কাম্যবন প্রভৃতি দ্বাদশটী প্রসিদ্ধ বনের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন অন্যতম। পূর্ব্বে সমস্ত স্থানগুলিই নিবিড় জঙ্গলময় ছিল, কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনের একাংশ এখন সহরে পরিণত হইয়াছে, অপর বন সমূহ প্রায় যেমন তেমনই আছে। ভগবান্ যশোদানন্দন, রাখালগণ সহ গোচারণচ্ছলে, সেই সকল স্বাভাবিক নিভৃত কুঞ্জে গোপিকানিকরে পরিবেষ্টিত হইয়া অপার অপরিসীম লীলারস সম্ভোগ করিতেন। কথিত আছে যে, ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মসময় দেবগণ তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিয়া ব্রজভূমির চৌরাশি ক্রোশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তদবধি প্রতিবৎসর বহুসংখ্যক লোক এইরূপে পরিক্রমণ করিয়া আসিতেছেন। শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পার্ষদ গোস্বামীপাদগণ এই প্রথা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ও বিভাগ করিয়া প্রতিদিনের পরিক্রমণ পথ ও স্থান নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। জন্মাষ্টমীর পরবর্ত্তী দশমী হইতে এই পরিক্রমণ আরম্ভ হয়। গোস্বামী প্রভু, পরমভাগবত গৌর শিরোমণি মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, শ্রীরাধা নাম স্মরণকরতঃ রাধাকুণ্ডবাসী শ্রীমদ্ বেণীমাধব পাণ্ডা ও ৺ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ছোট সতীশ) মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া পরিক্রমায় বহির্গত হইলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে মথুরায় আগমন করিয়া ভূতেশ্বর মহাদেব, জন্মস্থলী, ধ্রুবটীলা, বিশ্রামঘাট প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থান সকল দর্শন করিলেন। পরদিবস তালবন,

* ঢাকা, লোহজঙ্গনিবাসী শ্রীযুক্ত যশোদালাল তালুকদার মহাশয় প্রদত্ত বিবরণ

মধুবন, কুমুদবন প্রভৃতি দর্শন করিয়া শান্তনুকুণ্ডে উপস্থিত হইলেন। শান্তনুরাজার নামানুসারে এই স্থানের নাম শান্তনুকুণ্ড হইয়াছে। এই স্থানে তিনি পুত্রার্থে গঙ্গাদেবীর আরাধনা করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে ভীষ্ম সন্তান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শান্তনুকুণ্ডস্থিত রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ দেখিলে জীবন্ত বলিয়াই ভ্রম জন্মে। স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও অতীব মনোহর। চারিদিকে প্রস্ফুটিত কমল-শোভিত প্রকাণ্ড জলাশয়; মধ্যস্থলে অত্যুচ্চ টীলা, টীলার উপরিভাগে ভগবানের মন্দির বিরাজ করিতেছে। একটী সেতু পার হইয়া মন্দিরে যাইতে হয়। এই স্থলে একটী অপরিচিতা নিষ্ঠাবতী গোপী নিতান্ত পরিচিতের ন্যায় খুব ভক্তির সহিত ভাল ফল ও উৎকৃষ্ট বরফি দিয়া গোস্বামী প্রভুর সেবা করিলেন। কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তে গোস্বামী প্রভু শান্তনুকুণ্ড হইতে বেহুলাবনে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে ৺ রামকৃষ্ণ পরমহংসজীর কৃপাপ্রাপ্ত একটী বৃদ্ধা বিধবা রমণী রুগ্ন অবস্থায়ও পরিক্রমণ করিতে বহির্গত হইয়া গোস্বামী প্রভুর সঙ্গ ধরিলেন। গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে 'মা' বলিয়া মাতার ন্যায় শুশ্রূষা করিতেন। বেহুলাবনে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া, অতি প্রত্যূষে 'জয় রাধে শ্রীরাধে' বলিয়া তাঁহারা রাধাকুণ্ডের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে রাঢ় গ্রাম অতিক্রম করিয়া সূর্য্যকুণ্ডে উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু ভারতবর্ষের চারি ধাম পরিক্রমণকরতঃ শেষে যখন মথুরামণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন এই কুণ্ডে অবগাহন করিয়াছিলেন।

সূর্য্যকুণ্ড হইতে প্রায় দিবা দ্বিপ্রহরের সময় গোস্বামী প্রভু সদলবলে রাধাকুণ্ডে উপস্থিত হইলেন। গোস্বামী প্রভুর সহধর্ম্মিণী শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী শ্রীবৃন্দাবন হইতে গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য নিষ্কিঞ্চন ভক্ত ৺ শ্রীধর ঘোষ মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া এই স্থানে আসিয়া

স্বামীর সহিত মিলিত হইলেন, এবং পরিক্রমণের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই অবস্থান করিয়াছিলেন। গোস্বামী প্রভু রাধাকুণ্ডে ও শ্যামকুণ্ডে স্নান করিয়া কুণ্ডদ্বয় প্রদক্ষিণ করিলেন। এই স্থানে ললিতাদি অষ্ট সখীর পৃথক্ পৃথক্ কুণ্ডও আছে। রাধাকুণ্ডের তীরে বৈরাগী-শিরোমণি রঘুনাথদাস গোস্বামীর ভজনকুটীর ও ভক্তপ্রবর কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যে গৃহে বসিয়া চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এখনও বর্ত্তমান আছে।

রাধাকুণ্ডের অপরাপর দ্রষ্টব্যস্থান সকল দর্শন করিয়া, গোস্বামী প্রভু শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে কুসুমসরোবর হইয়া গিরিগোবর্দ্ধনে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে একটী অতীব আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হয়। যখন সঙ্গের অপরাপর সকলে নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন গোস্বামী প্রভু কুসুমসরোবর হইতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, একাকী গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের শোভা সন্দর্শন করিতেছিলেন, এমন সময় পর্ব্বতের কোন নির্জ্জন স্থানে একটী গোফার সন্নিকটে কতকগুলি কঙ্কাল খট্ খট্ করিয়া নড়িয়া উঠিল। তিনি স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া দেখিলেন যে, একখানি কঙ্কালহস্ত ইসারা করিয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিতেছে। গোস্বামী প্রভু নিকটবর্ত্তী হইলে, অস্থিমাত্রে পরিণত একটী মনুষ্যমূর্ত্তি দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহাকে অভিবাদনকরতঃ উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। এই মহাপুরুষটির কোন অঙ্গেই রক্তমাংসের সংস্রব নাই, কেবল চোকের কোটরে দুইটী উজ্জ্বল চক্ষু ও মুখগহ্বরে জিহ্বাটী মাত্র বর্ত্তমান আছে; এবং হস্ত, পদ, অঙ্গুলি প্রভৃতির কঙ্কালাংশ সন্ধিস্থলগুলিতে যথাযথ সংযুক্তই রহিয়াছে, সুতরাং হাঁটিয়া চলিয়া বেড়াইতে কোন বাধা জন্মে না। এই অদ্ভুত পুরুষ দর্শন করিয়া গোস্বামী প্রভু অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, এবং ভক্তিভরে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে, তিনি তাহাতে বাধা

প্রদানকরতঃ নিজেই গোস্বামী প্রভুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। অতঃপর দুই জনের মধ্যে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। গোস্বামী প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার যে শরীর দেখিতেছি ইহাকেই কি সূক্ষ্মশরীর বলে?" মহাপুরুষ উত্তর করিলেন—"না, ইহাকে সূক্ষ্মশরীর বলে না, তাহা ভিন্ন প্রকার। তবে ভগবান্ এই এক প্রকারে আমাকে রাখিয়াছেন। আমার শরীরের এক এক ইন্দ্রিয়ের বাসনাক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে তত্তৎ অঙ্গ খসিয়া পড়িয়াছে, কেবল চক্ষু ও জিহ্বার বাসনা আছে, তাই সেই দুইটী মাত্র অবশিষ্ট আছে।" গোস্বামী প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার আবার কি বাসনা থাকিতে পারে?" তিনি উত্তর করিলেন যে, "ভগবানের লীলা দর্শন ও হরিনাম করিবার বাসনা এখনও আছে, সেই জন্য চক্ষু ও জিহ্বা রহিয়াছে। ভগবান্ যশোদানন্দনের কৃপায় অদ্য আমার একটী বাসনা পূর্ণ হইল।" এই বলিয়া তিনি গোস্বামী প্রভুকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কত কাল এই ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন?" মহাপুরুষ উত্তর করিলেন যে, তাঁহার বয়ঃক্রম চারিশত বৎসরের অধিক হইয়াছে, তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখিয়াছেন। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু ও হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল—ইত্যাদি।"

কোন একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়াছেন যে, "ভগবানের এক অবতার হইতে আর এক অবতার হওয়া পর্য্যন্ত, পূর্ব্ব-অবতারের একজন করিয়া পার্ষদ সেই দেহেই বর্ত্তমান থাকেন। লীলারাজ্যের ইহা একটী অব্যর্থ নিয়ম। শ্রীকৃষ্ণ অবতারের শ্রীদাম সখা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া ভাণ্ডীরবনে একটী গোফার মধ্যে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। পরে অভিরাম গোস্বামী নাম ধারণ করিয়া নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।" এই কঙ্কালাবশিষ্ট মহাপুরুষ গৌরাঙ্গলীলা দর্শন

করিয়া, ভগবানের অন্য কোন ভাবী অবতারের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তাহা মাদৃশ অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন ব্যক্তির বুদ্ধির অগম্য। সে যাহা হউক, এই মহাত্মার আর একটী অদ্ভুত মহিমার কথা অবগত হইলে বিস্মিত হইতে হয়। বৎসরের মধ্যে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি একবার মাত্র উচ্চৈঃস্বরে 'হরিবোল' এই ধ্বনি করেন। তখন তাঁহার জিহ্বা হইতে এই শব্দ এতদূর উচ্চনাদে নিনাদিত হয় যে, ৭।৮ ক্রোশ দূর হইতে তাহা শ্রবণ করা যায়। গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, তিনি সপ্ত ক্রোশ দূরবর্ত্তী কোন একটী স্থান হইতে তাঁহার 'হরিবোল' ধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিলেন।

অতঃপর গোস্বামী প্রভু কুসুম-সরোবর হইতে যাত্রীদিগের সঙ্গে গোবর্দ্ধন পরিক্রমণে বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে 'দাউজীর' চরণ-চিহ্ন দর্শন করিলেন। বালক বলরামের বৃহৎ পদচিহ্ন দেখিয়া একজনের মনে সন্দেহ হইলে, গোস্বামী প্রভু বলিলেন যে ইহা নবদ্বীপচন্দ্রের পদচিহ্ন। মহাপ্রভুও পাষাণের বুকে পদপ্রদান করিতে ত্রুটি করেন নাই। এবিষয়ের প্রমাণ পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে গেলেই পাওয়া যায়। দাউজীর চরণচিহ্ন দর্শন করিয়া তাঁহারা দানঘাটে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ যে প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়াছিলেন, মহাপ্রভু তাহা ধরিয়া কত রোদন করিয়াছিলেন। অতঃপর গোবর্দ্ধন পরিক্রমণ করিতে করিতে বলদেবকুণ্ড হইয়া গোবিন্দকুণ্ডে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী গোপালদেবের মন্দির স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। নিকটে পুরীস্বামীজীর সমাধি বিদ্যমান। গোবিন্দকুণ্ডের নিকটস্থ একটী মন্দিরে শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দাস নামক একজন বৈষ্ণবমহাজন বাস করিতেন। ইনি গোবর্দ্ধনে একাসনে চল্লিশ বৎসর সাধন করিয়া সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়াছেন। বাবাজী মহাশয়

গোস্বামী প্রভুকে দর্শন করিবামাত্রই হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আমাকে কৃপা করিয়া দর্শন দিয়াছেন, আবার কৃপা করিয়া দর্শন দিবেন।" এইস্থানে গোস্বামী প্রভু পথে চলিতে চলিতে কি যেন দেখিয়া কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া ব্রজে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। পরে লোকসমাগম অবলোকন করিয়া ভাব সম্বরণকরতঃ পুনরায় চলিতে লাগিলেন।

গোবর্দ্ধন পরিক্রমণ শেষ হইলে গোস্বামী প্রভু মানসীগঙ্গা, যশোদাকুণ্ড হরদেবজী, গুলালকুণ্ড, সাক্ষীগোপাল, রূপসরোবর প্রভৃতি দর্শন করিয়া অলকাগঙ্গায় উপনীত হইলেন। এই স্থানে শ্রীমতী যোগমায়া দেবী বনযাত্রীদিগের সঙ্গে একটী বৃহৎকায় মহাবীরকে (হনুমান) পরিক্রমণ করিতে দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং গোস্বামী প্রভুর নিকটে এই কথার উল্লেখ করিলে তিনি বলিলেন যে, "বনযাত্রীদিগের রক্ষকস্বরূপ হইয়া স্বয়ং মহাবীরই অলক্ষিতভাবে তাহাদের সহিত পরিক্রমণ করিয়া থাকেন যাহাদের অন্তশ্চক্ষু খুলিয়া যায়, তাহারা তাঁহার দর্শন পাইবেন, আশ্চর্য্যের বিষয় কি ?" অলকাগঙ্গা হইতে, আদিবদ্রি হইয়া তাঁহারা কাম্যবনে উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে হঠাৎ বনরাজীর মধ্য হইতে সুমধুর চিত্তাকর্ষক সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ করিয়া, গোস্বামী প্রভু গায়ককে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথায়ও তাঁহার দর্শন না পাইয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, "কে অলক্ষিতভাবে থাকিয়া সুমধুরস্বরে গান করিতেছেন, দয়া করিয়া আমাকে দর্শন দিন।" এইরূপ প্রার্থনা করিবামাত্র সেই স্থানের একটী বৃক্ষ জটাজূটধারী একটী মহাপুরুষের আকার ধারণ করিয়া তৎসমীপে উপনীত হইলেন। গোস্বামী প্রভু সসম্ভ্রমে তাঁহাকে প্রণিপাত করিলে তিনি বলিলেন—"এইস্থানে যতগুলি বৃক্ষ দেখিতেছ, সকলেই একএকটী মহাপুরুষ। শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রাকৃত

নিত্যলীলা দর্শন করিবার জন্য আমরা এইভাবে অবস্থান করিতেছি।” এই কথা শ্রবণ করিয়া গোস্বামী প্রভু সেই স্থানের বৃক্ষরাজাকে উদ্দেশ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। উঠিয়া দেখিলেন বৃক্ষরূপী মহাপুরুষ অন্তর্ধান করিয়াছেন।

কাম্যবন হইতে গোস্বামী প্রভু বিমলাকুণ্ড হইয়া লুকলুকিকুণ্ডে উপনীত হইলেন। এই স্থানে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বয়স্যবর্গের সহিত চোক-বান্ধাবান্ধি খেলা করিতেন। অতঃপর লঙ্কাকুণ্ড দর্শন করিয়া চরণপাহাড়ী আগমন করিলেন।

চরণপাহাড়ী, কদমখণ্ডী, কালিয়াদহ প্রভৃতি ব্রজমণ্ডলের বহুস্থানে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেই জগমনোমোহন লীলাসমূহের অনেক চিহ্ন অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। চরণপাহাড়ীতে পাষাণের গাত্রে অসংখ্য পদচিহ্ন বিদ্যমান থাকিয়া আধুনিক বিজ্ঞানাভিমানী সুধীবৃন্দের দর্প চূর্ণ ও ভক্তবৃন্দকে মহা প্রেমসাগরে নিমগ্ন করিতেছে। গোষ্ঠবিহারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ত্রিজগন্মানসাকর্ষী সুমধুর মুরলীধ্বনি শ্রবণবশতঃ প্রগাঢ় প্রেমভরে পাষাণ পর্যন্ত দ্রবীভূত হইয়া মোমের সমধর্মিতা প্রাপ্ত হইত। এতদবস্থায় পাহাড়ে মনুষ্য, পশুপক্ষী প্রভৃতি যে সকল জীবজন্তু বিচরণ করিত, তাহাদের পদচিহ্ন পড়িয়া যাইত। পরে মোহন বংশীধ্বনি অপসৃত হইলে পাষাণরাশি পুনর্বার ধীরে ধীরে স্বীয় স্বাভাবিক কাঠিন্য প্রাপ্ত হইলেও পদচিহ্নগুলি বিলুপ্ত হয় নাই, তাহা যেমন তেমনই রহিয়া গিয়াছে। এই পাহাড়ের গাত্রে বৃন্দাবনচন্দ্র, রাখালগণ ও গো-বৎসাদির অনেক পদচিহ্ন বিদ্যমান আছে। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশের চিহ্ন দেখিয়া রাখালগণের পদচিহ্ন হইতে ভগবানের পদচিহ্ন পৃথক্ করিয়া লওয়া যায়। গোস্বামী প্রভু থাকিয়া থাকিয়া সেই স্থানে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

তৎপরে গোস্বামী প্রভু যাত্রীদল সহিত কদমখণ্ডীতে উপনীত হইলেন। এইস্থানে একপ্রকার দোনার (ঠোঙ্গার) গাছ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৃন্দাবনবিহারী বয়স্যগণসহ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া দুগ্ধপান করিবার জন্য বৃক্ষের নিকটে পানপাত্র যাচ্ঞা করিলে, ব্রজভূমির কল্পবৃক্ষ আপন আপন পত্র দ্বারা দোনা প্রস্তুত করিয়া দিতেন। রাখালগণ বৃক্ষ হইতে সেই সকল দোনা সংগ্রহকরতঃ কামধেনু হইতে দুগ্ধ দোহন করিয়া মনের আনন্দে পান করিতেন। অদ্যাবধি দিবা দুই প্রহরের কিছু পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য, সেই সকল বৃক্ষের বহুসংখ্যক পত্র আপনা আপনি সঙ্কুচিত হইয়া দোনার আকার ধারণ করে, এবং কিয়ৎকাল এই অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় স্বীয় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই স্থানে গোস্বামী প্রভু ও তাঁহার সহচরগণ এই ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন।

কদমখণ্ডী হইতে একটী ময়ূর, গোস্বামী প্রভুর সঙ্গ ধরিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল। যে যে স্থানে তিনি সশিষ্য উপবেশন করিতেন, সেই সকল স্থানে ময়ূরটী কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া তাঁহাদিগকে অদ্ভুত নৃত্য দেখাইত। আবার তাঁহারা চলিতে আরম্ভ করিলে, ময়ূরও সঙ্গে সঙ্গে চলিত। এই প্রকারে প্রায় ১৪।১৫ ক্রোশ পথ অতিক্রান্ত হইলে, ময়ূরটী হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল কেহ লক্ষ্য করিতে পারিল না।

অতঃপর তাঁহারা মানগড়ে উপনীত হইলেন। এইস্থলে অনেক নূপুরের বৃক্ষ আছে। যশোদাদুলাল ব্রজবালকবৃন্দসহ বৃন্দাবনের বনে বনে নৃত্য করিবার জন্য কল্পবৃক্ষের নিকট নূপুর চাহিলে, তাহারা প্রচুর পরিমাণে তাহা প্রদান করিত। তদবধি এই সকল বৃক্ষে নূপুর জন্মিয়া থাকে। প্রথমতঃ বকফুলের ছড়ার ন্যায় একটী বৃন্তে দুইটী করিয়া ছড়া বাহির হয়। পরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তাহাদের অগ্রভাগ পুনরায় মিলিত

হয় ও নূপুরের আকার ধারণ করে। ছড়াগুলি পরিপক্ক হইলে ভিতরের শস্যগুলি পৃথক্ হইয়া পড়ে। তখন তাহা নাড়িলে নূপুরের ধ্বনির ন্যায় ঝুমুর ঝুমুর শব্দ বাহির হয়। বৃন্দাবনের স্বভাব-শিশুদিগের ইহাই নূপুর। ভগবান্ যশোদানন্দন, রাখালবালকসমভিব্যাহারে এই সকল নূপুর পরিধানপূর্ব্বক মধুর মুরলীধ্বনি করিতে করিতে সময় সময় অপূর্ব্ব নৃত্য-লীলার অনুষ্ঠান করিতেন। তাহা দর্শন করিয়া বৃন্দাবনের পশু পক্ষী পর্য্যন্ত বিমুগ্ধ হইয়া যাইত, ময়ূর ময়ূরী পেখম ধরিয়া তালে তালে নৃত্য করিত, ধেনু-বৎসগণ না জানি কি ভাবে বিভোর হইয়া 'হাম্বা' 'হাম্বা' রবে বনভূমি মাতাইয়া তুলিত, শুকশারী প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ প্রেমে বিগলিত হইয়া, যশোদাদুলালের সেই মুরলীর মোহনধ্বনিসহ সুমধুর কূজনে সমগ্র ব্রজভূমি মুখরিত করিয়া তুলিত। শুকপিকের কাকলি-মিশ্রিত সেই মুরলীনিস্বনে না জানি কত মুনিঋষিগণের ধ্যান ভঙ্গ হইয়াছে, কত ব্রজমাতার স্তনযুগল হইতে স্নেহভরে দুগ্ধ ক্ষরণ হইয়াছে! অহো! অদ্যাপি সেই লীলামাধুরী স্মরণ মনন করতঃ কত শত ভক্তবৃন্দ যে প্রেমরসে বিবশ হইয়া দরবিগলিত আনন্দাশ্রু-ধারায় ধরিত্রীদেবীকে অভিষিক্ত করিয়া থাকেন, মাদৃশ ক্ষুদ্রব্যক্তি কিপ্রকারে তাহার বর্ণনা করিতে সমর্থ হইবে?

অতঃপর গোস্বামী প্রভু শিষ্যগণসহ নন্দঘাট, রামঘাট, বলরামকুণ্ড, পাণিগ্রাম প্রভৃতি লীলাস্থল দর্শন করিয়া, ভাণ্ডীর বনে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি কি জানি কি ভাবে আত্মহারা হইয়া 'শ্রীদাম! শ্রীদাম!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে নিবিড় বনভূমি হইতে একটী অপূর্ব্ব ধ্বনিতে উত্তর হইল 'আমি আছি'। ভাণ্ডীরবন হইতে তাঁহারা বেলবনে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানেও কয়েকটী বৃক্ষে 'হরেকৃষ্ণ,' 'রামকৃষ্ণ' 'রাধাকৃষ্ণ' প্রভৃতি নাম

স্বাভাবিক ভাবে অঙ্কিত আছে। তাহা দেখিলে বোধ হয়, যেন কোন মহাত্মা বৃন্দাবনের রজঃ প্রভাবে অচল বৃক্ষাকার ধারণ করিয়াছেন, আর নামগুলি তাঁহারই গাত্রের ছাপ মাত্র। গোস্বামী প্রভু এই স্থান হইতে লৌহবন হইয়া মহাবনে উপনীত হইলেন। মহাবনে নন্দের বাড়ী। এই স্থানে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে তিনি শিষ্যগণের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ড-ঘাটে উপস্থিত হইয়া তথায় স্নান করিলেন। এই ব্রহ্মাণ্ডঘাটেই কৃষ্ণ মা যশোদাকে ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়াছিলেন। পরে দধিমন্থন স্থান ও যমলার্জ্জুন হইয়া নূতন গোকুলে উপনীত হইলেন। এই স্থানে গোকুলের গোস্বামিগণ বাস করিয়া থাকেন। সম্মুখেই যমুনা। গোস্বামী প্রভু যমুনা পার হইয়া মথুরায় উপনীত হইলেন, এবং তথা হইতে শুভ একাদশী তিথিতে শ্রীশ্রীরাধারাণীর আশীর্ব্বাদে নির্ব্বিঘ্নে শ্রীবৃন্দাবনধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

দ্বাদশী তিথিতে তিনি পুনরায় নিজ বৃন্দাবন পরিক্রমণে বহির্গত হইলেন ও প্রথমে কেশীঘাট, পরে জ্ঞানগোধুরী ও রাধাবাগ হইয়া বদ্রিনাথ দর্শনকরতঃ রাজঘাটে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থবৃক্ষ আছে। মহাপ্রভু এখানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। নিকটে কোনও একটী প্রাচীন বৃক্ষমূলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের বিগ্রহ প্রকাশ হইয়াছে দেখিয়া যাত্রিগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। পরে উত্তরাভিমুখে দাবানলকুণ্ড, কালিয় হ্রদ, কিশোরঘাট হইয়া শৃঙ্গারঘাট উপস্থিত হইলেন। শৃঙ্গারঘাটে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহ দর্শন করিয়া বস্ত্রহরণঘাট, গোবিন্দঘাট ও ভ্রমরঘাট হইয়া পুনরায় কেশীঘাটে আগমন করিলেন। এতদিন শ্রীবৃন্দাবন লোকাভাবে কি এক গভীর দুঃখসংক্লিষ্ট নিস্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছিল, আবার লোকসমাগমে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বৃন্দাবন-বিহারীর জয়ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইল।

এদিকে বৃদ্ধ গৌরশিরোমণি মহাশয়, গোস্বামী প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিয়া অতিকষ্টে দিনযাপন করিতেছিলেন। এখন তাঁহার প্রাণের প্রিয়তম বস্তুকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া তৎসহবাসে অতীব আনন্দের সহিত দিনযাপন করিতে লাগিলেন। এই সময় একদিন শিরোমণি মহাশয়, গোস্বামী প্রভুকে বলিলেন—"দেখ, প্রভু! আমি রাধারাণীর কৃপায় অপ্রাকৃত বৃন্দাবনলীলা দর্শনের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি। সময় সময় লীলারস সম্ভোগও করিয়া থাকি; কিন্তু জানি না কেন তাহা স্থায়ী হয় না। এই দুঃখে দিবানিশি আমার প্রাণ হু হু করিয়া জ্বলিতে থাকে। শাস্ত্রে আছে সদ্‌গুরুর শক্তি ভিন্ন শ্রীবৃন্দাবনের মধুর লীলায় প্রবেশাধিকার জন্মে না। তুমিই সেই সদ্‌গুরুরূপে ভাগ্যবান্ জীবকে কৃপা করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ, এ বিষয়ে আমি নিঃসংশয় হইয়াছি। অতএব, প্রভু আমাকে আর পরীক্ষা করিও না। আমাকে সেই বস্তু প্রদান করিয়া কৃতার্থ কর।" এই কথা শুনিয়া গোস্বামী প্রভু মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। ইহার কিছুদিন পরে শিরোমণি মহাশয় কলেবর পরিত্যাগ করেন। এতদুপলক্ষে শ্রীবৃন্দাবনে অতিশয় সমারোহের সহিত মহোৎসব ও সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। গোস্বামী প্রভু সশিষ্য তাহাতে যোগদান করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ইহার কয়েক দিন পরে শিরোমণি মহাশয় দিব্যদেহে গোস্বামী প্রভুর নিকটে প্রকাশিত হইয়া বলিয়াছিলেন—"প্রভো, আমার বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। আপনার কৃপায় আমি অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধাম লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি।"

ইহারপর মাঘ মাসে শ্রীবৃন্দাবনে কুম্ভমেলার অধিবেশন হয়। কুম্ভমেলা ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত সাধু মহাপুরুষদিগের সম্মিলনক্ষেত্র। কুম্ভরাশিতে হয় বলিয়া ইহাকে কুম্ভমেলা বলে। প্রতি তিনবৎসর অন্তর হরিদ্বার, প্রয়াগ, পঞ্চবটী ও উজ্জয়িনী এই চারি স্থানে কুম্ভমেলার

অধিবেশন হইয়া থাকে। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। ইহার কোন উদ্যোগকর্ত্তা নাই, আবাহনকর্ত্তা নাই, সংবাদদাতা নাই। কুম্ভমেলা সকলেরই মেলা, সকলেই স্বয়ং আহূত। এই সকল সম্মিলনক্ষেত্রে সাধু-সজ্জনগণ একত্রিত হইয়া প্রশান্তভাবে নির্ব্বিবাদে পরস্পর ধর্ম্মতত্ত্বসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকেন, এবং এই সুযোগে সহস্র সহস্র ধর্ম্মপিপাসু গৃহস্থ নরনারী মেলাস্থলে উপস্থিত হইয়া, সাধু-সন্দর্শন ও তাঁহাদের শ্রীমুখ হইতে ভবব্যাধিবিনাশক, ত্রিতাপজ্বালা-নিবারক উপদেশামৃত পান করিয়া কৃতার্থ হন।

পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনে কুম্ভমেলার অধিবেশন হইত না। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীমৎরূপসনাতন-প্রমুখ বৈষ্ণবদিগের প্রযত্নে শ্রীবৃন্দাবনে এই সাধুসমাগমের ব্যবস্থা হয়। তদবধি যে বৎসর হরিদ্বারে কুম্ভমেলা হয়, তাহারই কিছু পূর্ব্বে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুগণ শ্রীবৃন্দাবনে সমবেত হইয়া একমাসকাল তথায় অবস্থান করতঃ হরিদ্বারে গমন করেন।

গোস্বামী প্রভু প্রতিদিন মেলাস্থলে উপস্থিত হইয়া সাধুসন্দর্শন ও তাঁহাদের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতেন। যতদিন মেলা ছিল, ততদিন এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। মেলা অন্তে সাধুগণ হরিদ্বার গমন করিলেন। গোস্বামী প্রভুও হরিদ্বার যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবীকে, শ্রীবৃন্দাবনধাম পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক দেখিয়া, সকলেই কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। যিনি জীবনে কখনও স্ব-ইচ্ছায় স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার কল্পনাও করিতে পারেন নাই, বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে স্বামী হইতে দূরে অবস্থান করিতে হইলে যিনি সর্ব্বদা ম্রিয়মান্ থাকিতেন, কিছুদিন পূর্ব্বে যিনি পতিবিরহে ব্যাকুল হইয়া পাগলিনীপ্রায়, ঢাকা হইতে বৃন্দাবনে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন, সেই পতিপ্রাণা সতী আজ স্ব-ইচ্ছায় পতিকে ছাড়িয়া

থাকিতে কৃতসঙ্কল্প, ইহার কারণ কি? মহাজন গাইয়াছেন—"সেই পীতবাস যাঁর হৃদয়বাসে, সে কি বাসে বাস করে?" কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই জননী যোগমায়া, গুরুকৃপায় নিত্যবৃন্দাবন বাসের অধিকারিণী হইয়াছেন। তিনি তাঁহার গুরুদেব স্বামীকে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সহিত অভিন্নরূপে অন্তরে বাহিরে সন্দর্শন করিয়া, দিবানিশি সেই ভাবেই বিভোর থাকিতেন। এই সময় যোগমায়া দেবী দেহে থাকা সত্ত্বেও যে রাজ্যে বাস করিতেছিলেন তথায় সময় এবং স্থানের ব্যবধান নাই, মায়ার আবরণ নাই। সেখানে যাহা কিছু আস্বাদনীয় ও দর্শনীয় আছে, তৎসমস্তই এখন জননী যোগমায়া দেবী তাঁহার নিকটে, অতি নিকটে, প্রাণের মধ্যে অনুভব করিতেছেন। সুতরাং সতীর আর পতিবিরহের আশঙ্কা কোথায়?

অতঃপর যোগমায়া দেবী, স্বামীর অনুমতি গ্রহণকরতঃ দেহত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলেন এবং পঞ্জিকা দেখিয়া শুভদিন নির্ণয়পূর্ব্বক শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবের দিন ফাল্গুনী ত্রয়োদশী তিথিতে বিসূচিকা রোগ উপলক্ষ করিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন। বঙ্গ-আকাশের সুবিমলচন্দ্রিমা চিরদিনের তরে শ্রীবৃন্দাবনশৈলে অস্তমিত হইলেন। কতশত নর-নারী আজ তাঁহাকে হারাইয়া হাহাকার করিতেছেন কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? জননী যোগমায়ার পঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার অমর আত্মা ষড়ৈশ্বর্য্য-সমন্বিত যোগিবা জননীর আসনে সমাসীন হইয়া জনগণের কল্যাণ-কামনায় সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছেন। যাহাদের অন্তশ্চক্ষু খুলিয়া গিয়াছে, তাঁহারা এখনও তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন এবং তাঁহার স্নেহবিগলিত স্তন্যপান করিয়া ভবক্ষুধা মিটাইতে সক্ষম হইতেছেন। আর যাহারা আন্তরিক ব্যাকুলতার সহিত তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইবেন,

তাঁহারাও তাঁহার করুণা উপলব্ধি করিবেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

এইস্থানে শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবীর ধর্ম্মজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা নিতান্ত আবশ্যক বোধ হইতেছে। এই পতিপ্রাণা সতী আজীবন কিপ্রকারে স্বীয় সুখ, স্বচ্ছন্দতা, বিলাসিতার উপকরণাদি নারী কুলের যাবতীয় উপভোগ্যবিষয় অগ্রাহ্যকরতঃ সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে স্বীয় পতির ধর্ম্মজীবন অনুসরণপূর্ব্বক তাঁহার ধর্ম্মকার্য্যের সাহায্য করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কিছু উল্লেখ না করিলে গোস্বামী প্রভুর ধর্ম্মজীবন-কাহিনী অঙ্গহীন হইয়া পড়ে।

১২৫৯ সনের ভাদ্রমাসে বুধবার, কৃষ্ণাদ্বাদশী তিথিতে, নদীয়া জেলার অন্তর্গত শিকারপুর গ্রামবাসী ৺রামচন্দ্র ভাতড়ী মহাশয়ের গৃহে শ্রীযুক্তা মুক্তকেশী দেবীর গর্ভে শ্রীমতী যোগমায়া জন্মগ্রহণ করেন, এবং ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে মাতাপিতাকর্ত্তৃক গোস্বামী প্রভুর হস্তে অর্পিতা হন। জননী যোগমায়া বাল্যকাল হইতেই অতীব শান্তশিষ্ট ও নিতান্ত সরল-প্রকৃতির মেয়ে ছিলেন। ইনি জীবনে কখনও কাহার সহিত কলহ করেন নাই। হিংসা বিদ্বেষ কাহাকে বলে তাহা তিনি একেবারেই জানিতেন না। শান্তিপুরের সমাজকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, গোস্বামী প্রভু যখন সপরিবারে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে কলিকাতায় বাস করিতে-ছিলেন, তখন শ্রীমতী যোগমায়ার বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের স্ত্রীশিক্ষা বিভাগে ভর্ত্তি করিয়া দেন। এই সময় গোস্বামী প্রভু নিজে এবং কোন কোন সময় শ্রদ্ধেয় কেশব বাবু, সাধু অঘোরনাথ প্রভৃতি ছাত্রীদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতেন। একদিন কেশববাবু, অঘোরবাবু প্রভৃতি কয়েকটী বিশিষ্ট ব্যক্তি বিদ্যালয়ের বালিকাদিগকে পরীক্ষা করিতে গিয়া, শ্রীমতী যোগমায়াকে ‘হিংসা’ শব্দের

শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী।

অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর করিলেন—"হিংসার বাড়ী কোথায়, সে কোথায় থাকে ?" হিংসাশূন্য বালিকার মুখে এই উত্তর শুনিয়া কেহ হাস্যসম্বরণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে কেশববাবু তাঁহাকে হিংসা শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝাইতে চেষ্টা করিলে, সাধু অঘোরনাথ তাহাতে বাধা প্রদান করিয়া বলিলেন—"ইঁহাকে হিংসার কোনরূপ ব্যাখ্যা শুনাইও না, হিংসার সংস্কার ইঁহার আদৌ নাই।" গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত সদরদী নিবাসী ৺ শ্রীধর ঘোষ মহাশয় গুরু-সেবার মানসে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া জীবনের শেষ পর্য্যন্ত গোস্বামী প্রভুর সহিত বাস করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি জীবনে কখনও শ্রীশ্রীমতী যোগমায়ার মুখে পরনিন্দা শ্রবণ করেন নাই অথবা কাহারও অনিষ্ট-চিন্তা কিংবা হিংসার ভাবও তাঁহার কার্য্যকলাপে লক্ষ্য করেন নাই।

শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী রূপে গুণে শীলে অতুলনীয়া এবং অতিশয় সংযতবাক্ ও মিষ্টভাষিণী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় পতিপ্রাণা নারী জগতে দুর্লভ। শান্তিপুর সমাজকর্তৃক পরিবর্জ্জিত হইবার পর, অশেষ ক্লেশে নিপীড়িত হইয়াও, তিনি জনকনন্দিনী সীতার মত অম্লানবদনে সর্ব্বপ্রকার বিপদ আপদের মধ্য দিয়া ছায়ার ন্যায় পতির অনুগমন করিতেন, এবং জীবনে কখনও স্বামীর নিকটে কোন প্রকার স্বীয় ভোগ্য বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করেন নাই। এ সম্বন্ধে তিনি এক দিবস গোস্বামী প্রভুর অনেক সদ্বংশজাতা শিষ্যাকে বলিয়াছিলেন—"দেখ, আমি কখনও স্বামীর নিকটে আত্মসুখের জন্য কোন বস্তু কামনা করি নাই। তোমরা যদি যথার্থরূপে স্বামীর ভালবাসা পাইতে চাও, তবে তোমাদের স্বামীর নিকটে কিছুই কামনা করিও না।"

আমাদের শাস্ত্রমতে সীমন্তিনীগণের প্রধান কর্ত্তব্য প্রাণপণে স্বামীর

ধর্ম্মকার্য্যের সাহায্য করা। এইজন্য বিবাহিতা স্ত্রীলোকদিগকে স্বামীর সহধর্ম্মিণী বলা হইয়াছে। এই 'সহধর্ম্মিণী' বাক্যটীর সার্থকত্ব শ্রীমতী যোগমায়া দেবীর জীবনে যেরূপ পরিস্ফুট হইয়াছিল, এমন সচরাচর দেখা যায় না। গোস্বামী প্রভুর শেষজীবনের ২০।২২ বৎসর শয়ন করিতেন না, সমস্ত রাত্রি বসিয়া সাধন করিতেন। শ্রীমতী যোগমায়া দেবীও প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। এতৎসম্বন্ধে গোস্বামী প্রভু একদিন বলিয়াছিলেন—"যোগমায়া একমাত্র আমার সেবা করিয়াই ধর্ম্মলাভ করিয়াছেন। আমি ১২ বার বৎসর নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সাধন করিয়াছি, আর যোগমায়াও ১২ বৎসর নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আমার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছেন।" অপর একসময় বলিয়াছিলেন—"যিনি ইঁহাকে (যোগমায়া দেবীকে) আমা হইতে পৃথক জ্ঞান করিবেন তিনি কদাচ আমাকে বুঝিতে পারিবেন না। ভগবানও আরাধনাদ্বারা দৃশ্য হন, কিন্তু ইঁহাদের দর্শন অত্যন্ত দুর্ল্লভ। ইঁনি কৃপা না করিলে কেহই ইঁহাদের দর্শন পান না।" * গোস্বামী প্রভু সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিবার পর, শ্রীমতী যোগমায়া দেবীও গৈরিক বসন পরিধানপূর্ব্বক যোগিনীর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন।

জননী যোগমায়া দেবী পুত্রবাৎসল্যে শিষ্যদিগকে স্নেহ করিতেন। তিনি নিজহস্তে রন্ধন করিয়া তাঁহাদিগকে আহার করাইতেন এবং তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতেও কুণ্ঠিতা হইতেন না।

একবার শান্তিপুরে কয়েকটী শিষ্য অপরাহ্নে শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপাট দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। এদিকে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তখনও শিষ্যগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না দেখিয়া, যোগমায়া দেবী

* শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র বসু বি, এল, মহাশয় সংগৃহীত গোস্বামী প্রভুর উপদেশাবলী হইতে উদ্ধৃত।

এতদূর চিন্তিতা হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের অন্বেষণার্থ গোস্বামী প্রভুকে একটী লণ্ঠন দিয়া প্রেরণ করিলেন। পথিমধ্যে শিষ্যদিগের সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে লণ্ঠন ধরিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া আসিলেন। বাটী আসিয়া দেখেন, যোগমায়া দেবী তাঁহাদের প্রতীক্ষায় ঘর বাহির করিতেছেন।

শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবীর জীবন-কাহিনী অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। তাঁহার জীবনের কার্য্যকলাপ আলোচনা করিলে অনুমিত হয় যে, তিনি এক অসাধারণ শক্তি লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাল্য-কালে শান্তিপুরে অবস্থানকালে শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রকাশ দেখিয়া তিনি মূর্চ্ছিতা হন, এবং পরবর্ত্তীকালে গোস্বামী প্রভুর নিকটে যোগসাধন গ্রহণ করিবার সময় পুনরায় তাঁহার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। গোস্বামী প্রভু এই কথা অবগত হইয়া শ্রীমতী যোগমায়াকে বলিয়াছিলেন—"তুমি বড় ভাগ্যবতী, তাই দীক্ষাকালে অদ্বৈতপ্রভু তোমাকে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন, এবং বাল্যকালে তিনিই কৃপা করিয়া তোমাকে দর্শন দিয়াছিলেন, আমি তখন তাঁহার সম্যক্ মর্য্যাদা করিতে পারি নাই।" দীক্ষাপ্রাপ্তির পর হইতে শ্রীমতী যোগমায়া দেবীর জীবনে অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে লাগিল। আবর্জ্জনাহীন উর্ব্বর-ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেমন অল্পকাল মধ্যেই তাহাতে অঙ্কুর দেখা দেয়, সেইরূপ যোগমায়া দেবীর সর্ব্ব-সংস্কার-বর্জ্জিত সুবিমল পবিত্র হৃদয়ক্ষেত্রে দীক্ষাবীজ বপন করিবার পর হইতেই তাঁহার অন্তরে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতে লাগিল। আশ্রমের নানাবিধ কার্য্যে তাঁহাকে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতে হইত, সুতরাং সাধনভজন করিবার জন্য তিনি অতি অল্প সময়ই প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু ঐ সকল কার্য্যকলাপের মধ্যে যখনই সুযোগ উপস্থিত হইত, তখনই তিনি সমস্ত প্রাণমন ঢালিয়া দিয়া সাধন

করিতেন। একসময় গোস্বামী প্রভু বিশেষ কোন ব্রত উদ্‌যাপন করিবার নিমিত্ত এক বৎসর কাল শ্রীবৃন্দাবনে একাকী বাস করাতে, শ্রীমতী যোগমায়া দেবীর সাধনভজন করিবার একটী সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময় তিনি দিবারাত্রের অধিকাংশ সময় গেণ্ডারিয়া আশ্রমস্থ গোস্বামী প্রভুর সাধনকুটীরে থাকিয়া সাধন করিতেন। গেণ্ডারিয়াবাসী শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন বসু মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী শরৎকামিনী বসু, যোগমায়া দেবীর নর্ম্ম সখীস্বরূপা ছিলেন। ইঁহার নিকটে যোগমায়া দেবী তাঁহার প্রাণের অনেক মর্ম্মগাথা ব্যক্ত করিয়া শান্তি অনুভব করিতেন। শ্রীমতী যোগমায়া দেবীর কুটীরে নির্জ্জন সাধনের সময় এক মাত্র তিনিই তাঁহার সহিত অবস্থান করিতে পারিতেন। যোগমায়া দেবীর এই সময়ের সাধনের অবস্থার কথাপ্রসঙ্গে একদিন শ্রীমতী শরৎকামিনী বলিয়াছিলেন—"মা ঠাকুরাণীর সঙ্গে যখন কুটীরে সাধন করিতে বসিতাম, তখন তাঁহার ভিতরে যে সকল আশ্চর্য্যভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা জীবনে কখনও দেখি নাই, আর দেখিব কি না জানি না। নাম করিতে করিতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অশ্রু কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব সকল বিকশিত হইয়া উঠিত। ভাবাবেশে তিনি কখনও ক্রন্দন এবং কখনও এমন অট্ট অট্ট হাস্য করিতেন যে, সমস্ত আশ্রমটী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত। আমি ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইতাম। ভাব অপসারিত হইলে তিনি মধ্যে মধ্যে একতারা সংযোগে নিম্নলিখিত গান করিতেন—

সুরট মল্লার—একতালা।

মোহ আবরণ কর উন্মোচন,
প্রাণ ভরে একবার দেখিতে তোমায়।
দেখিবার তরে, প্রভু হে তোমায়
তৃষিত নয়ন ব্যাকুল হৃদয়।

লুকাইয়ে ভালবাস নিরন্তর,
ওহে দয়াময় গুণের সাগর।
তব প্রেমরাতি, সুকোমল অতি
নাহি দেখি আর এমন কোথায়।
(তুমি) গোপনে গোপনে লও সমাচার,
কতই ভাবনা ভাবহে আমার,
এ প্রেমরহস্য বুঝে সাধ্য কার,
বুদ্ধির অগম্য এই সমুদয়।
এ হেন সুহৃদ উপকারী জনে,
না দেখিহে বল থাকিব কেমনে,
গুণে বশীভূত হ'য়ে বিমোহিত,
সহজেই চিত তোমা পানে ধায়॥ ইত্যাদি ;

"তাঁহার সুমধুর গান শুনিয়া আমার প্রাণে অপূর্ব্বভাব খেলিত। ক্রমে আমিও গানে যোগদান করিতাম। গান গাইতে গাইতে মা-ঠাকুরাণীর দুই চক্ষু দিয়া দরদর ধারে জল পড়িত, স্বর গদগদ হইয়া যাইত, তাঁহার বদনমণ্ডল এক প্রকার অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ রক্তিমাভা ধারণ করিত। আমি মহানন্দে নিমগ্ন হইয়া এই সকল দর্শন করিতাম।"

শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবীর অনেক অসাধারণ ক্ষমতার কথা গোস্বামী প্রভুর শিষ্যমণ্ডলী অবগত আছেন। সহৃদয় পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে দুই একটা ঘটনা উল্লেখ করা যাইতেছে, যথা :—ঢাকা গেণ্ডারিয়া আশ্রমে অবস্থানকালে একদিবস রাত্রি ১২টায় ৮।৯ জন অতিথি উপস্থিত হন। আশ্রমবাসিগণের তখন আহারাদি কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। যোগমায়া দেবী পুনরায় রন্ধন করিয়া অতিথিদিগকে ভোজন করাইলে, তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন যোগমায়া দেবীর জননী

মুক্তকেশী দেবীর মনে হইল যে, অন্ত রাত্রিতে রান্না হইবার পর ভাণ্ডারে চাউল, ডাইল ইত্যাদি কিছুই ছিল না, অথচ যোগমায়া কোথা হইতে এত রাত্রিতে আহার্য্য বস্তু সংগ্রহ করিল ? তিনি ইহা ভাবিতে ভাবিতে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গোস্বামী প্রভুকে এই কথা জ্ঞাপন করিলে, তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"উহার ঐরূপ অনেক অসাধারণ ক্ষমতা আছে।" শ্রীমতী যোগমায়া এই কথা শুনিয়া সক্রোধে উত্তর করিলেন—"তুমি যদি এইরূপভাবে হাটের মাঝে হাড়ি ভাঙ্গ, তবে আমি আর রান্না করিতে পারিব না, তোমরা ব্রাহ্মণ দ্বারা রসুই করাইও।"

শ্রীমতী যোগমায়া দেবীর শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানকালেও এইরূপ আর একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল। গোস্বামী প্রভুর আশ্রমে তখন ৫।৭ জন শিষ্য স্থায়ীভাবে বাস করিতেন। যোগমায়া দেবী তাঁহাদিগের জন্য স্বহস্তে একটী পিত্তলের হাঁড়িতে রন্ধন করিতেন। উক্ত পাকপাত্রে ৭।৮ জনের অতিরিক্ত লোকের অন্ন রান্না করা চলিত না। কিন্তু আশ্রমে সময় সময় অনেক অতিথি অভ্যাগত উপস্থিত হইতেন, এবং যোগমায়া দেবী এক হাড়ি অন্ন দ্বারাই সকলকে পরিপূর্ণরূপে ভোজন করাইতেন। প্রায় মাসাবধি এই ভাবে অতিবাহিত হইবার পর, এই অলৌকিক ঘটনার প্রতি কাহারও কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে, যোগমায়া তাঁহার শক্তি আবরণ করিয়া রাখিলেন। বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয় এই অলোকসামান্যা রমণীর প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধিকরতঃ 'বলিয়াছিলেন যে, "ইঁহার নামও যোগমায়া, ইঁনি কার্য্যেও যোগমায়া," এবং একদিন কৌশলক্রমে ইঁহার প্রসাদ ভোজন করিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন।

একসময় শ্রীমতী যোগমায়া দেবী প্রভুপাদ যোগজীবন গোস্বামীর সহিত কলিকাতা হইয়া শ্রীবৃন্দাবন গমন করিবার কালে কলিকাতায়, পরম শ্রদ্ধাভাজন ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের বাসায় কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রবাবুর সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া মাতঙ্গিনী দেবী বলিয়াছেন যে, যখন যোগমায়া দেবী সন্তানসন্ততিসহ শকটারোহণে তাঁহাদের বাটী হইতে হাওড়া ষ্টেসনের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, তখন তিনি (মাতঙ্গিনী দেবী) দেখিতে পাইলেন, লোকেরা কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতির সঙ্গে জগজ্জননী দশভুজা দেবীকে বিসর্জ্জন দিবার জন্য স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইতেছে। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া তিনি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রাণের প্রিয়তমা যোগমায়া বুঝি আর বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না, এই আশঙ্কা করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রন্দন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই অলোকসামান্যা রমণীর এই দর্শন সত্য হইয়াছিল। শ্রীমতী যোগমায়া দেবী সেইবারেই শ্রীবৃন্দাবনের নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, আর বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই।

শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবীর ভবিষ্যৎ দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে ঢাকা গেণ্ডারিয়া আশ্রমে যে ৺ নাম-ব্রহ্মের পূজা প্রতিষ্ঠিত হইবে, তিনি তাহা বহুদিন পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন। ঢাকা হইতে শ্রীবৃন্দাবন গমন করিবার সময় গেণ্ডারিয়াবাসী পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাধারমণ গুহ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীকে, বিদায়কালীন উপদেশ প্রদান-প্রসঙ্গে, তিনি ভবিষ্যতে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে ৺ নাম-ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা হইবার আভাস প্রদান করিয়াছিলেন ; এবং এ সম্বন্ধে শ্রীবৃন্দাবন অবস্থানকালে গেণ্ডারিয়াবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ মহাশয়ের মাতৃদেবীকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন—"দেখ, এবার তোমরা ঢাকায় গিয়া এক নূতন ব্যাপার অবলোকন করিবে। তথায়—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ॥
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥"

এইরূপ নাম-ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে। শঙ্খ, ঘণ্টা, খোল, করতালের ধ্বনির সহিত ভোগ, রাগ প্রভৃতি উপকরণ দ্বারা তাঁহার পূজা প্রবর্ত্তিত হইবে।" বলা বাহুল্য, যোগমায়া দেবীর এই ভবিষ্যৎবাণী বর্ণে,বর্ণে সত্য হইয়াছে।

এক দিবস জননী যোগমায়া, তাঁহার মাতৃঠাকুরাণী শ্রীযুক্তেশ্বরী মুক্তকেশী দেবী ও পূর্ব্বোক্ত শ্রদ্ধেয় সতীশবাবুর মাতৃদেবী, ইঁহারা সকলে একত্র হইয়া শ্রীশ্রীগোবিন্দজী দর্শন করিতে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে সতীশবাবুর মাতৃদেবী অকস্মাৎ দেখিতে পাইলেন যে, যোগমায়া দেবী আর সে যোগমায়া নাই। তিনি এক অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যসম্পন্না অষ্টমবর্ষীয়া বালিকামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার পদতল অলক্তকরাগে রঞ্জিত, পরিধানে রক্তবর্ণ চেলীর বসন ও সর্ব্বাঙ্গে নানাবিধ রত্নালঙ্কার ঝল্‌মল্ ঝল্‌মল্ করিতেছে। তিনি নূপুরাদি আভরণের ঝঙ্কারে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া দ্রুত-পদ-বিক্ষেপে শ্রীমন্দিরাভিমুখে গমন করিতেছেন, যেন শ্যাম-অভিসারে শ্রীমতী ব্রজসুন্দরী গরবভরে নিকুঞ্জকাননের দিকে ধাবিত হইয়াছেন। শ্রীমতী যোগমায়া দেবীকে হঠাৎ এইরূপ অপরূপ মূর্ত্তিতে দর্শন করিয়া, শ্রদ্ধেয় সতীশবাবুর মাতৃদেবী "একি ? একি ? এ কি দেখিতেছি" ? এই কথা বলিয়া প্রেমে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া, মা ও মেয়ে উভয়ে অতি কষ্টে তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অতঃপর তাঁহাকে তাঁহার ভাবান্তরের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। ইহা শুনিয়া শ্রীযুক্তা মুক্তকেশী দেবী স্বীয় কন্যাকে স্নেহ-ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—"তুই যার তার কাছে প্রকাশ হচ্ছিস্ আর আমার কাছে হ'তে পারিস্ না ?" জননী যোগমায়া সলজ্জভাবে উত্তর করিলেন—"মা, একবার প্রকাশ হ'লে সে কি আর থাকে ?"

এই ঘটনার কিয়দ্দিন পরে গোস্বামী প্রভুর মুখে হিমালয়ের কোন নিভৃত কক্ষস্থিত সিদ্ধপীঠ ৺ মুক্তিনাথবাসী ত্রিগুণাতীত মহাপুরুষদিগের বিবরণ শ্রবণ করিয়া, যোগমায়া দেবী তাঁহার নিকটে ৺ মুক্তিনাথ দর্শন করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। তদুত্তরে গোস্বামী প্রভু বলিলেন যে, মায়া থাকিতে কেহ তথায় গমন করিতে পারে না। শ্রীমতী যোগমায়া আবদার করিয়া বলিলেন—"আমাকে মায়া হইতে মুক্ত করিয়া সেই স্থান দর্শন করাইতেই হইবে।" গোস্বামী প্রভু বলিলেন—"মায়া হইতে মুক্ত হইলে তুমি আর এই দেহে থাকিতে চাহিবে না। এখন দেহত্যাগ করিলে তোমার অল্পবয়স্কা কন্যা ও বৃদ্ধা মাতার অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হইবে।" যোগমায়া দেবী ইহাতেও নিরস্ত না হইলে, গোস্বামী প্রভু অগত্যা সম্মত হইলেন, এবং ইহার কিয়ৎকাল পরেই এক দিবস দাম্পত্যপ্রণয়-কলহের ছল করিয়া যোগমায়া অদৃশ্য হন। এই সুযোগে গোস্বামী প্রভুর অনুরোধে তদীয় গুরুদেব শ্রীশ্রীপরমহংসজী যোগবলে যোগমায়া দেবীকে মুক্তিনাথ লইয়া যান। বলা বাহুল্য যে, সেই স্থানের মহাপুরুষগণ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া, তিন দিন পর্য্যন্ত বিশেষভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন; এবং চতুর্থ দিবসে পরমহংসজী তাঁহাকে মুক্তিনাথ হইতে শ্রীবৃন্দাবনে রাখিয়া গিয়াছিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে গোস্বামী প্রভু সশিষ্যে কুম্ভমেলা দর্শন করিবার জন্য হরিদ্বারে গমন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, শ্রীমতী যোগমায়া বলিলেন—"তোমরা যাও, আমি আর শ্রীবৃন্দাবন ছাড়িয়া কোথাও যাইব না।" এই কথা শুনিয়া গোস্বামী প্রভু বলিলেন—"আমিত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে, মায়ামুক্ত হইলে তুমি আর দেহে থাকিতে চাহিবে

প্রভুপাদ যোগজীবন গোস্বামী মহাশয়ের মুখে শ্রুত।

না।” ইহার দুই এক দিন পরেই বিসূচিকা রোগের ছল করিয়া শ্রীমতী যোগমায়া দেবী, ১২৯৭ সন, ১০ ফাল্গুন শনিবার ত্রয়োদশী তিথিতে নশ্বর দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অপ্রাকৃত বৃন্দাবনলীলায় প্রবেশ করেন। তৎপরে গোস্বামী প্রভুর আদেশে তদীয় শিষ্যবৃন্দ গুরুপত্নীর পরিত্যক্ত দেহ সৎকার করিবার জন্য যমুনাতটে উপস্থিত হইলে, ৺শ্রীধর ঘোষ ও গোস্বামী প্রভুর পুত্র শ্রীমৎ যোগজীবন গোস্বামী মহাশয় উভয়েই এক সময় দর্শন করিলেন যে, যোগমায়ার দেহ হইতে একটী চতুর্ভুজা কালী-মূর্ত্তি উত্থিত হইয়া কালিন্দীর জলে ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক অদৃশ্য হইলেন।

জননী যোগমায়া দেবীর শ্রীবৃন্দাবনপ্রাপ্তির 'পর, শ্রদ্ধেয় শ্রীধর ঘোষ মহাশয় গোস্বামী প্রভুর সঙ্গে হরিদ্বার গমন করেন। তথায় তিনি এক দিবস ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে উপবেশনপূর্ব্বক যোগমায়া দেবীকে স্মরণকরতঃ মাতৃহীন বালকের ন্যায় রোদন করিতেছিলেন, এমন সময় ব্রহ্মকুণ্ড হইতে যোগমায়াদেবী দিব্যশরীরে প্রকাশিত হইয়া শ্রীধরকে সান্ত্বনা প্রদান-পূর্ব্বক যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা তৎকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি যথাঃ—শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া বলিলেন—“শ্রীধর, তুমি আমার জন্য কাঁদিতেছ কেন? এই দেখ, আমি বর্ত্তমান। আমি মরি নাই। আমার দেহকে তোমরা অগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত করিয়া পঞ্চভূতে লয় করিয়াছ। আমি এক্ষণে মুক্ত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র গমনা-গমন করিতে পারি। এতদিন দেহে আবদ্ধ ছিলাম বলিয়া যাহা করিতে পারি নাই, এখন ইচ্ছানুসারে তৎসমুদয় করিতে পারি। আমার জন্য তুমি কাঁদিও না। তোমার প্রতি আমার বিশেষ দৃষ্টি রহিয়াছে।

“তোমার গুরুদেব এবং আমাকে যতদিন ভিন্নরূপে দেখিবে, যতদিন আমাকে ছাড়িয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি করিবে, ততদিনে ভক্তি কি জানিতে পারিবে না। যেমন পার্ব্বতী শিবের সহধর্ম্মিণী ছিলেন, সেইরূপ

আমাকেও তোমার গুরুদেবের সতীসাধ্বী স্ত্রী বলিয়া ভক্তি করিবে। আমি জীবিত থাকিতে সময় সময় তোমাকে যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহা স্থিরভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবে যে কথা কিছুই নহে, তাহার অন্তরালে যে ভাব নিহিত আছে তাহাই প্রকৃত বস্তু, তাহা বুঝিয়া চলা সামান্য মনুষ্যের ক্ষমতা নহে। তুমি মনুষ্য, কিন্তু আমাকে মনুষ্য ভাবিও না। জ্ঞানীরা সদ্‌গুরুকে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সদ্‌গুরু মনুষ্য নহেন। মহাদেব, দেবর্ষি নারদকে দীক্ষা দিবার পর তিনি মহাদেবকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া স্তুতি করিয়াছিলেন। তাহাতে মহাদেব, নারদকে বলিয়াছিলেন—"নিষ্ঠাবান্ বিশ্বাসী শিষ্য সদ্‌গুরু ও কৃষ্ণের মধ্যে ভেদ দর্শন করেন না। হে নারদ! তুমি যে আমাকে কৃষ্ণ বলিয়া স্তুতি করিতেছ ইহা মিথ্যা নহে।" এই বলিয়া মহাদেব নারদকে কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করাইলেন। তখন নারদ দেখিলেন, মহাদেব আর মহাদেব নাই, তিনি কৃষ্ণ হইয়া গিয়াছেন। পার্ব্বতী আর পার্ব্বতী নাই, তিনি রাধা হইয়া গিয়াছেন। এই প্রকারে দেবর্ষির, রাধাকৃষ্ণ ও শিবদুর্গাতে যে ভেদবুদ্ধি ছিল, তাহা দূর হইয়া গেল। তুমি গুরুকে যে মনুষ্যজ্ঞান করিতেছ, তাহার মূলে কেবল অজ্ঞানতা ও মূঢ়তা রহিয়াছে। এই অজ্ঞানতা ও মূঢ়তা হইতে যদি মুক্ত হইতে চাও, তবে সর্ব্বদা গুরুর নিকটে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিবে এবং সাক্ষাৎভাবে তাঁহার মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ধ্যান করিবে। তুমি সাধু হইতে চেষ্টা করিবে। সাধুর বেশের একটা মর্য্যাদা রহিয়াছে। চরিত্রে ও ব্যবহারে সেই মর্য্যাদা রক্ষা করিবে। এই গঙ্গাতীরে বসিয়া আমাকে স্মরণপূর্ব্বক মাতৃহীন বালকের ন্যায় কাঁদিতেছিলে, তাহাতে তোমার প্রতি আমার বাৎসল্য-ভাব উদয় হওয়াতে আমি তোমাকে দর্শন দিলাম।" এই বলিয়া গঙ্গা হইতে উত্থিতা যোগমায়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন।

উল্লিখিত ঘটনাতে আমরা দেখিতে পাই যে, জননী যোগমায়া তাঁহাকে আদ্যাশক্তি মনে করিয়া ভক্তি করিতে ভক্ত শ্রীধরকে উপদেশ দিতেছেন। ইহাতে কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, তিনি তাঁহাকে ভক্তি করিতে কি প্রকারে উপদেশ দিলেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, শাস্ত্রে অনেক স্থানে দেব-দেবীরা ভক্তগণের মঙ্গলের জন্য এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। অপিচ, যোগমায়া দেবী এখন আর ইহ-সংসারে মনুষ্য-দেহে নাই, সুতরাং পার্থিব-সম্মান বা পূজোপহারাদির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি থাকা অসম্ভব। কেবল ভক্তের উপকারার্থ ও সাধনমার্গে অগ্রসর হইবার জন্যই ঐ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমতী যোগমায়ার শ্রীবৃন্দাবনপ্রাপ্তির পর গোস্বামী প্রভু তদীয় জামাতা শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মৈত্র মহাশয়ের নিকটে ৬ যোগমায়া দেবীর দেহত্যাগ সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

ও হরিঃ। শ্রীবৃন্দাবন।

কল্যাণবরেষু,

গত ১০ই ফাল্গুন সন্ধ্যাকালে শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী তাঁহার চিরপ্রার্থনীয় সিদ্ধদেহ লাভ করিয়াছেন। অবিশ্বাসী লোক ইহাকে মৃত্যু বলে, কিন্তু একবার বিশ্বাস-নয়নে চাহিয়া দেখ, যোগমায়া আজ সখীবৃন্দের মধ্যে কি অপূর্ব্ব শোভা-সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছেন। শ্রীমতী শান্তিসুধাকে বলিবে যে সে যেন শোক না করে, ইহা শোকের ব্যাপার নহে, বহু সৌভাগ্যে মনুষ্য ইহা প্রাপ্ত হয়। আগামী ২১শে ফাল্গুন তাঁহার নামে মহোৎসব হইবে। তাহার পর আমরা ঢাকায় যাত্রা করিব।

শ্রীমতী শান্তিসুধা যদি শ্রাদ্ধ করিতে চায়, তবে আনন্দ উৎসব করিয়া যেন দুঃখী কাঙ্গালীদিগকে খাওয়ায়।

মা শান্তি, শোক করিও না, আনন্দ কর। যত শীঘ্র পারি আমরা ঢাকায় যাইব।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

হরিদ্বারে কুম্ভমেলা দর্শন। হিমালয় ও কৈলাস-পর্ব্বত ভ্রমণ।

শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবীর তিরোভাবের মহোৎসব সম্পন্ন করিয়া ১২৯৭ সনের ফাল্গুন মাসে গোস্বামী প্রভু কুম্ভমেলা দর্শন করিবার জন্ত হরিদ্বার গমন করেন। এই বৎসর মেলা উপলক্ষে প্রায় তিন লক্ষ সাধুর সমাগম হইয়াছিল। হরিদ্বারে স্থানের অল্পতাবশতঃ ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে, গঙ্গার চড়ায়, কনখল প্রভৃতি স্থানে সাধুসন্ন্যাসিগণ আপন আপন আসন স্থাপন করিয়াছিলেন। দিবানিশি হরিনাম গান, হরিকথা আলাপন প্রভৃতি সৎপ্রসঙ্গ দ্বারা মেলাস্থলে এক অপূর্ব্ব ভাব সঞ্চারিত হইত। এক দিবস গোস্বামী প্রভু তদীয় পুত্র শ্রীমৎ যোগজীবন গোস্বামী এবং শ্রদ্ধেয় শিষ্যবর্গ রামকৃষ্ণ গুহ, ৺ রাজকুমার দত্ত, ৺ শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ৺ শ্রীধর ঘোষ প্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া কনখলে সাধুদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময় জনৈক বৈষ্ণব বাবাজী মহাশয় গোস্বামী প্রভুর দিকে কিয়ৎকাল স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া ভাবাবেশে গান ধরিলেন—

কীর্ত্তনের সুর।

"যাঁদের হরি ব'লতে নয়ন ঝরে।
ঐ দেখ্ তারা দুভাই এসেছে রে।
(যাঁরা প্রেমে জগৎ ভাসাইল)
(যাঁরা নামে জগৎ মাতাইল)
তাঁরা দুভাই এসেছে রে॥ ইত্যাদি

গোস্বামী প্রভুর শিষ্যগণ গানে যোগদান করিলেন। দেখিতে দেখিতে একটী প্রবল ভাবের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। গোস্বামী প্রভু উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনে আকৃষ্ট হইয়া বহুলোক গোস্বামী প্রভুকে বেষ্টনপূর্ব্বক তারকব্রহ্ম হরিনামের জয়ধ্বনিতে মুহুর্মুহু দশদিক্ প্রকম্পিত করিতে আরম্ভ করিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বহু সাধু মহাত্মাগণ বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে এই ব্যাপার অবলোকন করিতে লাগিলেন; এমন অদ্ভুত নৃত্য, এমন অপূর্ব্ব ভাব, এবম্প্রকার প্রাণমাতান নামকীর্ত্তন তাঁহারা যেন কখনও শ্রবণ করেন নাই। রাধাকুণ্ডবাসী শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পাণ্ডা তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, তিনি ঐ সময় গোস্বামী প্রভুর বক্ষে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

এই শ্লোকটী উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছিলেন।

অতঃপর লোকসংঘট্ট দেখিয়া গোস্বামী প্রভু ভাব-সম্বরণপূর্ব্বক আশ্রমাভিমুখে গমনে উদ্যত হইলে, উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থবোধ করিতে লাগিলেন।

প্রকৃত তত্ত্বদর্শী মহাত্মা জগতে অতীব দুর্ল্লভ। ভক্তিভাজন ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব এ সম্বন্ধে বলিতেন—"কোটীতে গোটী (একটী)।" ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"

অর্থাৎ প্রতি সহস্র লোকের মধ্যে একজন মাত্র সিদ্ধিলাভ করিতে

যত্ন করে। এইরূপ সিদ্ধিলাভে যত্নশীলদিগের সহস্রের মধ্যে আবার একজন মাত্র সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়। ঈদৃশ সিদ্ধপুরুষদিগের মধ্যেও কচিৎ কেহ আমাকে তত্ত্বতঃ অবগত হইতে পারে।

এই কুম্ভমেলায় শত সহস্র সাধু সমবেত হইলেও তাঁহাদিগের মধ্যে মাত্র তিন চারিজন প্রকৃত তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহাদের একজনের সহিত গোস্বামী প্রভুর এই সম্বন্ধে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা তাঁহার স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা :—

"হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় প্রায় লক্ষ সাধুর সমাগম হইয়াছিল। তন্মধ্যে তিন জন মাত্র যথার্থ তত্ত্বদর্শী, আর সকলে বেশভূষা, সম্প্রদায়, মতামত লইয়া ব্যস্ত। এই তিন জনের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সাধুরা এত কঠোরতা করিয়াও তত্ত্বলাভ করেন না কেন? তিনি হিন্দিতে বলিলেন—"বাবা, আমি ক্ষুদ্রকীট, কি বলিব?" অনেক ব্যগ্রতা প্রকাশ করাতে বলিলেন—"এখন কেহ ভগবানকে চায় না। মান, মর্য্যাদা, বুজরুকী, মোহান্তগিরি, গুরুগিরি চায়, তাহা পায়। কিন্তু 'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং' ইত্যাদি।" *

একদিন মেলাস্থলে চারিশত বৎসরের অধিক বয়স্ক একজন সাধুর সহিত গোস্বামী প্রভুর, শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সম্বন্ধে যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা তাঁহার স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা :—"একদিন কুম্ভমেলার একস্থানে বসিয়া মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু ও অদ্বৈত প্রভুর কথা বলিতেছি, এমন সময় গুজরাটদেশীয় মিতভাষী একজন প্রাচীন সাধু বলিলেন—'বাবা! বাঙ্গালা দেশছে এক আদমি

* ৺মতিলাল ভৌমিক কর্ত্তৃক সংগৃহীত গোস্বামী প্রভুর উপদেশাবলী হইতে উদ্ধৃত।

হামারা গুজরাট দেশমে গিয়াথা, উন্‌কা নামথা কমলাক্ষ।'—অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশ হইতে কমলাক্ষ নামক একব্যক্তি গুজরাট দেশে গিয়াছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'তাঁহার বাড়ী কোথায় ছিল?' তিনি বলিলেন—'সো আদমি বোলা উন্‌কা ঘর নদীয়া শান্তিপুর। উন্‌কো একটো গীতা মেবাপাছ্ হায়।'—অর্থাৎ তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার বাড়ী নদীয়া শান্তিপুর। তাঁহার এক খানি গীতা আমার নিকট আছে। কি আশ্চর্য্য! লোক এত দীর্ঘজীবী হয়? সব মিলে গেল। অদ্বৈত প্রভুর নাম কমলাক্ষ ছিল। অদ্বৈত নাম শেষে হয়।" কি উপায়ে এত দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছেন এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে, সাধুটী গোস্বামী প্রভুকে নির্জ্জনে লইয়া হঠযোগের কতিপয় প্রক্রিয়া দেখাইয়া দিলেন। ইঁনি হিঙ্গুলাজের অপর একটী জীবিত সাধুর কথা ঐরূপ বলিয়াছিলেন যে; তিনি দ্বাপর যুগের লোক এবং শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত এখন আর আসন হইতে উঠিতে পারেন না। তাঁহার চক্ষুর পাতা ঝুলিয়া পড়াতে চক্ষু সর্ব্বদা বন্ধ হইয়াই থাকে। কিছু দর্শন করিবার সময় হস্ত দ্বারা চক্ষুর পর্দ্দা তুলিয়া তবে দেখিতে হয়।

এইস্থানে গোস্বামী প্রভু, তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত একটী সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে অতিশয় হর্ষ প্রকাশপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, তিনি যে জন্য হরিদ্বার আগমন করিয়াছিলেন তাহা সার্থক হইয়াছে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে এই সাধুর সঙ্গে গোস্বামী প্রভু কৈলাস পর্ব্বত দর্শন করিতে গমন করেন। যোগিঋষিদের তপস্থার প্রকৃষ্ট স্থল ভূস্বর্গ হিমালয়ের বহু নিভৃত স্থান ও কৈলাস পর্ব্বতাদি ভ্রমণ, গোস্বামী প্রভুর জীবনের একটী প্রধান ঘটনা। কিন্তু এ সম্বন্ধে বেশী কিছু জানিবার উপায় ছিল না। কারণ, তিনি নিজে এই সকল কথা আদৌ প্রকাশ করিতেন না। দৈবাৎ কোন সূত্রে কোন কথা প্রকাশ হইয়া

পড়িলে, অপরে তাহা অবগত হইতে পারিতেন। বিশেষ প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া কোন কথা বলিতে হইলেও তিনি অধিকারিভেদে কথা বলিতেন। যে তত্ত্ব যিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম, তাঁহার নিকটে তাহা ব্যক্ত করিতেন না; এবং যে ঘটনার যে অংশ যিনি বিশ্বাস করিতে পারিবেন না বুঝিতেন, তাঁহার নিকটে তাহা প্রকাশ করিতেন না, তাঁহার সহিত সেই অংশ বাদ দিয়া কথা বলিতেন; সুতরাং গোস্বামী প্রভু কর্ত্তৃক পৃথক্ পৃথক্ সময়ে বর্ণিত কোন একটী নির্দ্দিষ্ট ঘটনা, অধিকারি-ভেদে পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির নিকটে অল্পাধিক পরিমাণে বিভিন্ন বলিয়া বোধ হইলেও, যাঁহারা পূর্ব্বাপর সমস্ত বিষয় অবগত আছেন, তাঁহারা উহার মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখিতে পান। সে যাহা হউক, গোস্বামী প্রভুর হিমালয় ও কৈলাস পর্ব্বত ভ্রমণ বৃত্তান্ত পূর্ব্বোক্ত সাধুটীর মুখেই প্রথম তদীয় শিষ্যগণ অবগত হন। এ সম্বন্ধে আমরা, বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহার সামঞ্জস্য যথাসাধ্য রক্ষা করিয়া নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

গোস্বামী প্রভু কৈলাস পর্ব্বত দর্শনমানসে পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষ ও অপর দুইজন সাধুর সঙ্গে আলমোড়া হইয়া হিমালয় পর্ব্বত আরোহণ পূর্ব্বক কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে একটী পুলিশের থানা দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা কৈলাসে যাইতেছেন শুনিয়া, পুলিশের প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহাদিগকে বাধা প্রদানকরতঃ বলিলেন যে, সে পথ অতিশয় দুর্গম ও বরফাবৃত। অনেক লোক কৈলাস পর্ব্বত দর্শন করিতে গিয়া শীতাধিক্য বশতঃ শরীরের রক্ত জমাট হইয়া মারা পড়ে। এইরূপ বৃথা লোকক্ষয় নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে এই থানা স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু অবশেষে আগন্তুক সাধুদিগকে কৈলাসদর্শনে কৃতসঙ্কল্প অবগত হইয়া, পুলিশের কর্ম্মচারী তাঁহাদিগকে অন্য একটী পথের অনুসন্ধান বলিয়া

দিয়া, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার উপকরণ চকমকি পাথর, শোলা ও বহু পরিমাণ দীপ-শলাকা প্রদান করিলেন। গোস্বামী প্রভু, সাধুদিগের সহিত একত্র হইয়া হিমালয়ের বহুস্থান অতিক্রমকরতঃ চলিতে চলিতে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়া, সন্ধ্যার সময় একটি সাধুর আশ্রমে উপনীত হইলেন। সাধুটী অতিথি সেবার জন্য ব্যস্ত হইয়া নিকটবর্ত্তী জঙ্গল হইতে কচুর পাতার ন্যায় কতকগুলি পত্র আনয়নপূর্ব্বক রুটির মত করিয়া ধূনির অগ্নিতে সেকিয়া তাঁহাদিগকে আহার করিতে দিলেন। নবাগত ক্ষুধার্ত্ত অতিথিগণ তাহা ভোজন করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। এই অপূর্ব্ব রুটির কথা উল্লেখ করিয়া গোস্বামী প্রভু বলিয়াছিলেন যে, তাহার আস্বাদ অনেক পরিমাণে আমাদের দেশীয় ময়দার রুটির মত, তবে একটু লবণ হইলে খাইতে আর কোন রকমের অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। পরদিন প্রাতে হিমালয়বাসী সাধুটী জঙ্গল হইতে কয়েকটী বেলের ন্যায় ফল সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং পূর্ব্বদিনের মত ধূনিতে দগ্ধ করিয়া ভিতরের জিনিস বাহিরকরতঃ তদ্দ্বারা অতিথিসেবা করিলেন। গোস্বামী প্রভু এই ফলের আস্বাদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, চিড়া দুধে ভিজাইয়া চিনি মিশ্রিত করিলে খাইতে যেমন স্বাদ হয় উহাও প্রায় তদ্রূপ।

বিশ্ববিধাতার কি অপার করুণা! তিনি এই সকল নির্জ্জনকাননবাসী সাধুদিগের আহারের জন্য নানাপ্রকার সুমিষ্ট ফলমূলের, এমন কি দুগ্ধেরও সংস্থান করিয়া রাখিয়াছেন। এই সকল স্থানে অনেক বন্য চমরী গাভী বিচরণ করে। তাহাদের বৎসেরা যখন একটী বাঁট হইতে দুগ্ধ পান করে তখন অপর বাঁট হইতে, দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া দৈবাৎ নিম্নে কোন ক্ষুদ্র গর্ত্তময় স্থানে পতিত হইলে, শীতাধিক্যবশতঃ জমিয়া যায়। এই সকল জমাট দুগ্ধ উষ্ণ জলের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেই অতি উৎকৃষ্ট দুগ্ধে পরিণত

হয়। সাধুরা এই সকল জমাট দুগ্ধখণ্ড সংগ্রহ করিয়া প্রয়োজনমত ব্যবহার করিয়া থাকেন। যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীবজন্তুর আহার প্রদান করিতেছেন, তিনি যে এই সকল তপোবনবাসী, সংসারবিরাগী, ধর্ম্মার্থী সাধুদিগের শরীরধারণোপযোগী দ্রব্যাদি যোগাইবেন, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? সে যাহা হউক, এই অতিথিপরায়ণ সাধুর নিকটে বিদায় গ্রহণকরতঃ গোস্বামী প্রভু, সন্ন্যাসী বন্ধুদিগের সহিত পুনরায় কৈলাস পর্ব্বতাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন। পথিমধ্যে প্রাকৃতিক-দৃশ্য-পূর্ণ অতিশয় রমনীয় স্থান সকল তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল। কোন কোন স্থানে পার্ব্বত্য-হ্রদে বিবিধবর্ণের অসংখ্য শতদল সহস্রদল পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। সহস্র সহস্র ভ্রমর তদুপরি পরিভ্রমণপূর্ব্বক মধুর ঝঙ্কারে এই সকল বনভূমির গাম্ভীর্য্যের মধ্যে এক অপূর্ব্ব ভাব সঞ্চার করিতেছে। স্থানে স্থানে পার্ব্বত্য বিহঙ্গমগণ বিচিত্র ফল-ফুল-শোভিত বৃক্ষোপরি উপবেশন করিয়া সুমিষ্ট কাকলীতে সেই নির্জ্জন বনস্থলীকে মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। কোথাও বা দলে দলে মৃগযূথ শত শত মৃগশাবকে পরিবেষ্টিত হইয়া, মনের আনন্দে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেইদিকেই অপূর্ব্ব শোভা, সেইদিকেই যেন গাম্ভীর্য্য ও আনন্দের সংমিশ্রনে এক মহাভাব বিরাজ করিতেছে।

এই প্রকার অশেষবিধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে বহু দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা বৌদ্ধ লামাদিগের একটী মঠে উপস্থিত হইলেন এবং কিছুকাল তথায় বিশ্রাম করিলেন। এই বৌদ্ধমঠসম্বন্ধে জনৈক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিকে এক দিন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছিলেন, যথা :—"হিমালয়ে বৌদ্ধ লামাদিগের এক মঠ আছে। আমি সেখানে গিয়া কিছুদিন ছিলাম। তাঁহাদের সাধনপ্রণালী দেখিয়া আনন্দ হইল।

শাক্যসিংহ প্রথমে সাধনপথের ঐ সকল জোয়ার-ভাটা ভোগ করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি পূর্ব্বশিক্ষা, যাহা নিজের আত্মার অঙ্গীয় হয় নাই, তাহা ভুলিতে চেষ্টা করিয়া পুনর্ব্বার তপস্যা আরম্ভ করিলেন; তখন তাঁহার এক একটী সত্যলাভ হইতে লাগিল এবং উহা তাঁহার আত্মার অঙ্গীভূত হইয়া তাঁহাকে অবশেষে বুদ্ধত্বে প্রতিষ্ঠিত করিল। বৌদ্ধগ্রন্থ যদি দেখিতে চাহেন, তবে পালাভাষা শিক্ষা করিয়া হিমালয়ে বৌদ্ধমঠে গিয়া অধ্যয়ন করুন অনুবাদে অনেক ভুল আছে। লামা গুরুদিগের আচারব্যবহার ও তাঁহাদের সাধনপ্রণালী দেখিলে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বুঝিতে পারা যায়।" অতঃপর তাঁহারা এই বৌদ্ধ লামাদিগের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক কৈলাশ পর্ব্বতাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

এই প্রকারে কিয়দ্দিন গত হইলে অবশেষে তাঁহারা একটী স্বচ্ছসলিলা হ্রদের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তথায় কতিপয় মহাপুরুষ পত্রপুষ্পাদি নানা প্রকার পূজোপহার হস্তে লইয়া হ্রদের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা এই নবাগত মহাত্মাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগকে শীঘ্র স্নান করিয়া আসিতে বলিলেন। তদনুসারে তাঁহারা স্নান করিয়া আসিলে মহাপুরুষগণ তাঁহাদের দ্রব্যাদি হইতে তাঁহাদিগকে কিছু কিছু দিয়া বলিলেন—"অচিরাৎ এই সরোবর হইতে ভগবান্ সদাশিবের রথ উত্থিত হইবে। আমরা তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি।" অতঃপর এই স্থানে যে একটী অতীব আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হয় তাহা গোস্বামী প্রভুর স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। কোন সময় পাণ্ডবদিগের মহাপ্রস্থান বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে গোস্বামী প্রভু ঘটনাটী প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎপ্রদত্ত বিবরণ এইরূপ—"এক সময় আমি কয়েকজন সাধুর সঙ্গে হিমালয় পার হইয়া

সেই স্বর্গের পথে চলিতে থাকি। বরফের উপর দিয়া অনেক কষ্টে চলিতে লাগিলাম। আমরা অত্যন্ত দুর্গম পথে সরু রাস্তা ধরিয়া চলিতে চলিতে এক স্থানে গিয়া বিশ্রাম করিলাম। সেই স্থানে একটী কুণ্ড (হ্রদ) দেখিলাম, মহাদেব কুণ্ড ও মহাদেবের পূজা করিতে হয়। আমরা পূজা করিয়া যেমন শঙ্খধ্বনি করিলাম, অমনি কোথা হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হনুমান আসিয়া কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া বসিল। পরে কুণ্ড হইতে এক রথ উঠিল। তার মধ্যে মহাদেব দর্শন করিলাম। অতি আশ্চর্য্য দর্শন করিলাম। পরে সেই হনুমানদিগকে যথা সাধ্য ফলাদি খাইতে দেওয়া হইল। তাহারা খাইয়া চলিয়া গেল। অমনি রথসহ মহাদেব সেই কুণ্ডে অন্তর্হিত হইলেন।" * কিংবদন্তী এই যে এই দিবস এই রথ দর্শন করিতে না পারিলে কৈলাসপুরী গমন অথবা জগতের আদি পিতামাতা হরপার্ব্বতীকে দর্শন করিতে পারা যায় না।

অতঃপর তাঁহারা পুনরায় দীর্ঘকাল পথ চলিতে চলিতে অবশেষে একটী অতি নিভৃত পরম রমণীয় পর্ব্বতের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে অনেকগুলি শিবমন্দির আছে, তাহাতে কয়েকটী সাধু বাস করিয়া থাকেন। এই পর্ব্বতের শিখরদেশে হরপার্ব্বতীর তপস্যার স্থল কৈলাসপুরী অবস্থিত। কৈলাস পর্ব্বতের এই স্থান পর্য্যন্ত অতি কষ্টে সাধু সজ্জনগণ আগমন করিতে পারেন, কিন্তু ইহার পর অগ্রসর হওয়া একরূপ অসম্ভব। ইহার পর হইতেই পর্ব্বতের চিরবরফাবৃত অংশ আরম্ভ হইয়াছে। হঠযোগের প্রক্রিয়াবিশেষ অভ্যস্ত না থাকিলে, সেই স্থানের ভীষণ শীত সহ্য করা যায় না। অনেক মহাত্মা প্রাণের টানে কৈলাস-নাথকে দর্শন করিবার আশায় ইহার পরও অগ্রসর হইতে গিয়া, শীতাধিক্য-

* শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধৃত।

শতঃ শরীরের রক্ত জমাট হওয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এই সকল বরফাবৃত স্থানে মৃতদেহ পচিয়া যায় না। শরীরের রক্তমাংস প্রথমতঃ জমাট বাঁধিয়া সমগ্র শরীরটী বরফে পরিণত হয়, এবং এই অবস্থায় বহুকাল থাকিলে, বিশ্বনিয়ন্তার কি এক আশ্চর্য্য কৌশলে অবশেষে বরফ হইতে প্রস্তরে পরিণত হয়। এইরূপ প্রস্তরময় কয়েকটী মনুষ্য মূর্ত্তি দেখিয়া গোস্বামী প্রভু ও তদীয় সহযাত্রী সাধুগণ বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

গোস্বামী প্রভুর শরীর অপটু ছিল, তাহাতে আবার তিনি হঠযোগের ক্রিয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন না, সুতরাং তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। সঙ্গীয় সাধু দুইটী হঠযোগসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা বরফময় প্রদেশের উপর দিয়া কৈলাশপুরীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গোস্বামী প্রভু তাঁহাদিগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া পর্ব্বতের পাদদেশস্থ শিব-মন্দিরে অপরাপর সাধুদিগের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বোক্ত স্থান অতিক্রম করিতে করিতে হঠযোগসিদ্ধ উক্ত মহাপুরুষদিগের দৃষ্টি-পথে অনেক আশ্চর্য্য দৃশ্য পতিত হইতে লাগিল। শাস্ত্রে তপোবনের যেরূপ বর্ণন আছে, কৈলাস পর্ব্বতের এই সকল নিভৃত স্থানে তাদৃশ অনেক তপোবন তাঁহারা দর্শন করিতে লাগিলেন। নরমাংসভোজী অনেক অসভ্য জাতিও তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের গাত্রে যে এক প্রকার দ্বিভুজ ও একমুণ্ডবিশিষ্ট অস্বাভাবিক জীবের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, তদ্রূপ অনেকগুলি প্রাণীও তাঁহারা দেখিতে পাইয়া-ছিলেন। সর্ব্বাধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল অদ্ভুত জীব যেন কৈলাসপুরীর প্রহরীস্বরূপ হইয়াই আগন্তুকদিগকে কৈলাস গমনে সর্ব্বদা বাধা প্রদান করিয়া থাকে। বাধা না মানিলে তাহাদের প্রাণ নাশ করিতেও ত্রুটি করে না। বিহঙ্গমযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক শূন্যপথে উড্ডীয়মান হইয়া, সাধুদ্বয় এই সকল স্থান অতিক্রম করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া শিবরাত্রির দিবস তাঁহারা অবিকল শিবলিঙ্গের আকারবিশিষ্ট একটী পর্ব্বতের নিকটে উপস্থিত হইয়া, তদুপরি একটী স্বর্ণময়ী পুরী দর্শন করিলেন। এই পর্ব্বতের গাত্রস্থিত একটী প্রকাণ্ড গোফার মধ্যে তাঁহারা বহু পুরাতন ঋষিমুনিদিগের এক অপূর্ব্ব সমাবেশ দর্শন করিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ঘটনাটী গোস্বামী প্রভুর কৈলাসধাম যাত্রার সহচরদিগের মধ্যে একজনের প্রদত্ত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। ইঁহার সহিত গোস্বামী প্রভুর গয়াধামে একবার দেখা হইয়াছিল। তৎকথিত বিবরণ যথা :—"কিছুদিন গমন করিয়া পথের সম্মুখে এক প্রকাণ্ড পর্ব্বত পাইলাম, আর পথ নাই। সেই পথ ঐ স্থানে শেষ। সম্মুখে পাহাড়ের নিকট যাইয়া দেখিলাম যে, এক প্রকাণ্ড পাথরের দরজা। দুই দিকে দুইটী ঘণ্টা রহিয়াছে। ভিতরে যতদূর দেখা যায়, দেখি যে অসংখ্য তপস্বী। কেহ দীর্ঘকায়, কেহ শীর্ণকায়। কাহারও কেশসমূহ শুভ্র, কাহারও দীর্ঘ জটা শ্মশ্রু। শরীরের রং কাহারও কৃষ্ণবর্ণ, কাহারও শ্বেতবর্ণ। কেহ হোম করিতেছেন, কেহ যোগ করিতেছেন, কেহ ভজন সঙ্গীত গাইতেছেন, কেহ পূজা করিতেছেন ইত্যাদি। বহুবিধ পুরাতন ঋষি, মুনি, তপস্বী, যোগী, দেব, নর—ইত্যাদি, যেন অমরভবনে যুগযুগান্তর ধরিয়া তপোনিরত। সাধুগণ ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন রহিয়াছেন। আহা! এই ত চির-শান্তিময় স্বর্গধাম, অক্ষয়, অব্যয়, প্রলয়ের অধীন নহে। সেই দেবদ্বার-রক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলাম—"দেব, এই কোন্ ধাম ?" তিনি বলিলেন, "হরগৌরী-ধাম"। অদূরে ঐ যে মন্দির দেখিতেছ, ঐ স্থানে হরগৌরী বিরাজ করিতেছেন।" * ইহাই কৈলাসপুরী।

---

* শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধৃত।

মানস সরোবর হইতে কৈলাস পর্ব্বত পর্য্যন্ত ভূস্বর্গের দৃশ্য। মধ্যবর্ত্তী চিহ্নিত স্থানগুলি মহাপুরুষদিগের আশ্রম। ময়ূর মুকুট বাবার জনৈক হিমালয়বাসী ভক্ত সাধু কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে গৃহীত।

সন্ধ্যার সময়ে পুরীর দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। মহাপুরুষগণ অভ্যন্তরে প্রবেশ-পূর্ব্বক পুরীর অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়া মোহিত হইলেন। অতঃপর এক স্থানে গোস্বামী প্রভুকে দেখিয়া তদীয় সহযাত্রী সাধুদ্বয় অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কি উপায়ে তিনি তাঁহাদের পূর্ব্বেই কৈলাস-পুরীতে উপস্থিত হইতে সক্ষম হইয়াছেন, এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে গোস্বামী প্রভু উত্তর করিলেন যে, তিনি শারীরিক অপটুতাপ্রযুক্ত অগ্রসর হইতে অক্ষম হইয়া ক্ষুণ্ণমনে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময়ে দয়ার সাগর ভগবান্ আশুতোষ দয়া করিয়া তাঁহাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছেন। অনন্তর মহাপুরুষগণ দেখিতে পাইলেন, একটী মন্দিরের মধ্যস্থলে একখানি বিচিত্র হিরণ্ময় সিংহাসনে যোগেশ্বর মহাদেব, যোগমায়া পার্ব্বতীদেবীকে অঙ্কে ধারণপূর্ব্বক উপবিষ্ট আছেন। জগতের আদি পিতামাতাকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়া মহাপুরুষগণ আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জনকরতঃ ভক্তিগদগদচিত্তে নানা প্রকার স্তব পাঠ করিয়া তাঁহাদের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। এই ভাবে শিবরাত্রি অতীত হইয়া গেল। প্রত্যূষে ভগবান্ মহাদেব ও ভগবতী পার্ব্বতী দেবী মহাপুরুষদিগকে শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অতঃপর নন্দীকেশ্বর মহাপুরুষগণকে পুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক বাহিরে আগমন করিলে, পুরীর দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। মহাপুরুষেরা সানন্দচিত্তে 'হর হর বম্ বম্' শব্দে কৈলাসপর্ব্বত প্রতিধ্বনিত করিয়া, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় চারিদিন মাত্র অবস্থান করিবার পর, গোস্বামী প্রভু সশিষ্য ঢাকায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ঢাকা ও কলিকাতায় অবস্থান। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রত্যাদেশ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত শেষ সাক্ষাৎ।

গোস্বামী প্রভু হরিদ্বার হইতে ঢাকায় আগমনকরতঃ শিষ্যগণ সহ গেণ্ডারিয়া আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি এই সময়ে সাধন মার্গের শেষসীমায় উপস্থিত হইয়া দিবানিশি ভগবানের সহবাসে চির-শান্তি ও পরমানন্দ সম্ভোগ করিতেছিলেন। ভগবান্, তাঁহার ধাম, তাঁহার লীলা প্রভৃতি সমস্তই এখন গোস্বামী প্রভুর নিকট উন্মুক্ত। স্থান ও সময়ের ব্যবধান তাঁহার নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ইহলোক, পরলোক প্রভৃতি সমস্ত তিনি এখন 'করতল-ন্যস্ত আমলকবৎ' প্রত্যক্ষ করিতেছেন। "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।" গোস্বামী প্রভু তাঁহার জীবনে এই ঋষিবাক্যের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেহটি পর্য্যন্ত নাম-ব্রহ্মের মন্দির হইয়া গিয়াছিল। শেষজীবনে তাঁহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, আসনে, বসনে, এমন কি গেণ্ডারিয়া আশ্রমস্থ আম্রবৃক্ষে (যাহার তলে তিনি পাঠ পূজা হোম ইত্যাদি নিত্যক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন সেই বৃক্ষের গাত্রে) নাম, নামের প্রতিপাদ্য দেবতার মূর্ত্তি প্রকটিত হইত, তাহা ইতঃপূর্ব্বে এক স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে।

গোস্বামী প্রভুর জীবনের শেষ চতুর্দ্দশ বৎসর তিনি একেবারে নিদ্রা যান নাই। দিবানিশি স্বীয় আসনে উপবেশনপূর্ব্বক ধ্যান ধারণা, পাঠপূজা,

সদালাপ, সৎপ্রসঙ্গ দ্বারা সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। আহারসম্বন্ধেও তিনি একদিন বলিয়াছিলেন—"আমার শরীররক্ষার্থে এখন দিনান্তে আম্র, কলা প্রভৃতি কোন একটা ফলের কিয়দংশ হইলেই হয়।" পরে বলিলেন—"ইহাও না হইলে চলে।" কোন ভক্ত সাধক শ্রীগৌরাঙ্গদেবের রূপ বর্ণন করিয়া গাহিয়াছিলেন—"একাধারে বিরাজিছে রাধাশ্যাম।" প্রকৃতি-পুরুষের এই একাধারে মিলনের পূর্ণ লক্ষণ যেমন গোস্বামী প্রভুর শেষজীবনে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে প্রকটিত হইয়াছিল, তদ্রূপ আর কোথাও দৃষ্ট অথবা শ্রুত হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। যাঁহারা তাঁহার এই অপূর্ব্ব শারীরিক লক্ষণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য হইয়াছেন। তাঁহার এই সময়ের রূপ বর্ণনা করিয়া তদীয় অন্যতম শিষ্য বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত গণপুরগ্রাম নিবাসী ৺ মহাবিষ্ণু জ্যোতি মহাশয় একটী অপূর্ব্ব গান রচনা করিয়াছিলেন। সহৃদয় পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে; যথা:—

পরজমিশ্র—ঝাঁপতাল।

অপরূপ শ্রীগুরুরূপ হৃদয়ে সদা ভাবনা রে।
ভবন বন সমান হবে, শমন-ভয় আর রবে না রে॥
তরুণ রবি-কিরণ দুটী চরণ পাশে পরকাশে,
ধন্য সে জন, ও চরণ (যার) হৃদিঃসরসে সদা ভাসে,
কোটীজন্মের পাপনাশে, ও রাঙ্গাপদ পরশে,
মজ ও পদে মন-ভৃঙ্গ আন সঙ্গ ছাড় না রে॥
কটিতে ঝাপি কৌপীন বহির্ব্বসন শোভে সুন্দর,
দণ্ড কমণ্ডলু করে শোভে কিবা মনোহর,
(জিনি) মদমত্ত কুঞ্জর গমন কিবা মন্থর,
মধুর হাস মধুর ভাষ মধুমাখা সব ব্যবহারে॥

সুবিশাল বক্ষে শোভে সপ্ত-লহরী-মাল,
ঊর্দ্ধ তিলক-রেখা ভালে কিবা শোভে ভাল,
মৌলী-রচিত চূড়া যেন শ্যামের মোহন-চূড়া,
কিম্বা ফণি-ফণা যেন ধরে গঙ্গাধর শিরে ॥
পৃষ্ঠে দোলে বেণী যেন ভানু রাজনন্দিনী,
প্রেম নীরে ভাসে সদা শ্রীমুখ কমলখানি,
আনন্দময় সব আনন্দ-রস-খনি,
মগন দিবা রজনী কিবা আনন্দ-সায়রে ॥

তাই বলিতেছিলাম যে সাধন-ভজন করিয়া গোস্বামী প্রভু দৈহিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক যে সকল অবস্থা পূর্ণমাত্রায় লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সকল যুগে সকল সাধকের পক্ষেই সুদুর্লভ। তাঁহার আবির্ভাবে বঙ্গদেশ ধন্য ও বাঙ্গালীজাতি গৌরবান্বিত হইয়াছে।

গোস্বামী প্রভুর গেণ্ডারিয়া আশ্রমে অবস্থানকালে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইত। তাঁহার অলৌকিক প্রভাবে, তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত সুমধুর হরিনাম শ্রবণে স্থাবরজঙ্গমাদি সকলেই পুলকিত হইয়া, বিবিধ অদ্ভুত প্রণালীতে স্ব স্ব আনন্দোল্লাসের পরিচয় প্রদান করিত। আশ্রমস্থ যে আম্রবৃক্ষের মূলে উপবেশনকরতঃ গোস্বামী প্রভু অনেক সময় পাঠ, পূজা-ভজনাদি করিতেন, সেই বৃক্ষের প্রত্যেক পত্র হইতে, ১২৯৯ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে অজস্র মধুবর্ষণ হইয়াছিল, এবং সেই মধুলোভে আকৃষ্ট হইয়া অসংখ্য ভ্রমর, পিপীলিকাদি মনের আনন্দে মধুপানে তৎপর হইয়াছিল। ক্রমে এই ব্যাপারটী সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে, হিন্দু, মুসলমান বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, দরিদ্র প্রভৃতি বহু লোক আশ্রমে উপস্থিত হইয়া এই অত্যদ্ভুত ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। গোস্বামী প্রভুকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা

করিলে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—"যেমন মনুষ্যের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণপ্রধান বিবিধ শ্রেণীর লোক আছে, বৃক্ষাদির মধ্যেও তদ্রূপ দৃষ্ট হয়। অহৈতুকী ভক্তি-প্রণোদিত সশক্তিক-হরিনাম শ্রবণ করিলে, সাত্ত্বিক মনুষ্যের ন্যায় সত্ত্বগুণপ্রধান বৃক্ষাদিরও আনন্দরস উথলিয়া উঠে, এবং তখন তাহারা পুষ্পবর্ষণ, মধুবর্ষণ প্রভৃতি প্রণালীতে ঐ আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে। এই মধুবর্ষণ যে কেবল এই বৃক্ষ হইতেই হইল এমন নহে; অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবে যে, হরিনামধ্বনি যতদূর পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে, সেই সীমার মধ্যে সত্ত্বগুণ-প্রধান সকল বৃক্ষেই এইরূপ ঘটিয়াছে।" বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছিল। এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে, গোস্বামী প্রভুর স্বীয় বাসগৃহের সংলগ্ন দুইটী নিম্ববৃক্ষ হইতে মধু অজস্র বর্ষিতে লাগিল, এবং আশ্রমসমীপস্থ অন্যান্য স্থানের কোন কোন বৃক্ষ হইতেও ঐরূপ মধুবর্ষণ লক্ষিত হইল।

এতদুপলক্ষে তিনি আরও বলিলেন, "শ্রীবৃন্দাবনে একটী নিম্ববৃক্ষ হইতে এইরূপ মধুধারা নিঃসৃত হইতে আমি দেখিয়াছি। এই বৃক্ষমূলে একজন অকিঞ্চন ভগবদ্ভক্ত ভজন করিতেছেন। এই সকল ঘটনা সাধারণের নিকট অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। শাস্ত্রাদিতে ইহার উল্লেখ আছে এবং প্রকৃত উপাসনার স্থানে এইরূপ ঘটনা সচরাচরই ঘটিত। * আমাদিগের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়ার একটি মন্ত্র এইরূপ :—

---

* বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ
প্রণতভার বিটপা মধুধারাঃ
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩৫।৫)

"ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তু সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধী মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ
পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তুনঃ পিতা মধুমান্নো
বনস্পতি র্মধুমাংস্তু সূর্য্যো মাধ্বীগাবো ভবন্তুনঃ।"

অর্থাৎ 'বায়ু মধুবহন করিতেছে, নদীসমূহ মধুক্ষরণ করুক, আমাদের ওষধিসমূহ মধুময় হউক, রাত্রি, উষা, পার্থিব রজঃ মধুমান্ হউক, দ্যুলোক, পিতৃলোক, বনস্পতি, সূর্য্য এবং আমাদের গাভী সমূহ মধুময় হউক।' এইমন্ত্র রূপক নহে, শ্রাদ্ধক্রিয়া যথাশাস্ত্র সম্পন্ন হইলে, ক্ষণকালের জন্য সমস্ত মধুময় হয়, তাহাতে প্রেতাত্মা তৃপ্তিলাভ করেন।"

বৃক্ষগণ পুষ্পবর্ষণ করিয়া যে আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে তাহার প্রমাণ গোস্বামী প্রভুর চাচুড়তলায় অবস্থিতিকালে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের সময়ে পুষ্পবর্ষণ। হিন্দুশাস্ত্রাদিতে এইরূপ পুষ্পবর্ষণসম্বন্ধে ভূরি ভূরি ঘটনার উল্লেখ আছে; কিন্তু হায়! আজ কাল শিক্ষাভিমানী নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেরই নিকট উহা রূপক বলিয়া গণ্য হয়। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, জড় বৈজ্ঞানিকের স্থূল ক্রিয়াফলের অতিরিক্ত অন্য কিছু যে বুঝিবার কি জানিবার বিষয় আছে, তাহা আমরা একবার চিন্তাও করিয়া দেখি না। সৎসঙ্গ লাভ হইলে—আধ্যাত্মিক জগতে কিঞ্চিৎ প্রবেশ করিতে পারিলেই, যাহা এখন অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ও খেয়াল বলিয়া উড়াইয়া দেই, তৎসমুদয়ের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী ও প্রচলিত আচারব্যবহারের দোষে লোকের হৃদয় সংশয় অবিশ্বাসাদি ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে এবং সহানুভূতির ক্ষমতা ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছে। লৌকিকবিজ্ঞানে অলৌকিক-তত্ত্ব কি প্রকারে প্রকাশ করিবে? সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়গ্রাম অসীমকে কি প্রকারে ধারণা করিবে? শরীর ক্ষণবিধ্বংসী, কিন্তু মানবাত্মা অমর ও চিরস্থায়ী।

হায়!" চিরদিনের পথের সম্বল সঞ্চয় না করিয়া, আমরা এই ক্ষণভঙ্গুর দেহের জন্য সুখান্বেষণে ব্যস্ত হইয়া, দুঃখের পর দুঃখে, নিরাশার পর নৈরাশ্যে এবং অশান্তির পর অশান্তিতে ডুবিয়া ক্লেশ পাইতেছি, তবুও আমাদের চৈতন্য হয় না! মহাপুরুষগণ একবার এই অধঃপতিত জীবগণের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন। সৎপুরুষের কৃপা আমাদের উপর বর্ষিত হউক, এবং আমাদের এই তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে সত্যধর্ম্মের সুবিমল জ্যোতিঃ উদ্ভাষিত হউক।

আশ্রমস্থ ভজনকুটীরের গর্ত্তের মধ্যে একটী সর্প বাস করিত। গোস্বামী প্রভু তাহাকে দুগ্ধ কলা প্রভৃতি আহার্য্য বস্তু প্রদান করিতেন। সর্পটী সময় সময় তাঁহার জটা অবলম্বন করিয়া স্কন্ধে ও মস্তকের উপর আরোহণ করিয়া পুনর্ব্বার আপনা আপনি নামিয়া যাইত। অনেকেই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই সর্প কদাচ কাহারও কোন অনিষ্ট করে নাই। শুনিয়াছি, ইনি একজন উচ্চস্তরের ফকির ছিলেন, সর্পদেহ ধারণ করিয়া সাধনভজনের জন্য ঐ স্থানে বাস করিতেন। *

গভীর রাত্রে দুইটী কোলাব্যাঙ্ গোস্বামী প্রভুর ভজন কুটীরে উপস্থিত হইত এবং এক প্রকার অব্যক্ত শব্দ করিয়া গলা ফুলাইতে ফুলাইতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া সমাধিস্থের ন্যায় পড়িয়া থাকিত। রাত্রি প্রভাত হইবার কিয়ৎকাল পূর্ব্বেই আবার ধীরে ধীরে স্বস্থানে প্রস্থান করিত। +

আশ্রমে একটী কুকুর ছিল। আশ্রমবাসীরা তাহাকে "কেলে" বলিয়া ডাকিতেন। সে কীর্ত্তন শুনিতে অতিশয় ভালবাসিত। সে যেখানেই থাকুক, কীর্ত্তন আরম্ভ হইলেই সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত

* স্বর্গীয় শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয়ের মুখে শ্রুত।

+ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয়ের মুখে শ্রুত।

হইত এবং অনেক সময় কাঁপিতে কাঁপিতে কীর্ত্তনের মধ্যে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যাইত। এই সময় তাহার কর্ণমূলে হরিনাম উচ্চারণ না করিলে কিছুতেই আর চৈতন্য হইত না। কুকুরটীর একটী বিশেষ গুণ ছিল যে, আশ্রমে যত অতিথি অভ্যাগত উপস্থিত হইতেন, নিতান্ত পরিচিতের ন্যায় সে সকলেরই নিকটে উপস্থিত হইত ও লেজ নাড়িয়া আনন্দ প্রকাশ করিত। এমন কি, বিদায়ের কালে তাঁহাদিগকে দোলাইগঞ্জ ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসিত। দিবাভাগে অথবা রাত্রিতে কখনই তাহাকে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে দেখা যায় নাই। কোন কোন সময় কুকুরটী গোস্বামী প্রভুর আসনের কিছু দূরে স্থিরভাবে বসিয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টি করিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিত। এই দৃশ্য যিনিই দেখিয়াছেন তিনিই অবাক্ হইয়া গিয়াছেন। একদিন কুকুরটীর এই অবস্থার প্রতি গোস্বামী প্রভুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে তিনি করুণস্বরে বলিলেন—"কালু, আমাকে মিনতি করিলে কি হইবে? তোমার এ জন্ম এইরূপে কাটাও, পর জন্মে উদ্ধার পাইবে, এখন হইবে না।" আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কুকুরটী এই কথা শুনিয়া 'ভেউ ভেউ' করিয়া রোদন করিতে লাগিল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া দরদর ধারে জল পড়িতে লাগিল। ইহাকে কেহ কখনও মাংস খাইতে দেখে নাই। এই সকল গুণে সকলেই কুকুরটীকে অতিশয় আদর ও যত্ন করিত এবং দেহান্তে আশ্রমবাসীরা আশ্রমের এক প্রান্তে তাহার দেহ সমাধিস্থ করিয়া রাখিয়াছেন।

গেণ্ডারিয়া আশ্রমে একটী কামধেনু ছিল। সকলে তাহাকে "রাণী" বলিয়া ডাকিতেন। গাভীটী কখনও গর্ভধারণ করে নাই অথচ প্রয়োজনমত দোহন করিলেই অল্প পরিমাণ দুগ্ধ প্রদান করিত। কামধেনুর একটী বিশেষ গুণ ছিল যে, কেহ কোন দুরভিসন্ধি লইয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেই সে তাহাকে তাড়া করিত। এক সময় একটী কীর্ত্তনের দল জানি

না কি অভিপ্রায়ে কীর্ত্তন করিতে করিতে আশ্রমে প্রবেশ করিতেছিল। কিন্তু কীর্ত্তনের ধ্বনি আশ্রমস্থ সকলের নিকটেই অত্যন্ত অপ্রীতিকর বোধ হইলেও কেহ তাহাতে বাধা দিতে পারিতেছিলেন না, এমন সময় রাণীগাভী পুচ্ছ ঊর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক দড়ি ছিঁড়িয়া গর্জ্জন করিতে করিতে কীর্ত্তনের দলের মধ্যে গিয়া পড়িলেই কীর্ত্তন বন্ধ হইয়া গেল।

অপর একদিন কোথা হইতে একটী লোক আশ্রমে উপস্থিত হইলে, রাণী তাহাকে পুনঃ পুনঃ তাড়া করিতে লাগিল। তিনি ভীত হইয়া আশ্রমস্থ কোন গৃহে প্রবেশ করিলেন। লোকটী চলিয়া গেলে গোস্বামী প্রভু বলিলেন—"রাণীগাভীর পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি আছে। এই লোকটী পূর্ব্বজন্মে কসাই ছিল, রাণী তাহা অবগত হইয়া তাহার গোজন্মের সংস্কারবশতঃ উহার প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়াছিল।"

এই স্থানে একবার গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য বিক্রমপুরের অন্তর্গত টেঁউরিয়া নিবাসী ৺রাজকুমার দত্ত মহাশয় তদীয় কঠিন রোগগ্রস্ত ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গোস্বামী প্রভুর নিকটে আশ্রমে উপস্থিত হন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে ভ্রাতুষ্পুত্রের রোগারোগ্য কামনায় বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকটে গিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় অনেক সময় চিকিৎসক-গণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অনেক দুরারোগ্য রোগীকে যোগবলে রোগমুক্ত করিয়া দিতেন। কিন্তু এইবার তিনি কি জানি কি ভাবিয়া তাহাদিগকে গোস্বামী প্রভুর নিকটে প্রেরণ করিলেন। তদনুসারে তাঁহারা গেণ্ডারিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। গোস্বামী প্রভু তখন স্বীয় আসনে বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। এমন সময় রোগী ধীরে ধীরে নিকটে গিয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। চরণ স্পর্শ করিবামাত্র গোস্বামী প্রভুর ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি রোগীর অতিশয় শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে পুনঃপুনঃ তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে

গোস্বামী প্রভুর গুরুদেব মানস-সরোবরবাসী পরমহংসজী অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া আরক্তলোচনে গোস্বামী প্রভুকে বলিলেন—"এ কি করিতেছ? তুমি এইরূপে রোগারোগ্য করিতে থাকিলে তোমার নিকটে কেহই ধর্ম্ম চাহিবে না।" গোস্বামী প্রভু সলজ্জ-ভাবে উত্তর করিলেন—"রোগীর কাতরতা দর্শন করিয়া তাহার রোগ দূর করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল মাত্র কিন্তু কোনরূপ শক্তি প্রয়োগ করি নাই।" পরমহংসজী বলিলেন—'তোমার সকরুণ-দৃষ্টিতেই উহার রোগ আরোগ্য হইবে। কিন্তু সাবধান বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন পুনরায় কখনও ঐরূপ কার্য্য করিও না।'

শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবীর শ্রীবৃন্দাবনধামপ্রাপ্তির পর, গোস্বামী প্রভু তথায় একটি সর্ব্বজনহিতকর প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন। কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এই সময়ে গোস্বামী প্রভুর নিকটে প্রকাশিত হইয়া, তদীয় গেণ্ডারিয়া আশ্রমে যোগমায়া দেবীর অস্থি সমাধিস্থ-করতঃ তদুপরি মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক শ্রীশ্রীনাম-ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা এবং তাঁহার পূজা প্রচার করিতে আদেশ করেন। নাম-ব্রহ্মের প্রতিনিধি কি, ইহা জিজ্ঞাসা করায়, নিম্নলিখিত অক্ষর কয়েকটী গোস্বামী প্রভুর নিকটে স্বর্ণাক্ষরে আকাশে প্রকাশিত হইয়াছিল। যথা :—

ওঁ হরিঃ।

নাম-ব্রহ্ম।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

৺নাম-ব্রহ্ম পূজার প্রত্যাদেশপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আরও বলিয়াছিলেন যে, "নাম ব্রহ্মই কলির একমাত্র দেবতা। এই নাম-ব্রহ্ম-পূজা এবং আচার্য্যপূজাই কলিতে ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। সময়ে

ইহার এমনই প্রভাব হইবে যে, তাহাতে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোড়িত হইবে।”

গেণ্ডারিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গোস্বামী প্রভু একদিন উপস্থিত শিষ্য-মণ্ডলীর নিকটে উক্ত প্রত্যাদেশ ব্যক্ত করিয়া পূজার উপকরণ শঙ্খ, ঘণ্টা, পঞ্চপ্রদীপাদি ক্রয় করিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। উপকরণাদি আনীত হইলে, তিনি স্বহস্তে নাম-ব্রহ্মের একখানি পট অঙ্কিত করিয়া সাধনকুটীরে স্থাপনপূর্ব্বক প্রত্যহ তুলসী চন্দনাদি দ্বারা তাহার পূজা ও আরতির আদেশ করিলেন। তদবধি প্রত্যহ নাম-ব্রহ্মের পূজা ও আরতি হইতে লাগিল। আরতির সময় সাধারণতঃ নিম্নলিখিত গানটী গীত হইত। যথা :—

কীর্ত্তনের সুর—ঝং।

ভালি গোরাচাঁদের আরতি বনি।
বাজে সংকীর্ত্তন সুমধুর ধ্বনি॥
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে, বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল॥
বিবিধ কুসুম ফুলে বনি বনমালা।
কত কোটি চন্দ্র জিনি বদন উজালা॥
ব্রহ্মা আদি দেব যাকো করযোড় করে।
সহস্রবদনে ফণী শিরে ছত্র ধরে॥
শিব শুক নারদ বেদ বিচারে।
নাহি পারাপার ভাব ভরে॥
শ্রীনিবাস হরিদাস মঙ্গল গাওয়ে।
গদাধর নরহরি চামর ঢুলাওয়ে॥

বীরবল্লভদাস শ্রীগৌরচরণে আশ।
জগভরি রহল মহিমা প্রকাশ ॥

অতঃপর আশ্রমস্থ আম্রবৃক্ষের নীচে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া, বাঙ্গালা ১২৯৮ সালের আশ্বিন মাসে মহাষ্টমী তিথিতে মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবীর অস্থি (যাহা গোস্বামী প্রভু ইতঃপূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবন হইতে সঞ্চয়পূর্ব্বক তাহার কতকাংশ হরিদ্বারে গঙ্গাসাৎ করিয়া অবশিষ্টাংশ সঙ্গে আনিয়াছিলেন তাহা) সমাধিস্থ করিয়া তদুপরি যথাশাস্ত্র মঙ্গলঘট স্থাপনপূর্ব্বক ৺ নাম-ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তদবধি এই আশ্রমে শঙ্খ, ঘণ্টা, খোল, করতালের ধ্বনির সহিত, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি উপকরণ দ্বারা ৺ নাম-ব্রহ্ম পূজিত হইয়া আসিতেছেন। গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান্ ফণিভূষণ ঘোষ মহাশয়ের উপর এই নাম-ব্রহ্ম পূজার ভার অর্পিত হইলে, তিনি ব্রাহ্মণ নহেন বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। তদুত্তরে গোস্বামী প্রভু বলিয়াছিলেন যে, "শাস্ত্রানুসারে নাম-ব্রহ্মের পূজায় জাতি কিংবা বর্ণ বিচারের আবশ্যকতা নাই। ইঁহার নিকটে নিবেদিত অন্ন মহাপ্রসাদের তুল্য; তাহা হীনবর্ণের লোক দ্বারা অর্পিত অথবা স্পৃষ্ট হইলেও, ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের গ্রহণীয়, কেহ অবজ্ঞা করিলে তাহাকে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়।" এই বলিয়া মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে যে এই পূজাবিধির উল্লেখ আছে তাহা প্রকাশ করিলেন।* নাম-ব্রহ্ম পূজার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে অন্যান্য বিগ্রহাদি পূজার ন্যায় সেবাপরাধের সম্ভাবনা নাই। এ সম্বন্ধে গোস্বামী প্রভুর

---

* মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ৩য় উল্লাস।—শ্রীসদাশিব উবাচ :—
"অনেন ব্রহ্মমন্ত্রেণ ভক্ষপেয়াদিকঞ্চযৎ।
দীয়তে পরমেশায় তদেব পাবনং মহৎ॥

উপদেশ এইরূপ:—"ভক্তিই নাম-ব্রহ্ম পূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। ভক্তিপূর্ব্বক দিনান্তে একটী প্রণাম করিলেও ইহার পূজা হয়। কোন কারণে মন্দিরের দরজা দুই দিন বন্ধ থাকিলেও ক্ষতি নাই; কিন্তু শ্রদ্ধাহীন বাহ্য লোকদেখান ভাব যেন ইহার মধ্যে প্রবেশ না করে, এই বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। পরম দয়াল নিত্যানন্দ প্রভু দয়াপরবশ হইয়াই দুর্ব্বল কলির জীবের জন্য এই সহজসাধ্য পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।"

এস্থলে প্রত্যাদেশসম্বন্ধে গোস্বামী প্রভু যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করা সঙ্গত মনে হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন—"প্রত্যাদেশ নানা প্রকারে হইয়া থাকে। পরলোকের আত্মা প্রত্যাদেশ করিলে এবং কোন মহাত্মা সূক্ষ্মদেহে আসিয়া উপদেশ করিলে, তাহাকেও প্রত্যাদেশ বলে। কিন্তু প্রকৃত প্রত্যাদেশ ভগবদাদেশ। বিশেষভাবে চিত্তশুদ্ধি না হইলে তাহা শোনা যায় না। ভগবদাদেশ বিবেক নহে, মনের ভাবও নহে। তাহা আত্মাতে শ্রবণ করা যায়। প্রত্যাদেশ সত্য, পতিতপাবন, জ্বলন্ত উৎসাহপূর্ণ, অমর; তাহার সহিত কাহারও অনৈক্য হয় না।

গঙ্গাতোয় শিলাদৌ চ স্পৃষ্টদোষোঽপি বর্ত্ততে।
পরব্রহ্মার্পিতে দ্রব্যে স্পৃষ্টাস্পৃষ্টং ন বিদ্যতে।
নাত্রবর্ণ বিচারোঽস্তি নোচ্ছিষ্টাদি বিবেচনং।
ন কালো নিয়মোপ্যত্র শৌচাশৌচং তথৈবচ॥
যদি শ্বান্নীচজাতীয়মন্নং ব্রহ্মণি ভাবিতং।
তদন্নং ব্রাহ্মণৈর্গ্রাহ্যমপি বেদান্তপারগৈঃ।
যে ত্যাজন্তি নরাঃমূঢ়া মহামায়েন সংস্কৃতং।
অন্নতোয়াদিকং তত্রে পিতৃংস্তে পাতয়ন্ত্যধঃ।"

"প্রকৃত প্রত্যাদেশ জীবনে দুই একটীর অধিক হয় না। 'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ' বুদ্ধদেব এই প্রত্যাদেশ শুনিয়া জগৎকে জাগ্রত করিয়াছেন। 'জীবে দয়া নামে রুচি' আদেশ পাইয়া শ্রীচৈতন্যদেব জগৎকে মত্ত করিয়াছেন। যিশুখৃষ্ট, 'ভগবৎ সেবাতে জীবের উদ্ধার হয়, একজন দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না' এই প্রত্যাদেশ পাইয়া পাশ্চাত্য-জগৎকে মোহিত করিয়াছেন। ঋষিরা যে প্রত্যাদেশ শুনিয়াছিলেন, তাহাই উপনিষৎরূপে বর্ত্তমান। এইরূপে যিনি যে প্রত্যাদেশ শ্রবণ করেন, তাহা ঘরের কোণে লুক্কায়িত থাকে না, জগৎময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। *

গোস্বামী প্রভু যে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাও কালে সমগ্র দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ইতিমধ্যেই তাহার সম্পূর্ণ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। বঙ্গদেশের বহুস্থানে এমন কি সুদূর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলেও নাম-ব্রহ্মের সমধিক আদর দৃষ্ট হইতেছে।

এইস্থানে অবস্থানকালে গোস্বামী প্রভু একবার কঠিন ডবল নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, দুই পার্শ্বের ফুস্‌ফুস্ পচিতে আরম্ভ করিয়াছে, জীবনের আশা অতি কম। এই সময়ে তিনি কোন ঔষধ ব্যবহার করিতেন না, সুতরাং আত্মীয়স্বজন অধিকতর ভীত হইয়া পড়িলেন। এইভাবে ১৪।১৫ দিবস অতীত হইলে, গোস্বামী প্রভু দধি খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু চিকিৎসকগণের কেহই দধি দিতে সম্মত হইলেন না। পরে জনৈক গুরুনিষ্ঠ শিষ্য দধি আনিয়া উপস্থিত করিলে, গোস্বামী প্রভু তাহা অতি তৃপ্তির সহিত ভক্ষণ করিলেন, ইহা দেখিয়া অনেকে হায় হায় করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাহাতেই তিনি রোগমুক্ত হইলেন। পরদিন তিনি

---

* মৌনী অবস্থায় গোস্বামী প্রভুর স্বহস্ত লিখিত উপদেশ। ফরিদপুর, বনগ্রাম নিবাসী ৺ মতিলাল ভৌমিক মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধৃত।

অন্নপথ্য করিলেন। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া একজন চিকিৎসক তাহাকে বলিলেন—"মহাশয়, আপনি বেদবিধির অতীত। আমাদের চিকিৎসা-শাস্ত্র আপনার নিকট পরাস্ত হইয়াছে।"

সাধনপথে অগ্রসর হইবার সময় সাধকের শরীরের রজস্তমোবিশিষ্ট পরমাণু সকল পরিবর্ত্তিত হইয়া, ক্রমে সত্ত্বগুণের পরমাণুতে পরিণত হয়। এই প্রকারে সাধক ক্রমে ভাগবতী তনু লাভ করেন। এই পরিবর্ত্তনের সময় প্রকৃতিভেদে এক এক দেহে এক এক প্রকার ব্যাধির সৃষ্টি হয়। কোন দেহে জ্বরবিকার, কোন দেহে উদরা, কোন দেহে নিউমোনিয়া ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এগুলি ব্যাধিই নয়, সাধন-ঘটিত অবস্থাবিশেষ। এই সকল ব্যাধির পর সাধকদিগের এক একটা নূতন অবস্থা লাভ হয়। এই ব্যাধির পর গোস্বামী প্রভুর নিদ্রা একেবারে অন্তর্হিত হইল। তিনি জীবনের অবশিষ্ট ভাগে আর কখনও নিদ্রা যান নাই। শাস্ত্রে আছে যে, সম্পূর্ণ সত্ত্বগুণবিশিষ্ট পুরুষকে নিদ্রায় অভিভূত করিতে পারে না, এবং যিনি সিদ্ধ হইয়াছেন তিনি নিদ্রা জয় করিতে সমর্থ হন। *

---

* "সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশক মনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞান সঙ্গেন চানঘ॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্
প্রমাদালস্য নিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৪ অ, ৫-৮ শ্লোক।

অপিচ—"সিদ্ধস্য ত্রীণি চিহ্নানি দাতা ভোক্তাপ্যযাচকঃ।
বিপ্র ত্রয়ো রণাজত্বং ভবেন্নিদ্রাজয়স্তথা।
জপধ্যানরতো মৌনী ন খেদ মধিগচ্ছতি॥"

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত নারদ পঞ্চরাত্রের শ্লোক।

১৭ বিলাস, ১৩১ ও ১৩৫ শ্লোক।

এই সময় গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় নারায়ণগঞ্জে সপরিবারে কিছুদিন বাস করিতেছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী পরলোকগতা শ্রীমতী মনোরমা দেবীও গোস্বামী প্রভুর শিষ্যা। ইঁহারা উভয়ে মাঝে মাঝে গোস্বামী প্রভুর সঙ্গে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আসিয়া দেখা সাক্ষাৎ করিতেন। শ্রীমতী মনোরমা দেবী সংসারের নানাবিধ রোগ-শোক, জ্বালা-যন্ত্রণা, অভাব অনটনের মধ্যে পাঁচ ছয়টী সন্তানসন্ততি লইয়া বাস করা সত্ত্বেও সাধনমার্গের যে প্রকার উচ্চাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, সংসারবিরাগী, কৌপিন বহির্ব্বাসধারী, পর্ব্বতগুহাবাসী সন্ন্যাসীদিগকেও সচরাচর সেই অবস্থা লাভ করিতে দেখা যায় না। শ্রীমতী মনোরমা দেবী সময় সময় ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত একাসনে সমাধিস্থ হইয়া উপবিষ্টা থাকিতেন। এই অবস্থায় তাঁহার ক্রোড়ের শিশুকে স্তন্যপান করাইয়া লইতে হইত; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইত না। যখন জননী মনোরমা, ধীর স্থির অটল ভাবে চক্ষু নিমীলনকরতঃ সমাধিস্থা হইয়া ভগবৎসত্তায় ডুবিয়া থাকিতেন, তখন তাঁহার প্রস্ফুটিত কমলসদৃশ সুপ্রসন্ন বদনমণ্ডল যে কি এক অনৈসর্গিক শোভায় অলঙ্কৃত হইত, এ জগতে তাহার তুলনা মিলে না, তাহা দেখিলে নিতান্ত অবিশ্বাসীরও মন ভগবদ্ভাবে বিগলিত হইয়া যাইত।

শ্রীমতী মনোরমা দেবী দেহে থাকিতেই মুক্তাবস্থা লাভ করিয়া, গোস্বামী প্রভুর সাধন-প্রণালীর চিরশান্তিময় অবশ্যম্ভাবী ফলের জীবন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার পরলোকপ্রাপ্তির পর, গোস্বামী প্রভু একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "ইনি (মনোরমা দেবী) ভগবানের বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রেরিত। সংসারের বিবিধ প্রকার অভাব-অনাটনের মধ্যে পতিপুত্রাদি লইয়া বাস করিয়াও যে মানুষ ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হয়, এই মহাসত্যের দৃষ্টান্ত দেখাইতে ইঁনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই

অলোকসামান্যা রমণীর জীবনবৃত্তান্ত "মনোরমার জীবনচিত্র" নামক পৃথক্ গ্রন্থকারে প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং এ বিষয় আমরা অধিক লিখিতে বিরত থাকিলাম।

১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে গোস্বামী প্রভু শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে কলিকাতায় আগমন করিয়া শ্যামবাজারে একটী ত্রিতল বাটীতে কিয়ৎকাল অবস্থান করেন।

এই সময় এক দিবস গোস্বামী প্রভু, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আহ্বানে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য পার্কষ্ট্রীটস্থিত তদীয় ভবনে গমন করেন। এই কার্য্যের জন্য মহর্ষি তদীয় অনুগত ভক্ত শ্রদ্ধেয় প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে গোস্বামী প্রভুর নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় গোস্বামী প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া বলিলেন—"মহর্ষি অত্যন্ত অসুস্থ, চক্ষে কম দেখেন, কাণেও কম শুনেন। আপনি কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন শুনিয়া তিনি আপনাকে একবার দেখিতে অভিলাষ করিয়াছেন। তাঁহার কোন কোন গোপনীয় কথা আপনাকে বলিতে চান।" শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা শেষ হইতে না হইতেই গোস্বামী প্রভু মহর্ষির উদ্দেশ্যে করযোড়ে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"আমার বহু সৌভাগ্য যে তিনি আমাকে স্মরণ করিয়াছেন। কোন্ সময় গেলে তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইবে?" শাস্ত্রী মহাশয় সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য যথা সময় মহর্ষির আলয়ে কতিপয় শিষ্য সমভিব্যাহারে উপনীত হইলেন। গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক মহর্ষির চরণদ্বয় স্পর্শ করিয়া নমস্কার করিবার সময়, কি জানি কি ভাবে অভিভূত হইয়া গোস্বামী প্রভু কাঁদিয়া ফেলিলেন। এতদ্দর্শনে মহর্ষির মুখমণ্ডল রক্তিম হইয়া উঠিল, মস্তক ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি গদ্গদ স্বরে—

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

গোবিন্দায় নমো নমঃ, গোবিন্দায় নমো নমঃ—ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন। অশ্রুজলে তাঁহার গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এই ভাবে কিয়ৎকাল অতীত হইলে উভয়েই ভাব সম্বরণ করিয়া কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিলে, শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু তাঁহাকে এই মন্ত্রে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ বৈষ্ণবগণ স্বীয় ইষ্টদেবতার প্রণামেই এই মন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক্ অতঃপর গোস্বামী প্রভুর সহিত মহর্ষির অনেক ধর্ম্মালাপ হইল। মহর্ষি কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন—"মানুষ যখন কোন উৎকৃষ্ট খাদ্য বস্তু পায়, তখন কেবল নিজে খায় না, অন্যকেও দিয়া খাইতে তাহার ইচ্ছা হয়। তুমিও সেই রূপ যাহা নিজে ভোগ করিতেছ, তাহা তোমার শিষ্যদিগকে দিতেছ। ইহাতে তোমার এক বিন্দুও স্বার্থ নাই। তুমিই সত্য শিষ্যদিগের সন্তাপ-হারক।" অতঃপর মহর্ষি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বোলপুর শান্তিনিকেতনের উৎসবে যোগদান করিবার জন্য সশিষ্য গোস্বামী প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। গোস্বামী প্রভু বলিলেন—"শান্তিনিকেতনের নিয়মাদি যাহাতে অসাম্প্রদায়িক ভাবে সকল সম্প্রদায়ের লোকেই যাইয়া থাকিতে পারেন এবং অবাধে আপনাপন সাধনভজন করিতে পারেন এরূপভাবে করিবেন। শান্তি-নিকেতন যদি সাধু সন্ন্যাসী, ফকির দরবেশাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের সাধক-দিগের শান্তির স্থান হয় তবে দেশের একটা যথার্থ মঙ্গল হয়। অসাম্প্রদায়িক ভাবের আশ্রম কোথায়ও দেখা যায় না। দেশে এটির বড়ই অভাব।" মহর্ষি গোস্বামী প্রভুর কথা শুনিয়া অতীব সন্তুষ্ট চিত্তে বলিলেন—"সাধু

সাধু! যাহাদের হৃদয়ে প্রেম তাঁহাদের কথায় অন্তর স্পর্শ করে। নতুবা কথা উপরে উপরে ভাসিয়া যায়। তুমি যাহা বলিলে, তাহাই ঠিক, তাহাই সত্য। সাধুর কথা এইরূপই হয়। কিন্তু শান্তিনিকেতনের ভার যাঁহাদের উপর রহিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে মতের অনৈক্য রহিয়াছে। তোমার এই উদার ভাব তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।" পরে বলিলেন—"আমার মনের কথা কাহাকেও বলিনা, কেহ উহা বুঝে না। তুমি বুঝ, তাই তোমাকে বলি। ঈশ্বরকে যেমন ভাবে চাই, তেমন ভাবে এখনও পাই নাই। বিদ্যুতের ন্যায় দেখা দিয়া অদৃশ্য হন। প্রাণ আমার ধড়ফড় ধড়ফড় করে।" এই বলিয়া মহর্ষি বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভাব সম্বরণ করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন— "জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না। জ্ঞান কেবল কথার কথা, প্রেমভক্তিই তাঁহাকে পাইবার একমাত্র উপায়। তাহাত আর চেষ্টা-সাধ্য নয়। তাঁরই দয়ায় হয়। 'পুরুষকার' অর্থ শূন্য কথা। তাঁর চরণে নির্ভরই সার।"

অতঃপর গোস্বামী প্রভু মহর্ষির নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করিবার সময় তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন—"আমাকে দয়া ক'রে আশীর্ব্বাদ করুণ।" তদুত্তরে মহর্ষি বলিলেন—"আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারি না, তবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তোমার জয় হউক।" *

মহর্ষির সহিত গোস্বামী প্রভুর বিভিন্ন সময়ের ধর্ম্মালোচনা সম্বন্ধে, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের অন্যতম সহকারী সম্পাদক ৺ শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়

---

* শ্রীযুক্ত কুলদাকান্ত ব্রহ্মচারী মহাশয় প্রণীত সদ্গুরু প্রসঙ্গ নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

"দাসী" পত্রিকায় 'সাধু সমাগম' নামক একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রবন্ধটী যথাযথ উদ্ধৃত করা যাইতেছে, যথা :—

"কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভক্তিভাজন পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় যখন ঢাকানগরীতে অবস্থান করিতেন, তখন প্রয়োজন বশতঃ কলিকাতায় উপস্থিত হইলেই, ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইতেন। আমরা অনেকেই দুই তিনবার গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে মহর্ষিকে দেখিতে গিয়াছি। মহর্ষি একবার গোস্বামী মহাশয়কে দর্শন করিবামাত্র, "ওঁ নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ" ইত্যাদি শ্লোক উচ্চারণপূর্ব্বক পরম সমাদরে গোস্বামী প্রভু ও তাঁহার সংগামী শিষ্যগণকে অভ্যর্থনা করিলেন। গোস্বামী প্রভু তাঁহার চরণে পড়িয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইয়া বলিলেন—"আপনাকে দেখিলে আমার ব্রহ্মদর্শনের ফল হয়, "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।" গোস্বামী প্রভুর শিষ্যগণ মহর্ষির পদস্পর্শ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবিষ্ট হইলেন। প্রেমিকের নিকটই প্রেমিকের প্রাণ খুলিয়া যায়, রসিকের কাছেই রসিকের স্ফূর্ত্তি হয়। সাধু দর্শন করিতে হইলে মানুষ যেন, সাধুর সঙ্গেই সাধু-দর্শনে যায়, জহরি না হইলে রতন চেনে কে? মহর্ষির চৌরঙ্গিস্থ মনোহর উদ্যান বেষ্টিত সুরম্য দ্বিতল গৃহের একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে এই সাধু সমাগম হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে আর একবার যখন আমরা গোস্বামী প্রভুর সঙ্গে গমন করিয়াছিলাম, তখন মহর্ষি আমাদিগকে উপবেশন করাইয়াই উপনিষদের শ্লোক সকল আবৃত্তি করিতে করিতে তিনি আত্মস্থ হইলেন। গোস্বামী প্রভু স্থির দৃষ্টিতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে আপনার ভিতরে ডুবিয়া গেলেন। নিমিলিত নেত্রে উভয়েই কিয়ৎকাল নীরবে রহিলেন। পাছে আমাদের সম্মুখে সাধনের গূঢ় তত্ত্ব সকল প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই জন্যই যেন উভয়ে ধ্যান মগ্ন হইয়া প্রাণে প্রাণে আলাপ

করিতে লাগিলেন ; তখন গৃহটী গম্ভীর নিস্তব্ধতায় পরিপূর্ণ হইল, তাঁহাদের সেই মগ্নাবস্থা দেখিয়া প্রাচীন কালের পূজ্যপাদ ঋষিগণকে স্মরণ হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা পুনর্ব্বার কথা আরম্ভ করিলেন। মহর্ষি গোস্বামী প্রভুকে বলিলেন—"আপনাকে দেখিয়া আমার প্রাণ খুলিয়া গেল।" গোস্বামী প্রভু করযোড়ে বিনীত ভাবে বলিলেন— "আপনিই আমার সকল, আপনার কৃপায়ই আমার শান্তিলাভ হইয়াছে।" মহর্ষি কহিলেন—"ধর্ম্ম প্রচারে অনেক লোকই প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তিনি স্বয়ং যাঁহার হাত ধরিয়া একার্য্যে নিযুক্ত করেন, তাঁহার সমস্ত বাধাবিঘ্ন আপনা হইতেই সরিয়া যায়।" একটু পরে গোস্বামী প্রভুর শিষ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক, মহর্ষি এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—"আপনি যে সকল বীজ বপন করিয়াছেন, আশীর্ব্বাদ করি তাঁহার কৃপায় ইহারা সফলকাম হউক।" মহর্ষি, গোস্বামী প্রভুর দিকে আবার ফিরিয়া বলিলেন—"পূর্ব্বে যে সকল কথা বিশ্বাস করিতাম না এখন নিজের জীবনেই তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমি তাঁহার কাছে যাইতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে বলিলেন—"তুই আরও পবিত্র হ, আরও নির্ম্মল হ, আমার নিত্য সহবাসের উপযুক্ত হইলে আমি তোকে ডাকিব।" তখন মহর্ষিকে প্রশ্ন করা হইল—"আপনি এ সকল কথা কিরূপে শুনিলেন ?" তিনি উত্তর করিলেন—"একটা বাণী শুনিলাম, সে বাণী অতি স্পষ্ট, অতি পরিষ্কার ; সেই বাণী শুনিয়া অবধি আমি তাঁহার ডাকের অপেক্ষা করিতেছি। তিনি আমার চক্ষু কর্ণ আদি, ইন্দ্রিয় সকলই লইয়াছেন, আমি এখন সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হাতের পুতুল। কি খাইব, কি পরিব নিজে কিছুই জানি না।" তিনি যাহা করান তাহাই করি ; তিনি যে দিকে ফিরান, সে দিকেই ফিরি ; আমাকে আর কতদিন এভাবে থাকিতে হইবে কিছুই জানি না, এই কথা বলিতে বলিতে মহর্ষির

প্রশান্ত মূর্ত্তি জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠিল; তাঁহার আরক্তিম শ্রীমুখ কমলে দুই এক বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। প্রভাত কালের প্রস্ফুটিত স্থলপদ্মের উপর শিশির বিন্দু পড়িলে যেরূপ অপূর্ব্ব শোভা হয়, মহর্ষির শুভ্র শ্মশ্রুতে অশ্রুবিন্দু পড়িয়াও সেইরূপ অতুল শোভা ধারণ করিল। গোস্বামী প্রভুর স্বাভাবিক সৌম্যমূর্ত্তি হইতে প্রেমভক্তির সুস্নিগ্ধ রশ্মি বিকীর্ণ হইতে লাগিল; এক অপূর্ব্ব ব্রহ্মজ্যোতি তাঁহার মুখমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিল। আমরা সেই অতুল শোভা, অপূর্ব্ব ভাব, অদ্ভুত প্রেমছবি, প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিয়া চক্ষু সার্থক করিলাম। মহর্ষি গোস্বামী প্রভুর দিকে তাকাইয়া আবার বলিতে লাগিলেন—"আজ আপনাকে অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম, তাঁহার জন পাইলে, তাঁর কথা বলিতে আমার বড়ই উৎসাহ জন্মে। প্রাণের কথা আর কাহাকেই বলি, আর কেই বা বুঝিবে? ভুক্তভোগী না হইলে প্রাণের কথা বুঝিতে পারে না, বুঝিবেই বা কি প্রকারে? আমি নিজেই দেখিতেছি এতদিন যাহা নোট করিয়া রাখিয়াছিলাম এখন তাহা ক্যাশ ভাঙ্গাইয়া নগদ টাকা খাইতেছি।" মহর্ষির কথার মর্ম্ম আমরা এই বুঝিয়াছিলাম যে তিনি শাস্ত্রালোচনা করিয়া বুদ্ধিতে যে সকল তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন, এবং স্মৃতিতে যাহা ধারণা করিয়াছিলেন, অবশেষে সাধন দ্বারা তাহা জীবনে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া অবধি মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে কেবল ধর্ম্মের কথা লইয়া কেহ কখনও ধার্ম্মিক হইতে পারে না; কেবল তত্ত্বালোচনা দ্বারা কেহ কস্মিন্ কালেও তত্ত্বদর্শী হইতে পারে না; ধর্ম্মতত্ত্ব জীবনে সাধন করিতে হয়; ধর্ম্মের কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক জীবনে যাপন করিতে হয়; নতুবা ধর্ম্মজীবন গঠন হয় না। ধর্ম্ম যতদিন যুক্তি তর্কের উপর দাঁড়ায়, ততদিন তাহা লইয়া মানুষ নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। ধর্ম্ম যখন জীবনে ফুটিয়া উঠে, তখনই মানুষ আপনাকে

নিরাপদ জ্ঞান করে। কথার ধর্ম্ম যেমন, অসার ও অস্থায়ী, শুধু ভাবের ধর্ম্মও তেমন মত্ততাপূর্ণ ও অনিত্য; প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার।"

গোস্বামী প্রভুর সঙ্গে মহর্ষির এই শেষ দেখা। ইহার প্রায় দশ বৎসর পরে গোস্বামী প্রভুর আদিগুরু, ব্রাহ্মসমাজের শিরোভূষণ, বঙ্গ আকাশের অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, পরমপিতার আহ্বানে পরমধামে গমন করেন।

অতঃপর ঢাকা হইতে সংবাদ আসিল যে গোস্বামী প্রভুর পুত্রবধূ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত। সংবাদ পাইয়াই তিনি প্রভুপাদ যোগজীবন গোস্বামীকে তাঁহার চিকিৎসার সুবন্দোবস্তের জন্য ঢাকায় প্রেরণ করিয়া, কিয়দ্দিন পরে নিজেও তথায় গমন করিলেন। আসিয়া দেখিলেন রোগিণী রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, জীবনের আশা কম। ইহা দেখিয়া গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য স্বর্গীয় প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার মহাশয় গোস্বামী প্রভুকে বলিলেন যে, রোগিণীর রোগ-যন্ত্রণা আর দেখা যায় না, অতএব শীঘ্র ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা দরকার। তদুত্তরে গোস্বামী প্রভু বলিলেন— "ইনি অনতিবিলম্বে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া উচ্চাবস্থা লাভ করিবেন। কিন্তু এখনও একটু অবশিষ্ট আছে। কোন আত্মীয় লোকের দুর্ব্ব্যবহারে সংসারে ইনি মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিয়াছেন। সেই যাতনার সংস্কার অথবা দাগ এখনও ইহার অন্তর হইতে তিরোহিত হয় নাই। সেই ব্যক্তি ইঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে এবং ইনিও তাঁহাকে ক্ষমা করিলে সর্ব্বপ্রকার সংস্কার হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া মুক্তাবস্থা লাভ করিবেন।" এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় হঠাৎ সেই ব্যক্তি অনুতাপদগ্ধহৃদয়ে রোগিণীর নিকটে উপস্থিত হইয়া, সাশ্রুনয়নে কৃত অপরাধের কথা উল্লেখ করিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন এবং রোগিণীও

অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া তাঁহার প্রার্থনার অনুমোদন-সূচক ভাব ব্যক্ত করিলেন। তখন গোস্বামী প্রভু শ্রদ্ধেয় প্রসন্নবাবুকে বলিলেন—"এখন ইঁহার মুক্তাবস্থা।" এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরেই রোগিণী পরলোকে গমন করিলেন।

অনন্তর গোস্বামী প্রভু স্বীয় গুরুদেবের আদেশে ১২৯৯ সালের রাসপূর্ণিমার দিবস মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া প্রায় এক বৎসরকাল মৌনী ছিলেন। দীর্ঘকাল সাধন ভজনের পর অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাপ সমূহ সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্তই সাধারণতঃ সাধুরা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য মৌনব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে উহা পরিত্যাগ করেন। এতদ্ভিন্ন ইহার অপরাপর প্রয়োজনীয়তাও আছে। এই সময় গোস্বামী প্রভুর নিকটে যে সকল তত্ত্ব প্রকাশিত হইত তাহা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন, এবং তদবস্থায় কেহ কোন প্রশ্ন করিলে, তিনি কাগজে কিংবা অন্য কিছুতে লিখিয়া উত্তর দিতেন। এই সকল প্রশ্নোত্তর অনুগত শিষ্য-মণ্ডলী সংগ্রহ করিয়া যত্নে রক্ষা করিতেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তাহা হইতে অনেকগুলি উপদেশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

গোস্বামী প্রভু মৌনী হইবার কিছুদিন পরে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক, তাঁহাকে উক্ত সমাজের সাধারণ সভার (General Committee) সভ্যপদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তদুত্তরে তিনি তদীয় জামাতা শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মৈত্র মহাশয় দ্বারা যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। উত্তর গোস্বামী প্রভু স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছিলেন ; পত্র এইরূপ :—

"তিনি কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের মতে নাই। যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম। সত্য জানিবার জন্য সকল সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান নিজে করিয়া

জানিতে হইবে! সুতরাং যাগ যজ্ঞ, মালা তিলক, জটাজূট, ভস্ম, ব্রত, উপবাস কিছুই অবজ্ঞা করা যায় না। এজন্য তিনি সকল দলেই যোগ দিতে পারেন। সাধারণ বাহ্যবস্তু জানিতে কত শিক্ষার প্রয়োজন। ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে অধিক শিক্ষার প্রয়োজন। তিনি মৌনী হইয়াছেন, তীর্থাদি ভ্রমণ করেন। সর্ব্বভূতে ভগবানের অধিষ্ঠান দেখিয়া প্রতিমার নিকটে প্রণাম করেন। ভগবান্ বিশেষ প্রয়োজনে অবতীর্ণ হন বিশ্বাস করেন। এই সকল কারণে ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন। এজন্য তিনি বলেন তফাৎ থাকাই ভাল।"

এই সময় সত্যনিষ্ঠ, নিরভিমানী, তীব্র বৈরাগ্যযুক্ত আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম স্বর্গীয় প্যারালাল ঘোষ মহাশয় (ইনি মৌনী বাবা বলিয়া পরে লোক সমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন) দাক্ষিণাত্যের ওঁকারনাথ হইতে স্বীয় সাধনের অবস্থা বিবৃতকরতঃ গোস্বামী প্রভুকে দৈন্য প্রকাশ করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। ইনি এক সময় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য গোস্বামী প্রভুর সঙ্গে কাঁথি গমন করিয়াছিলেন। তথায় এক দিবস কোন সরোবরের একটী প্রস্ফুটিত কমলের উপর "কমলে কামিনী" মূর্ত্তি দর্শন করিয়া গোস্বামী প্রভু ভাবাবেশে সরোবরে ঝম্পপ্রদান করিলে, শ্রদ্ধেয় প্যারী বাবু তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ সময় প্যারী বাবু উক্ত দেবীমূর্ত্তি এবং গোস্বামী প্রভুর তাৎকালিক অবস্থা দর্শনে ও তাঁহার সংস্পর্শে এতদূর বিমোহিত হইয়াছিলেন যে, এই ঘটনার পর হইতেই তিনি সংসারে আরও বিরাগী হইয়া নির্জ্জন তপস্যার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন; এবং অত্যল্পকাল মধ্যে তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতঃ ব্রাহ্মসমাজের ক্ষুদ্র বেষ্টনী অতিক্রম করিয়া নানা তীর্থাদি ভ্রমণ পূর্ব্বক, অবশেষে ওঁকারনাথে উপস্থিত হইয়া কঠোর সাধনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তখনও তিনি গুরুগ্রহণের আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। তাঁহার

পত্রের মর্ম্ম এইরূপ :—"তিনি সাধনপথে অনেক অগ্রসর হইয়াছেন, আহারের পরিমাণ অত্যন্ত হ্রাস করিয়াছেন, মৌনী হইয়াছেন, আসন স্থির করিয়াছেন—ইত্যাদি ; কিন্তু তিনি যে ব্রহ্মবস্তু প্রাপ্ত হইবার জন্য এত কঠোরতা করিতেছেন তাহা তাহার লাভ হয় নাই। সুতরাং কি উপায়ে তিনি সেই পরাৎপর পরব্রহ্মকে লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, তাহার সদুত্তর যেন গোস্বামী প্রভু দয়া করিয়া প্রদান করেন—ইত্যাদি।" গোস্বামী প্রভু শ্রদ্ধেয় প্যারী বাবুকে তাঁহার পত্রের যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন নিম্নে তাহার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"বাহিরের ধর্ম্ম লাভের জন্য যাহা প্রয়োজন সমস্তই হইয়াছে। সাক্ষাৎভাবে জীবন্ত সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত না হইলে পিতার দর্শনে অধিকার জন্মে না। ধ্রুব পঞ্চম বৎসরের শিশু, বনে বনে 'পদ্মপলাশলোচন' 'পদ্মপলাশলোচন' বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন, তথাপি গুরুকরণ না হওয়া পর্য্যন্ত দর্শন পাইলেন না ; ঈশা জন্‌দি ব্যাপটিষ্টের নিকট দীক্ষিত, শ্রীচৈতন্য ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষিত। আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি গুরুকরণ ভিন্ন ব্রহ্ম দর্শন হয় না। আহার যাবে, নিদ্রা যাবে, মৌনীও হইবেন, লোকে সাধু বলিয়া ভক্তি করিবে, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত বস্তু লাভ হইবে না। যদি ব্রহ্মদর্শন করিতে চান তবে অন্তরের পূর্ব্ব সংস্কার দূর করুন। কি সত্য, কি অসত্য, তাহা আপনি জানেন না। এখনও সেই পূর্ব্বের শিক্ষাকে সত্য মনে করিতেছেন। উহা সত্য নহে। ব্রহ্মদর্শনে প্রকৃত জ্ঞান যখন উজ্জ্বল হইবে, তখন এক একটী সত্য জানিতে পারিবেন। গুরু করিয়া যখন সমস্ত বাসনা দূরীভূত হয় তখন ঐ দর্শন পাওয়া যায়। অন্তরে যে বাসনা আছে তাহা পাইবেন, ব্রহ্ম পাইবেন না। ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতি বাসনাও ছাড়িতে হইবে। নিজের ইচ্ছায় কোন কার্য্য করিবেন না ; যতক্ষণ নিজের ইচ্ছা আছে ততক্ষণ ব্রহ্ম মহাবল অনেক দূরে।

"আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। মানুষ নিজের চেষ্টায় যতদূর করিতে পারে আপনি তাহা করিয়াছেন; এখন গুরুকরণ ভিন্ন অগ্রসর হইতে পারিবেন না।

"ভগবান্ সমস্ত কার্য্য নিয়মে করেন। বাহ্য জগতের কোন কার্য্য যেমন অনিয়মে চলে না, সেইরূপ অন্তর্জগৎও নিয়ম ভিন্ন চলে না। ব্রহ্ম দর্শনের পক্ষে সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ অব্যর্থ নিয়ম। আপনাকে বড় ভাল বাসি, এইজন্য এত লিখিলাম।"

ইহার কিয়ৎকাল পরে গোস্বামী প্রভু যখন কুম্ভমেলা দর্শনার্থ প্রয়াগে অবস্থান করিতেছিলেন তখন শ্রদ্ধেয় প্যারী বাবু, তাঁহার ভ্রাতা এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জামাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল ঘোষ মহাশয়কে একখানি পত্র লিখেন। পত্রের মর্ম্ম এইরূপ:—

"তুমি সংসার সম্পর্কে আমার ভ্রাতা, তোমার নিকট আমার একটী শেষ ভিক্ষা। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, আত্মশক্তিতে আমি আর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। এখন গুরুর আবশ্যক। সকলকে বিশ্বাস করিতে পারি না, তাই আমি ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে গুরুত্বে বরণ করিয়াছি। কিন্তু আমি পঙ্গু, কোথায়ও যাইতে পারি না। তিনি যদি দয়া করিয়া একবার ওঁকারনাথে আসিতে পারেন তবে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। তুমি আমার এই সংবাদ তাঁহাকে জানাবে। সকলকে আত্মসমর্পণ করা যায় না। তাঁহার ন্যায় বিশ্বাসী সাধু আর কোথায় পাইব?—ইত্যাদি।"

শ্রদ্ধেয় কুঞ্জবাবু এই পত্র গোস্বামী প্রভুকে প্রদান করিবার জন্য শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করেন। তিনি প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া এই পত্র গোস্বামী প্রভুকে প্রদান করেন। পত্র পাইয়া গোস্বামী প্রভু ওঁকারনাথ যাইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া-

ছিলেন। যাত্রার আয়োজনও হইয়াছিল, কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে যাত্রা স্থগিত করিলেন। তখন তাঁহার কার্য্যকলাপে এই ভাব প্রকাশ পাইল যেন কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে আর যাইবার প্রয়োজন নাই। আমরা বিশ্বাস করি গোস্বামী প্রভু এই সময় সূক্ষ্মদেহে ওঁকারনাথ গমন করিয়া প্যারীবাবুকে দীক্ষা প্রদান করিয়া ছিলেন। শ্রদ্ধেয় প্যারী বাবু ইহার পর এক বৎসর জীবিত ছিলেন কিন্তু আর কখনও গোস্বামী প্রভুকে পত্র লিখেন নাই। ইহা দ্বারা ও প্রমাণিত হয় যে তাঁহার গুরু গ্রহণের আকাজ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছিল।

অতঃপর গোস্বামী প্রভুর মাতৃদেবী শ্রীযুক্তেশ্বরী স্বর্ণময়ী দেবী পরলোক গমন করেন। দেহত্যাগ করিবার কিয়ৎকাল পরে তদীয় পিতৃপুরুষ গোস্বামী প্রভুর নিকট প্রকাশিত হইয়া, তাঁহাকে গঙ্গাতীরে গমনপূর্ব্বক যোগজীবন গোস্বামী মহাশয় দ্বারা তাঁহার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া গোস্বামী প্রভু কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক ৯০।৫ নং মেছুয়া বাজার রোডস্থিত সোমরা নিবাসী শ্রদ্ধেয় হরিনারায়ণ রায় মহাশয়ের বাসাবাটীতে উপস্থিত হইলেন। ইঁহার পরিবারস্থিত প্রায় সকলেই গোস্বামী প্রভুর শিষ্য। এই বাটীতে থাকিয়া গোস্বামী প্রভু শ্রীমৎ যোগজীবন গোস্বামী মহাশয়ের দ্বারা যথাশাস্ত্র স্বীয় মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া নিজে উক্ত কার্য্যের অধিকারী ছিলেন না; কিন্তু গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া মাতৃদেবীর উদ্দেশ্যে তিন অঞ্জলি গঙ্গাজল প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার মাতৃদেবী দিব্যদেহে আবির্ভূতা হইয়া তৎপ্রদত্ত জল গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং এতদ্ভিন্ন অপরাপর সময় পারলৌকিক তত্ত্বাদি সম্বন্ধে যে সকল কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা গোস্বামী প্রভুর স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি যথা :—

"মাতা ঠাকুরাণীর মৃত্যুর পর পিতৃলোক মাতৃলোকদিগের সহিত আসিয়া বলিলেন যে একাদশ দিবসে যোগজীবন তাঁহার শ্রাদ্ধ করিবে অর্থাৎ তাঁহার নামে দ্রব্যাদি উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও দুঃখীদিগকে দান করিবে। অপরপক্ষে গয়ায় গিয়া পিণ্ড দান করিবে। অপরপক্ষ আশ্বিন মাসে। দান যথাসাধ্য। কি কি দান করিবে? তণ্ডুল, বস্ত্র জলপাত্র, ফল মূল, খাদ্যবস্তু—ইত্যাদি। মাতার মৃত্যুতে অনেক তত্ত্ব প্রকাশ হয়। মৃত্যুর তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে আত্মা দেহ হইতে বাহির হইয়া ঘরের মধ্যে অতি কষ্টে ঘুরিতে থাকে। ঘর হইতে বাহিরে আসিলে আত্মা ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করে। তখন তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ আসিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করেন। যদি পুণ্যাত্মা হয়, পিতৃলোক অথবা মাতৃলোক লইয়া যায় এবং তাঁহাকে লইয়া এক বৎসরকাল আনন্দ করে। এই এক বৎসর পরে তাহার যেরূপ কর্ম্ম সেইরূপ অবস্থা লাভ করে। এই এক বৎসর শ্রাদ্ধের ফলভোগ করে। পাপাত্মা হইলে এই এক বৎসরের উৎকট পাপ যন্ত্রণা ভোগ করে। এইরূপ অনেক কথা মাতা জানাইতেছেন। ইহা আমার পক্ষে আনন্দজনক ঘটনা।" *

শ্রাদ্ধের দিন গৃহের সন্নিকটস্থ ময়দানে প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া শ্রীযুক্ত মুকুন্দ দাসের কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনের মধ্যে গোস্বামী প্রভু মহাভাবে বিভোর হইয়া –

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

'জয় শচীনন্দন! জয় শচীনন্দন! জয় পদ্মাবতী কুমার! কলির জীবের আর ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই"—ইত্যাদি বাক্য এমন গম্ভীর-

* ঢাকা কুলচরিত্র নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দে মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধৃত।

স্বরে, এমন গদগদ ভাবে মুহুর্মুহু উচ্চারণ করিতে লাগিলেন যে, উপস্থিত জনমণ্ডলী তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন,' শ্রীমান্ ললিত নামক একটী ৮।৯ বৎসরের বালক একেবারে কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিল। কীর্ত্তনান্তে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, কাঙ্গালী প্রভৃতিকে পরিতোষ-রূপে ভোজন করান হইয়াছিল।

গোস্বামী প্রভু যখন যে স্থানে অবস্থান করিতেন, মধুলুব্ধ মক্ষিকার ন্যায় দলে দলে ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে ঘেরিয়া বাস করিতেন এবং তাঁহারা সকলেই তাঁহার আলয়ে আহারাদি করিতেন। কিন্তু গোস্বামী প্রভুর আশ্রমের কোন নির্দ্দিষ্ট আয় না থাকিলেও কোথা হইতে কি প্রকারে এতগুলি লোকের ব্যয়াদি নির্ব্বাহ হইত তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই সময় শ্রদ্ধেয় হরিনারায়ণ বাবুর বাড়ীতে গোস্বামী প্রভুর সম্পর্কে কোন কোন দিন প্রায় ৫০।৬০ জন আহার করিতেন, কিন্তু লোক সংখ্যার অনুপাতে তাঁহার আয় অতি সামান্যই ছিল। এই সময় একটী আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হয়। গোস্বামী প্রভুর আগমনে এই পরিবারের সকলেই আনন্দে আত্মহারা, সুতরাং আয় ব্যয়ের হিসাব করিবার অবসর তাঁহাদের অতি কম। ঘরের মেয়েরা চাউলের জালা হইতে উপযুক্ত মত চাউল লইয়া রান্না করিতে আরম্ভ করেন, তারপর বাজার হইতে তরিতরকারী ইত্যাদি যেমন আসিতে থাকে আর অমনি উহার রান্নার ব্যবস্থা হইতে থাকে। গোস্বামী প্রভুর আগমনের ৫।৭ দিন পরে শ্রদ্ধেয় হরিনারায়ণ বাবুর মাতৃদেবী তাঁহার পুত্রবধূদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—জালাতে চাউল আছে কি না? তাঁহারা যখন অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে জালাতে যথেষ্ট পরিমাণে চাউল রহিয়াছে, তখন তাঁহারা অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন; কারণ সপ্তাহ অন্তে তাঁহাদের গৃহে এক মণ করিয়া চাউল আসিত এবং তদ্দ্বারাই ক্ষুদ্র পরিবারে জীবিকা-

নির্ব্বাহ হইত; কিন্তু সশিষ্য গোস্বামী প্রভুর আগমনের পর ৫।৭ দিন পর্য্যন্ত অসংখ্য লোকে আহার করিতেছেন, অথচ চাউল আর ফুরায় নাই! গোস্বামী প্রভু এই সময় মৌনী ছিলেন। তাঁহাকে এই বিষয় জানান হইলে তিনি হুঁ হুঁ শব্দ উচ্চারণ করিয়া সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। এইরূপ আর একটী ঘটনা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক স্বর্গীয় নগেন্দ্র বাবুর বাটীতে সংঘটিত হয়। ঘটনাটী নগেন্দ্র বাবুর সহধর্ম্মিণীর স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা:—"আমাদের গুয়াবাগানের বাসায় গোঁসাই ও ভক্তবৃন্দ আসিয়া উপস্থিত। দিন রাত্রি মহোৎসব চলিল। এক খোড়া দধি দিয়া তিনদিন মহোৎসব চলিল, তথাপি দধি ফুরাইল না। তিন দিন পরে আমার হুঁস হইল! গোঁসাইকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন— "ইহা স্বয়ং মধুসূদন যোগাইয়াছেন, ফুরাবে কেন?" *

স্বীয় মাতৃদেবীর পারলৌকিক কার্য্য সমাধা করিয়া গোস্বামী প্রভু ঢাকায় গমন করেন; এবং কিয়ৎকাল তথায় অবস্থান করিয়া ১৩০০ সালের শ্রাবণ মাসের শেষভাগে পুনরায় কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক সুকিয়া ষ্ট্রীটস্থিত স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থান করেন।

এই স্থানে অবস্থান কালে এক দিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রিয়ভক্ত ৺রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় পরমহংসদেবের তীরোভাবের উৎসবে যোগদান করাইবার জন্য সশিষ্য গোস্বামী প্রভুকে কাঁকুরগাছি যোগোস্থানে লইয়া যান। কিয়ৎকাল পরে কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে এক অপূর্ব্ব ভাবের স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। গোস্বামী প্রভু নৃত্য করিতে করিতে ভূমি হইতে প্রায় অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ ঊর্দ্ধে উঠিয়া কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত শূন্যে থাকিয়াই নৃত্য করিয়াছিলেন।

* শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধৃত।

এই অদ্ভুত ব্যাপার কেহ কেহ প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। * অপর এক সময় হুগলী জেলাস্থিত বাঁশবেড়িয়ার ব্রহ্মমন্দিরের উৎসব উপলক্ষে তথায় কীর্ত্তনের মধ্যে শূন্যে উঠিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। তখন উক্ত মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া মাতঙ্গিনী দেবী এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। কীর্ত্তনান্তে মাতঙ্গিনী দেবী তাঁহার পুত্র শ্রীমান মুনীন্দ্র নাথকে বলিয়াছিলেন—"দেখ্, তোরা কেহ লক্ষ্য করিস্ নাই, আজ কীর্ত্তনে গোস্বামী মহাশয় শূন্যে উঠিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন।" † গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য শ্রদ্ধেয় ৺শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় এক সময় বোলপুরের কোন কীর্ত্তনে, এবং অপর একজন শিষ্য পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময় কীর্ত্তনের মধ্যে কিয়ৎকাল শূন্যে উঠিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। ‡ সংকীর্ত্তনের শিরোমণি শ্রীমন্ মহাপ্রভু অনেক সময় কীর্ত্তনে নৃত্য করিতে করিতে শূন্যে উঠিতেন এইরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার অপ্রকটের পরে ঈদৃশ ব্যাপার আর কেহ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি।

গোস্বামী প্রভু কখনও কোন শিষ্যের মতের স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করিতেন না, পক্ষান্তরে তাঁহাদের সহিত যতটুকু সহানুভূতি দেখাইবার তাহা দেখাইতেন। সামান্য সামান্য ঘটনাতেও তাহা প্রকাশ পাইত। কলিকাতা সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে অবস্থান কালে একদিন পাঠের সময় কতিপয় শিষ্য কোন বিষয় লইয়া নীচের তলায় উচ্চৈঃস্বরে তর্কবিতর্ক করিতে থাকিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিসের

---

* প্রভুপাদ যোগজীবন গোস্বামী মহাশয়ের মুখে শ্রুত।

† শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে শ্রুত।

‡ স্বর্গীয় শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের মুখে শ্রুত।

গোলমাল?” শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন বাবু ও স্বামী দেবপ্রসাদ (দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী) নিকটে ছিলেন। স্বামীজী ঘটনাস্থল হইতে অনুসন্ধান করিয়া আসিয়া বলিলেন—“আমি তাহাদিগকে গোলমাল করিতে নিষেধ করিয়া আসিয়াছি।” তদুত্তরে গোস্বামী প্রভু বলিলেন—“আমি নিষেধ করিতে ত বলি নাই, কারণ জানিতে চাহিয়াছিলাম।”

তিনি মানুষকে কতদূর ভালবাসিতেন, জীবের ক্লেশ তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ বাজিত নিম্নলিখিত ঘটনা কয়েকটী হইতে তাহা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি হইবে।

১। একদিন রাত্রিতে গোস্বামী প্রভু তদীয় অন্যতম সেবক স্বর্গীয় মোহিনী মোহন রায় মহাশয়কে নিকটে আহ্বান করতঃ স্বীয় মস্তকের জটা বাছিয়া দিতে বলেন। তিনি ধীরে ধীরে জটা বাছিতেছেন, এমন সময় এক স্থানের কেশে টান পড়িলে গোস্বামী প্রভু হঠাৎ ‘উহু উহু’শব্দ করিয়া উঠিলেন। তখন শ্রদ্ধেয় মোহিনীবাবু ঐ স্থান লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, তথায় একটী বিষম আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান। গোস্বামী প্রভুকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—“কোন কারণে দেবেন্দ্রের (দেবপ্রসাদ স্বামীর) পিতা পাদুকা দ্বারা দেবেন্দ্রের মস্তকে আঘাত করিয়াছেন তাহা আমার মস্তকেই লাগিয়াছে।” ঘটনাক্রমে তৎপর দিবস স্বামীজী পিত্রালয় হইতে গোস্বামী প্রভুর নিকটে আগমন করিলেন, এবং শ্রদ্ধেয় মোহিনী বাবু প্রমুখাৎ পূর্ব্ব রাত্রের ঘটনা অবগত হইয়া বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরমারাধ্য গুরুদেব তাঁহার ভোগ মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ইহাই ক্রন্দনের কারণ। বলা বাহুল্য যে তাঁহার পিতৃদেব এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে তদীয় কোন আদেশ প্রতিপালিত না হওয়ায় স্বামীজীর মস্তকে বস্তুতই পাদুকাঘাত করিয়াছিলেন।

২। কোন সময় শীত ঋতুতে কাকিনা অবস্থানকালে স্বীয় আসনে

উপবেশন করতঃ গোস্বামী প্রভু অকস্মাৎ কাঁপিতে লাগিলেন। নিকটস্থ সেবকবৃন্দ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কিঞ্চিদ্দূরে অবস্থিত একটী শীতার্ত্ত কম্পমান বালককে দেখাইয়া দিয়া শীঘ্র তাহাকে নিজের গাত্রাবরণ প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে উক্তবস্ত্র প্রদান করিবার পর বালকের শীত নিবারিত হইলে, গোস্বামী প্রভুর শরীরের কম্পও দূর হইল। প্রয়াগ, ঢাকা, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে এইরূপ আরও অনেক ঘটনার কথা তাঁহার সঙ্গীয় শিষ্যগণ অবগত আছেন।

৩। এক সময় মাদারিপুর হইতে জনৈক শিষ্য গোস্বামী প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, স্বীয় গুরুদেবকে দর্শন না করা পর্য্যন্ত জলগ্রহণ করিবেন না, এই সঙ্কল্প করিয়া রাত্রি অনুমান ৩ ঘটিকার সময় ষ্টীমারে আরোহণ করিলেন। পরদিবস সন্ধ্যার সময় ষ্টীমার গোয়ালন্দ পৌছিল। এদিকে ক্ষুধাতৃষ্ণায় তিনি অতীব কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া অতিকষ্টে তাহা সহ্য করিতে লাগিলেন। রাত্রি দশটার গাড়ীতে আরোহণ করিবার পর তিনি ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সময় সময় অজ্ঞাতসারে কোঁকাইতে লাগিলেন, তবুও কিছু আহার করিলেন না। এমন সময় হঠাৎ তাঁহার ক্ষুধাতৃষ্ণা আশ্চর্য্যভাবে অন্তর্হিত হইল, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থের ন্যায় নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। পরদিবস কলিকাতায় পঁহুছিয়া গোস্বামী প্রভুর মাধ্যাহ্নিক আহারান্তে প্রায় ১ ঘটিকার সময় তাঁহার প্রসাদ পাইলেন। ইহার পূর্ব্বে ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা তাঁহার মনেও একবার উদয় হয় নাই। ইহাতে শিষ্যটী কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পূর্ব্বরাত্রের অকস্মাৎ ক্ষুধাতৃষ্ণার অন্তর্দ্ধানের কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় গোস্বামী প্রভুর অন্যতম সেবক শ্রীযুক্ত কুলদাকান্ত ব্রহ্মচারী মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—"দেখ, গত রাত্রে অনুমান ১১ ঘটিকার সময় হঠাৎ গুরুদেব অতীব ক্ষুধার্ত্তের

ন্যায় আমার নিকট হইতে আহার্য্য লইয়া ভক্ষণ করিলেন। অসময়ে তাঁহার ক্ষুধার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে, একটী ছেলে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া ক্লেশ পাইতেছিল। আমি আহার করাতে তাঁহার ক্ষুধা দূর হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া শিষ্যটী তাঁহার গুরুদেবকে অতিশয় ক্লেশ দিয়াছেন বলিয়া অতীব দুঃখিত হইয়া পূর্ব্বরাত্রের সমস্ত কথা প্রকাশ করিলে, শ্রীযুত কুলদাকান্ত অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

৬। কোন সময় গেণ্ডারিয়া আশ্রমে অবস্থান কালে একদিবস গোস্বামী প্রভু অসময়ে প্রচুর আহার করিলে, জনৈক শিষ্য তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিলেন যে, "যে সকল মহাপুরুষ আতিবাহিক দেহে বাস করেন, তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণের মুখে আহার করিয়া থাকেন। ঈদৃশ একজন মহাপুরুষ অদ্য ক্ষুধায় কাতর হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনিই আমার মুখে ভক্ষণ করিয়াছেন।"

প্রকৃত গুরুশিষ্য সম্পর্ক কিরূপ স্বাভাবিক ও মধুর এবং গোস্বামী প্রভু শিষ্যগণকে কি ভাবে দর্শন করিতেন, নিম্নলিখিত ঘটনা কয়েকটী হইতে তাহা কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

১। এক সময় গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য স্বর্গীয় শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গোস্বামী প্রভুকে প্রশ্ন করিলেন—"আপনার প্রতি সঙ্কোচভাব যায় না কেন?" গোস্বামী প্রভু উত্তর করিলেন—"নিজকে যেমন পাপী ভাবেন, আমাকেও তেমনি মনে করিবেন। নন্দ যশোদা গোপালকে যেরূপভাবে দেখিতেন, আমাকে সেইভাবে দেখিবেন। শ্রীমতীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইলে তিনি গর্ব্বিতা হইয়াছিলেন। এই সময়ই শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হন। তৎপর সখীগণ ও শ্রীমতী একত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্য ক্রন্দন করিলে, তিনি প্রকাশিত হইয়া

রাসলীলা করিলেন। তখন সখিগণ শ্রীকৃষ্ণের বামে শ্রীমতীকে দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা, শ্রীমতীও সখিগণের পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া আত্মহারা। সেইরূপ গুরু যদি শিষ্যকে অবজ্ঞা করেন তবে ভগবান্ গুরুকে পরিত্যাগ করেন। গুরু, শিষ্য একত্র হইয়া ক্রন্দন করিলে ভগবান্ প্রকাশিত হন। তখন গুরু, শিষ্যকে ভগবানের বামে দর্শন করিয়া নয়ন সফল করেন এবং শিষ্যও ভগবানের বামে গুরুদেবকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন।"

২। অপর এক সময় জনৈক আগন্তুক, কতিপয় শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া গোস্বামী প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইঁহারা সকলেই কি আপনার শিষ্য?" তদুত্তরে গোস্বামী প্রভু বলিলেন—"আমরা সব একই, আমরা সকলে ধর্ম্মার্থী হইয়া একত্র বাস করিতেছি।" কিয়ৎকাল পরে লোকটী উঠিয়া গেলে গোস্বামী প্রভু পুনরায় বলিলেন—"ভগবানই একমাত্র গুরু। তিনিই একজনের মধ্য দিয়া অপরকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই জন্য গুরু যদি মনে করেন, আমি গুরু আর ইনি আমার শিষ্য তাহা হইলেই গুরুর পতন অবশ্যম্ভাবী।"

গোস্বামী প্রভু শিষ্যদিগের নিকটে সাধারণতঃ যেরূপ পত্র ব্যবহার করিতেন, তাহার উদাহরণ স্বরূপ একখানি পত্র উদ্ধৃত করা যাইতেছে, যথাঃ—

ওঁ হরিঃ।

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার—

আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। পূর্ব্ব পত্র আমার হস্তগত হয় নাই। নিষ্ঠাপূর্ব্বক সাধন করিলে নিশ্চয়ই ফল লাভ হয়। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ হয়। ধর্ম্ম আর কথার কথা থাকে না। কোন বিষয় অনুমান করিয়া লইতে হয় না, সকলই প্রত্যক্ষ।

পত্র লিখুন বা নাই লিখুন ক্ষতি নাই। যাঁহারা সাধন গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা নিকটে। সম্প্রতি ঢাকাতেই আছি, শীঘ্র কোন স্থানে যাওয়া হইবে বোধ হয় না। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

শিরোনামাঃ—

ভ্রাতৃবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়

সমীপে।

নারী-জাতির প্রতি গোস্বামী প্রভু কিরূপ বিশুদ্ধ ভাব পোষণ করিতেন তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য ১৩০৬ সনের ১লা আষাঢ় তারিখের 'ধর্ম্মতত্ত্ব' হইতে একটী ঘটনা উল্লেখ করা যাইতেছে, যথাঃ—"একদিন গোস্বামী মহাশয় পত্নীসহ নির্জ্জনে বাস করিতেছেন, এমন সময় পত্নীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার মুখে জগজ্জননীকে দেখিতে পাইলেন। অমনি তাঁহার ভাবাবেশ উপস্থিত হইল। ধূলিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া তিনি তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। পত্নী একেবারে অবাক্ এবং কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ হইয়া গেলেন। যে স্বামী আপনার পত্নীর মুখে জগন্মাতার আবির্ভাব দর্শন করিয়া মুগ্ধ হন, নারীজাতির সম্বন্ধে তাঁহার কি প্রকার বিশুদ্ধ ভাব হইবে অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। যে পত্নী তাঁহার সঙ্গে বহুবর্ষ যাবৎ বহু ক্লেশ বহন করিয়া পরিশেষে শিষ্যমণ্ডলীতে আদৃত হইয়া সুখী হইলেন, তিনি স্বর্গস্থা হইলেন। কিন্তু তাঁহার স্বামী তৎপ্রতি হৃদয়ের বিশুদ্ধ ভাব রক্ষা করিলেন।" নারীজাতির প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে গোস্বামী প্রভুর উপদেশ এইরূপঃ—"নারীজাতিকে মাতৃ-ভাবে দর্শন করিবে। নারীজাতিকে যত সম্মান করিবে ততই নিজে পবিত্র থাকিবে। যাহাকে সম্মান করি তাহাকে কুৎসিৎ ভাবে দৃষ্টি করা

যায় না। বঙ্গদেশে স্ত্রীজাতিকে সম্মান করা যেন একটা উপহাসের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। যদি বাবুদের বলা যায় যে নারীজাতিকে সম্মান কর, তখনই তাঁহারা 'হো হো' করিয়া হাসিবে। নারীজাতি বিলাসের সামগ্রী নহেন। উত্তর পশ্চিমে স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান আছে। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে স্ত্রীজাতির সম্মান অধিক। তাহাতেই তাঁহাদের মধ্যে সব বীর জন্মগ্রহণ করেন। ইংরাজ কেবল নারীজাতিকে সম্মান করিয়া পৃথিবীর মধ্যে প্রধান জাতি হইল। পুরাণে আছে যেখানে নারীজাতির সম্মান সেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণ বর্ত্তমান। নারীজাতিকে সম্মান করিতেই হইবে, নচেৎ এদেশের কিছুতেই মঙ্গল নাই। এক সতীর (দ্রৌপদীর) অপমানে ভারতবর্ষ এখনও জ্বলিতেছে! *

স্বদেশের জন্য গোস্বামী প্রভুর প্রাণ কিরূপ কাঁদিত, দেশের সর্ব্বসাধারণের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলের জন্য তিনি কত চিন্তা করিতেন, নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে তাহা কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি হইবে।

১। হিমালয় ভ্রমণকালে বরফান প্রদেশে একজন মহাপুরুষ দর্শন করিয়া গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন "এদেশ সকল বিষয়ে দিন দিন হীন হইয়া যাইতেছে, কি উপায়ে ইহার প্রতিবিধান হইতে পারে?" তদুত্তরে মহাপুরুষ বলিলেন—"বীর্য্য রক্ষা ও সত্য প্রতিপালন করিতে পারিলেই এদেশের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন হইবে।" পরবর্ত্তীকালে কোন এক সময় দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে গোস্বামী প্রভু কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"আমাদের দেশে যাঁহারা শিক্ষকতা করেন তাঁহারা যদি ছেলেদের সহিত বিশেষভাবে মিশিয়া, তাহাদিগকে প্রাণ খুলিয়া নিজ জীবনের সমস্ত বিষয় বলিবার

* "উপদেশ মঞ্জরী" হইতে উদ্ধৃত।

সুবিধা দিয়া বীর্য্যরক্ষা ও সত্য প্রতিপালন করিতে অভ্যাস করাইতে পারেন, তাহা হইলে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধিত হয়।”

২। একবার কলিকাতার নিকটস্থ খৈপাড়া নামক স্থানে শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত প্রভৃতি কতিপয় ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির সহিত একত্র হইয়া গোস্বামী প্রভু কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন ছিলেন। এমন সময় কি যেন দেখিয়া তাঁহার ভাবসিন্ধু উথলিয়া উঠিল, প্রেমাশ্রুতে গণ্ডদ্বয় প্লাবিত হইল। তিনি আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবাবেশে অস্ফুটভাষায় কত কি বলিতে লাগিলেন। উপস্থিত সকলে তদ্দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে গোস্বামী প্রভুর ভাব অপসারিত হইলে তিনি বলিলেন—“আজ একটী বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলাম।” ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—“যদি বলিতে বিশেষ আপত্তি না থাকে তবে এখন কি দর্শন করিলেন বলুন।” গোস্বামী প্রভু উত্তর করিলেন—“আজ দেখিলাম মহাপুরুষগণ দেশের দুরবস্থা দর্শনে ব্যথিত হইয়া তাহার কল্যাণ কামনা করিয়া ভগবানের নিকট বিশেষভাবে প্রার্থনা করিতেছেন। এমন সময় ভগবান্ অতি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইলেন। এত উজ্জ্বল প্রকাশ আমি পূর্ব্বে আর কখনও দর্শন করি নাই। তাঁহার প্রকাশে নক্ষত্রসকল উজ্জ্বল, পর্ব্বত সকল কম্পিত ও সমুদ্র উদ্বেলিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাপুরুষদিগের মধ্যে কেহ মূর্চ্ছিত, কেহ আনন্দে নৃত্য, কেহবা উচ্চৈঃস্বরে স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ভগবান্ তাঁহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।”

জীবের দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়াই তিনি তাঁহার কঠোর সাধনলব্ধ ধন অকাতরে যাকে তাঁকে দান করিয়াছিলেন। তিনি একদিবস কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—“নিজের প্রিয়তমা সুন্দরী স্ত্রীকে অন্যকে দান করিতে লোকের হৃদয় বিচ্ছিন্ন হয়। উহা অতিশয় আদরে ও গোপনে রক্ষণীয়া।

সেইরূপ বহু সাধনের ধন এই জিনিষ সাধুরা কাহাকেও দান করেন না, গোপনে রক্ষা করেন।" এই কথা শুনিয়া একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে আপনি এই দেবদুর্ল্লভ বস্তু যাঁকে তাঁকে বিতরণ করিতেছেন কেন?" উত্তরে গোস্বামী প্রভু বলিলেন—"ইহ সংসারে অকথ্য দুঃখ যন্ত্রণা আমি নিজে ভোগ করিয়াছি। ইহা হইতে জগৎ রক্ষা পাইবে এই আশায় সন্তপ্ত ব্যক্তিদিগকে ইহা দান করিতেছি।"

—

জনসমাগম কিসের জন্য ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। কোন আমোদ-প্রমোদের জন্য নয়, ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য নয়, কোন প্রদর্শনীর জন্য নয়, কেবলমাত্র সাধু-দর্শনের জন্য! এরূপ ব্যাপারে এরূপ জনতা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। অযুত অযুত সাধু সন্ন্যাসী, কেহ কুটীরে, কেহ বস্ত্রাবাসে, কেহ ছত্রাচ্ছাদনে, কেহবা সম্পূর্ণ অনাবৃত বসিয়া আছেন। কেহ গৈরিকধারী, কেহ কৌপীন বহির্ব্বাসধারী, কেহবা শুদ্ধ কৌপীন-ধারী; কাহারও গাত্রে কিঞ্চিৎ আচ্ছাদন আছে, কেহবা শুদ্ধ বিভূতি-ভূষিত দীর্ঘ জটাধারী। পুরাণে নৈমিষারণ্যে যে ঋষি-সভার বর্ণনা পাওয়া যায়, এ দৃশ্য তাহা অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহে। এই সাধুদলে মহা পণ্ডিত আছেন, মহাধ্যানী, মহাকর্ম্মী, মহাপ্রেমিক, মহাদাতা—ইত্যাদি সমস্তই আছেন।" * গোস্বামী প্রভু যে দিন শিষ্যদল পরিবেষ্টিত হইয়া—

"নাম-ব্রহ্ম নাম-ব্রহ্ম নাম-ব্রহ্ম বল ভাই।
হরিনাম বিনা জীবের আর গতি নাই॥"

এই সুমধুর নামগান করিতে করিতে নৌ-সেতু পার হইয়া গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী বালুকাপূর্ণ বিস্তীর্ণ মেলাক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, তখন সেই স্থানে মহাভাবের যে এক অপূর্ব্ব স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। গোস্বামী প্রভু যখন ভাবমদিরায় মাতোয়ারা হইয়া হরি-নামের সিংহনাদে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন তখন পৃথিবীতে প্রকৃতই স্বর্গের শোভা দীপ্যমান হইয়াছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুমণ্ডলী কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত বিস্ময়-

* শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রণীত 'প্রয়াগধামে কুম্ভমেলা' নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

বিস্ফারিত-নেত্রে এই নবাগত মহাপুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, না জানি কি ভাবে বিভোর হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিবার জন্য তীব্রবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং তাহাতে এত গণ্ডগোল উপস্থিত হইল যে, সেই ভীষণ জনস্রোতের মধ্যে তাঁহাকে রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে কোথা হইতে একটী জ্যোতিষ্মান, খর্ব্বকায় মহাত্মা সমীপবর্ত্তী হইয়া "আও মেরা প্রাণ" বলিয়া গোস্বাম প্রভুকে আলিঙ্গন করিলেন। মহাভাবের সঞ্চার হওয়াতে ঐ মহাত্মার চক্ষু হইতে অবিরল ধারায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল এবং তাঁহার শরীরে মুহুর্মুহুঃ রোমঝঙ্কারাদি সাত্বিক লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইতে লাগিল। পশ্চিমদেশীয় এই অপরিচিত সাধুর দেহে ঈদৃশ মহাভাবের বিকাশ দর্শন করিয়া গোস্বামী প্রভুর সঙ্গিগণ অতীব বিস্মিত হইয়াছিলেন; কিন্তু আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ক্ষণকাল পরে উক্ত মহাপুরুষ হঠাৎ কোথায় অন্তর্হিত হইলেন কেহ তাহা লক্ষ্য করিতেও পারিলেন না। এইরূপে কীর্ত্তন করিতে করিতে শিষ্যদল-পরিবেষ্টিত গোস্বামী প্রভু স্বীয় পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট তাঁবুতে উপস্থিত হইলেন। কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর এই অপরিচিত মহাত্মার কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—"ইনি আমার গুরুদেব পরমহংস বাবাজী। তোমাদিগকে কৃপা করিয়া দর্শন দিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন।"

গোস্বামী প্রভু আপনাকে মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে আসন স্থাপন করিয়াছিলেন। মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সম্প্রদায়। স্বয়ং নারায়ণ ইহার প্রবর্ত্তক। কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালীর একটী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

নারায়ণ
ব্রহ্মা
নারদ
ব্যাসদেব
শুকদেব
মধ্বাচার্য্য
পদ্মনাভাচার্য্য
নরহরি
দ্বিজমাধব
অক্ষোভ
জয়তীর্থ
জ্ঞানসিন্ধু
মহানিধি
রাজেন্দ্র
জয়ধর্ম্মমণি
বিষ্ণুপুরী
পুরুষোত্তম
ব্যাসতীর্থ
লক্ষ্মীপতি
মাধবেন্দ্রপুরী
ঈশ্বরপুরী
অদ্বৈতপ্রভু

ঈশ্বরপুরী
|
মহাপ্রভু
|
মানসসরোবরবাসী ব্রহ্মানন্দপরমহংস
|
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
|
যোগজীবন গোস্বামী ——ইত্যাদি।
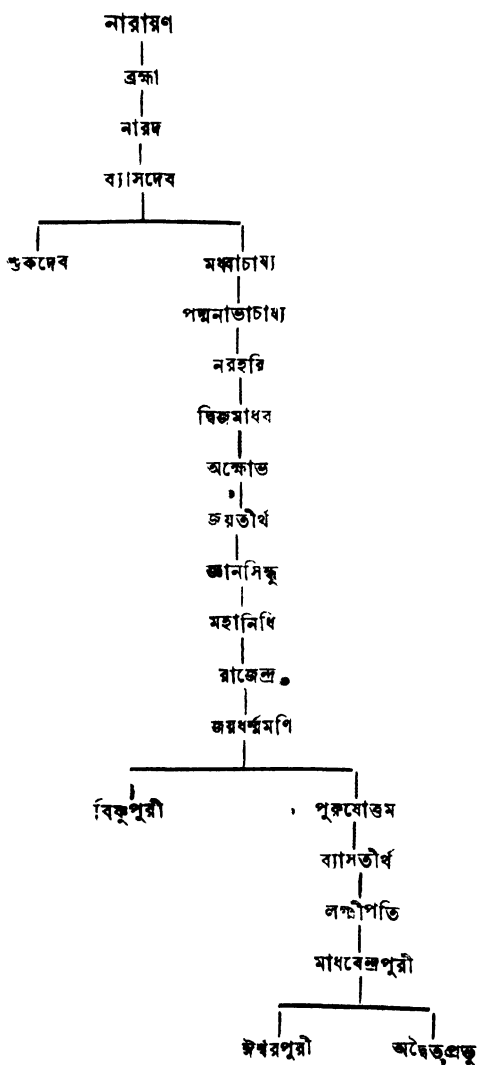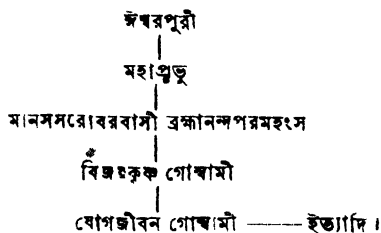
গোস্বামী প্রভুর আশ্রমের ব্যবহারের জন্য গোয়ালিয়রের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী সার দিনকর রাও বাহাদুর একটী প্রকাণ্ড তাঁবু প্রদান করিয়াছিলেন। আশ্রমের দ্বারে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

এই শ্লোকটী বড় বড় অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল, এবং উহার এক প্রান্তে কলিপাবনাবতার "গৌর নিতাইর" মৃণ্ময় বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছিল। যে পর্য্যন্ত গোস্বামী প্রভু মেলাস্থলে অবস্থান করিয়াছিলেন তাবৎকাল পর্য্যন্ত অতীব সমারোহের সহিত প্রতিদিন এই বিগ্রহদ্বয়ের যথারীতি পূজা আরতি, ভোগ রাগ ইত্যাদি সম্পন্ন হইত এবং পূজান্তে কীর্ত্তন হইত। মেলা অন্তে বিগ্রহদ্বয় গোস্বামী প্রভুর আদেশে ত্রিবেণীতে বিসর্জ্জন করা হইয়াছিল।

গোস্বামী প্রভুর আশ্রমের কোন নির্দ্দিষ্ট আয় ছিল না। তিনি বহু দিন হইতেই স্বীয় গুরুদেবের আদেশে আকাশ-বৃত্তি অর্থাৎ অযাচক বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। অযাচিত ভাবে যখন যাহা আসিয়া উপস্থিত হইত তদ্দারাই আশ্রমের ব্যায়াদি নির্ব্বাহ হইত।

কুম্ভমেলায় অবস্থানকালে গোস্বামী প্রভুর আশ্রমের আয় ব্যায়াদি সাধারণতঃ কি ভাবে নির্ব্বাহ হইত তাহা জনৈক দর্শকের স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা :—

"কুম্ভমেলার সময় মেলাক্ষেত্রে ঠাকুরের আশ্রমে কুম্ভমেলায় উপস্থিত হইয়া দেখি এলাহি কারখানা, "দীয়তাং ভোজ্যতাম্" চলিতেছে। বিস্তর লোক আছে, কিন্তু কাহারও কোন কাজ নাই, কপর্দ্দকশূন্য ভিক্ষুকের মত, কেবল প'ড়ে প'ড়ে খাচ্ছেন। ভাত, ডাইল, তরকারী ত বটেই, তার উপর দৈ, দুধ, ক্ষীর, মিঠাই, মণ্ডা; ওদিকে আয়ের ঘরে ফাঁক। কেহ কিছু দিলে খাবেন, নয় উপবাস। সঙ্গে কিছু নিয়ে গিয়াছিলাম, কোন দিক্ হইতে কিছু আয় নাই দেখিয়া দিয়া দিলাম। ভাবিয়াছিলাম হিসাব করিয়া চলিলে দুই চারি দিন চলিবে। খেতে গিয়া দেখি, মিঠাই মণ্ডার ধুম, যাহা দিয়াছিলাম এক দিনেই ফর্শা। দেখিয়া গা জ্বলিয়া গেল, মনে মনে ভাবিলাম, দেখি এখন কি খান। কানপুরের উকিল মন্মথবাবু আসিলেন। তিনিও কিছু দিলেন। পরে ভাবগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়িলেন। আমি তখন ভাবিলাম বেশ হ'য়েছে, দেখি এখন কি খান। যা'র হাতে যা ছিল, সব দিয়ে চুকেছেন। দেখি এখন কোথা থেকে আসে। যেখান থেকে যা আসে, সবতো জানা, তবু অত ক'রে ফেলে ছেড়ে খাওয়া কেন? যাঁহার উপর খরচের ভার, তাঁহার নিকট যাইয়া তত্ত্ব নিলাম, এক কপর্দ্দকও নাই; সকলেরই মন মলিন। মনে মনে ভাবিলাম, মজা হয়েছে। নিজেরও ঐ দশা ভাবিয়া তত সুখ হইল না বটে, তা হউক হরিষে বিষাদ। আমরা সকলেই চিন্তাযুক্ত আছি, এমন সময় দেখি প্রায় ১১ টার সময় একটী ভদ্রলোক দুটী ভারে ক'রে লুচি, মণ্ডা, মিঠাই, দৈ, ক্ষীর, সন্দেশ, নানাবিধ আচার, মোরব্বা একরাস নিয়ে হাজির। তিনি করযোড়ে ঠাকুরকে বলিলেন—'যৎকিঞ্চিৎ সেবার বস্তু আনিয়াছি, অনুমতি হয়ত হাজির করি।' ঠাকুর অনুমতি দিলেন। লোকটি সেবার বস্তু তাঁহার নিকট রাখিয়া, প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। আমি ভাবলাম—আজ যেন হ'লো, কাল ত আর এমনটী হবে না। পরদিন

আবার সকলে ভাব্‌ছেন। কোথা হ'তেও খরচপত্র কিছু আসে না, কি হবে! দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেলা ১১টা হ'লো। আমি মনে মনে খুব তামাসা দেখ্‌ছি, আজ মিঠাই মণ্ডা খাওয়া বের হবে। এমন সময়, আবার সেই লোকটী নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী লইয়া উপস্থিত; পূর্ব্বদিন হইতে বরং বেশী ছিল; এবং তেমনি হাতযোড় করিয়া অনুমতি চাহিলেন। ঠাকুর অনুমতি দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি কাল সেবার বস্তু আনিয়াছিলেন, আজও আনিয়াছেন। আপনার পরিচয় কি? এবং কেনই বা এই দুই দিন সেবার বস্তু নিয়া উপস্থিত হইলেন?' তিনি বলিলেন—'আমি নিকটস্থ গ্রামের একজন তালুকদার, আমার বিষয়সম্পত্তি আছে। আমি গুরুজীর দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। তিনি আমাকে আপনার তত্ত্ব লইতে বলিয়াছেন, তাই আপনি যতদিন এই স্থানে অবস্থান করিবেন, ততদিন আপনার সেবা করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন।' এই কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন—'তোমার সেবার দ্বারা আমরা সকলে সন্তুষ্ট হইলাম, কাল হইতে তোমার সেবা আর গ্রহণ করা হইবে না।' আমি শুনিয়া অবাক্, যা একটা খাওয়ার সংস্থান হইয়াছিল, তাহাও দূর হইল। যাহা হউক, দেখি এখন কি হয়। পরদিন ঐ লোকটা আর আসে না। বেলা দ্বিতীয় প্রহর বসিয়া বসিয়া কেবল ভাবিতেছি; এমন সময় এক মঠ হইতে একটী লোক আসিয়া বলিলেন—'আমাদের মঠে সংকীর্ত্তন হইবে, আপনারা চলুন।' অতঃপর সকলে একত্র হইয়া সংকীর্ত্তনে যোগ দিয়া, চর্ব্ব্য চোষ্য নানাবিধ ফলার করিয়া তাঁবুতে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। দিনের পর দিন ঠাকুরের এবম্বিধ মহিমা দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম।" *

---

* বোলপুরের উকিল শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু মহাশয়ের প্রদত্ত বিবরণ। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধৃত।

"একদিবস শ্রীশ্রীগৌরনিতাই বিগ্রহদ্বয়ের সম্মুখে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য ৺মহাবিষ্ণুজ্যোতি তাঁহার স্বরচিত গান গাইতে আরম্ভ করিলেন। গানটী এই :—

কীর্ত্তনের সুর—একতালা।

সাজ ভাই সবে মিলে আজ হরি-সংকীর্ত্তনে।
মাতাও মধুর তানে জগজ্জনে মধুমাখা হরিনামে ॥
তীর্থরাজ এই প্রয়াগধামে, গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে,
শ্রীগুরুগোবিন্দ সনে, এমন সুযোগ আর পাবিনে ॥
আনন্দে দুবাহু তুলে, ডাক দীনবন্ধু ব'লে,
শুনেছি সে থাকৃতে নারে, ডাকলে কাতরপ্রাণে ॥
নামটী হরির দীনবন্ধু, দীন-দুঃখীজনের বন্ধু,
কে আছে ভাই পাপীতাপীর (সেই) পতিতপাবন হরি বিনে ॥
কোথায় কমলআঁখি ব'লে, ডেকেছিল দুখের ছেলে,
অমনি কোলে নিলে তুলে, সেই সরল শিশুর কান্না শুনে ॥
আর এক ছেলে অসুরকুলে, মেতেছিল হরি ব'লে,
ম'ল না (সে) জলে অনলে, এই তারকব্রহ্ম নামের গুণে ॥
কোথায় দীনবন্ধু ব'লে, ডাক ভাই রে নয়নজলে,
ডাক একবার হৃদয় খুলে (সেই) প্রাণের প্রাণ সাধনের ধনে ॥
অনিত্য বিষয় ত্যজ, শ্রীহরিচরণে মজ,
দেখ চেয়ে চেতন হ'য়ে, দিন ফুরাল দিনে দিনে ॥
মান অপমান দূরে থুয়ে, তৃণ হ'তে সুনীচ হ'য়ে,
মনে প্রাণে নিশিদিনে ভাস হরিদাস হরিনামে ॥

এই গান গাইতে গাইতে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইল, কিন্তু গান জমিতেছে না দেখিয়া সকলেই উন্মনা হইলেন। ঠাকুর (গোস্বামী প্রভু) বলিলেন—'ভগবানের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া গান কর, তাঁহার কৃপার ছিটা ফোঁটা পাইলে সব ভাসিয়া যাইবে।' ক্রমে গান জমিতে লাগিল। বাহির হইতে সাধু সন্ন্যাসী সকল জড় হইতে লাগিলেন। ঠাকুর ও সকলে উঠিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে এক অপূর্ব্ব তাড়িৎ-শক্তি সকলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া, সকলকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। ঠাকুর 'অবধূত, অবধূত', বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। এই সময় হঠাৎ কোথা হইতে একজন মুণ্ডিতমস্তক, ভস্মাচ্ছাদিত, উলঙ্গ পুরুষ কীর্ত্তনে প্রবেশ করিলেন। আসিয়াই দুই হাত তুলিয়া ঠাকুরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। যেই তাঁহার প্রবেশ, অমনি যে যেখানে ছিল সে তদবস্থায়ই চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। এক অব্যক্ত শক্তিতে খোল করতাল বাদিত হইতে লাগিল। সকলেই মুগ্ধ। অশ্বিনী (গোস্বামী প্রভুর জনৈক শিষ্য) বলিল, তাহার হাতে করতাল ছিল, সকল শরীর অবসন্ন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! না জানি কোন শক্তিতে যেন হাত নড়িয়া বাজিতে লাগিল। রামযাদব বাক্‌চী (গোস্বামীপ্রভুর জনৈক অনুগত ভক্ত) কীর্ত্তনে নৃত্য করিতে করিতে পদপ্রসারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি তদবস্থায়ই রহিলেন। এমন সময় ঐ মহাপুরুষ সম্মুখস্থ নিত্যানন্দ বিগ্রহের মালা আনিয়া, ঠাকুরের গলায় জড়াইয়া দিয়া দেখিতে দেখিতে কোথায় চলিয়া গেলেন, অনুসন্ধান করিয়া আর পাওয়া গেল না। কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর বলিলেন—'আজ কৃপা করিয়া নিত্যানন্দ মহাপ্রভু উপস্থিত হইয়া কৃতার্থ করিলেন। তিনি আসলও করিয়াছেন, নকলও করিয়াছেন। আমি সংকীর্ত্তনের সময় ভাবিতেছিলাম, গৌরনিতাই সংকীর্ত্তনের সময় কিরূপ করিয়া দাঁড়াইতেন, অমনি আমার সচ্চিদানন্দ

রূপ দর্শন হইল। এমন সময় শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অন্য দেহে প্রবেশ করিয়া প্রকটভাবে দেখা দিয়া গিয়াছেন, তোমরা ধন্য হইয়াছ।' যোগজীবন গোসাই বলিলেন যে, "তিনি তাঁহাকে শুভ্রবর্ণ দর্শন করিয়াছিলেন। ক্ষেপাচাঁদ (মহাত্মা অর্জ্জুনদাস) কি বুঝিয়া তাঁহার পা টিপিয়া দিয়াছিলেন। কুঞ্জঠাকুরতা (গোস্বামীপ্রভুর জনৈক শিষ্য) তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়াছিল।" *

একদিবস গোস্বামী প্রভু কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন যে, "যিনি এই মহামেলায় এক মাস কাল রাত্রি জাগরণ করিয়া সাধন করিবেন, তিনি কোন অদ্ভুত ঘটনাদি প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।" কথাটী কেহ তেমন ভাবে লক্ষ্য করিলেন না। কিন্তু গোস্বামী প্রভুর জনৈক উদাসীন শিষ্য যিনি নামপ্রকাশে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন) প্রথমেই গুরুদেবের এই উপদেশটী হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে এক দিবস তিনি দেখিতে পাইলেন যে, হঠাৎ তাঁবুটী অন্ধকারময় হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে দেখিলেন, গোস্বামী প্রভুর আসনে আর তিনি নাই, তৎপরিবর্ত্তে চতুর্ভুজা কালীমূর্ত্তি দণ্ডায়মানা। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলেন, কালিকাদেবী অন্তর্হিতা হইয়াছেন এবং তাঁহার স্থানে কৃষ্ণ-বলরাম বিরাজ করিতেছেন। পরে দর্শন করিলেন, কৃষ্ণ-বলরাম নাই, গৌর-নিতাই বিদ্যমান। পরিশেষে দেখিতে পাইলেন, গৌর-নিতাইএর পরিবর্ত্তে আসনে গোস্বামী প্রভুই পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিতেছেন। বলা বাহুল্য যে, এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া শিষ্যটী আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন। অপর একদিবস রাত্রি অনুমান ৩ ঘটিকার সময় পূর্ব্বোক্ত শিষ্য মহোদয় গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন, কতকগুলি দিব্যকান্তি পুরুষ ও রমণী যদৃচ্ছা গঙ্গাতীরে

* দুইজন দর্শকের কথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত।

বিচরণ করিতেছেন। এই গভীর রজনীতে মাঘমাসের দারুণ শীতে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত-গাত্রে ইঁহাদিগকে এই ভাবে বিচরণ করিতে দেখিয়া, তিনি অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিবামাত্র গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গঙ্গাতীরে কি দেখিলে?" তদুত্তরে তিনি আদ্যোপান্ত ঘটনা বর্ণন করিলে, গোস্বামী প্রভু বলিলেন—"কুম্ভস্নান উপলক্ষে দেবতারা আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছেন।"

এই মহামেলাতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে যে সকল যোগসিদ্ধ মহাত্মাগণ আগমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত মহাপুরুষগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১ম। শ্রীবৃন্দাবনবাসী মহাত্মা রামদাস কাঠিয়া বাবা। কাঠের কৌপীন পরিধান করিতেন বলিয়া লোকে ইঁহাকে 'কাঠিয়া বাবা' বলিত। ইঁনি কিয়ৎকাল হিমালয়ের কোন নিভৃত স্থানে থাকিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। সেখানে কন্দমূলই সাধুদিগের একমাত্র উপজীবিকা। একবার অনাবৃষ্টি হেতু কন্দমূল উৎপন্ন হইবে না আশঙ্কায়, সেই স্থানের অপরাপর সাধুদিগের চিত্তচাঞ্চল্য লক্ষ্যকরতঃ, মহাত্মা কাঠিয়া বাবা প্রাণে দারুণ আঘাত পাইয়াছিলেন এবং এইরূপ অযথা নির্ভরের ভাব পোষণ করা অপেক্ষা যে স্থানে ভিক্ষা সহজলভ্য এইরূপ কোন স্থানে থাকিয়া, নিশ্চিন্তমনে সাধন-ভজন করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া, শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহার সুগঠিত অটুট শরীর, আজানুলম্বিত হস্তদ্বয়, শুভ্র কেশকলাপ-বিমণ্ডিত মস্তক, গভীর জীব-বৎসলতাব্যঞ্জক সুস্নিগ্ধ মনোহর দৃষ্টি—ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করিলে পুরাকালের ঋষিদিগের কথাই স্বতঃ মনে উদিত হইত। শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিবার পর, অল্পদিনের মধ্যেই ইঁহার যশোসৌরভ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, এবং স্থানীয় বৈষ্ণব-

মণ্ডলা ইঁহাকে চৌরাশি ক্রোশ-ব্যাপী ব্রজমণ্ডলীর মোহান্তপদে অভিষিক্ত করিলেন। ব্রজবাসীরা ইঁহাকে বিদেহ-মুক্ত মহাপুরুষ বলিতেন অর্থাৎ ইনি দেহে থাকিয়াই মুক্তাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় ইঁহারই মন্ত্র-শিষ্য। ইঁহার ন্যায় জ্ঞানী ও প্রেমিক সাধু মেলাতে অতি অল্পই উপস্থিত হইয়াছিলেন। কুম্ভস্নানের দিবস সমগ্র বৈষ্ণবমণ্ডলী ইঁহাকেই অগ্রণী করিয়া স্নান করিয়াছিলেন।

২য়। মহাত্মা ছোট কাঠিয়া বাবা। ইনি অতিশয় নির্ভরশীল ছিলেন। ইঁহার ন্যায় শীতোষ্ণসহনশীল সাধু প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না, অথচ ইঁনি কোন প্রকার মাদকদ্রব্যাদিও ব্যবহার করিতেন না। মাঘমাসের ভয়ানক শীতে সম্পূর্ণ অনাবৃত স্থানে, ও গাত্রে কোন প্রকার বস্ত্রাবরণ ব্যবহার না করিয়াই ইঁনি এলাহাবাদের চড়াতে দিবসযামিনী অতিবাহিত করিয়াছেন; এবং কদাচ কাহারও নিকটে কোন দ্রব্য যাচ্ঞা করেন নাই।

৩য়। মহাত্মা নরসিংহ দাস বা পাহাড়ী বাবা। মানস-সরোবরে ইঁহার তপস্যাস্থান ছিল। তথায় বহুকাল তপস্যাকরতঃ সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়া, ইঁনি কুম্ভমেলা উপলক্ষে লোকালয়ে আগমন করিয়াছিলেন। ইঁহার ন্যায় ধ্যানপরায়ণ সাধু কুম্ভমেলায় অতি অল্পই উপস্থিত হইয়াছিলেন। দিবসের অধিকাংশ সময় ইঁনি নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানধারণায় অতিবাহিত করিতেন। ইঁহার ভালবাসা এক অপার্থিব বস্তু। "তুহি মেরা প্রাণ" বলিয়া ইনি যাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। বাবাজী মহাশয় সমস্ত সংসারকেই যেন আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। ক্ষুধার উদ্রেক হইলে ইঁনি বালকের ন্যায় সরলভাবে সম্মুখে যাহাকে দেখিতেন, নিঃসঙ্কোচে তাহারই নিকটে খাবার চাহিয়া আহার করিতেন। ইঁহার অসাধারণ যোগবলসম্বন্ধে একদিন গোস্বামী

প্রভু বলিয়াছিলেন—"ইনি রাত্রি ২টার সময় মানস-সরোবরে স্নান করতঃ বদরিকাশ্রম হইয়া শ্রীক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক জগন্নাথদেবের মঙ্গল আরতি করেন। পরে দ্বারকাতে যাইয়া যজ্ঞ করতঃ ত্রিবেণীতে আসিয়া বেলা ১টার সময় স্নান করেন। এইটী ইঁহার নিত্যকর্ম্ম।" ইঁহার শেষজীবন ইঁনি লোকালয়েই অতিবাহিত করিয়াছেন এবং কিয়ৎকাল কলিকাতা সহরে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইঁহার অসাধারণ সাধুতা, সরলতা ও ভগবৎ-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, বঙ্গদেশীয় বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোক ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

৪র্থ। মহাত্মা গম্ভীরনাথ। ইঁনি নাথযোগী এবং গোরক্ষনাথ সম্প্রদায়ের মোহান্ত। বহুদিন পূর্ব্বে ইঁনি গয়াধামে আসিয়া কপিলধারার নিকটস্থ একটী নির্জ্জন আশ্রমে থাকিয়া কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ইঁনি গোরক্ষসম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান আশ্রম গোরক্ষপুরের গোরক্ষনাথজীউর মঠে অবস্থান করিতেছেন। সাধুরা বলেন, বর্ত্তমান সময়ে হিমালয়ের নীচে এত বড় মহাপুরুষ আর দ্বিতীয় নাই। ক্ষণকাল এই মহাত্মার নিকটে বসিলেই মন স্থির হইয়া যায়। গোস্বামী প্রভু প্রণীত 'আশাবতীর উপাখ্যান' নামক গ্রন্থে গয়া, 'বরাবর' পাহাড়স্থিত যে চারিটী সিদ্ধ মহাপুরুষের কথা উল্লিখিত আছে, ইঁনি তন্মধ্যে অন্যতম। কিছুদিন পূর্ব্বে মহাত্মা গম্ভীরনাথ দয়া করিয়া কলিকাতা সহরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তখন অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বঙ্গবাসী তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন।

৫ম। মহাত্মা ভোলাগিরি। ইনি দণ্ডী সন্ন্যাসী। ইঁহার বর্ত্তমান আশ্রম হরিদ্বারে অবস্থিত। মেলার মধ্যে ইঁনি একজন অতিশয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। স্নানের দিন নাগাসন্ন্যাসিগণ ইঁহাকেই অগ্রে করিয়া স্নানে যাত্রা করিয়াছিলেন।

৬ষ্ঠ। মহাত্মা অমরেশ্বরানন্দ স্বামী। দাক্ষিণাত্যে পঞ্চবটীতে ইঁহার পূর্ব্বাশ্রম। ইঁনি পাঠ্যাবস্থায় ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপে আগমন করিয়াছিলেন এবং এই স্থানেই ইঁনি শ্রীমন্ মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হন। ইঁনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত এবং মেলাতে একজন বিশেষ প্রতিভাসমন্বিত সাধু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন।

৭ম। মহাত্মা অর্জ্জুনদাস বা ক্ষেপাচাঁদ। ইঁনি একজন ষড়ৈশ্বর্য্যশালী মহাপুরুষ। ইঁহার কার্য্যকলাপ, আচারব্যবহার দেখিলে স্বভাবতঃ ইঁহাকে পাগল বলিয়াই ভ্রম জন্মে; কিন্তু ইঁনি একজন ভগবৎলক্ষণাক্রান্ত পরম ভক্ত। মহাত্মা ছোট কাঠিয়া বাবা ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, 'এ জ্ঞানপাগলা হ্যায়'। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মতত্ত্ব বহু সাধুসন্ন্যাসীর নিকটেই অপরিজ্ঞাত ছিল; কিন্তু মহাত্মা অর্জ্জুনদাসের নিকট কিছুই অবিদিত নাই। বাঙ্গালা কোন গ্রন্থাদি না পড়িয়াও তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর তত্ত্ব অবগত ছিলেন। কেমন করিয়া তিনি বৈষ্ণব-সাধনতত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, মহাত্মা ক্ষেপাচাঁদ বলিয়াছিলেন—"ধ্যানমে মিলা"—অর্থাৎ ধ্যানে মিলিয়াছে। ইঁহার প্রেমের কথা অবর্ণনীয়। "মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।" এই তত্ত্বটী ইঁহার মধ্যে যেমন প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, এইরূপ প্রায় সচরাচর দেখা যায় না। ইঁনি সকলের মধ্যে ইঁহার ইষ্টদেবের প্রকাশ উপলব্ধিকরতঃ আত্মহারা হইয়া তাঁহাদিগকে হাত ঘুরাইয়া আরতি করিতেন; এবং কেহ কাহাকেও আঘাত করিলে ইঁনি স্বীয় প্রাণে তাহা অনুভব করিয়া বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতেন।

৮ম। মহাত্মা দয়াল্ দাস। ইনি গরীবদাসী-সম্প্রদায়ের একজন প্রধান ব্যক্তি। স্বর্গীয় পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় (কৃষ্ণানন্দ

স্বামী) ইঁহার অশেষ গুণে মুগ্ধ হইয়া ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মহাত্মার দানযজ্ঞ কুম্ভমেলার একটী প্রধান ঘটনা। ইঁনি মেলায় এক-মাস কাল একটী অন্নসত্র খুলিয়া অগণিত সাধুসন্ন্যাসী ও কাঙ্গালিগণের আহার যোগাইয়াছিলেন।

সমাগত সাধুসন্ন্যাসীগণ গোস্বামী প্রভুকে প্রথম প্রথম তাদৃশ ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু তাঁহাদিগের কেহ কেহ অদূরদর্শিতানিবন্ধন তাঁহার কার্য্যকলাপের মধ্যে নানারূপ দোষ দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তাঁহার কার্য্যের বিরুদ্ধে প্রধানতঃ তিনটী আপত্তি উত্থাপিত করিলেন। ১। তিনি বৈষ্ণবদিগের প্রচলিত বেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক গৈরিক বস্ত্র পরিধান করেন। তুলসী ও রুদ্রাক্ষের মালা একত্রে ব্যবহার করেন, জটা রাখিয়াছেন অথচ তিলকও ধারণ করেন। ২। ইঁহার আশ্রমে গৌরনিতাইএর বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু দশাবতারের মধ্যে তাঁহাদের নামোল্লেখ নাই। ৩। তিনি সন্ন্যাসী হইয়াও আশ্রমে শ্বাশুড়ী, কন্যা প্রভৃতি কতিপয় স্ত্রীলোককে স্থান প্রদান করিয়াছেন। এই সকল বিষয় লইয়া সাধুদিগের মধ্যে অল্লাধিক পরিমাণে আন্দোলন হইতে লাগিল। অবশেষে ইহার মীমাংসার জন্য প্রধান প্রধান মোহান্তগণ সাধুদিগের একটী সভা আহ্বান করিলেন। সভাস্থলে মহাত্মা অমরেশ্বরানন্দ স্বামাজী প্রথম ও দ্বিতীয় আপত্তি সম্বন্ধে বলিলেন যে, "এই বৈষ্ণব বাবা যে বেশ ধারণ করিয়াছেন শাস্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে। শাস্ত্রে ইহাকে 'অবধূত'বেশ বলে।" গৌরনিতাই-বিগ্রহ স্থাপনসম্বন্ধে বলিলেন যে, "আমি পাঠ্যাবস্থায় নবদ্বীপ অবস্থানকালে মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত আছি। গৌরনিতাই যে কৃষ্ণ-বলরামের অবতার, শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ আছে। মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ও বর্ত্তমান। ইঁহারা মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত।" তৃতীয় আপত্তি সম্বন্ধে মহাত্মা ভোলাগিরি

বলিলেন যে, "সাধারণতঃ সন্ন্যাসীদিগের আশ্রমে স্ত্রীলোক থাকা নিষেধ বটে, কিন্তু সামর্থ্যবান্ সন্ন্যাসিগণের পক্ষে সে নিয়ম প্রযুজ্য হইতে পারে না। ইঁনি (গোস্বামী প্রভু) অতিশয় সামর্থ্যবান্ পুরুষ—সাক্ষাৎ শিবতুল্য। ইঁনি শাস্ত্রবিধির অতীত এবং অহর্নিশ সমাধিমগ্ন। ইঁহার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না।" * তিনটী প্রধান সম্প্রদায়ের তিনজন সর্ব্বপ্রধান মহাত্মার এই সকল শাস্ত্র ও যুক্তিযুক্ত উত্তর শ্রবণ করিয়া, উপস্থিত সাধুমণ্ডলী অতীব প্রীত হইলেন এবং সেই অবধি তাঁহারা গোস্বামী প্রভুর নিকট গমনাগমন করিতে লাগিলেন। যতই তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার অসাধারণ গুণে ও মহত্ত্বে মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। এমন কি, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমভক্তি লাভ করিবার আশায়, অবশেষে তাঁহার শিষ্যত্ব পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

---

* শ্রীসদাশিব উবাচ—

অবধূতাশ্রমোদেবি কলৌ সন্ন্যাস উচ্যতে।
বিধিনা যেন কর্ত্তব্যং তৎসর্ব্বং শৃণু সাম্প্রতং॥
বিহায় বৃদ্ধৌ পিতরৌ শিশুং ভার্য্যাং পতিব্রতাং।
ত্যক্ত্বাসমর্থান্ বন্ধুংশ্চ প্রব্রজন্ নারকী ভবেৎ॥
সম্পাদ্য গৃহকর্ম্মাণি পরিতোষ্যাগমানপি।
নির্ম্মমো নিলয়াদ্গচ্ছেন্নিষ্কামো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥
ব্রহ্মজ্ঞানবিশুদ্ধানাং কিং যজ্ঞৈঃ শ্রাদ্ধপূজনৈঃ।
স্বেচ্ছাচারোপরাণাস্ত প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে॥
কুলাবধূতস্তত্ত্বজ্ঞো জীবন্মুক্ত নরাকৃতিঃ।
সাক্ষান্নারায়ণং মত্বা গৃহস্থস্তং প্রপূজয়েৎ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ৮ম উল্লাস।

গোস্বামী প্রভু মেলাক্ষেত্রে আগমনাবধি প্রায় প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে, কোন কোন দিন বা অপরাহ্নেও শিষ্যদলপরিবেষ্টিত হইয়া সাধুদর্শনে বহির্গত হইতেন। এই সময় তিনি যে পথ দিয়া গমন করিতেন, সেই সকল স্থানের সাধুগণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র আনন্দে হরিধ্বনি করিতেন। গোস্বামী প্রভু তাঁহাদিগের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া অতি বিনীতভাবে তাঁহাদিগের সহিত ধর্ম্মতত্ত্বাদি আলোচনা করিতেন। তখন গোস্বামী প্রভুর বিনয়-নম্র বাক্যে, তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যে, তাঁহার শাস্ত্র ও যুক্তিযুক্ত উপদেশে সাধুসজ্জনগণ অতীব আকৃষ্ট হইতেন। একদিবস পূর্ণানন্দস্বামী নামক জনৈক বিখ্যাত মোহান্ত, গোস্বামী প্রভুর ললাটে তিলক দেখিয়া বলিলেন—"তেরা ললাটমে ত মেরা মহাদেব ঝাড়া ফেরতা।" গোস্বামী প্রভু বিনীতভাবে উত্তর করিলেন—"মেরা ত বহুত ভাগ হায় কি মহাদেবজী হামারা ললাটমে টাট্টি ফেরতা।" তাঁহার এইরূপ উত্তর শুনিয়া স্বামীজীর আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

সাধুসন্ন্যাসিগণ, মৎস্যাহারী বলিয়া বাঙ্গালীদিগকে এযাবত বড়ই ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছিলেন। এমন কি, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বাঙ্গালীদিগকে একরূপ ধর্ম্মকর্ম্মবর্জ্জিত বলিয়াই অনুমান করিতেন। কিন্তু এই একমাসকাল কুম্ভমেলায় গোস্বামী প্রভু ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর আচারব্যবহার, কার্য্যকলাপ, ধর্ম্মানুরাগ প্রভৃতি দর্শন করিয়া, তাঁহাদের পূর্ব্বসংস্কার দূর হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বড় বড় মহাত্মাগণ একবাক্যে গোস্বামী প্রভুকে মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; এমন কি, তাঁহাদিগের কেহ কেহ তাঁহাকে সাধুমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। মহাত্মা বড় কাঠিয়া বাবা, গোস্বামী প্রভুর নাম করিয়া বলিতেন—"বাবা প্রেমী হায়, উন্‌কা বহুৎ প্রেম হায়।" ইনি গোস্বামী প্রভুকে এতদূর ভাল বাসিতেন যে, তাঁহার

নাম শুনিলেই 'বিজয় কিশোর' (কৃষ্ণ) 'বিজয় কিশোর' বলিয়া অস্থির হইতেন। গোস্বামী প্রভুর বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে, তিনি তাহা আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। কোন এক সময় শ্রীবৃন্দাবনে গোস্বামী প্রভুর আশ্রমে তাঁহার সহধর্ম্মিণী অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া, কতিপয় স্থানীয় সাধু গোস্বামী প্রভুর প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলেন। ইহাতে মহাত্মা কাঠিয়া বাবা মর্ম্মাহত হইয়া, সাধুদিগকে লক্ষ্য করিয়া সাতিশয় তেজের সহিত বলিলেন—"কেয়া বোল্‌তা হ্যায়, দেখ্‌তা নেহি উন্‌কা (গোস্বামী প্রভুর) ললাট মে আগ্‌ জল্‌তা হ্যায়! তোম লোগ ঐছা এক আসন পর হরদম বৈঠ রহত। শরীর খান্ খান্ হো যায়েগা",—অর্থাৎ তোমরা কি বলিতেছ? দেখিতেছ না উঁহার (গোস্বামী প্রভুর) ললাটে অগ্নি জ্বলিতেছে। উঁহার মত তোমরা অষ্টপ্রহর একাসনে বসিয়া থাক ত? তাহা হইলে তোমাদের শরীর খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে। মহাত্মা ভোলাগিরি, গোস্বামী প্রভুকে দেখিলেই 'মেরা আশুতোষ' 'মেরা আশুতোষ' বলিয়া অধীর হইতেন। গোস্বামী প্রভুর অন্তর্ধানের পর ইঁনি একদিবস তাঁহার কতিপয় শিষ্যের নিকট বলিয়াছিলেন "আমার আশুতোষের অভাবে আজ বাঙ্গালাদেশ বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।" ইঁনি অপর এক সময় গোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—'ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, তিন মিলায় কর্‌কে এক ব্যাটা হ্যায়,—অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিনজন মিলিয়া এক জন হইয়াছেন।

মহাত্মা গম্ভীরনাথ, গোস্বামী প্রভু সম্বন্ধে বলিতেন—"এমন প্রেমিক সাধু অতীব দুর্লভ।" মহাত্মা দয়াল দাস, গোস্বামী প্রভুর কোন শিষ্যকে অনেক বার বলিয়াছেন—"বাঙ্গালী বাবাকে আমি আবার কিরূপে দেখিতে পাইব?' গোস্বামী প্রভুর শিষ্যদিগের কীর্ত্তন শুনিয়া ইঁনি অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতেন। মহাত্মা ছোট কাঠিয়া বাবা,

দিনের মধ্যে অনেক বার গোস্বামী প্রভুর নিকটে আগমন করিয়া, তাঁহার সহিত ধর্ম্মালাপ করিতেন এবং বিদায়ের কালে এমন ভাব প্রকাশ করিতেন, যেন তিনি তাঁহার সঙ্গচ্যুত হইতে বিশেষ ক্লেশ অনুভব করিতেছেন। তিনি গোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"কভি রামজী, কভি গণেশ দেখ্‌তা হ্যায়, বড়ী তাজ্জবকা বাৎ হ্যায়!"—অর্থাৎ উহাকে (গোস্বামী প্রভুকে) আমি কখনও রামরূপে কখনও বা গণেশরূপে দেখিতে পাই, ইহা অতীব আশ্চর্য্যজনক কথা! মহাত্মা নরসিংহ দাস বা পাহাড়ী বাবা, গোস্বামী প্রভু সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"হাম সাচ্ কয়তেহে, এ বাবা সাক্ষাৎ রামজী হ্যায়, জ্যোতিস্বরূপ হ্যায়,"—অর্থাৎ আমি সত্য বলিতেছি যে, ইঁনি সাক্ষাৎ রামচন্দ্র ও জ্যোতিস্বরূপ। ইঁনি গোস্বামী প্রভুর প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্তর্ধানের পর ৺পুরীধামে তাঁহার সমাধিআশ্রমে গিয়া অনেক সময় বাস করিতেন।

মহাত্মা অর্জ্জুন দাস দিবানিশির অধিকাংশ সময় গোস্বামী প্রভুর আশ্রমে তাঁহার আসনের একধারে পড়িয়া থাকিতেন এবং সময় সময় ভাবাবেশে তাঁহার দিকে দৃষ্টি করিয়া, করযোড়ে স্বীয় ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রের স্তব পাঠ করিতেন। কখনও বা হাত নাড়িয়া নাড়িয়া গোস্বামী প্রভুকে আরতি করিতেন, আর উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন—"দেখ্‌তা নেহি কেত্তা রামজী, কিষণজী মহারাজকো (গোঁসাইজীর) জটাকো সেবা কর্‌তা হ্যায়। মহারাজ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু হ্যায়। এ বাঙ্গালাদেশকো চেতন কিয়া। হাম্ জেতনা কুম্ভ দেখা হ্যায়, মহারাজকো দর্শন কর্‌কো সব পূরণ ভায়া।" ইঁনি কোন্ কোন সময় গোস্বামী প্রভুর সঙ্গীয় লোকদিগের কীর্ত্তনের অগ্রে অগ্রে নৃত্য করিয়া চলিতেন, কোন সময় বা অতি বিনীতভাবে করযোড়ে কীর্ত্তনের পিছনে

থাকিতেন, আবার কোন সময় বা আনন্দে অধীর হইয়া ছুটাছুটি করিতেন এবং গোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন—"এসা মহাত্মা হাম কভি নেহি দেখা, হাম উন্‌কা নোফরকা নোফর",—অর্থাৎ এই প্রকার মহাপুরুষ আমি কখনও দেখি নাই, আমি উঁহার দাসের দাস। মহাত্মা অর্জ্জুন দাস অনেক সময় গোস্বামী প্রভুর ভুক্তাবশিষ্ট গ্রহণ করিয়া মনের আনন্দে ভোজন করিতেন এবং কোন কোন সময় তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া, সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতেন।

এক দিবস তিনি সাধুদিগের পাদোদক সংগ্রহ করিয়া কতকাংশ পান করিয়া অবশিষ্টাংশ লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। গোস্বামী প্রভু তাহা জানিতে পারিয়া, বলিলেন—"মহারাজ! যে মহামৃত সঞ্চয় করিয়া আনিয়াছেন তাহা কি একাই পান করিতে হয়?" এই কথা শুনিয়া মহাত্মা অর্জ্জুন দাস অতীব লজ্জিত হইয়া চরণামৃতের পাত্র গোস্বামী প্রভুর হস্তে অর্পণ করিলেন। ইঁনি তাহা হইতে কিঞ্চিৎ পান করিয়া, অবশিষ্টাংশ অপরাপর শিষ্যদিগকে পান করিতে দিলেন। এই সাধু চরণামৃতের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য অল্লাধিক পরিমাণে অনেকেই অনুভব করিয়াছিলেন।

উত্তরসংক্রান্তির দিবস প্রাতঃকাল হইতেই মকরস্নানের জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুসন্ন্যাসীদিগের মধ্যে নানাপ্রকারের আয়োজন হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দিকে এক অপূর্ব্ব ধর্ম্মোৎসাহের মহাতরঙ্গ উত্থিত হইল। তাহার ঘাতপ্রতিঘাতে মেলাক্ষেত্রের সমগ্র অধিবাসীদিগকে মাতাইয়া তুলিল। সকলেই আজ কুম্ভমেলার মহাধিবেশনের সময় পুণ্যতীর্থ ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান করিয়া পবিত্র হইবার আশায় শশব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বাহ্নে অনুমান আট ঘটিকার সময় সর্ব্বাগ্রে নাগাসন্ন্যাসিগণ মহাজাঁকজমকের সহিত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বহির্গত হইলেন। দুইজন বলিষ্ঠকায় জটাজূটধারী দিগম্বর নাগাসন্ন্যাসী, তাঁহাদের সম্প্রদায়ের চিহ্ন

সুবর্ণখচিত বহুমূল্য দুইটী প্রকাণ্ড ঝাণ্ডা (নিশান) স্কন্ধে বহন করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন, অপর দুই জন নাগাসন্ন্যাসী দুই পার্শ্বে থাকিয়া, উক্ত ঝাণ্ডাদ্বয়কে চামরব্যজন করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। ইঁহাদিগের পশ্চাতে মোহান্তগণ স্ব স্ব পদমর্য্যাদা অনুসারে কেহ অশ্বে কেহ বা পাল্কীতে আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। মোহান্তগণের পশ্চাতে সহস্র সহস্র ভস্মাচ্ছাদিত জটাজূটধারী দিগম্বর নাগাসন্ন্যাসী, সামরিক রীত্যনুসারে ধীরপদবিক্ষেপে উৎসাহভরে মেদিনী কম্পিত করিয়া চলিতে লাগিলেন। নাগাদিগের পশ্চাতে দশনামা সন্ন্যাসিগণ এবং তৎপশ্চাতে অপরাপর সন্ন্যাসিগণ গমন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে সমগ্র সন্ন্যাসীসম্প্রদায়, মেলাবাসীর ব্যবহারের জন্য নির্ম্মিত অস্থায়ী নৌসেতু পার হইয়া ত্রিবেণীসঙ্গমে উপস্থিত হইয়া, যথারীতি স্নানকার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের পরে বৈষ্ণবসম্প্রদায়, তৎপরে নানকপন্থিগণ স্নান করিয়াছিলেন। অপরাপর সম্প্রদায় ইহার পরে স্নান করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন লক্ষ লক্ষ কল্পবাসী, অগণ্য দর্শকমণ্ডলী—সর্ব্বসমেত প্রায় দশলক্ষ নরনারী—মকরসংক্রান্তিতে ত্রিবেণী স্নান করিয়া আপনাদিগকে কৃত-কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। এই মহাস্নানের অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাবপূর্ণ ধীর-গম্ভীর অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় দৃশ্য বর্ণনা করিবার ভাষা নাই, কল্পনা করিয়াও ধারণা করা অসাধ্য। ইহা যাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদের চিত্তপটে উহা চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া থাকিবে।

গোস্বামী প্রভু শিষ্যগণপরিবেষ্টিত হইয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া স্নান করিয়াছিলেন। স্নানের সময় তীর্থগুরু মহাশয়, গোস্বামী প্রভুর সঙ্গীয় লোকদিগকে ধন জন স্বর্গ ইত্যাদি নানাবিধ কামনাসূচক শ্লোক আবৃত্তি করাইয়া মন্ত্র পড়াইতেছিলেন, এমন সময় গোস্বামী প্রভু

তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন—"ও কি করিতেছেন? উহাদিগকে ঐরূপ মন্ত্র পড়াইবেন না।" ইহাতে তীর্থ-গুরু মহাশয় কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে কি মন্ত্র পড়াইব?" তদুত্তরে গোস্বামী প্রভু বলিলেন যে, উহাদের দ্বারা এইরূপ প্রার্থনা করান, যেন ঐ সব কিছু না হয় এবং উহাদের ভগবানে মতি হয়। তীর্থগুরু মহাশয় তদ্রূপই করিলেন। *

মকরস্নানের পর ২৪শে মাঘ দিবাকর কুম্ভরাশিতে গমন করিলে, কুম্ভের স্নান হইয়াছিল। মকরস্নান যে ভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল, কুম্ভ-স্নানও সেই প্রণালীতেই সম্পন্ন হইয়াছিল। অধিকন্তু এই দিন মকরস্নান অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ লোকের সমাগম হইয়াছিল। শুনিয়াছি, ঐ দিবস প্রায় বিংশ লক্ষ নরনারী ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মার্থে এরূপ জনসমাগম পৃথিবীতে না কি আর দেখা যায় নাই।

মকরস্নানের পর গোস্বামী প্রভুর গুরুদেব পরমহংসজী, মেলার অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে মেলাক্ষেত্রেই অবস্থান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি কুম্ভস্নানের দিবস চড়া পরিত্যাগ করিয়া অপর পারে ত্রিবেণীতে গমন করেন নাই।

একমাস পরে এই মহামেলার অবসান হইল, চাঁদের হাট ভাঙ্গিয়া গেল। সাধুরা কত যুগের বান্ধবের ন্যায় পরস্পরের নিকট হইতে সাশ্রু-নয়নে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক দেশ-দেশান্তরে গমন করিলেন। মহাত্মা ক্ষেপাচাঁদ, বিদায়ের কালে গোস্বামী প্রভুর সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবেশন করতঃ করযোড়ে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পর্য্যন্ত তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া, "তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু"—ইত্যাদি ভগবদ্বিষয়ক স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। পরে ভাব সংবরণ করিয়া বলিলেন—"প্রভো! এই স্থানের সকলেই

* শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের মুখে শ্রুত।

আমাকে পাগল বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু একমাত্র আপনিই আমাকে অতিশয় আদর করিয়া চরণপ্রান্তে স্থানদান করিয়াছিলেন।” এই কথা বলিতে বলিতে তিনি হঠাৎ কোথায় সরিয়া পড়িলেন, আর কেহ তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। গোস্বামী প্রভু এই সকল দেবদুর্ল্লভ সঙ্গ হারাইয়া, গভীর দুঃখ হৃদয়ে ধারণকরতঃ সহরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

মেলাবসানে গোস্বামী প্রভু কিয়ৎকাল এলাহাবাদ সহরে বাস করিয়াছিলেন। এই স্থানে শ্রীধাম নবদ্বীপবাসী শ্রীযুক্ত বাণীতোষ বাগচি মহাশয়ের সহিত তদীয় কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রেমসখীর হিন্দুমতে উদ্বাহ-কার্য্য সম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষে এলাহাবাদস্থিত প্রবাসী বাঙ্গালী হিন্দুগণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল এবং তাঁহারা সাগ্রহে উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। বিবাহান্তে একদিন গোস্বামী প্রভুর জনৈক শিষ্য, শ্রীযুক্ত বাণীতোষ বাবুর মাতৃদেবীর মন পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনারা নবদ্বীপ সমাজের নিষ্ঠাবান্ হিন্দুঘরের লোক হইয়া জাতিত্যাগী গোস্বামী মহাশয়ের কন্যা গ্রহণ করিলেন কেন?” তদুত্তরে তিনি বলিলেন—“আমি সাক্ষাৎ ভগবানের কন্যা গ্রহণ করিয়া কুল পবিত্র করিয়াছি।” এইরূপ উত্তর শুনিয়া শিষ্যটী নির্ব্বাক্ হইয়া স্বকার্য্যে প্রস্থান করিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীধাম নবদ্বীপের মহোৎসবে যোগদান, শান্তিপুর ভ্রমণ।

প্রয়াগধামে কুম্ভমেলার মহাধিবেশন দর্শন করিয়া, গোস্বামী প্রভু সশিষ্যে কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক, কুমারটুলীর প্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺গঙ্গা-প্রসাদ সেন মহাশয়ের বাটীতে কিয়ৎকাল অবস্থান করেন। এই স্থান হইতে ১৩০০ সালের ফাল্গুনী পূর্ণিমাতিথিতে কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে শিষ্যগণসমভিব্যাহারে আহিরীটোলার ঘাট হইতে ষ্টীমারযোগে কালনা হইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে উপনীত হন। তথাকার প্রধান স্মার্ত্তপণ্ডিত ভগবদ্ভক্ত ৺মথুরানাথ পদরত্ন মহাশয় অতিশয় সমাদরের সহিত তাঁহাদিগকে স্বীয় হরিসভার সংলগ্ন টোল বাড়ীতে বাসস্থান প্রদান করেন।

যে ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে ভগবান্ শচীনন্দন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে দিন চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। বহুদিন পরে এই বৎসরও ফাল্গুনী পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হইবে বলিয়া অতি সমারোহের সহিত জন্মোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। দূর-দুরান্তর হইতে লক্ষ লক্ষ ভক্তবৃন্দ এতদুপলক্ষে নবদ্বীপে আগমন করিয়াছিলেন। যখন মহোৎসব আরম্ভ হইল, তখন এক অদ্ভুত শক্তি নবদ্বীপ-বাসীকে মাতাইয়া তুলিল। দিন নাই, রাত নাই, দলে দলে সংকীর্ত্তন বাহির হইতে লাগিল এবং তারকব্রহ্ম হরিনামের জয়ধ্বনিতে দশদিক্ পূর্ণ

হইয়া গেল।* আজানুলম্বিতভুজ, দণ্ডকমণ্ডলুধারী গোস্বামী প্রভু, ভাবে মাতোয়ারা শিষ্যগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া, প্রেমভরে হেলিয়া ঢুলিয়া নাচিতে নাচিতে যখন কীর্ত্তন করিতে বহির্গত হইতেন, তখন নবদ্বীপবাসীর মনে সপার্ষদ গৌরাঙ্গদেবের কীর্ত্তনলীলার স্মৃতি জাগরূক হইত। তাঁহাদের প্রেমের হুঙ্কার, তাঁহাদের উদ্দণ্ড নৃত্য, তাঁহাদের অশ্রুকম্প পুলকাদি সাত্ত্বিক লক্ষণের বিকাশ যিনিই প্রত্যক্ষ করিতেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। এমন কি, স্থানে স্থানে কুলবধূগণ পর্য্যন্ত তাহা দর্শনকরতঃ ভাবে উন্মাদিনী হইয়া, গোস্বামী প্রভুর পদধূলি গ্রহণ করিবার জন্য লজ্জা-ভয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কীর্ত্তনের মধ্যে প্রবেশ করিতেন; জাতি, কুল, মান ইত্যাদি লৌকিক আচারের দুশ্ছেদ্য বন্ধনও তাঁহাদিগকে বান্ধিয়া রাখিতে পারিত না। একটী অদ্ভুত পাগলিনী প্রায়ই গোস্বামী প্রভুর সঙ্গীয় লোকদিগের কীর্ত্তনে প্রবেশ করিয়া অপূর্ব্ব নৃত্য করিতেন। নৃত্যকালে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে কদম্বপুষ্পের ন্যায় পুলক দেখা দিত।

গোস্বামী প্রভুর বাসস্থান টোলবাড়ীর সন্নিকটেই ৺মথুরানাথ পদরত্ন মহাশয়ের পিতৃদেব ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ৺হরিসভার মন্দির অবস্থিত।* বিদ্যারত্ন মহাশয় একজন অতিশয় উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক আরাধনায় তুষ্ট হইয়া, শ্রীমন্ মহাপ্রভু যেরূপ অপরূপ মনোহর ভঙ্গিমাতে তাঁহার অন্তরে প্রকাশিত হইয়া দর্শন প্রদান করিয়াছিলেন, ঠিক তদনুযায়ী একটী শ্রীমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় উক্ত মন্দিরাভ্যন্তরে স্থাপন করিয়াছেন। প্রত্যহ তথায় রীতিমত ভোগ রাগ আরতি কীর্ত্তন ইত্যাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। নবদ্বীপে অবস্থানকালে গোস্বামী প্রভু শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে প্রায়ই এই হরিসভার কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিতেন।

আজ ফাল্গুনী পূর্ণিমা। সন্ধ্যার পরই চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হইবে।

প্রাতঃকাল হইতেই সমগ্র নবদ্বীপময় এক মহানন্দের রোল উত্থিত হইল। চারিদিকেই হরিনাম-মহোৎসবের বিবিধপ্রকার আয়োজন উদ্যোগ চলিতে লাগিল। যে তিথি নক্ষত্রের শুভযোগে স্বয়ং গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, নাম প্রেম বিলাইতে গৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আজ ৪০০বৎসর পরে সেই শুভযোগ সমুপস্থিত। ভক্তমণ্ডলীর আজ বুকভরা আশা, তাঁহারা এই শুভদিনে ভগবান্ গৌরচন্দ্রের কোনও না কোনরূপে আবির্ভাব দর্শন করিবেন। নবদ্বীপবাসী ৺মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় (অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী কলেক্টর) এই মহা শুভযোগে তাঁহার আলয়ে নবগৌরাঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মহা আয়োজন করিতে লাগিলেন। নদীয়ার আবালবৃদ্ধবনিতা আজ আনন্দে উৎসাহে মাতোয়ারা।

অপরাহ্ন হইতে না হইতেই দলে দলে কীর্ত্তনীয়াগণ সহস্র সহস্র ভক্তমণ্ডলী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, তারকব্রহ্ম হরিনামের সিংহনাদে দিগ্ দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া পতিতপাবনী সুরধুনীর তীরে সমবেত হইতে লাগিলেন। টোলবাড়ী হইতে সশিষ্য গোস্বামী প্রভু, কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে, বর্ষাকালীন বেগবতী স্রোতস্বিনীর ন্যায় জাহ্নবীতীরস্থ সেই কীর্ত্তনসমুদ্রে প্রবিষ্ট হইলে, তথায় যে মহাভাবের উত্তাল তরঙ্গ সমুত্থিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত জনৈক দর্শকের স্বকথিত বিবরণ হইতে কথঞ্চিৎ উপলব্ধি হইবে; তৎপ্রদত্ত বিবরণ যথা :—

"১৩০০ সনের ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিবস সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে আমরা ঠাকুর গোঁসাইর সহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে টোলবাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া, সন্ধ্যার পরই নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইলাম। পথিমধ্যে অসংখ্য সংকীর্ত্তনের দলও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চলিল। আমাদের কীর্ত্তন ও

অপরাপর দলের কীর্ত্তন পথে মিলিত হইয়া, এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তন-লহরী ছুটিতে লাগিল। গোঁসাই, সকল সম্প্রদায়কেই আপন স্থানে স্বচ্ছন্দে তাঁহাদের মধ্যে নৃত্যকরতঃ সকলকেই আপনার করিয়া ফেলিতে লাগিলেন এবং তাঁহারাও তাহাতে অপূর্ব্ব শক্তি ও উৎসাহ লাভ করিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। এইরূপে ধীরে ধীরে নদীতীরে গিয়া দেখি যে, গঙ্গার ঘাট লোকারণ্যে পরিণত হইয়াছে। চারিদিকে অসংখ্য কীর্ত্তনের সম্প্রদায় গান ও উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছে। লোকচলাচল অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন অভীপ্সিত স্থানে যাইবার পথ পাওয়া যায় না, অথবা কোনও স্থানে স্থিরও থাকিবার উপায় নাই; লোকপ্রবাহ বিভিন্ন কীর্ত্তনসম্প্রদায়সমূহকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে চালিত করিতেছে। ইহার মধ্যে গোঁসাই স্বচ্ছন্দে নৃত্য করিতেছেন, আর "জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কখনও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকে কীর্ত্তনের মধ্যে আহ্বান করিতেছেন, কখনও বা তাঁহাকে সমাগত অনুভব করিয়া যেন তাঁহার শ্রীমুখের কাছে হাত ঘুরাইয়া সাদরে আরতি করিতেছেন। ইহাতে উপস্থিত জনমণ্ডলী সত্যদর্শনানুভবের প্রবাহ নিজ নিজ হৃদয়ে অনুভব করিয়া কেহ মূর্চ্ছিত, কেহ পুলকিত, কেহ উল্লসিত আর কেহ বা বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। নাচিতে নাচিতে কেহ নৃত্য আর থামাইতে পারেন না, অনেকে মাথা টলিয়া পার্শ্বে বা পশ্চাৎ দিকে পতিত হইয়া ধরাশায়ী হইতে লাগিলেন। এমন সর্ব্বব্যাপী কীর্ত্তন ও তাহাতে সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে ভগবৎকৃপা-সঞ্চার আর কখনও দেখি নাই। ভবিষ্যতে দেখিব কি না বলিতে পারি না। এই ত গেল সাধারণ দৃশ্য। তারপর আমাদের ঠাকুর গোঁসাইর অবস্থা ও তাঁহার আশে পাশে যাহা ঘটিল, তাহার বিবরণ আর ব্যক্ত করা যায় না। নদীর প্রবাহ দেখিয়া তৎপ্রসূতি হ্রদের গাম্ভীর্য্য এবং বেগও যদি ধারণা ও অনুভব

করা সম্ভব হয়, তাহা হইলেও গোঁসাই ও তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া যে সকল শিষ্যবর্গ কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তাঁহাদের ভাবগাম্ভীর্য্য ও পর্ব্বতবিদারণকারী অদম্য বেগ অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে না—তাহা এতই গম্ভীর, এতই অতলস্পর্শ!

"অদ্যকার এই মহাসংকীর্ত্তনের মধ্যে গোঁসাই প্রভু অপূর্ব্ব মাধুরীময় নৃত্য ও জয়ধ্বনি করিতেছেন, চতুর্দ্দিকে এক মহা উত্তেজনাময় আনন্দ-প্রবাহ বিকীর্ণ হইতেছে, দর্শকমণ্ডলী চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহা দর্শন করিতেছে, এমন সময় দূর হইতে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী ও বদান্য শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের গুরুদেব সুপ্রসিদ্ধ সাধু হরিবোলানন্দ স্বামী, কি জানি কি ভাবে আবিষ্ট হইয়া দুই বাহু প্রসারণকরতঃ তীরবেগে গোঁসাইএর দিকে ধাবিত হইলেন, এবং নিকটবর্ত্তী হইলেই গোঁসাই প্রভু স্বীয় দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়াই সমাধিস্থ হইলেন। এই ভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে, দুই জনেই মহাভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। চারিদিক্ হইতে অসংখ্য লোক ছুটিয়া আসিয়া সতৃষ্ণনয়নে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিল; তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে লাগিল—"যেন সাক্ষাৎ গৌরনিতাই নাচ্চে গো!" সাধু হরিবোলানন্দ, গোঁসাইকে নির্দ্দেশ করিয়া উন্মাদের ন্যায় কখনও লম্ফ, কখনও অদ্ভুত নৃত্য এবং কখনও বাগ্গভীর উল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যেন ইঁহাকে পাইয়াই তাঁহার আরাধনার ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"গ্রহণ আরম্ভ হইবামাত্র গোঁসাই প্রভু ঊর্দ্ধে দৃষ্টিকরতঃ সদা রাহুগ্রস্ত সুধাকরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক স্থিরনেত্রে দণ্ডায়মান হইলেন, দাঁড়াইয়াই তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। এতদবস্থায় প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অতিবাহিত হইল। অতঃপর তিনি সুরধুনী-তীরে উপবেশনপূর্ব্বক

পুনরায় চন্দ্রের দিকে দৃষ্টি স্থিরকরতঃ 'ঐ দেখ, ঐ দেখ' বলিয়া সমাধি-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। মহাযোগী যোগারূঢ় হইয়া গ্রহণ-মুক্তিকাল পর্য্যন্ত প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করিলেন। এই সময় তাঁহার শ্রীঅঙ্গে এককালে ভক্তিমাধুর্য্য ও যোগৈশ্বর্য্য বিকশিত হইয়া উঠিল। তিনি রাহুগ্রস্ত চন্দ্রমার মধ্যে কি দেখিয়া 'ঐ দেখ, ঐ দেখ' বলিলেন, তিনিই জানেন, তাহা সাধারণ মানবের বুদ্ধির অগোচর।

"গ্রহণাবসানে গোঁসাই প্রভু গঙ্গাস্নান করিলেন। এই সময় তাঁহার ভক্তগণ তাঁহার সহিত জলকেলী আরম্ভ করিলেন। সকলেই তাঁহার শ্রীঅঙ্গে জল ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন, তিনিও সহাস্যবদনে তাঁহাদের ঐ আদর গ্রহণ করিলেন। স্নানান্তে নূতন কৌপীন ও বহির্ব্বাস পরিধান করিয়া, শিষ্যগণকে পুনরায় কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। বরিশাল বানরিপাড়ানিবাসী ৺কালাচাঁদ গুহ মহাশয় গান ধরিলেন—

কীর্ত্তনের সুর—একতালা।

গোরা শচীর দুলাল যাঁচে রে।
যাঁচে প্রেম রাধাভাবে বিভোর হ'য়ে রে ॥
উত্তম অধম নাই, যারে দেখে আপন ঠাঁই রে,
ধরিয়া ধরিয়া প্রেম করে।
(গোরা) গোলোক হ'তে অবনীতে, জীবে প্রেম বিলাইতে,
উদয় হ'ল রে ॥
পতিত হেরিয়ে কাঁদে, গোরার হিয়া নাহি স্থির বান্ধে রে,
সুরধুনী বহে দুনয়নে।
যাঁচে বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত প্রেম, বলে কে নিবি নে রে,
আয় রে তোরা আয় রে ॥
(এবার বিনা মূলে বিলাইব)

এই কীর্ত্তন করিতে করিতে সশিষ্য গোঁসাই প্রভু, স্বীয় বাসভবন টোলবাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে তিনি ভাবে পুনঃ পুনঃ ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন। বরিশালনিবাসী স্বর্গীয় গোরাচাঁদ দাস মহাশয় ভাবে বিভোর হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, আর সাধু শ্রীধর 'জয় নিতাই, জয় নিতাই' বলিয়া মুহুর্মুহুঃ গভীরগর্জ্জনে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে কোথা হইতে একটী ক্ষিপ্তপ্রায় লোক একখণ্ড বাঁশ স্কন্ধে লইয়া—"তুই এত দিন কোথায় ছিলি ? আজ সামে পেয়েছি, এই বাঁশ দ্বারা পিটিয়ে ঠিক্ ক'র্‌ব—ইত্যাদি" বাক্য উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে তীরবেগে গোস্বামী প্রভুর দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। শিষ্যগণ তাঁহার রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! লোকটী নিকটে আসিয়াই বংশখণ্ড দূরে নিক্ষেপ-পূর্ব্বক গোস্বামী প্রভুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল এবং ক্ষণকাল পরে গাত্রোত্থান করিয়া অপূর্ব্ব নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। এই ভাবে সেই দিনের মহাসংকীর্ত্তন সমাধা করিয়া, গোস্বামী প্রভু স্বীয় বাসভবন টোলবাড়ীতে আগমনপূর্ব্বক শিষ্য ও ভক্তজন পরিবেষ্টিত হইয়া বিশ্রামসুখ অনুভব করিলেন।" *

গ্রহণের পরদিন প্রাতে গোস্বামী প্রভু কীর্ত্তনসহ টোলবাড়ী হইতে হরিসভায় উপস্থিত হইলেন। কীর্ত্তনে অপূর্ব্ব শক্তির বিকাশ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হরিমোহন চৌধুরী (স্বামীজি) ভাবে বিভোর হইয়া অভূতপূর্ব্ব নৃত্য করিয়াছিলেন; এবং কয়েকটী লোক ভাবাবিষ্ট হইয়া জানু পাতিয়া করযোড়ে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত স্তব পাঠ করিয়াছিলেন। প্রায় ১১ ঘটিকার সময় কীর্ত্তন শেষ হইল। কীর্ত্তনান্তে গোস্বামী প্রভু শিষ্যগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া সেই স্থানেই প্রসাদ পাইলেন।

---

* শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় প্রদত্ত বিবরণ।

ঐ দিন শেষরাত্রে কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য গোস্বামী প্রভু কতিপয় শিষ্যসমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাড়ী উপস্থিত হন। এই স্থানের বিগ্রহ শ্রীশ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী স্থাপন করেন। এমন অপরূপ মূর্ত্তি গৌড়-মণ্ডলে অতি অল্পই আছেন। হঠাৎ দেখিলে জীবন্ত বলিয়াই ভ্রম জন্মে। কথিত আছে যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিকটে ব্যক্ত করিলে, তিনি স্বামীর ভাবী বিরহজনিত শোকে অতীব অভিভূত হইয়া পড়েন। তদ্দর্শনে মহাপ্রভু তাঁহাকে সান্ত্বনাপ্রদানপূর্ব্বক এই বর প্রদান করিলেন যে, তিনি মনে করিলেই তাঁহাকে অন্তরে দর্শন পাইবেন। কিন্তু শ্রীমতী তাঁহাকে অন্তরে দর্শন করিয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন—"কৈ ? এই মূর্ত্তি ত আমি হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতে পারিতেছি না। অতএব এই মূর্ত্তি যাহাতে আমি স্বহস্তে সেবা পূজা করিতে পারি, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দাও।" ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু সুনিপুণ কারিকর দ্বারা স্বীয় অনুরূপ একটা দারুময় মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং স্বীয় পূর্ণত্বহেতু নিজেও পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দুইটী শ্রীমূর্ত্তিই আকারে প্রকারে এরূপ সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইল যে, শ্রীশ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া কিছুতেই উঁহাদের পার্থক্য অনুভব করিতে পারিলেন না। তখন মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"তোমার যাহাকে ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পার, তুমি যাঁহাকে স্পর্শ করিবে তিনিই তোমার নিকটে থাকিবেন।" শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া দারুময় মূর্ত্তিটীই স্পর্শ করিয়া ফেলিলেন। স্পর্শমাত্র চৈতন্যময় মূর্ত্তি অচৈতন্যবৎ বিরাজ করিতে লাগিলেন। সেই অভূতপূর্ব্ব শ্রীবিগ্রহই এখন ৺নবদ্বীপধামে মহাপ্রভুর বাড়ীতে ষোড়শোপচারে পূজিত হইতেছেন।

উৎসবাদির সময় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাড়ীতে প্রায় সমস্ত রাত্রিই কীর্ত্তন

হয়। একদলের কীর্ত্তন শেষ হইলে অপর দল আসিয়া কীর্ত্তন করেন। সশিষ্য গোস্বামী প্রভু তথায় উপস্থিত হইলে, প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া ৺রসিক দাসের কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। তিনি কীর্ত্তন আরম্ভ করিবার সময় করযোড়ে গোস্বামী প্রভুকে নমস্কার করিয়া কীর্ত্তনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। গোস্বামী প্রভু তাঁহার মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া 'মঙ্গল হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবামাত্র, বাবাজী মহাশয় যেন কোন এক অভিনব তড়িৎশক্তি দ্বারা চালিত হইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে কীর্ত্তন খুব জমাট বাঁধিয়া উঠিল। গোস্বামী প্রভু ভাবে বিহ্বল হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে, পূর্ব্বোক্ত শ্রীবিগ্রহের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক "ঐ ত, ঐ ত," বলিয়া গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ইহাতে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার ভাব সংক্রামিত হওয়াতে, তাঁহারাও ৺ মহাপ্রভুর বিগ্রহের দিকে দৃষ্টি করতঃ মুহুর্ম্মুহুঃ হরিধ্বনি করিয়াছিলেন। কীর্ত্তনান্তে গোস্বামী প্রভু শিষ্যবর্গ-পরিবেষ্টিত হইয়া টোলবাড়ীতে আগমন করিলেন।

এই স্থানে একদিন একটী অপরিচিতা গোয়ালিনী একটী দুগ্ধের ভাঁড় হস্তে করিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কিয়ৎকাল গোস্বামী প্রভু ও তদীয় শিষ্যবর্গের প্রতি নির্নিমেষনয়নে দৃষ্টি করিয়া হঠাৎ বলিতে লাগিলেন—"তোরা সব এখানে কি ক'রে এলি ? তোরা ত সব ব্রজের লোক ! আমি তোদের জন্যই ত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।" এই কথা বলিয়া নিজের বিক্রয়ের সমস্ত দুগ্ধ আদর করিয়া সকলকে খাওয়াইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এই অদ্ভুত গোয়ালিনীর কথা উল্লেখ করিয়া গোস্বামী প্রভু একদিন বলিয়াছিলেন যে, "ইনি একজন উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন।"

একদিবস গোস্বামী প্রভু সশিষ্যে নবদ্বীপের প্রসিদ্ধা তপস্বিনী

রাইমাতাকে দর্শন করিবার জন্ত তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধা বৈষ্ণবী, গোস্বামী প্রভুকে দেখিয়াই ভাবাবেশে করযোড়ে শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন এবং "তুই ত মহাপ্রভুকে এনেছিলি, আচণ্ডালে হরিনাম বিলাইয়া জীব উদ্ধার করিয়াছিলি" ইত্যাদি দৈন্যোক্তি করতঃ কতই আদর করিয়া হাত ধরিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহস্থালীর যাবতীয় বস্তু, এমন কি, তাঁহার গাছপালাটি পর্য্যন্ত একে একে দেখাইতে লাগিলেন—গোস্বামী প্রভু যেন তাঁহার কতই পরিচিত, কতই আপনার জন। অতঃপর গৃহে যে কিছু প্রসাদ ছিল, সমস্ত আনিয়া সশিষ্য গোস্বামী প্রভুকে খাওয়াইতে লাগিলেন। সমস্ত প্রদান করিয়াও যেন তাঁহার তৃপ্তি নাই। আরও খাওয়াইতে ইচ্ছা, কিন্তু কি দিবেন খুঁজিয়া পান না। অবশেষে ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া দোকান হইতে যথেষ্টপরিমাণে রসগোল্লা ও পানতোয়া আনাইয়া সকলকে প্রদান করিলেন। বৃদ্ধা মাতাজীর এইরূপ আশ্চর্য্য ভাব দেখিয়া, উপস্থিত সকলেরই পঞ্চবটীর ত্রেতাযুগের শবরীর কথা মনে হইতে লাগিল।

বিদায়ের কালে মাতাজী, সশিষ্য গোস্বামী প্রভুকে মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাইবার জন্ত করযোড়ে অনুনয় বিনয় করিলে, তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন। মধ্যাহ্নে ঠাকুরের ভোগান্তে সকলে প্রসাদ পাইতে বসিলেন। মাতাজী মহানন্দে ছুটাছুটি করিয়া তাঁহাদিগকে প্রসাদ পরিবেশন করিতে লাগিলেন। আহারান্তে গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য বরিশাল গাভানিবাসী শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় উচ্ছিষ্ট পাতা ঘুটাইতেছেন দেখিয়া, মাতাজী চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—"উচ্ছিষ্ট পাতা রাখিয়া দাও, নহিলে আমি নিশ্চয়ই এখানে খুন হইব।" ইহাতেও সত্যেন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হইতেছেন না দেখিয়া, মাতাজী

গোস্বামী প্রভুর নিকটে তাহার নামে অভিযোগ করিলেন। অতঃপর গোস্বামী প্রভুর আদেশে তিনি পাতা রাখিয়া দিলেন। মাতাজী সকলের পাতা হইতে কিছু কিছু ভুক্তাবশিষ্ট সংগ্রহ করিয়া তাঁহার অনুগত লোকদিগকে খাইতে দিলেন।

প্রসিদ্ধা রাইমাতার আশ্রম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় 'হরিসভার' বাড়ীতে নবদ্বীপধামে মহাপ্রভুর নিত্যলীলাব্যঞ্জক একটী অপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটিত হয়। ঘটনাটি জনৈক দর্শকের প্রদত্ত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা:—"শনিবার দিন দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে রাইমাতার বাড়ী হইতে ফিরিবার সময় হরিসভায় উপস্থিত হইলাম। উহার নাটমন্দিরে ৺মথুরানাথ পদরত্ন মহাশয়, ঠাকুরের (গোস্বামী প্রভুর) সহিত কিছু আলাপ করিয়া একটী অপূর্ব্ব তমালগাছ দেখাইতে তাঁহাকে বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেলেন। তমালগাছটী এমন ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, দেখিলেই বোধ হয় যেন একটী অপূর্ব্ব শ্যামল লতামণ্ডপ প্রস্তুত রহিয়াছে। গাছটী দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। উহার তলায় যাইয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া গাছের সৌন্দর্য্য দেখিতেছি, এমন সময় একস্থানে পদরত্ন মহাশয়ের ২॥০।৩ বৎসরের একটী দৌহিত্রকে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইয়া ঠাকুর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—'এ ত বেশ ছেলে!' আমরা অমনি সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, ঠাকুর সেই ছেলেটীর আপাদমস্তক অতি আগ্রহের সহিত নিরীক্ষণ করিতেছেন; আর বালকটী ঠাকুরকে দেখিয়া যেন লজ্জায় অভিভূত হইয়া, তাহার চক্ষুর্দ্বয় এক একবার চাপিয়া ধরিতেছে, আর এক একবার মুখ তুলিয়া ঠাকুরকে দেখিয়া মধুর হাসিতেছে। এইরূপ দুই তিনবার করার পরে দেখা গেল, বালকটী নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে প্রাণায়ামের মত সর্ব্বশরীরে একটানা একটী শক্তি সঞ্চারিত হইতেছে। ঠাকুর এক একটী করিয়া

সমুদয় লক্ষণ আমাদিগকে দেখাইয়া বলিলেন—‘লোকে যাঁহার জন্য ছুটাছুটি করিয়া এদিক ওদিক ঘুরিতেছে, তিনি যে কোথায় কোন্ গলিতে ক্রীড়া করিতেছেন, তাহা কেহ জানিতে পারিতেছেন না। তিনি সর্ব্বদা গুপ্তভাবে নবদ্বীপে নিত্যলীলা করিতেছেন। তাঁহার নিত্যলীলা কি মিথ্যা হইতে পারে? নবদ্বীপে প্রত্যহ কোন না কোন স্থানে তাঁহার নিত্যলীলা হইতেছে। এই বালকের যেরূপ গঠন ও অঙ্গভঙ্গি, এরূপ কি কোন বিগ্রহের দেখিয়াছ? যাঁহারা লোক চিনেন, তাঁহারাই ভগবান্ কোথায় বসতি করেন, তাহা জানিতে পারেন। পদরত্ন মহাশয় পণ্ডিত লোক, তাই তিনি ইঁহার মহল্লক্ষণ চিনিতে পারিয়া ইঁহাকে আদর করিয়া থাকেন।” বালকের অশ্রুকম্প, ঘন ঘন শ্বাস ইত্যাদি শেষ হইতে না হইতেই তাহার প্রায় সমবয়স্কা পদরত্ন মহাশয়ের পৌত্রীটি অকস্মাৎ সেই স্থানে আগমন করিয়া, প্রথমে বালকের একটি হাত ধরিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইল, পরে দুইটী হাত ধরিল, তৎপরে অতিশয় আদরের সহিত তাহার কোন কোন অঙ্গ চুল্কাইয়া দিতে লাগিল, এবং অবশেষে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বালকের গলদেশ ধারণপূর্ব্বক তাহার বামপার্শ্বে প্রেমভরে দাঁড়াইল। তখন* নেপাল গোঁসাই (ঢাকানিবাসী শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র গোস্বামী)—‘ইনি আবার কে এইরূপ প্রেম দেখাইতে উদয় হইলেন?’ এই কথা বলিয়া, ‘জয় রাধারাণী,’ ‘জয় রাধারাণী’ বলিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন। আমরা সকলে অবাক্! অতঃপর পদরত্ন মহাশয়ের আদেশে বালকটী ঠাকুরকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে, ঠাকুর বলিলেন—‘থাক্, নমস্কারের দরকার নাই। তুমি আর কাহাকেও নমস্কার করিও না। তুমি আজ যাহা দেখাইলে তাহাতে ধন্য হইয়া গেলাম।’ পরে শিষ্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—‘তোমরা

* শ্রীযুক্ত স্বর্গিনী কুমার বসু মহাশয় প্রদত্ত বিবরণ।

ধন্য হইলে। দোলের দিন, ভগবান্ দয়া ক'রে তোমাদিগকে প্রকৃত দোল দেখাইলেন। তোমাদের অনেক জন্মের সুকৃতিতে আজ ইহা দেখিতে পাইলে।" দুঃখের বিষয়, এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে এই অসামান্য বালকটি অমরধামের যাত্রী হইয়াছেন।

অপর একদিবস ৺মহেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে শ্রীশ্রীনব-গৌরাঙ্গ দর্শন করিতে গিয়া, গোস্বামী প্রভু স্থিরদৃষ্টিতে বিগ্রহের দিকে কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিয়া ভাবাবেশে বলিতে লাগিলেন—"চুপ কর্, হাঁপাস্‌নে, দেবে, আমি ব'লে দে'ব, সোনার বালা ও নূপুর দেবে।" পরে বলিলেন—"ঐ দেখ ঠাকুর হাঁপাচ্ছেন।" তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া উপস্থিত সকলেই সেই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে, প্রকৃতই শ্রীবিগ্রহের চক্ষুতে পলক পড়িতেছে ও বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইতেছে। তাহাতে বক্ষঃস্থল-সংলগ্ন পুষ্পের মালাগুলি পর্য্যন্ত নড়িতেছে। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া সকলে বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইলেন। বলা বাহুল্য, অতঃপর ভক্তিভাজন মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতিশয় আগ্রহসহকারে 'নব-গৌরাঙ্গ' ঠাকুরকে সোনার বালা ও নূপুর প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

আর একদিন গোস্বামী প্রভু শ্রীবাসের আঙ্গিনায় উপস্থিত হইয়া, ঠাকুরদর্শনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, সেবকগণ তাঁহার নিকটে ভেট অর্থাৎ দর্শনী প্রার্থনা করিলেন। যে কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ, পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ সমভিব্যাহারে, দেশে দেশে পরিভ্রমণপূর্ব্বক, জীবের ঘরে ঘরে যাইয়া তাহাদিগকে দর্শনদান করিয়া হরিনাম উপদেশ করিতেন, আজ তাঁহাদেরই লীলাভূমি ৺নবদ্বীপধামে কপর্দ্দকশূন্য কাঙ্গালগণ তাঁহার শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে পাইবেন না, নবদ্বীপবাসীর এই ব্যবস্থা দেখিয়া গোস্বামী প্রভু এতদূর মর্ম্মাহত হইলেন যে,

আঙ্গিনায় প্রণামিপূর্ব্বক বিগ্রহ দর্শন না করিয়াই স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

নবদ্বীপের গঙ্গা পুরাতন নবদ্বীপকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রকৃত বসতবাটী কোথায় ছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইয়াছিল। "সম্প্রতি নদীর উত্তর পারে—নবদ্বীপের গঙ্গা নবদ্বীপের দুইদিক বেষ্টন করিয়া আছেন, এই জন্য পূর্ব্ব পার ও উত্তর পার—একটী প্রশস্ত টীলা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে অসংখ্য তুলসী বৃক্ষ, নিম্ব বৃক্ষ হইয়া আছে। টীলাটী অত্যন্ত কঠিন, যেন প্রস্তরময়। নবদ্বীপের সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয় ধ্যানে জানিয়াছেন, উহাই মহাপ্রভুর বাটী।"* এই বৎসর নবদ্বীপের গঙ্গার অপর পারস্থিত মায়াপুর (মেয়াপুর) নিবাসী কতিপয় বৈষ্ণব পণ্ডিত মেয়াপুরকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান প্রতিপন্ন করিয়া তথায় শ্রীশ্রীগৌর-নিতাইএর নূতন বিগ্রহ স্থাপনপূর্ব্বক মহোৎসবের আয়োজন করিলেন। মহোৎসবের দিবস এই স্থান হইতে কতিপয় লোক গোস্বামী প্রভুকে তথায় লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন—"আমরা নবদ্বীপকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া অবগত আছি, সুতরাং তাঁহার বসতবাটী অন্বেষণ করিবার জন্য নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া অন্য কুত্রাপি যাইতে ইচ্ছা করি না।"

নবদ্বীপের মহামহোৎসবের দিবস উৎসবের কর্তৃপক্ষগণ সশিষ্য গোস্বামী প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। যথাসময়ে তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে ভিন্নবর্ণের শিষ্যদিগ হইতে পৃথক্ আসন প্রদত্ত হইয়াছে দেখিয়া তিনি বলিলেন—"আমি উঁহাদের সহিত এক পংক্তিতেই ভোজন করিব।" এই কথা বলিয়া তিনি শিষ্যদিগের সহিত একত্রে ভোজনে বসিলেন। ভোজনের সময় কথাপ্রসঙ্গে জনৈক

* গোস্বামী প্রভুর উক্তি। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দে মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধৃত।

নবদ্বীপবাসী পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুকে বলিলেন—"আপনার শিষ্যদিগের মধ্যে কীর্ত্তনের সময় যেরূপ সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ দেখিয়াছি, তাহা সচরাচর দেখা যায় না। তবে ইঁহারা মালা তিলক ধারণ করেন না কেন?" তদুত্তরে গোস্বামী প্রভু বলিলেন—"আমার গলদেশে বিস্তর মালা দেখিতে পাইতেছেন না? উঁহাদের মালা তিলকের ভার এবার আমি গ্রহণ করিয়াছি।" সাধকের অবস্থা অনুসারে মালা তিলক প্রভৃতি চিহ্নধারণের যে একটা প্রয়োজনীয়তা আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু গোস্বামী প্রভু কখনও কোন শিষ্যকে এই সমস্ত বাহ্য চিহ্ন ধারণ বিষয়ে বাধা করিতেন না। সাধনের সময় যিনি মালা তিলক প্রভৃতির আবশ্যকতা স্বীয় প্রাণে উপলব্ধি করিতেন, তিনি স্ব-ইচ্ছায় কখনও বা গোস্বামী প্রভুর অনুমতি গ্রহণ করিয়া তাহা ধারণ করিতেন।

এক দিবস গোস্বামী প্রভু কতিপয় শিষ্য সমভিব্যাহারে নবদ্বীপ ব্যান্দড়াপাড়া নিবাসী, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সুগায়ক শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের আলয়ে উপস্থিত হইলে, উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা শ্রদ্ধেয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা:—"একবার গোস্বামী প্রভু কৃপা করিয়া অনেক গুলি শিষ্য সমভিব্যাহারে আমার জন্মভূমি নবদ্বীপের বাড়ীতে উপস্থিত হন। আমি তাঁহাদিগকে হঠাৎ মধ্যাহ্নে এই গরীবের বাড়ীতে পদার্পণ করিতে দেখিয়া যুগপৎ ভয়ে, আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। কিন্তু জানি না কি প্রভাবে গোস্বামী প্রভু একটী কথায় আমার ভয় দূর করিয়া দিলেন। অতঃপর আমি তাড়াতাড়ি শিষ্যদিগের জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া গোঁসাই প্রভুকে বাড়ীর ভিতর লইয়া বসাইলাম। আমার মাতৃদেবী তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলে, তিনি তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন—"রাজকুমার বাবুকে আমি ভাইএর মত দেখি, সুতরাং আপনি আমার মা,

আপনার প্রণাম আমি কি করিয়া গ্রহণ করিব?” মা বলিলেন—“তোমাকে দেখিয়া আমার মহাদেব মনে পড়িয়াছে।” গোঁসাই বলিলেন—“তবে আপনি মহাদেবকে প্রণাম করুন, আমি মাকে প্রণাম করি।” এইরূপে আমার মায়ের সঙ্গে প্রণামের আদান প্রদান হইল। পরে আমি গোঁসাইকে প্রণাম করিয়া বলিলাম—“একবার রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের সংকীর্ত্তনের পর আপনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন, ‘আমার হৃদয় তোমার হউক, তোমার হৃদয় আমার হউক।’ কিন্তু এত আমাদের বিবাহের মন্ত্র। যাহা হউক আপনার শ্রীমুখ হইতে যখন এত বড় একটী উচ্চ কথা বাহির হইয়াছিল, তখন আমার হৃদয়ের এইরূপ দুর্গতি দেখিয়া আপনার চুপ করিয়া বসিয়া থাকা উচিত নয়। অতএব আপনি আমাকে এমন একটী উপদেশ দিন, যাহাতে অন্ততঃ এক মিনিটের জন্যও আমার কলুষিত চিত্ত ভগবৎ চিন্তায় নিমগ্ন হইতে পারে। কিন্তু খুব সহজভাবে শুভঙ্করীর রকমের উপদেশ না দিলে আমার দ্বারা তাহা প্রতিপালিত হইবে না। পরে আমি উপযুক্ত হইলে আমাকে দীক্ষা প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিবেন।” গোঁসাই প্রভু হাসিয়া বলিলেন—“আপনাকে সেইরূপ একটী উপদেশ দিতেছি। ইহা সহজও বটে, শক্তও বটে। সহজ বলিতেছি এই জন্য যে ইহা অতি অল্পায়াসসাধ্য, এবং শক্ত এই জন্য যে ইহা সকলেই জানে অথচ কেহই ধরিতে পারে না। আপনি ওঁকারের অর্থ সাধন করুন। ওঁকারের অর্থ অ, উ, ম, অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়—যাহা পূর্ব্বে ছিল না, এখন আছে, আবার পরে থাকিবে না। ছিল না, আছে, থাকিবে না—এই অর্থ, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরু লতা ইত্যাদি যাহা কিছু চক্ষে পড়িবে সেই সমস্ত পদার্থেই আরোপ করুন। ইহা ছিল না, ইহা আছে, ইহা থাকিবে না—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আপনার আর এক চক্ষু খুলে যাবে। তখন

আপনি আপনার ঠাকুর ঘর (হৃদয়মন্দির) যে সকল 'থাকে না' পদার্থের দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন উহারা ক্রমে ক্রমে সরিয়া যাইতে থাকিবে; কেন না, 'ছিলনা—আছে—থাকে না জিনিষের' প্রতি মমতা থাকে না। আর মমতা না থাকিলে সে জিনিষ আর হৃদয়ে স্থান পায় না। ক্রমে এই সাধনে আপনি যতই সিদ্ধিলাভ করিবেন ততই দেখিবেন যে আপনার হৃদয় শূন্য হইয়া পড়িতেছে। তখন স্বতঃই আপনার একটী অভাব জ্ঞান আসিবে এবং এই সময় আপনি মনে করিবেন যে, আমি এযাবৎ কতকগুলি 'থাকে না' জিনিষ লইয়া বেশ মুগ্ধ হইয়াছিলাম, এ যে আমার সব গেল! এই সময় আপনার কোন 'থাকে' (চিরস্থায়ী) জিনিষের জন্য একটী তীব্র ব্যাকুলতা আসিবে এবং সেই সময় আপনার দীক্ষা গ্রহণের সময় উপস্থিত হইবে। অতএব আপনি ওঁকার মন্ত্রের সাধন দ্বারা ঠাকুর ঘরের আবর্জ্জনা সকল দূর করিতে থাকুন।"

নবদ্বীপের উৎসবান্তে গোস্বামী প্রভু গঙ্গাপথে শান্তিপুর গমন করেন। উৎসবের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই শান্তিপুরবাসী সজ্জনগণ তাঁহার মহত্ত্ব অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন। এইবার তাঁহারা গোস্বামী প্রভুকে বিশেষ ভাবে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক সাদরে গ্রহণ করিলেন। তিনিও শান্তিপুরবাসী শ্রীশ্রীঅদ্বৈত সন্তানদিগের বংশমর্য্যাদা প্রদর্শন করিবার জন্য স্বহস্তে মাতৃস্থানীয়া কতিপয় স্ত্রীলোকের চরণ ধৌত করিয়া দিয়াছিলেন।

একসময় শান্তিপুরবাসিগণ গোস্বামী প্রভুকে অগ্রণী করতঃ চৌদ্দমাদলের কীর্ত্তন লইয়া অদ্বৈত প্রভুর ভজনস্থল বাবলায় উপনীত হইয়া, সমারোহের সহিত তথায় একটি মহোৎসব সম্পন্ন করেন। এই স্থানটি অতিশয় নির্জ্জন এবং সহর হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই স্থানসম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়। গভীর রাত্রিতে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের কেহ কেহ এই স্থানে সুমধুর কীর্ত্তনের ধ্বনি শ্রবণ

করিতে পান বলিয়া ব্যক্ত করিয়া থাকেন। কোন এক সময় শ্রীযুক্ত কুলদাকান্ত ব্রহ্মচারী প্রভৃতি গোস্বামী প্রভুর কতিপয় শিষ্য এই স্থানে অপ্রাকৃত কীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই কীর্ত্তন সম্বন্ধে একদিন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছিলেন—"এ কীর্ত্তন সাধারণ কীর্ত্তন নয়। ছেলেবেলায় প্রায়ই আমি বাবলায় আসিয়া এই কীর্ত্তন শুনিয়া একবার এদিক, একবার ওদিক ছুটাছুটী করিতাম। এইস্থানে একটু স্থির হইয়া বসিয়া নাম করিলেই স্থানের প্রভাব বুঝিতে পারা যায়।" বহুদিন হইল শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর স্বপ্নাদেশে বালেশ্বরবাসী জনৈক ভক্ত বৈষ্ণব এইস্থানে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া, অদ্বৈত প্রভু ও শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপনপূর্ব্বক সেবা পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এক সময় গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের প্রকৃত ভজনস্থান নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে শান্তিপুরবাসী প্রভুপাদ জগদ্বন্ধু গোস্বামী ও শ্রীযুত কালীভূষণ ঘোষ মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া বাবলাতে গমন করেন। যাইবার সময় গৃহপালিত একটী কুকুর তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে। পথিমধ্যে অপরাপর কুকুরে ইহাকে দংশন করিতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া, প্রভুপাদ জগদ্বন্ধু দুই তিন বার কুকুরটীকে বাটী ফিরাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সে কিছুতেই তাঁহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইল না। অবশেষে গোস্বামী প্রভুর অভিপ্রায়ানুসারে তাহাকে সঙ্গে লওয়া হইল। বাবলায় উপনীত হইয়া গোস্বামী প্রভু সহচরদিগের সঙ্গে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময় উক্ত কুকুরটী মন্দিরের নিকটবর্ত্তী একটী নির্দ্দিষ্টস্থান পদনখ দ্বারা আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে পুনঃ পুনঃ ঘেউ ঘেউ শব্দ করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতে লাগিল। হঠাৎ কুকুরটীর এবম্প্রকার আচরণ দর্শন করিয়া গোস্বামী প্রভু ঐ স্থান খনন করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে স্থানটী খনন করা মাত্রই

অল্প মৃত্তিকার নীচে একখণ্ড কাষ্ঠ পাদুকা ও একটী পঞ্চপাত্রের সহিত একটি পিত্তলের হাঁড়ী সকলের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। দ্রব্যগুলি দেখিয়া, গোস্বামী প্রভু বলিলেন—"এই সমস্তই শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ব্যবহার্য্য জিনিষ, বহু সৌভাগ্যে অদ্য ইহা আবিষ্কৃত হইল।" পূর্ব্বোক্ত কুকুরটীর এই প্রকার আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়া উপস্থিত সকলে বিমুগ্ধ হইলেন। অতঃপর শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিদর্শন-চিহ্নগুলি স্থানীয় মন্দিরের সেবায়েতের নিকটে গচ্ছিত রাখিয়া, গোস্বামী প্রভু সঙ্গীয় লোকসহ স্বীয় আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই কুকুরটী সম্বন্ধে গোস্বামী প্রভু একদিন বলিলেন যে, এ পূর্ব্বজন্মে সাধক ছিল, ইহার গঙ্গাপ্রাপ্তি হইবে। এই কথা বলিতেছেন, এমন সময় কুকুরটী নিকটে আগমন করিল। তিনি তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—"আর কেন? বেশী দিন থাকিলে কষ্ট হইবে, দেহ ছাড়িয়া দাও।" তাহার পরদিবস লোকে গঙ্গায় গিয়া দেখে যে উক্ত কুকুরের শব গঙ্গাতীরে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার দেহের অর্দ্ধেক জলের ভিতর ও অপরার্দ্ধেক তীরের উপর পতিত আছে। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া শান্তিপুরবাসিগণ গোস্বামী প্রভুর অলৌকিক প্রভাব অনুভব করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। *

* শান্তিপুরবাসী শ্রীযুক্ত কালীভূষণ ঘোষ মহাশয় প্রদত্ত বিবরণ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতায় অবস্থান, শ্রীবৃন্দাবন গমন, গেণ্ডারিয়া আশ্রমে ধূলট উৎসব।

শান্তিপুর হইতে কলিকাতা আসিয়া গোস্বামী প্রভু কিয়ৎকাল স্থকিয়াষ্ট্রীটস্থ শ্রদ্ধাস্পদ রাখালবাবুর বাড়ীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই স্থানে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রেমসখির কঠিন জ্বররোগে পরলোকপ্রাপ্তি হয়। রোগীর যখন আসন্ন কাল উপস্থিত হইল, গোস্বামী প্রভু তখন দৈনন্দিন নিয়মিত পাঠাদিকার্য্যে ব্যাপৃতছিলেন। গৃহে কান্নার রোল পড়িল, তাঁহার পাঠও চলিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে তিনি মৃত কন্যার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং কীর্ত্তন করিতে বলিলেন। ধীরে ধীরে কীর্ত্তন হইতে লাগিল। গোস্বামী প্রভু নৃত্য করিতে করিতে প্রেমসখীর মস্তকে দক্ষিণ চরণ স্থাপন করিয়া কিয়ৎকাল চক্ষু মুদ্রিত করতঃ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। এই সময় তাঁহার দেহে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিকশিত হইয়াছিল। ইত্যবসরে শ্রীমতী প্রেমসখীর পবিত্রাত্মা নরদেহত্যাগ করিয়া গুরুকৃপায় শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রাকৃত মধুর লীলায় প্রবেশ করিলেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ গোস্বামী প্রভুর কুলাধিদেবতা ৺শ্যামসুন্দরের বিগ্রহ অঙ্গহীন হইলে, অপর একটী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়। এইস্থানে অবস্থানকালে তিনি কৃষ্ণনগর হইতে নূতন বিগ্রহ প্রস্তুত করাইয়া শান্তিপুর প্রেরণ করেন। যে প্রস্তর খণ্ডের উপর

শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত ছিল, তাহাতে গোস্বামী প্রভুর বয়োজ্যেষ্ঠ, জ্ঞাতিভ্রাতা ৺কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের নাম ও তন্নিম্নে তাঁহার নিজের নাম খোদাইয়া আনা হইয়াছিল। এই বিগ্রহই এখন শান্তিপুরে ৺ শ্যামসুন্দরের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। পরবর্ত্তীকালে গোস্বামী প্রভু এই শ্যাম-সুন্দরের অশেষ কৃপা সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা বলিতেন। একদিন বলিলেন—"৺শ্যামসুন্দর বাল্যকাল হইতেই আমাকে বড় কৃপা করিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্ম অবস্থায়, আজ পূজারী জল দেয় নাই বলিয়া জল চাহিতেন। গুপ্ত স্থানে রক্ষিত টাকার সন্ধান বলিয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে বাঁশী ও চূড়া চাহিতেন, উপাসনাকালে হঠাৎ সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলত বলিয়া কৌতুক করিতেন। আমি কত বলিতাম—'আমি এই সব বিশ্বাস করি না, আমি ব্রহ্মজ্ঞানী; কিন্তু শ্যামসুন্দর ছাড়েন কি ?" পরে একদিন শ্যামসুন্দর প্রকাশিত হইলে বলিলাম—"শ্যামসুন্দর, তোমার মনে যদি এই ছিল তবে আর ব্রাহ্মসমাজে নিয়াছিলে কেন ?" উত্তরে তিনি বলিলেন—"আরে যা, আমি তোকে ব্রাহ্মসমাজে নিয়াছিলাম, আবার আমি তোকে ফিরাইয়া আনিয়াছি।" *

শ্রদ্ধেয় রাখাল বাবুর বাটী পরিত্যাগ করিয়া গোস্বামী প্রভু শ্যামবাজার কম্বলীটোলাস্থিত একটী বাটীতে কিছুদিন অবস্থান করেন। এইস্থানে মহাত্মা অর্জ্জুনদাস বা ক্ষেপাচাঁদ গোস্বামী প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। প্রয়াগধামে কুম্ভমেলাতে গোস্বামী প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর অর্জ্জুনদাস বাবাজী মহাশয় গোস্বামী প্রভুর উপর এতদূর অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য পদব্রজে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ নবদ্বীপ ধামে গিয়া বহুলোকের নিকটে "গৌর নাচা বাবাজীর" (গোস্বামী প্রভুর) অনুসন্ধান করিয়াছিলেন।

* শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র চন্দ্র বসু বি,এল, মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধৃত।

গোস্বামী প্রভুর প্রকৃত নাম ভুলিয়া যাওয়াতে বাবাজী মহাশয় উক্ত নামেই তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহাকে "গৌর নাচা বাবার" সংবাদ দিতে পারে নাই। পরে তিনি তাঁহার অনুসন্ধানে কলিকাতায় আগমন করেন। ভগবদিচ্ছায় গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দে মহাশয়ের সঙ্গে পথিমধ্যে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহাকে কম্বলীটোলাতে গোস্বামী প্রভুর নিকটে উপস্থিত করেন। প্রথম সাক্ষাৎ হইবার পর উভয় উভয়কে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। সেই সময় তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে যে প্রকার ভাবের উত্তাল তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। তাহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাঁহারাই ধন্য হইয়াছেন। মহাত্মা ক্ষেপাচাঁদ কতিপয় দিবস গোস্বামী প্রভুর সঙ্গে একত্র বাস করিয়াছিলেন। শেষ রাত্রিতে গোস্বামী প্রভুর সহিত একত্র হইয়া বাবাজী মহাশয় যখন ভগবানের গুণগান করিতেন তখন তাহা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত পাষণ্ডের প্রাণও দ্রবীভূত হইত। উভয়ে যখন ভাবাবেশে নিম্নলিখিত গান করিতেন তখন এক অনির্ব্বচনীয় অমৃতধারা প্রবাহিত হইয়া উপস্থিত সকলকে অভিভূত করিত। গানটী এই :—

পিলু—পোস্তা।

চল ভাই ভার নিয়ে যাই, অযোধ্যায় রাম রাজা হবে।
দিব তার চরণে ভার, রাম বিনে ভার কেবা ববে॥
পাপে হ'য়েছি ভারি, আরত ভার সইতে নারি,
বিনা সেই ভূভারহারী, সে বিনে ভার আর কে ববে।
দিয়ে ভার নিয়ে শরণ, বল্‌ব দুটী ধ'রে চরণ,
এবার যেমন বইলেম ভার, এমন ভার দিও না ভবে॥

বাবাজী মহাশয় এক দিবস গোস্বামী প্রভুকে বলিলেন—"গোঁসাইজী, হাম তোমরা হোগিয়া"। ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি উত্তর করিলেন—"এ কি বলেন? আমিই আপনার।" মহাত্মা ক্ষেপাচাঁদ বলিলেন—"নেহি, হামরা বাত শুন, হাম তোমরা মাফি জটা রাখেঙ্গে, মালা তিলক ধারণ করেঙ্গে, আউর সব দেশমে এছা বাত হাজির করেঙ্গে কি নবদ্বীপমে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হুয়ে হায়, উনকো ভজন করো।" গোস্বামী প্রভু তাঁহার এইরূপ কথা শুনিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এই স্থানে অবস্থান কালে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত কতিপয় মাৎসর্য্যপরায়ণ লোক চক্রান্ত করিয়া সন্দেশের সহিত হলাহল মিশ্রিত করতঃ গোস্বামী প্রভুকে আহার করাইয়াছিল; কিন্তু ভগবৎকৃপায় ও মহাত্মা অর্জ্জুনদাসের যোগ-প্রক্রিয়া বিশেষের সহায়তায় তিনি এ যাত্রায় রক্ষা পাইয়াছিলেন।

একদিন জনৈক শিষ্য গোস্বামী প্রভুর নিকটে গান করিলেন—

হরদমে আল্লাজীর নাম লইও।
হরদমে গুরুজীর নাম লইও।
দমে দমে লইও নাম কমাই নাহি দিও॥ ইত্যাদি।

এই গান শ্রবণ করিয়া মহাত্মা ক্ষেপাচাঁদ মহাবীরের আবেশে, "দেশ সব ম্লেচ্ছাচারী হোগিয়া, ভ্রষ্ট হোগিয়া"—ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক যষ্টি হস্তে নানাপ্রকার ভীতিজনক হাবভাব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া গোস্বামী প্রভু, "মহাবীর, মহাবীর, স্থির হউন" ইত্যাদি স্তুতি-বাক্য দ্বারা তাঁহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া অকস্মাৎ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মহাত্মা ক্ষেপাচাঁদ চলিয়া গেলে পর প্রাগুক্ত শিষ্যটী গোস্বামী প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"উনি (ক্ষেপাচাঁদ) কি রাগ করিয়া গেলেন? গোস্বামী প্রভু উত্তর করিলেন—"না, রাগ করিয়া যান নাই। তাঁহার যাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই ঐ ছুতা ধরিয়া গেলেন।"

মহাত্মা অর্জ্জুন দাস কলিকাতা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে একদিন গোস্বামী প্রভুকে চুপে চুপে হিন্দিভাষায় বলিলেন—গোঁসাইজী, আমি ৫২ প্রকার কল্পসাধন জানি, আপনার অনুমতি হইলে আপনার শরীরের সমস্ত পরমাণু পরিবর্ত্তন করিয়া আপনাকে নিরোগ করিয়া দিতে পারি।" গোস্বামী প্রভু উত্তর করিলেন—"মহারাজ, ইহাতে কি আমার প্রারব্ধ কর্ম্ম নষ্ট হইবে?" মহাত্মা অর্জ্জুনদাস উত্তর করিলেন—"মহারাজ, সো বাত হাম কহেনে নেহি শক্তে হে।" তখন গোস্বামী প্রভু বলিলেন—"তবে আমাকে ক্ষমা করুন। আমার উহাতে প্রয়োজন নাই।" এই প্রারব্ধ কর্ম্ম দূর করিবার অধিকারী নির্ণয় প্রসঙ্গে একদা গোস্বামী প্রভু বলিয়াছিলেন—"ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও একটী সাময়িক আনন্দের স্রোত খুলিয়া দিতে পারেন, কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্ম নষ্ট করিতে একমাত্র সদ্‌গুরু ভিন্ন আর কেহ অধিকারী নহেন।"

কম্বুলীটোলা হইতে গোস্বামী প্রভু পটলডাঙ্গা সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটস্থ ১৪।২ নং ভবনে আসিয়া দীর্ঘকাল বাস করেন। তিনি যখন যে স্থানেই অবস্থান করিতেন সেই স্থানেই নৈমিষারণ্য বদরিকাশ্রমবাসী ঋষিদিগের সম-দম-তিতিক্ষাদি তপ-কল্পলতিকা সকল যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিত। তাঁহার আশ্রমের পাঠ-পূজা-কীর্ত্তনাদি নিত্যনৈমিত্তক ক্রিয়া সকল প্রত্যহ যে ভাবে সম্পন্ন হইত তাহার উল্লেখ এক স্থানে করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার আলয়ে প্রায় সর্ব্বদাই শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্বতন্ত্রভাবে ভগবতাদি শাস্ত্র পাঠ করিতেন, কেহ হোম করিতেন, কেহ

বা ভজনানন্দে মগ্ন থাকিতেন। এইভাবে দিবানিশি একটী প্রবল ধর্ম্মের স্রোত আশ্রমের উপর দিয়া প্রবাহিত হইত।

এই স্থানে অবস্থান কালে প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রদ্ধেয় বেণীমাধব বাবু প্রভৃতি গোস্বামী প্রভুর নিকটে করতাল সংযোগে সাধারণতঃ যে সকল ভজন গান করিতেন তন্মধ্য হইতে তিনটী মাত্র গান নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে ; যথাঃ—

১। রাগিণী ভৈঁরো—ঠুংরি।

হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ গাওরে।
গাও শ্রীমধুসূদন, যশোদানন্দন, কৃষ্ণ গোপীজনবল্লভ প্রাণারামে॥

২। ললিত—ঠুংরি।

জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে।
তব গুণ কথনে, শ্রবণ মননে, সব শোকতাপ হরে॥
গায় ঋষিগণ, তন্নাম অবিরাম, হে পরমেশ, প্রাণেশ প্রাণারাম,
অনুদিন যোগভরে।
কিবা তব নাম, প্রেমনিরঞ্জন, যোগীতপোধন ধ্যান করে ;
সুধাগন্ধে অন্ধ ভক্ত-অলিবৃন্দ, (তব) পদারবিন্দে বাস করে ;
ও পদ স্মরণে দর্শনে স্পর্শনে (কত) মহাপাতকী তরে॥

৩। ললিত বিভাষ—একতালা।

রাই জাগো রাধে জাগো, শুক-সারী বোলে।
বৃন্দাবনমে, কুসুমিত কাননে, ভ্রমরা হরিগুণ গায় হে॥

তমালকি ডালে পিক কুহরতু, পাপিয়া ছোরতহু তান হে।
কদমকি মূলে গোচারণ-চ্ছলে, কানুয়া তুয়া লাগি ধায় হে ॥

এই স্থানে সন্ধ্যা কীর্ত্তনের সময় প্রায়ই গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য কোকিল-কণ্ঠ সুগায়ক শ্রদ্ধেয় রেবতীমোহন সেন (মূক-বধির বিদ্যালয়ের প্রধান সহকারী শিক্ষক) মহাশয় অগ্রণী হইয়া কীর্ত্তন করিতেন এবং শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দে, শ্রীযুক্ত সরলনাথ গুহ, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মিত্র প্রভৃতি সেবকবৃন্দ কীর্ত্তনে তাঁহার সাহায্য করিতেন। কীর্ত্তনে কোন কোন দিন যেরূপ অপূর্ব্ব ভাবের সমাবেশ হইত তাহা বর্ণতাতীত। তাহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহাদের চিত্তপটে তাহা চিরকালের তরে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। কীর্ত্তনান্তে গোস্বামী প্রভু নিম্নলিখিত শ্লোক কয়েকটী আবৃত্তি করিয়া লুট বিতরণ করিতেন। শ্লোক, যথাঃ—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরেহরে ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ ॥

কীর্ত্তনের পর কোন কোন দিন গোস্বামী প্রভু যখন কোকিলকণ্ঠ-বিনিন্দিত-স্বরে নিম্নলিখিত গান করিতেন, তখন উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী একাধারে শ্রীগৌরাঙ্গলীলার গভীরতা, মাধুর্য্য ও শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইতেন। গান যথাঃ—

ললিতবিভাষ—একতালা।

এমন দয়াল ভাই আর নাই, গৌর-নিতাই দু'ভাই ভিন্ন।
কলিযুগে জীবের লেগে হ'লেন নদে অবতীর্ণ,
বলিহারি যাই রে, জীবের ভয় আর নাই অন্য।
শ্রীচৈতন্যরূপের কি লাবণ্য, জিনি জাম্বুনদ স্বর্ণ, অভিন্ন
চৈতন্য নিত্যানন্দ বলরাম ধন্য ;
এই যে নিমাই, ব্রজের কানাই, শচী-রত্ন-গর্ভ-রত্ন,
শ্যামরূপ ঢাকা, রাইরূপ মাখা, নয়ন বাঁকা আছে চিহ্ন ॥
পুষ্পবন্ত যুগে সদয়, চন্দ্র সূর্য্য একত্র উদয়, কিরণে সমুদয়
চিত্তসন্দ তমো শূন্য ;
আচণ্ডালে, করি কোলে, অশ্রুজলে নিতাই মগ্ন,
প্রেমে নাচে, প্রেমধন যাচে, নাহি বাছে কোন বর্ণ ॥

এই গান করিতে করিতে গোস্বামী প্রভু নিজে নয়নজলে ভাসিতেন ও অপরকেও নয়নজলে ভাসাইতেন। আবার কখনো কখনো তিনি আপন মনে গান করিতেন :—

মূলতান মিশ্র—আড়খেমটা।

গৌর, তোর লাগি কাঙ্গাল হ'য়ে আমার এ যন্ত্রণা।
কেউ সুধায় না, কেউ সুধায় নারে, আমায় কাঙ্গাল বলে সবে
করে ঘৃণা ॥

কাঙ্গালের দোষ পদে পদে, সে রহে না কোন বিসম্বাদে,
তবু তারে ফেলাও বিপদে ;
(গৌর) তোর নামের একি এমনি ধারা, নাম নিলে হই পাগলপারা,
যে জন গৌর ব'লে ডাকে, তারে ফেলাও পাকে, আমি বুঝ্‌তে
নারি এ তোর কি মন্ত্রণা ॥
যে জন গৌর তোর অনুগত, তারে কাঁদাও অবিরত, এ ত
তোমার না হয় উচিত ;
(গৌর) তুমি সুখে বা দুঃখেতে রাখো, আমি তোমায় ছারবো
নাকো,
ক্ষেদে উত্তমচাঁদ বলে, গৃহে বা জঙ্গলে, সদা গৌর ব'লে ডাকি
এই বাসনা ॥

তাঁহার শ্রীমুখে করুণ-রসপূর্ণ এই গান শ্রবণ করিয়া উপস্থিত শিষ্য-মণ্ডলীর কেহ কেহ সাধকজীবনের কঠোর পরীক্ষার কথা স্মরণ করিয়া চিন্তান্বিত হইতেন, আবার কেহ কেহ বা ভক্ত-সাধকের এই মর্ম্ম-গাথার অন্তর্নিহিত অহৈতুকী-প্রেম-কাহিনীর মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া মহাপ্রেম-সাগরে নিমজ্জিত হইতেন।

এই স্থানে অবস্থানকালে এক দিবস পূর্ব্বোক্ত শ্রদ্ধেয় রেবতী বাবুর তান-লয়-সমন্বিত প্রাণস্পর্শী কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া, গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—"তোমার কণ্ঠ মধুময় হউক।" অতঃপর তাঁহাকে বেহালাদি কোন যন্ত্রের সংযোগে গান করিতে উপদেশ করিয়া একটী কীর্ত্তনের দল গঠন করিতে অনুরোধ করেন। বলা বাহুল্য শ্রদ্ধেয় রেবতী বাবু গোস্বামী প্রভুর এই কৃপাদেশ যথাসাধ্য পালন করিয়া আসিতেছেন।

এই স্থানে এক দিবস অবসরপ্রাপ্ত বিলাতপ্রবাসী প্রসিদ্ধ ডেপুটি কালেক্টর ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ৺ পার্ব্বতীচরণ রায় মহাশয় গোস্বামী প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করেন। ইঁনি ইংলণ্ডে অবস্থান কালে একটী ইংরাজ রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। এমন সময় একদিন তাঁহার শয়নকক্ষে একটী হিন্দুদেবীর (ভুবনেশ্বরীর) প্রকাশ দেখিয়া তিনি বিস্মিত হন। অপর একদিন তিনটী মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিতে আদেশ করেন। তদনুসারে তিনি দেশে আসিয়া গোস্বামী প্রভুর নিকট আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বর্ণন করিয়া বলিলেন যে, তিনি যে তিন জন মহাপুরুষ দর্শন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিনিও (গোস্বামী প্রভুও) একজন, অপর দুই জন মহাপুরুষের দর্শন তিনি কোথায় গেলে পাইতে পারেন। গোস্বামী প্রভু হরিদ্বারের নাম উল্লেখ করিলেন। ইহার পর তিনি হরিদ্বার যাইয়া তাঁহাদের দর্শন পাইয়াছিলেন। গোস্বামী প্রভু গেণ্ডারিয়া আশ্রমে অবস্থানকালে এই পার্ব্বতী বাবু এক সময় তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"গোসাই ভগবানের অস্তিত্বে আমার বিশ্বাস নাই, আর কাহারও কথায় আমি আস্থা স্থাপন করিতে পারি না, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, তুমি ঠিক করিয়া বলত ভগবান্ আছেন কিনা ?" গোস্বামী প্রভু উত্তর করিলেন—"হাঁ, তিনি আছেন।" পার্ব্বতী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাঁহাকে কি দেখা যায় ?" গোস্বামী প্রভু উত্তর করিলেন—"হাঁ, দেখা যায়।" পার্ব্বতী বাবু প্রশ্ন করিলেন—"তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ ?" গোস্বামী প্রভু বলিলেন—"হাঁ, দেখিয়াছি।" গোস্বামী প্রভুর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া তিনি যেন আশ্বস্ত হইলেন।

অতঃপর একদিন জনৈক ব্রাহ্ম (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আত্মীয়) গোস্বামী প্রভুকে প্রশ্ন করিলেন—"আপনি না কি রাধাকৃষ্ণ

ইত্যাদি বিগ্রহ মানেন, তাঁহাদের নিকটে প্রণাম করেন এবং ঈশ্বর সাকার এই কথা বিশ্বাস করেন? আমার কিন্তু আপনি ঐ সকল কথা বলিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। বাস্তবিক ঐ সকল কথা সত্য কিনা তাহা আপনার মুখে শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া আসিয়াছি।" তদুত্তরে গোস্বামী প্রভু স্বীয় কর্ণে অঙ্গুলি প্রদানপূর্ব্বক তিনবার 'শ্রীবিষ্ণু' শব্দ উচ্চারণ করিয়া বলিলেন—"আজ আপনি আমার আশ্রমটী অপবিত্র করিলেন। আপনি জানেন পরের মুখে ঝাল খাইয়া আমি কখনও কোন কথা বিশ্বাস করি নাই। যখন যেটী সত্য প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছি তখন তাহাই ধরিয়াছি ও বিশ্বাস করিয়াছি। যে মুখে ঈশ্বর নিরাকার বলিয়াছি, সেই মুখেই ঈশ্বর সাকার বলিতেছি। তাঁহার রূপ অবাঙমনসোগোচর। তিনি সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ। তাঁহার মুখ, হস্ত, পদ ইত্যাদি সকলই আছে, তবে তাহা জড়ীয় নহে। সত্য সত্যই তাঁহাকে দর্শন করা যায়, স্পর্শ করা যায়, আস্বাদন করা যায়। শুধু তাহাকে দর্শন করিয়াই আমি ক্ষান্ত হই নাই, তাঁহার দুই হাত, দুই পা টিপে টিপে দেখিয়াছি। বাস্তবিক তাঁহার দুই হাত দুই পা আছে। তাঁহার অপরূপ রূপ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আমি তাঁহার সহিত কথা বলিয়াছি, আর আপনাকে কত বল্‌বো? আমাকে এই প্রকার প্রশ্ন আর জিজ্ঞাসা করিবেন না। আমি প্রাণে বড় ব্যথা পেয়েছি।" এই বলিয়া গোস্বামী প্রভু ধ্যানস্থ হইলেন। লোকটী কিয়ৎকাল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। *

এই স্থানে অবস্থান কালে দুইটী আশ্চর্য্য ঘটনা সংঙ্ঘটিত হয়। ১ম। কলিকাতা দপ্তরী পাড়া নিবাসী প্রসিদ্ধা ধাত্রী এবং গোস্বামী প্রভুর শিষ্যা

---

* শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ রায় মহাশয়ের প্রদত্ত বিবরণ। ইনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীমতী ক্ষীরদা সুন্দরী দাসী তাঁহাকে ষড়ভুজ গৌরাঙ্গরূপে দর্শন করিয়া ভাবে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং অতি কষ্টে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে হইয়াছিল। ২য়। এই স্থানে ব্রাহ্ম শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদার মহাশয়ের মাতৃদেবী (ইঁনিও ব্রাহ্মিকা) গোস্বামী প্রভুর কৃপালাভ করেন। দীক্ষাপ্রাপ্তি মাত্রই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অশ্রুকম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিকভাব সকল ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইতে থাকে। ভাবের আবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অবশেষে তিনি অচেতন হইয়া পড়েন। অতঃপর কর্ণমূলে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে তাঁহার চৈতন্য হইলে তিনি বলিলেন—"প্রভো, আমি পেয়েছি, আমার ভগবদ্দর্শন হইয়াছে।" গোস্বামী প্রভু বলিলেন, "এ কথা অতীব সত্য। সত্য সত্যই আপনি ভগবানের দর্শনলাভ করিয়াছেন এবং আপনার দেহত্যাগ হইয়াছিল।" এই কথা শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে আমাকে পুনরায় বাঁচা'লে কেন?" তদুত্তরে গোস্বামী প্রভু বলিলেন—"কি করিব? পাহাড় জঙ্গল হ'লে মৃতদেহটা একদিকে টানিয়া ফেলিয়া দিলেই চলিত; কিন্তু এ যে কলিকাতা সহর। তোমাকে না বাঁচালে এখনই পুলিশের লোক আসিয়া ভয়ানক গোলমাল উপস্থিত করিত।" গোস্বামী প্রভুর জীবনে এইরূপ শত শত ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহাতে তিনি যে স্বতন্ত্র পুরুষ ছিলেন একথা নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গোস্বামী প্রভু যখন শ্যামবাজার ষ্ট্রীটের বাসায় অবস্থান করিতেছিলেন (১২৯৮ সাল, ২৪—২৭শে অগ্রহায়ণ) তখন কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী বদান্যপ্রবর ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় গোস্বামী প্রভুকে স্বীয় আলয়ে লইবার জন্য স্বর্গীয় রামকুমার বিদ্যারত্ন (রামানন্দ স্বামী) মহোদয়কে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় বিদ্যারত্ন মহাশয় গোস্বামী প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"ঠাকুর মহাশয়

ধর্ম্মার্থে উপযুক্ত পাত্রে অর্থ দান করিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করেন। আপনার সম্বন্ধে তিনি লোকমুখে অনেক কথা শুনিয়া আপনাকে একলক্ষ টাকা উৎসর্গ করিতে তাঁহার একান্ত আকাজ্ক্ষা জন্মিয়াছে। অতএব আপনার অবসর মত অনুগ্রহ করিয়া যদি একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন তবে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় আপনাকে জ্ঞাপন করিয়া ঐ টাকা আপনার হস্তে অর্পণ করেন—ইত্যাদি।"

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের এই প্রস্তাব শুনিয়া গোস্বামী প্রভুর চক্ষে জল আসিল। তিনি করযোড়ে ভগবানকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"ঠাকুর মহাশয়কে বলিবেন যে আমার এখানে যাহা যথার্থ প্রয়োজন, কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া তাহা প্রতিদিন ভগবান দিয়া থাকেন। একটী কাণা কড়িরও অভাব রাখেন না। তাঁরই দ্বারে তাঁর নাম নিয়ে যেন দীন হীন কাঙ্গাল হ'য়ে প'ড়ে থাকতে পারি, ঠাকুর মহাশয়কে এই আশীর্ব্বাদ করিতে বলিবেন। তিনি ঐ টাকা ধর্ম্মার্থে যথা ইচ্ছা দিতে পারেন। আমি তাহা গ্রহণ করিলে বিশেষ অনিষ্ট হ'বে মনে করি। আর বড় লোকের বাড়ী যেতে আমার ভয় হয়।"

গোস্বামী প্রভুর এই উত্তর শুনিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য যে বিদ্যা-রত্ন মহাশয় অতিশয় সদ্ভাবেই এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি এই ঘটনার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে হিমালয়বাসী জনৈক লোক-প্রসিদ্ধ মহাপুরুষের আদেশে গোস্বামী প্রভুর নিকট হইতে গৈরিক বসন ও তাহা ধারণের উপযোগী উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কারণেও গোস্বামী প্রভুর উপরে তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। সে যাহা হউক অতঃপর উক্ত ঠাকুর মহাশয় গোস্বামী প্রভুর নিকটে সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, তিনি তাঁহার

* "সদ্‌গুরু সঙ্গ" হইতে উদ্ধৃত।

নিকট আগমন করিয়া গোপনে কিছু বলিতে চাহেন। তদুত্তরে গোস্বামী প্রভু বলিলেন যে তাঁহার নিকটে সর্ব্বদাই লোকজন স্বাধীন ভাবে যাতায়াত করেন, কাহাকেও বাধা দেওয়া হয় না, সুতরাং নির্জ্জনে কথা হইবার সম্ভাবনা অতি কম।

এই ঘটনার দুই তিন বৎসর পরে শ্রদ্ধেয় ঠাকুর মহাশয় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশকে সঙ্গে লইয়া এই স্থানে গোস্বামী প্রভুকে দর্শন করিতে আগমন করেন। তিনি ঠাকুর মহাশয়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে একখানা পৃথক আসন প্রদান করিলেন। কিন্তু বিনয়ের খনি ঠাকুর মহাশয় আসনখানা পশ্চাতে রাখিয়া ভূমিতলেই উপবেশন করিলেন এবং কিয়ৎকাল সাধুর বেশধারী ব্যক্তিদিগের অত্যাচারের কথা কিছু কিছু বলিয়া স্বীয় বাসভবনে প্রস্থান করিলেন। এই কথা উপলক্ষ করিয়া কিয়দ্দিন পরে গোস্বামী প্রভু শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বাবুকে বলিয়াছিলেন—"উনি (ঠাকুর মহাশয়) যে রূপ সরল ও অমায়িক লোক তাহাতে ধূর্ত্ত লোকের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া উহাঁর পক্ষে কঠিন। যদি উহার কোন হিতৈষী সুবোধ কর্ম্মচারী থাকেন, তাঁহার কর্ত্তব্য যে, তিনি নিজে বিশেষ ভাবে না জানিয়া কোন সাধুকে উঁহার নিকটে যাইতে না দেন।"

অতঃপর এইস্থান হইতে গোস্বামীপ্রভু সশিষ্যে শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন। শ্রীবৃন্দাবন যাইবার সময় গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছেন, এমন সময় বাটীর মেথরটী তাঁহাকে নমস্কার করিল। তিনিও মেথরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত করিয়া করযোড়ে বলিলেন—"আশীর্ব্বাদ করুন যেন রাধারাণীর দর্শন পাই।" তাঁহার এই প্রকার ভাব দেখিয়া মেথরটী কাঁদিয়া ফেলিল; এবং উপস্থিত শিষ্যবৃন্দও অতিশয় অভিভূত হইলেন। ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে সাধককে কিরূপভাবে অগ্রসর হইতে হয় তাহার একটী

প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। গোস্বামী প্রভু এক সময় বলিয়াছিলেন যে, "ভগবৎপ্রাপ্তির পথ সমস্ত নরনারীর চরণতল দিয়া।"

শ্রীবৃন্দাবন গমন করিবার সময় রেলগাড়ীর মধ্যে গোস্বামী প্রভু শিষ্য-দিগকে স্নেহভরে উপদেশ করিলেন—"দেখ, শ্রীবৃন্দাবন গিয়া সকলকেই কয়েকটী নিয়ম পালন করিয়া চলিতে হইবে। নিয়মগুলি এই যে, কোনও ব্রজবাসীকে হীন মনে করিবে না, তাঁহাদের কার্য্যে কোনরূপ দোষ দর্শন করিবে না, ব্রজমায়ীর চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কদাচ কোন কথা বলিবে না, এবং প্রত্যহ অন্ততঃ একবার কোন ঠাকুর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া বিগ্রহ দর্শন করিবে। এই ভাবে না চলিলে কেহ ব্রজে স্থান পাইবে না।" ইহার শেষোক্ত উপদেশটী লক্ষ্য করিয়া জনৈক শিষ্য অপর কতিপয় শিষ্যের নিকটে এই ভাব ব্যক্ত করিলেন যে, 'গুরুনিষ্ঠা থাকিলে ভগবান্ অথবা তাঁহার বিগ্রহাদির প্রতি ভক্তি না করিলেও ক্ষতি নাই। কথাটী গোস্বামী প্রভুর কর্ণগোচর হইলে তিনি বলিলেন— "ভগবত্তত্ত্ব গুরুতত্ত্বেরই অন্তর্গত। গুরুভক্তি লাভ হইলে ভগবান্ অথবা তাঁহার বিগ্রহাদির প্রতি ভক্তি না হইয়াই পারিবে না। যদি কেহ বলেন যে তাঁহার গুরুভক্তি লাভ হইয়াছে অথচ তিনি ভগবদ্বিগ্রহাদি মানেন না, তবে বুঝিতে হইবে যে তাঁহার গুরুভক্তিই লাভ হয় নাই।"

শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া গোস্বামী প্রভু কিছুদিন প্রসিদ্ধ কালাবাবুর কুঞ্জে অবস্থান করিয়াছিলেন ; পরে লুইবাজারের তীর্থমুনির কুঞ্জে গিয়া তথায় প্রায় ৬ মাস বাস করেন। এইস্থানে অবস্থান কালে একদিন জনৈক পাণ্ডা গোস্বামী প্রভুর জন্য শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর প্রসাদ আনিয়া উপস্থিত করিলে তিনি তাহা পৃথক্ করিয়া রাখিয়া দিলেন। কিয়ৎকাল পরে পায়খানা পরিষ্কার করিবার জন্য মেথররমণী আগমন করিলে গোস্বামী প্রভু তাহাকে নিকটে ডাকাইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রসাদ প্রদানপূর্ব্বক

করযোড়ে বলিলেন,—"মা, ছোটকালে মা বিষ্ঠা পরিষ্কার করিতেন, এখন সেই কার্য্য তুমি করিতেছ। মা ভিন্ন গু ফেলিতে সকলেই ঘৃণা করে, সুতরাং তুমিত মায়েরই কার্য্য করিতেছ। মা, তোমাকে আমি আর কি দিব? তোমার জন্য আজ গোবিন্দজীর প্রসাদ রাখিয়াছি।" গোস্বামী প্রভুর এইরূপ সকরুণ বাক্য শুনিয়া মেথররমণী কাঁদিয়া ফেলিল, পরে বলিল—"বাবা আমাদিগকে এমন করিয়া কেহত কখনো কথা বলে না। তুমি ধন্য—ইত্যাদি।"

এইস্থানে গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দে মহাশয় স্বীয় গুরুদেবের আগ্রহে কখনো রাধাকৃষ্ণলীলা, কখনো বা গৌরলীলা বিষয়ক গান করিয়া তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতেন। তিনি যখন একতারা সংযোগে গোস্বামী প্রভুর নিকটে নিম্নলিখিত গান করিতেন, তখন উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী কি জানি কেন, কি ভাবে অভিভূত হইয়া অধিকক্ষণ অশ্রু সম্বরণ করিতে সমর্থ হইতেন না। গান যথা :—

খাম্বাজ—যৎ।

গৌর অনুগত না হ'লে কি তাপিত প্রাণ জুড়ায়।
(আমরা) যেনে শুনে প্রাণ সঁপেছি শ্রীগৌরাঙ্গের পায় ॥
নয়নরঞ্জন খঞ্জন আঁখি, যত দুঃখী তাপীর দুঃখপাসরা,
নবদ্বীপের নবগোরা দেখ্‌বি যদি আয় ॥
দ্বিজ গোঁসাই চাঁদে বলে, শ্রীগৌরাঙ্গের নাম না নিলে,
কি ক'রবে তোর বিদ্যাকুলে বৃথা জনম যায় ॥

এই সময় শ্রীবৃন্দাবনে নিম্বাদিত্য সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রজবিদেহী রামদাস কাঠিয়া বাবা (প্রয়াগের কুম্ভমেলাতে এই মহাত্মার সঙ্গে গোস্বামী প্রভু বিশেষভাবে পরিচিত হন) ও সিদ্ধ জগদীশ বাবা অবস্থান করিতেছিলেন।

ইঁহারা প্রায়ই গোস্বামী প্রভুকে দর্শন করিতে তাঁহার আলয়ে আগমন করিতেন। গোস্বামী প্রভুও মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের আশ্রমে গিয়া তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিতেন। এই দুইজন মহাপুরুষই গোস্বামী প্রভুর শিষ্যদিগকে অতীব স্নেহ সমাদর করিতেন। একদিন মহাত্মা কাঠিয়া বাবা গোস্বামী প্রভুর সম্মুখে তাঁহার শিষ্যদিগকে বালকের ন্যায় সরলভাবে হিন্দি ভাষায় বলিলেন—"দেখ, বাবা (গোস্বামী প্রভু) যখন এখানে (শ্রীবৃন্দাবনে) থাকিবেন তখনত তোমরা তাঁহার নিকটেই থাকিবে, কিন্তু যখন উঁনি এখানে না থাকিবেন তখন তোমরা আমার নিকটেই থাকিবে। আমি সত্য বলিতেছি আমি তোমাদের জন্যই আশ্রম প্রস্তুত করিয়াছি।" তাঁহার এই বালকোচিত সরলতামাখা ও গভীর স্নেহব্যঞ্জক কথা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত সকলেই আনন্দরসে আপ্লুত হইলেন।

শ্রীবৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ ময়ূরমুকুট বাবাজী মহাশয়ও এই সময় তথায় বাস করিতেছিলেন। ইঁনি অনেক সময় গোস্বামী প্রভুর আতিথ্যগ্রহণ করিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করিতেন। ১২৫৮ সনের ১৩ই শ্রাবণ সোমবার ব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত নন্দগ্রামে কিংবা বর্ষানে মহাত্মা ময়ূরমুকুট বাবাজী জন্মগ্রহণ করেন; এবং শুকদেবের ন্যায় প্রগাঢ় বৈরাগ্যবশতঃ ৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া হিমালয়ের নানাস্থানে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক জনৈক লামা সন্ন্যাসীর সহিত ৪।৫ বৎসর অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি অযোধ্যা-নিবাসী জনৈক বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর নিকটে দীক্ষিত হইয়া হিমালয়ে অবস্থানপূর্ব্বক কঠোর সাধনায় মনোনিবেশ করেন। ইঁনি বহুকাল তপস্যা করিয়া অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন এবং অবশেষে কৈলাস পর্ব্বতে উৎকট সাধনা করিয়া কৈলাসপতির দর্শন লাভকরতঃ নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন। সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তদবধি তাঁহার অন্তরে আপনাআপনি শ্রীবৃন্দাবনের মধুরলীলা স্ফূর্ত্তি পাইতে

মহাত্মা ময়ূর মুকুট বাবা।

থাকে।* এই অপ্রাকৃত লীলারসের আস্বাদ পাইয়া তাহাতে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হইবার অভিপ্রায়ে কৈলাসনাথের শরণাপন্ন হইলে, তিনি প্রসন্ন হইয়া বাবাজী মহাশয়কে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিতে আদেশ প্রদানপূর্ব্বক বলেন যে, তথায় তাঁহার সদ্‌গুরু লাভ হইবে, যাঁহার নিকট তিনি রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। এইরূপ কৃপাদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হইলেন এবং কিছুদিন সদ্‌গুরুর অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে রাধাকুণ্ডে উপস্থিত হইলে, একদিবস শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী রাধারাণী তাঁহাকে স্বপ্নযোগে আদেশ করেন যে, শ্রীবৃন্দাবনে কেশীঘাটে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহার সকল আশা চরিতার্থ হইবে। তদনুসারে বাবাজী মহাশয় শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া কেশীঘাটে গোস্বামী প্রভুর সাক্ষাৎ পাইলেন এবং কৈলাসপর্ব্বতে মহাদেবের অনুজ্ঞা ও রাধাকুণ্ডে শ্রীমতীর স্বপ্নাদেশ আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে কৃপাপূর্ব্বক শক্তিসঞ্চার করিলেন। শক্তিসঞ্চার মাত্রই বাবাজী মহাশয় গোস্বামী প্রভুর মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের দর্শন প্রাপ্ত হন।* দর্শন পাইয়াই তিনি ভগবানের নিকটে কিছু নিদর্শন প্রার্থনা করিলেন; তখন ভক্তবৎসল শ্রীহরি তাঁহার সমক্ষেই একটী ময়ূরের রূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক পক্ষ ঝাড়া দিয়া কতকগুলি পালক নিক্ষেপ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সেই পালকগুলি সংগ্রহ করিয়া বাবাজী মহাশয় একটী মুকুট প্রস্তুত করাইয়া মস্তকে ধারণ করিতে লাগিলেন। তদবধি তিনি ময়ূরমুকুট বাবাজী বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। মহাত্মা ময়ূরমুকুট গোস্বামী প্রভুর উপরে এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহার তিরোভাবের পরে

* এই ঘটনাটি বাবাজী মহাশয় ঢাকায় অবস্থানকালে গোস্বামী প্রভুর জনৈক শিষ্যের নিকটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

তদীয় সমাধিস্থান দর্শন করিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবন পরিত্যাগপূর্ব্বক পুরী (শ্রীক্ষেত্র) গমন করিয়া কিয়দ্দিন তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি গোস্বামী প্রভুর গেণ্ডারিয়া আশ্রম দর্শন করিবার জন্য কলিকাতা হইয়া ঢাকায় গমন করেন এবং তথাকার আশ্রমের শোভা সৌন্দর্য্য দশন করিয়া অতীব প্রীতি প্রকাশ করেন। এই সুযোগে ঢাকাবাসী বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত নরনারী তাঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধন্য হন। গোস্বামীপ্রভুর শিষ্যমণ্ডলীকেও তিনি অতিশয় প্রীতি ও স্নেহের চক্ষে দর্শন করিতেন এবং তাঁহাদের নিকটে অনেক মনের কথা, প্রাণের ব্যথা ব্যক্ত করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। কিয়ৎকাল ঢাকায় অবস্থান করিয়া তিনি অযোধ্যা হইয়া শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন এবং তথা হইতে শিষ্যমণ্ডলী নিকটে ইঙ্গিতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া হিমালয়ে গমনপূর্ব্বক কৈলাস পর্ব্বতের কোন নিভৃতকক্ষে অন্তর্হিত হন। তাঁহার এই ভাবী মহাপ্রস্থানের কথা তিনি শ্রীবৃন্দাবন পরিত্যাগ করিবার সময়, গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য বৃন্দাবণ্যবাসী শ্রীযুক্ত মন্মথরঞ্জন চৌধুরী মহাশয়ের নিকট স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

গোস্বামী প্রভু যখন যেস্থানে অবস্থান করিতেন, তাঁহার আশ্রমের আয় ব্যয় নির্ব্বাহের ভার একজন বিশেষ ব্যক্তির উপর ন্যস্ত থাকিত। এই সময় কিয়দ্দিনের জন্য গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য স্বর্গীয় পণ্ডিত ভারতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর উক্ত গুরুতর ভার অর্পিত হইলে, তিনি অতিশয় পরিপাটীরূপে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইঁনি অতিশয় নিরীহ, সংযমী, ক্রোধশূন্য, নিরভিমানী এবং পরম ভক্ত লোক ছিলেন। ১২৪৪ সনের মাঘ মাসে ঢাকা জেলার অন্তর্গত শ্রীনগর ষ্টেসনের অধীনে কালাসাধা গ্রামে (চলিত নাম তারপাশা) ইঁনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতৃদেবের নাম ৺গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়। শ্রদ্ধেয়

পণ্ডিত মহাশয় ৩০ বৎসরকাল অতিশয় দক্ষতার সহিত ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের অধ্যাপকের কার্য্য করিয়া পেন্সন গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া রাধাকুণ্ডে বাস করেন, এবং জীবনের শেষ ১৫ বৎসর সাধন ভজনে অতিবাহিত করিয়া ৭০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। গুরু-কৃপায় ইঁনি দেহে থাকিতেই শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রাকৃত লীলা সম্ভোগের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গোস্বামী প্রভু একদিন কথা প্রসঙ্গে ইঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, "সাধনপ্রাপ্ত লোকদিগের মধ্যে যে কয়েক জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে ভারত পণ্ডিত মহাশয় অন্যতম।" গোস্বামী প্রভু শ্রীক্ষেত্রে গমন করিলে ইঁনিও তথায় গিয়া গুরুগোবিন্দ একত্রে দর্শন করিয়া নয়ন সফল করিয়াছিলেন। তথা হইতে পুনরায় তিনি শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া নির্জ্জন সাধন-ভজনে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি প্রায় নিদ্রা যাইতেন না, সমস্ত রাত্রি বসিয়া সাধন করিতেন এবং অধিকাংশ সময় সমাধিস্থ থাকিতেন। অতঃপর সন ১৩১১ সনের ৬ই মাঘ সজ্ঞানে হরিনাম করিতে করিতে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনলীলায় প্রবেশ করেন। ইহার ২।৩ দিবস পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার দেহত্যাগের কথা কতিপয় সতীর্থের নিকটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

ভাদ্রমাসে গোস্বামী প্রভু বাঁকিপুর হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তথায় কিয়ৎকাল সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটস্থ পূর্ব্বের বাসভবনে অবস্থান করিয়া কার্ত্তিক মাসে ঢাকা গেণ্ডারিয়া আশ্রমে উপস্থিত হন। মাঘ মাসে এই স্থানে মহাসমারোহের সহিত ধূলটোৎসব সম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষে কলিকাতা, বরিশাল, মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থান হইতে বহু শিষ্যসেবক আগমন করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত মুকুন্দ কীর্ত্তনীয়া নিমন্ত্রিত হইয়া সদলবলে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

স্থানাভাব বশতঃ অনেককে তাঁবুতে বাস করিতে হইয়াছিল। আশ্রমে যেন একটী আনন্দের বাজার বসিয়া গিয়াছিল। কেহ পাঠ করিতেছেন, কেহ গান করিতেছেন, কেহ বা ভাবে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন। কেহ প্রসাদ বিতরণ করিতেছেন, অপর সকলে তাহা আনন্দে ভোজন করিতেছেন। এই ভাবে দিবানিশি উৎসব চলিয়াছিল।

আশ্রমস্থ একটী কাল-জাম বৃক্ষের মূলে প্রকাণ্ড চাঁদোয়ার নীচে যথাশাস্ত্র মঙ্গলঘট স্থাপনপূর্ব্বক গৌর-নিতাই-সীতানাথের চিত্রপট স্থাপিত হইয়াছিল। তথায় প্রত্যহ ভোগ পূজা আরতি ও কীর্ত্তন হইত। কীর্ত্তনের মধ্যে যখন গোস্বামী প্রভু হরিনাম-মদিরায় মত্ত শিষ্যবৃন্দ সহ মহাভাবে বিভোর হইয়া 'জয় শচীনন্দন' 'ধন্য কলি' ইত্যাদি বাক্য সিংহনাদে উচ্চারণ করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেন, তখন চারিশত বৎসর পূর্ব্বের শ্রীবাসের আঙ্গিনায় ভক্তবৃন্দ সহ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নৃত্যোৎসবের কথা সকলের স্মৃতিপথে উদিত হইত। এইরূপে এক সপ্তাহকাল দিবারাত্র মহামহোৎসব চলিয়াছিল। সকলেই যেন আনন্দে আত্মহারা। পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন বসু, শ্রীযুক্ত রাধারমণ গুহ, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ, শ্রীযুক্ত শশিমোহন বসু, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ প্রভৃতি গোস্বামী প্রভুর গেণ্ডারিয়াবাসী শিষ্যগণ আপনাদের সুখ, স্বচ্ছন্দতা, আরাম, বিশ্রাম ইত্যাদি বিস্মৃত হইয়া, দিবানিশি উৎসবের কার্য্যে ও আগন্তুক শিষ্য ও অতিথি-অভ্যাগতের সেবাতেই রত থাকিতেন। এই সেবা-ব্যাপারে জাতি, বর্ণ কিংবা বয়সের বিচার ছিল না। সকলেই আপনাকে হীন বিবেচনা করিয়া অপরকে যথাযোগ্য মর্য্যাদা দান করিতেই যেন ব্যস্ত থাকিতেন। গোস্বামী প্রভুর উদাসীন শিষ্য, শ্রদ্ধেয় বিধুভূষণ ঘোষ মহাশয়ের উপর সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হইয়াছিল। গুরুশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি আহার নিদ্রা প্রভৃতি শারীরিক

ধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া দিবানিশি এই হরিনামযজ্ঞের বিভিন্ন কার্য্যের শৃঙ্খলা সম্পাদনে তৎপর থাকিতেন। যে স্থানে যে কার্য্যের ত্রুটি লক্ষিত হইত, শ্রদ্ধেয় বিধু বাবু বিদ্যুদ্বেগে তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার সুব্যবস্থা করিয়া দিতেন। গোস্বামী প্রভুর শিষ্য শ্রদ্ধাভাজন নবকুমার বাকৃচী মহাশয় সমস্ত প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়া এই মহোৎসবের শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। বিবিধ স্থান হইতে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহের ভার সুযোগ্য কর্ম্মঠ শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন বসু মহাশয়ের উপর ন্যস্ত হইলে, তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য অতিশয় দক্ষতা ও নৈপুণ্য-সহকারে সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

ধূলটের শেষ দিবস একটী বিরাট নগরসংকীর্ত্তন বাহির করা হইয়াছিল। গুরুশক্তিতে শক্তিমান হইয়া শিষ্যবৃন্দ আশ্রম হইতে—

"দয়াল নিতাই ডাকে আয়।
প্রেমধন বিলায় গোরারায়॥" ইত্যাদি।
(এই ধর প্রেম লও বলিয়ে)

এই কীর্ত্তন করিতে করিতে বহির্গত হইলেন তাঁহাদের মধ্যে এমন একটী অপূর্ব্বশক্তির স্রোত ও ভাবের উত্তাল তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছিল যে, তাহার ঘাত-প্রতিঘাতে সমগ্র সহরটী যেন টলমল করিতে লাগিল। সকলেই আনন্দে উন্মাদ। কীর্ত্তনকারিগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে সহর প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। আহ্বান নাই, সংবাদ নাই, দলে দলে লোক আসিয়া সংকীর্ত্তনে যোগ দিতে আরম্ভ করিল। চারিদিকেই হরি নামের জয়ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শ্রুতিগোচর হইতেছিল না। দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে কাহারও মুখে কথা নাই, সকলেই নীরব নিস্পন্দ হইয়া কি দেখিতেছে, কি শুনিতেছে কিছুই যেন বুঝিতে পারিতেছে না।

কেহই আর আপনাতে নাই ; ক্ষণকালের জন্য সংসার যেন সহর হইতে উঠিয়া গিয়াছিল। অকিঞ্চন ভক্ত শ্রীধর উৰ্দ্ধদিকে অঙ্গুলী-নির্দ্দেশপূর্ব্বক 'ঐ দেখ ক্ষীরোদ সাগর,' 'ঐ দেখ শ্বেতদ্বীপ' বলিয়া গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে যাহাকে সম্মুখে পাইতেছিলেন তাহাকেই আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এমন সময় একখানি চলন্ত ঘোড়ার গাড়ী সম্মুখে নিপতিত হইলে, তিনি উহার ঘোড়াকেই আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। শত্রুঘ্ন নামক জনৈক উড়িষ্যাবাসী শিষ্য ভাবে একেবারে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলে, অপরাপর শিষ্যগণ তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধাবিত হইল। যে যে রাস্তা দিয়া কীর্ত্তন যাইতে লাগিল, তাহার দুই ধারের বাটী সমূহ হইতে নারীবৃন্দ উলুধ্বনি করিয়া পুষ্প, খৈ প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য ও পার্শ্বের বিপণিশ্রেণী হইতে লোকসমূহ বাতাসা ও অন্যান্য মিষ্টদ্রব্য কীর্ত্তনের দলের উপর অজস্র বর্ষণ করিতে লাগিল। শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন গোস্বামী প্রভু অশ্বযানারোহণে কীর্ত্তনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে কতকগুলি সৈন্য তাঁহার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল, তাহারা তাহাদের স্কন্ধস্থিত বন্দুক অবনত করিয়া গোস্বামী প্রভুকে সম্মান প্রদর্শন করিল। বিদ্যুৎবেগে কীর্ত্তনের দল অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে প্রায় ৩।৪ মাইল পথ পরিক্রমণ করিয়া অবশেষে আশ্রমে উপনীত হইল। এই প্রকারে নগরকীর্ত্তন সমাধাকরতঃ শিষ্যবৃন্দ পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন অভিবাদনাদি করিয়া বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

এই উৎসব সম্বন্ধে জনৈক দর্শকপ্রদত্ত একটী বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে, যথা:—"ঢাকার ধূলটের সময় অদ্ভুতশক্তি প্রকাশ করিয়া গোঁসাই অনেককে কৃপা করেন। সংকীর্ত্তনের সময় ঐ ঢাকা সহরে হরিনামের প্রভাবে ধর্ম্মের এক মহাস্রোত বহিয়া যায়। গোঁসাই প্রভু যেদিক্

দিয়া সংকীর্ত্তন লইয়া যান, সেই দিকের লোকসকল উন্মত্ত হইয়া উঠে। যে যে অবস্থায় ছিল, আত্মহারা হইয়া সংকীর্ত্তনে মিলিল, এক কর্ম্মকার কাজ করিতে করিতে হাতে যন্ত্রপাতি লইয়া কীর্ত্তনে যোগ দিল এবং অজ্ঞানবৎ নৃত্য করিতে লাগিল। জনৈক চামার জুতা সেলাই করিতে করিতে আসিয়া নাচিতে লাগিল; লোকে লোকারণ্য, সে ব্যাপার বর্ণনা করা অসম্ভব। গোঁসাই সেইদিন ঢাকা সহর মাতাইয়া গেণ্ডারিয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ওদিকে নগরের সব লোক তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়ায়। কত লোক কত নামে কীর্ত্তনের দল বাহির করিল। ঢোল লইয়া, খোল লইয়া, অন্যান্য যন্ত্র লইয়া, যাহার যাহা ছিল তাহা লইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে নগরে বাহির হইল এবং পাগলের মত বাজাইয়া, গাইয়া রাস্তায় চলিল আর কিছুক্ষণ এইরূপ হইলে নগর সমেত লোক উন্মত্ত ও পিশাচবৎ হইয়া পড়িত। কত লোক রাস্তায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল! দুই তিন দিন পর্য্যন্ত কাহারও কাহারও জ্ঞান ছিল না। ঐ দিন প্রভু বলিলেন, "আজ যে প্রার্থনা করিবে, সেই সাধন পাইবে" দিবস রাত্রিতে অন্যূন ৫০ লোক সাধন পাইলেন। আশ্রমের বৃক্ষ সকল হইতে মধু বর্ষণ হইতে লাগিল। মধুতে সমস্ত গাছের পাতা যেন ভিজিয়া গিয়াছিল। ঝর্ ঝর্ করিয়া মধু পড়িতেছে। বহুলোক সেই মধু আস্বাদন করিয়া দেখিতেছে। গোঁসাই ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া বলিতে লাগিলেন— "দেখ, দেখ, ভগবান্ আজ কেমন মেয়ে মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। অদ্ভুত! অদ্ভুত!!" *

উৎসবান্তে গোস্বামী প্রভু কলিকাতা যাইবার কথা উল্লেখ করিলে গেণ্ডারিয়াবাসী শিষ্যগণ মর্ম্মাহত হইলেন। ইঁহাদের গুরুভক্তির তুলনা নাই। আশ্রমবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা গোস্বামী প্রভুকে নিতান্ত আপনার

* শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধৃত।

জন, প্রাণের একমাত্র দরদী জ্ঞান করিয়া নিঃসঙ্কোচে আপন আপন মনের কথা, প্রাণের ব্যথা জ্ঞাপন করিয়া হৃদয়ের জ্বালা দূরীভূত করিতেন। তাঁহার প্রতি ইঁহারা যেরূপ উচ্চভাব পোষণ করিতেন তাহা দর্শন করিলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীদিগের স্বাভাবিক ভালবাসা ও আকর্ষণের কথা স্বতঃই মনে উদিত হইত। মহানুভব ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয় ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক-নিবাসে অবস্থানাবধি যেরূপ আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত গোস্বামী প্রভুর সেবা-পরিচর্য্যা করিতেন তাহা সম্যক্‌রূপ বর্ণনা করা অসম্ভব। গোস্বামী প্রভু কলিকাতা ফিরিয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন শুনিয়া শ্রদ্ধেয় ঘোষ মহাশয় একেবারে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। পুনরায় তাঁহাকে তাঁহার প্রধান লীলাস্থলে পাইবার জন্য, শ্রদ্ধেয় ঘোষ মহাশয়ের ধীমান গুরুবৎসল পুত্র শ্রীমান ফণিভূষণ ঘোষ কলিকাতা গমন করিয়া গোস্বামী প্রভুকে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আনিবার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয়ে অনুরোধ করিলে, তিনি তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। গেণ্ডারিয়াবাসীর মনে আশার সঞ্চার হইল প্রভুপাদ আবার আসিবেন, কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ তিনি আর ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না।

কলিকাতায় আগমন করিয়া গোস্বামী প্রভু, সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটস্থ ১৪।২নং ভবনে কিয়ৎকাল বাস করিবার পর হ্যারিসন রোডের ৪৫নং আলয়ে আগমন করিয়া তথায় প্রায় এক বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন। এই স্থানে অবস্থানকালে গোস্বামী প্রভু বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কুলীন গ্রামবাসীর প্রতি যেরূপ অসামান্য কৃপা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ হইলে—

> "কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর।
> সেহো মোর প্রিয় অন্যে রহু বহু দূর॥"

—ইত্যাদি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উক্তির কথা স্বতঃই স্মৃতিপথে উদয় হয়। তাঁহার এই অনুপম কৃপার বৃত্তান্ত কুলীনগ্রামবাসী জনৈক শিষ্যের স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি যথা ঃ—

"বোলপুরের প্রসিদ্ধ উকীল কুলীনগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু মহাশয় বলিলেন—"কে যে গোঁসাইর কৃপাপাত্র, কে অপাত্র ইহা বুঝিয়া উঠা দায়। এক দিন ইচ্ছা হইল দেশের লোকগুলিকে লইয়া গিয়া যদি ওঁর (গোস্বামী প্রভুর) নিকট হইতে দীক্ষা দেওয়াইয়া আনিতে পারি, তাহা হইলে খুব একটা কাজ হয়, লোকগুলি উদ্ধার হইয়া যায়। ইহা ভেবে দেশে পত্র লিখিলাম, কে কে গোঁসাইর নিকট হইতে দীক্ষা লইবে চ'লে এস, যাওয়া আসার সব খরচ আমার।' এই কথা শুনিয়া যত ইতর লোক—কামার, কুমার, ছুতার, হাড়ি, ডোম, চোর, ডাকাত, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ লোক সব সাজল। ভাল জাতিও ছিল কিন্তু তাঁদের সংখ্যা কম। কেবল বিদ্বান, পাণ্ডিত্যাভিমানী, ধার্ম্মিক, নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণ রহিলেন।" শ্রদ্ধেয় হরিদাস বাবু এই সময় কলিকাতা ৪৫নং হ্যারিসন রোডস্থিত গোঁস্বামী প্রভুর বাসভবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি এই সংবাদ পাইয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন বিলকুল গাঁওকে গাঁও হাজির, যত হেচি পেচির দল, ভদ্রলোক প্রায়ই নাই। যাঁহারা আসিবেন ভাবিয়াছিলেন তাঁদের মধ্যে দুই এক জন মাত্র। দেখিয়াই তাঁহার চক্ষুস্থির। পণ্ডিত মহাশয়ের (শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়) নিকটে দৌড়িয়া গেলেন। গিয়া বলিলেন—"পণ্ডিত মহাশয় এখন উপায় কি? যত বেটা চোর ডাকাত ত আসিয়া হাজির, একজন আবার একটী পতিতা রমণীকে লইয়া আসিয়াছে, কি লজ্জার কথা!" গোঁসাই উপরে আছেন, তাঁহাকে জানাবে কে সাহস হয় না। সে দিন ত সেই ভাবেই গেল। পরদিন প্রাতে গোঁসাইর নিকটে যেমন যাইতে হয় তেমনি সকলে যাইয়া বসিতেই কথায় বার্ত্তায়

জগাই মাধাইর গল্প উঠিল। তার পর কোন এক ডাকাতের কৃপালাভের কথা বলিতেই হরিদাস বাবু সুযোগ পাইয়া গোঁসাইকে বলিলেন—"সেবার একজন, এইবার একদল পরিত্রাণ করিতে হইবে, তাহারা সব নীচে হাজির।" এই কথা বলিয়াই সাধনপ্রার্থী সকলের বিবরণ বলিলেন। গোঁসাই বলিলেন—"কা'ল দীক্ষা হবে।" এই আদেশ শুনিয়া হরিদাস বাবু হাতে আকাশ পাইলেন, তাঁহার গায়ে আর আনন্দ ধরে না। পরদিন সকলের দীক্ষা হইল। সে দীক্ষা এক অদ্ভুত ব্যাপার! কেহ কাঁদছে, কেহ হাসছে, কেহ নৃত্য করছে, কেহ বা অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে আছে। হাঁড়ি, মুচি, বামন, শূদ্র সব এক মিশাল। একে অন্যের পায়ে পড়ছে, আলিঙ্গন করছে—ইত্যাদি। অতঃপর গোঁসাইর নিকট হইতে বিদায় লইয়া সকলে দেশে গেলেন। দেশে ইঁহাদের কীর্ত্তন ও কীর্ত্তনে ভাব দেখিয়া সকলে অবাক হ'য়ে গেল। এই সকল দেখে শুনে দেশের অপরাপর অনেক লোক আসিয়া গোঁসাইর নিকট হইতে দীক্ষা লইয়া গেলেন। আজ কাল কীর্ত্তনে ইঁহাদের যেরূপ ভাব হয়, ভাল ভাল উচ্চ সাধকের মধ্যেও তাহা বিরল।" *

এই স্থানে প্রসিদ্ধগায়ক নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কোকিলকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া শ্রীযুক্ত গণেশদাস মহাশয় আসিয়া গোস্বামী প্রভুকে কীর্ত্তন শ্রবণ করাইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একবার গোস্বামী প্রভু কতিপয় শিষ্য সহ শান্তিপুরের কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে নীলকণ্ঠের যাত্রা গান শ্রবণ করিতে উপস্থিত হন। তাঁহার শ্রবণমঙ্গল সুমধুর কীর্ত্তন শুনিয়াই গোস্বামী প্রভুর ভাবসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। অশ্রুকম্প পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাব সমূহ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বিকশিত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে তিনি উন্মত্তবৎ নৃত্য করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া

* কুলীনগ্রামবাসী জনৈক শিষ্যের উক্তি।

নীলকণ্ঠও ভাবে মাতিয়া মহা উৎসাহে কীর্ত্তন করিতে করিতে গোস্বামী প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া আরতি করিতে লাগিলেন। গোস্বামী প্রভু মুহুর্মুহু হরিনামের সিংহনাদে দশদিক্ প্রকম্পিত করিতে লাগিলেন। এই সময় সেই স্থানে শান্তিপুরের অপরাপর অনেক গোস্বামিসন্তানও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের এই সব ভাল লাগিল না। তন্মধ্যে এক জন গোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন—"এরা ভারি গোলমাল ক'চ্ছে, শীঘ্র থামিয়ে দাও"। এইকথা শুনিয়া নীলকণ্ঠ খুব তেজের সহিত তারস্বরে বলিলেন—"যে স্থানে ভাবের আদর নাই, ভক্তের মর্য্যাদা নাই, সে স্থানে আমি গান করি না, সে স্থানে থাকাও আমি মহা অপরাধ মনে করি।" এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ গান বন্ধ করিয়া আসর হইতে চলিয়া গেলেন, গোস্বামিসন্তানদিগের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। এই দিন গোস্বামী প্রভুর মধ্যে মহাভাবের বিকাশ দেখিয়া, নীলকণ্ঠ তাঁহার প্রতি অতীব আকৃষ্ট হন। তাই অনেক দিন পরে গোস্বামী প্রভুকে গান শুনাইতে তিনি এবার কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন।

শ্রদ্ধেয় কীর্ত্তনীয়া গণেশদাসের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনবাসী সিদ্ধ প্রেমিক ভক্ত বলরামদাস বাবাজী মহাশয়ও গোস্বামী প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। ইঁহার সঙ্গে গোস্বামী প্রভুর শ্রীবৃন্দাবন অবস্থানকালে যথেষ্ট আলাপ-পরিচয় ছিল। বাবাজী মহাশয় এক সময় "সুখময় বৃন্দাবন" —ইত্যাদি কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া ভাবাবেশে তিনদিন পর্য্যন্ত অচৈতন্যাবস্থায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন; তখন ইঁহার রোমকূপ হইতে রক্তোদ্গম হইয়াছিল। অনেকে ইঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু গোস্বামী প্রভু যখন তাঁহার বুকের উপর কাণ পাতিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, তিনি তাঁহার পেটের ভিতর হইতে 'সুখময় বৃন্দাবন'

এই কথাটী পুনঃপুন অস্ফুটস্বরে উচ্চারিত হইতে শুনিতে পাইতেছেন, সুতরাং ইঁহার মৃত্যু হইতে পারে না, তখন সকলে নিঃসংশয় হইলেন। এই বৎসর এই মহাপ্রেমিক মহাপুরুষকে অতিথিরূপে পাইয়া, গোস্বামী প্রভু ইঁহাকে যথোচিত আদর-অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। কীর্ত্তনে ইঁহার ভাবাবেশ যিনিই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন।

এই স্থানে অবস্থানকালে গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য বীরভূমের অন্তর্গত আলিগ্রামনিবাসী সুগায়ক শ্রদ্ধেয় সূর্য্যনারায়ণ রায় মহাশয় প্রায়ই গোস্বামী প্রভুকে তাঁহার ভাবানুরূপ, কখনো রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক, কখনও বা শ্যামাবিষয়ক গান শুনাইয়া তৃপ্তি প্রদান করিতেন। এক দিবস তিনি কৃষ্ণলীলাসম্বন্ধীয় একটী গান করিতেছিলেন, এমন সময় গোস্বামী প্রভু তাহাতে বাধাপ্রদানপূর্ব্বক অতিশয় বিনীতভাবে বলিলেন —"দয়া ক'রে একটী শ্যামা-বিষয়ক গান করুন।" স্বীয় গুরুদেবকে এই ভাবে বিনয় প্রকাশ করিতে দেখিয়া, শ্রদ্ধেয় সূর্য্যবাবু কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইলেন, কিন্তু তখন কিছু না বলিয়া তাঁহার আদেশানুরূপ নিম্নলিখিত গান করিলেন; যথা :—

ভৈরবী—একতালা।

জাননা রে মন, পরম কারণ, শ্যামা কভু মেয়ে নয়।
সে যে মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয়॥
কভু পরে ধড়া, কভু বাঁধে চূড়া, ময়ূরপুচ্ছ শোভিত তায়।
(শ্যামা) কখনো পার্ব্বতী, কখনো শ্রীমতী,
কখন রামের জানকী হয়॥
হ'য়ে এলোকেশী, করে ল'য়ে অসি, দনুজদলে করে সভয়,
(আবার) ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী, ব্রজবাসীর মন হরিয়ে লয়।

যে ভাবে যে জন, করয়ে ভজন, সে রূপ তার মানসে রয়,
কমলাকান্তের হৃদি-সরোবরে কমল মাঝে কমল উদয় হয় ॥

কীর্ত্তনান্তে শ্রদ্ধেয় সূর্য্যবাবু, গোস্বামী প্রভুকে বলিলেন—“আপনি ওরূপ ভাবে আমার নিকটে বিনয় প্রকাশ করিলেন কেন? আমাকে আদেশ করিলেই ত হইত?” তদুত্তরে তিনি বলিলেন—“ভাব হইতে ভাবান্তরে লইলে ভাবের কাছে অপরাধ হয়। তাই আপনাকে ঐরূপ ভাবে বলিয়াছিলাম।” ভাবের অসাধারণ কোমলত্ব ও কমনীয়তা সম্বন্ধে তিনি অপর এক সময় বলিয়াছিলেন—“ভাবটী যেন লজ্জাবতী লতা, স্পর্শ করিলেই সঙ্কুচিত হইয়া যায়। ভাবের সামান্য অমর্য্যাদা হইলেই ভাব শুকাইয়া যায় এবং ভাবের কাছে ভয়ানক অপরাধ হয়। সুতরাং সকলেরই এই বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া প্রয়োজন।”

এই সময় গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য, হবিগঞ্জের ভূতপূর্ব্ব প্রসিদ্ধ উকিল, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গুরুদর্শনার্থ তৎসমীপে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাকে হবিগঞ্জ পরিত্যাগপূর্ব্বক গয়াতে গিয়া ওকালতী ব্যবসায় করিতে আদেশ করেন। গুরু-আজ্ঞা শিরোধার্য্যকরতঃ গয়ায় উপস্থিত হইয়া, শ্রদ্ধেয় বরদাবাবু প্রভুপাদকে তথাকার আকাশগঙ্গা পাহাড়ে অবস্থিত তাঁহার যোগদীক্ষাপ্রাপ্তির স্থানটীর স্মৃতিরক্ষার আবশ্যকতার বিষয় উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিলে, তিনি তাঁহাকে তৎকার্য্য করিতে অনুমতি প্রদান করেন। তদনুসারে শ্রদ্ধেয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গয়া উপস্থিত হইয়া, উক্ত স্থানটী সংস্কৃত ও চিহ্নিত করিয়া গোস্বামী প্রভুর শিষ্যমণ্ডলীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। গত বৎসর গোস্বামী প্রভুর শিষ্যদ্বয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু বি, এল, ও শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের উদ্যোগে এই স্থানে একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

৪৫নং হ্যারিসন রোডে অবস্থানকালে একদিবস ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক পরম শ্রদ্ধাস্পদ ৺প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়, গোস্বামী প্রভুর নিকটে আগমন করিয়া কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন—"মানুষের মুখ চেয়ে, লোকলজ্জা ক'রে জীবন নষ্ট করিলাম। এখন লোকে বড়লোক বলে, সেই অভিমানে মারা গেলাম। যথার্থ ধর্ম্ম হইল না, নিজেরই ক্ষতি হইল।" তদুত্তরে গোস্বামী প্রভু বলিলেন—"আপনি গীতা ও ভাগবত পাঠ করিবেন, কেবল ইংরেজীভাবে থাকিবেন না। যাহারা টাকাকড়ি দিয়া তুষ্ট করিতে চায়, তাহারা চিরদিনই ধর্ম্মজগতে নিন্দিত। ভগবান্ তাহাদের দোষ তাহাদের অন্তরে মাখাইয়া অহঙ্কারের সৃষ্টি করেন। তাহাতে তাহারা ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল হইতে ভ্রষ্ট হয়। ইহা অপেক্ষা শাস্তি আর কি হইতে পারে? যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত তাঁহারা একটু জানিতে পারিলে আর তাঁহাদের গৃহে পদার্পণ করেন না, ইহাও অল্প শাস্তি নহে।"

কোন এক সময় ব্রাহ্মসমাজভুক্ত সব্‌জজ স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়, গোস্বামী প্রভুর নিকটে কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ হয় কিসে?" তিনি উত্তর করিলেন—"ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র অবলম্বন করিলে।" শ্রদ্ধেয় চণ্ডীবাবু বলিলেন—"ব্রাহ্মসমাজ ত এখন তাহা করিয়া থাকেন।" গোস্বামী প্রভু উত্তর করিলেন—"না, তাহা করেন না। শাস্ত্রের যে অংশটুকু মতের সঙ্গে মিলে, তাহাই মাত্র অনুসরণ করেন। তাহাতে হইবে না। শাস্ত্র মানিতে হইলে আগাগোড়াই মানিতে হইবে।" এ সম্বন্ধে গোস্বামী প্রভু অপর একদিন বলিয়াছিলেন—"পূর্ব্বে যখন অভিধান দেখিয়া শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিতাম, তখন তাহার অনেকাংশ পরিত্যজ্য বোধ হইত। কিন্তু একদিবস গুরুদেবের কৃপায় যখন ঋষিগণ প্রকাশিত হইয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন যে, "তোমার অন্তরে শাস্ত্র স্ফূর্ত্তি হউক", তখন হইতে দেখি যে, শাস্ত্রের

পরায়ণ ব্যক্তি পুলিশ-কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে এই মর্ম্মে একখানি আবেদন-পত্র প্রেরণ করে যে, গোস্বামী প্রভুর আশ্রমে মাসিক অন্যূন ৪।৫ শত টাকা ব্যয় হয়, অথচ তাঁহার এক কপর্দ্দকও আয় বা উপার্জ্জন নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে পুলিশের দিক্ হইতে বিশেষভাবে তদন্ত হওয়া উচিত। এইরূপ পত্র পাইয়াই পুলিশের কর্ত্তৃপক্ষ ডাকঘরে এবং অপরাপর স্থানে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গোস্বামী প্রভু বিশ্বস্তসূত্রে এই ব্যাপার অবগত হইয়াও ইহার কোন প্রতিকারের চেষ্টা করিলেন না। তিনি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্তমনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য শ্রীযুক্ত ভূতনাথ ঘোষ (গোয়ালা) এক দিবস রাজ-পথে শতাধিক মুদ্রার একখানি চেক্ কুড়াইয়া পাইলেন। চেক্ পাইয়া তিনি গোস্বামী প্রভুকে সমস্ত বিষয় জানাইলে, 'কেন তিনি পরের দ্রব্যে হস্তার্পণ করিয়াছেন?' এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে তীব্র ভৎ সনা করিয়া চেকখানি তখনই পুলিশ কমিশনরের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন; এবং 'অমৃত বাজার পত্রিকায়' চেকপ্রাপ্তির সংবাদ প্রদান করিলেন। গোস্বামী প্রভুর এই কার্য্যে পুলিশের কর্ত্তৃপক্ষের মনে তাঁহার প্রতি যে অবিশ্বাসের উদয় হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইল। এই প্রকারে ভগবান্ গোস্বামী প্রভুকে আসন্নবিপদ হইতে রক্ষা করিলেন।

এই সময় গোস্বামী প্রভুর সুযোগ্য পুত্র পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগ-জীবন গোস্বামী মহাশয়ের উপর আশ্রমের আয়ব্যয়নির্ব্বাহের ভার অর্পিত হয়। অধিকবয়স্ক শিষ্য উপস্থিত থাকিতে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক যোগ-জীবন গোস্বামীর উপর এই দায়িত্বপূর্ণ গুরুতর ভার প্রদত্ত হইল দেখিয়া, জনৈক সূক্ষ্মদর্শী শিষ্য আপত্তি উত্থাপিত করিলেন। তদুত্তরে গোস্বামী প্রভু বলিলেন—"আমি কি করিব? মহাপুরুষগণ যোগজীবনকেই এই

কার্য্যের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। তাঁহাদের আদেশেই আমি এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি।"

ইদানীং গোস্বামী প্রভু নিজে কাহারও কোন চিঠিপত্রাদি দেখিতেন না, অথবা স্বহস্তে কোন চিঠি লিখিতেন না। ঐ সকল কার্য্যের ভার পূজ্যপাদ যোগজীবন গোস্বামীর উপর অর্পিত হইয়াছিল। শত শত লোক সাধনপ্রার্থী হইয়া গোস্বামী প্রভুর নিকটে আপন আপন জীবনের গূঢ় পাপকার্য্যের কথা বিবৃতকরতঃ দৈন্য প্রকাশ করিয়া পত্রাদি লিখিলে, পরদুঃখকাতর শ্রীযুক্ত যোগজীবন গোস্বামী মহাশয় সেই সকল পত্র পাঠ করিয়া অনেক সময় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন, এবং নির্জ্জনে গোস্বামী প্রভুর নিকটে উহার মর্ম্ম অবগত করাইয়া, সাধনপ্রার্থীদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। অনুকূল অনুমতি প্রাপ্ত হইলে তাঁহার আর আনন্দের সীমা থাকিত না। একদিবস গোস্বামী প্রভু বলিলেন—"দেখ্ যোগজীবন, তুই আর পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মার্থীদিগের সাধন-প্রাপ্তির অনুমতির জন্য আমার অপেক্ষা করিস্ কেন? তুই একটু চিন্তা করিয়া যাহাকে অনুমতি প্রদান করিবি, তিনিই সাধন পাইবেন।" কিন্তু পিতৃভক্তের শিরোমণি প্রভুপাদ যোগজীবন, পিতৃদেবের অনুমতি ভিন্ন কাহারও কোন চিঠির উত্তর প্রদান করিতেন না।" "পিতাই পুত্ররূপে উৎপন্ন হন" এই প্রবাদবাক্যের মধ্যে গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ পূজ্যপাদ যোগজীবন গোস্বামী স্বীয় পিতৃদেবের অমানুষিক তেজস্বিতা, জ্বলন্ত ধর্ম্মানুরাগ, অনধিগম্য উদারতা, অলোকসামান্য পরদুঃখ-কাতরতা, অপরিসীম দয়া, অসাধারণ ন্যায়নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণে সমলঙ্কৃত হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পিতাপুত্র একস্থানে বসিয়া যখন দেশ, ধর্ম্ম, সমাজ, পরলোক প্রভৃতি বিষয়ক কথোপকথন করিতেন, তখন পুরাকালের নরনারায়ণ ঋষির কথাই স্বতঃ মনে উদিত হইত। ইনি

প্রভুপাদ যোগজীবন গোস্বামী।

গোস্বামী প্রভুর দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার, দান, পরোপকারসাধন প্রভৃতি সমস্তকার্য্যে প্রাণপণে সাহায্য করিতেন। এমন পিতৃভক্ত পুত্র বঙ্গদেশে অতীব দুর্লভ।

এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের জন্ম সাধারণ মনুষ্য হইতে ভিন্নরূপে সংঘটিত হইয়াছিল। গর্ভাবস্থায় সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদিগের মাসিক ঋতু বন্ধ থাকে, কিন্তু পূজনীয় যোগজীবন গোস্বামী মহাশয়ের জন্মের সময় ইহার বিপরীত ঘটিয়াছিল। শাস্ত্রে এই লক্ষণকে মহাপুরুষের জন্মলক্ষণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ১২৭৬ সনের ২৯ অগ্রহায়ণ সোমবার শুক্লপক্ষীয় দশমী তিথিতে, ঢাকা সহরের পাতলাখাঁর গলিস্থিত ৩নং ভবনে যোগজীবন গোস্বামী জন্ম-গ্রহণ করেন। ইঁহার বালসুলভ চপলতার সঙ্গে সরলতা, সত্যপ্রিয়তা, দয়া, তেজস্বিতা, ন্যায়নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণ মিশ্রিত থাকাতে, ইঁনি পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজন ও গোস্বামী প্রভুর অপরাপর শিষ্যমণ্ডলীর অতীব প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অন্তরে দয়াবৃত্তি কিরূপ পরিস্ফুট হইতেছিল, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে প্রতিপন্ন হইবে। অনুমান ৫।৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে একবার জনৈক গরীবলোক শাকসব্জী বিক্রয় করিতে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলে, একব্যক্তি ২।১ পয়সার শাক ক্রয় করিয়া ফাওস্বরূপ পুনরায় কিঞ্চিৎ শাক লইবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীমান্ যোগজীবন তীব্রভাবে তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—"ইহারা গরীব লোক, এই শাক বিক্রয় করিয়া ইহারা সকলে খাইবে। ইহাদের ঠকাচ্ছ কেন?" এই অল্পবয়স্ক বালকের মুখে এইরূপ যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া আশ্রমস্থ সকলে অবাক্ হইলেন। সংসারের লোক সকল নিজের সুখ সুবিধা অনুসন্ধান করিতে করিতে এতই অন্ধ হইয়া পড়ে যে, অপরের সুখদুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে তাহাদের অবসরই থাকে না। কিন্তু শ্রীমান্ যোগ-

জীবনের ন্যায় যাঁহারা পরের দুঃখে দুঃখানুভব করেন, সংসারে তাঁহারাই ধন্য, তাঁহারাই নমস্য।

শ্রীমান্ যোগজীবন ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়েই লালিতপালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক সংস্কারাদি ব্রাহ্মসমাজের অনুরূপই হইয়াছিল। সন্ধ্যাবন্দনা, উপবীতধারণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি তাদৃশ অনুরাগ ছিল না। কিন্তু গোস্বামী প্রভু তাঁহার উপবীতসংস্কারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া, নিজে কিছু না বলিয়া তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য ৺কাশীধামে তদানীন্তন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক মহাত্মা পূর্ণানন্দ স্বামীজীর সঙ্গ করিতে আদেশ করেন। পিতৃভক্তের শিরোমণি শ্রীমৎ যোগজীবন গোস্বামী, পিতৃআজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র কাশীধামে উপস্থিত হইয়া স্বামীজীর নিকটে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামীজীর মাদকদ্রব্যাদি দ্বারা তান্ত্রিক অনুষ্ঠান তাঁহার ভালবোধ না হওয়াতে, তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, পিতৃদেব আমাকে কাহার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, ইঁহার আচরণ ত আমার মোটেই ভাল লাগে না।" তীব্রভাবে প্রার্থনা করাতে তিনি মনে মনে উত্তর পাইলেন যে, "তুই যা ব'লছিস্ সত্য, কিন্তু স্বামীজীর মধ্যে যে প্রকৃত গুণ আছে, সৌভাগ্যক্রমে তাহা যদি তোর চক্ষে পড়ে, তবে তুই ধন্য হইয়া যাবি।" এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া যোগজীবন গোস্বামী মহাশয় আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া পুনরায় তাঁহার নিকটে গমন করিতে লাগিলেন। একদিবস তিনি স্বামীজীর সম্মুখে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় জনৈক ভক্ত সাধক একতারা বাজাইয়া তাঁহাদের নিকটে শ্যামাবিষয়ক গান করিতে লাগিলেন। গান শুনিতে শুনিতে স্বামীজীর সর্ব্বাঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক ভাব প্রকটিত হইয়া উঠিল, অবশেষে ভাবে একেবারে বিভোর হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার

সর্ব্বশরীর শ্বেতবর্ণাভা ধারণ করিল এবং ললাটদেশে অর্দ্ধচন্দ্র প্রকাশিত হইল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া পূজ্যপাদ যোগজীবন ভাবাবেশে স্বামীজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। প্রণাম করিবামাত্র স্বামীজী তাঁহার গলদেশে উপবীত না দেখিয়া বলিলেন—"কি রে, তোর উপবীত কোথায়?" যোগজীবন বলিলেন—"আমার উপবীত হয় নাই।" এই কথা শুনিয়া স্বামীজী তাঁহার জনৈক সেবককে একটী উপবীত আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। উপবীত আনীত হইলে, তিনি স্বহস্তে তাঁহাকে উপবীত পরাইয়া দিলেন। স্বামীজীর দেহে জগদ্গুরু মহাদেবের প্রকাশ দর্শন করিয়া ইতঃপূর্ব্বেই শ্রীমৎ যোগজীবন গোস্বামী মোহিত হইয়াছিলেন; এখন তাঁহার এই প্রকার অযাচিত কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে নিমগ্ন হইলেন। অতঃপর তিনি গোস্বামী প্রভুর নিকটে আগমন করিলে তিনি তাঁহার গলদেশে উপবীত দেখিয়া আনন্দপ্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন—"বেশ হইয়াছে, তোকে যে জন্য স্বামীজীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহা সিদ্ধ হইয়াছে।" *

প্রভুপাদ যোগজীবন বাল্যকাল হইতেই শুকদেবের ন্যায় তীব্র বৈরাগ্য-যুক্ত ছিলেন। তিনি বিবাহ করিবেন না বলিয়াই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। অবশেষে যদিও স্বীয় মাতৃদেবীর অনুরোধে বিবাহ করেন, কিন্তু দৈব-দুর্ব্বিপাকবশতঃ অল্প দিনের মধ্যেই বিপত্নিক হন, পুনরায় বিবাহ করেন নাই।

প্রভুপাদ যোগজীবন গোস্বামী মহামতি কর্ণের ন্যায় দাতা ছিলেন। দানসম্বন্ধে ইনি পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিতেন না। ধনী কি দরিদ্র, ব্রাহ্মণ কি শূদ্র, সাধু কি অসাধু, যে কেহ যে কোন বিষয়ের অভাব জ্ঞাপন

* প্রভুপাদ যোগজীবন গোস্বামী মহাশয়ের মুখে শ্রুত।

করিয়াছেন, ইনি তৎক্ষণাৎ তাহা পূরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। হাতে অর্থ না থাকিলে ঋণ করিয়া পর্য্যন্ত দান করিয়াছেন। এই সকল ঋণের জন্য তাঁহাকে লোকসমাজে সময় সময় অপদস্থ হইতে হইয়াছে, কিন্তু তিনি সে দিকে কখনও ভ্রূক্ষেপ করেন নাই।

বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মসংস্থাপনকারীদিগের অগ্রগণ্য গোস্বামী প্রভুপাদের কার্য্যের সহায়তা করিবার জন্যই ইনি আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই কার্য্য সমাধা করিয়া তিনি সানন্দচিত্তে শান্তিধামে গমন কয়িয়াছেন। ১৩১২ সনের আশ্বিন মাসে সপ্তমী পূজার দিবস ৩৬ বৎসর বয়ক্রম কালে, ঢাকার নিকটবর্ত্তী তালতলা নামক স্থানে, রুগ্ন দেহ লইয়া কলিকাতা হইতে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আগমনকালে তাঁহার অমর আত্মা নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন। অনুগত শিষ্য ও সতীর্থগণ গেণ্ডারিয়া আশ্রমে তাঁহার পরিত্যক্ত দেহ সৎকারপূর্ব্বক, সেই স্থানে তাঁহার নামে একটী মন্দির উৎসর্গ করতঃ তৎপ্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্পণের উপায় করিয়া রাখিয়াছেন।

গোস্বামী প্রভু কলিকাতায় অবস্থানকালে একদা "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকার" বর্ত্তমান সম্পাদক পূজ্যপাদ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন। তিনিও তাঁহাকে সমাদরপূর্ব্বক নিকটে আহ্বান করিয়া কথপ্রসঙ্গে বলিলেন—"শীঘ্রই আমাদের দেশে ধর্ম্মের একটী তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইবে। নদীয়াবিহারী শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ধর্ম্মই আবার জাগিবে। তখন তিনি আপনার দ্বারা কিছু কার্য্য করিবেন। বৈষ্ণবশাস্ত্র আপনাকে আলোচনা করিতে হইবে। আমার কথা কয়েকটী স্মরণ রাখিবেন, সময়ে সমস্ত বুঝিতে পারিবেন—ইত্যাদি।" পূজ্যপাদ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সরলভাবে আমাদিগের নিকট বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার কথায় তেমন আস্থা প্রদান করিতে

পারিয়াছিলেন না। কারণ তিনি তখন মহাপ্রভুর ধর্ম্মের বেশী ধার ধারিতেন না, মিল (Mill), স্পেনসার (Spencer) প্রভৃতি পাশ্চাত্য সংশয়বাদী-দিগের গ্রন্থ আলোচনা করিয়াই সময় কাটাইতেন, এবং ডাক্তারী ব্যবসায় করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। পরে তিনি অজ্ঞাতসারে শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া বৈষ্ণবশাস্ত্র আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন, এবং ক্রমে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার সম্পাদকের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইলে, সম্পাদকীয় স্তম্ভে গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরবর্ত্তীকালে এই সকল প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় "গম্ভীরায় গৌরাঙ্গ", "শ্রীশ্রীরায় রামানন্দ" প্রভৃতি মহাপ্রভুর ধর্ম্মসম্বন্ধে অতি উপাদেয় গ্রন্থ সকল প্রকাশ করিয়া, সমগ্র বৈষ্ণবসমাজকে অত্যধিক কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এযাবৎ তিনি গোস্বামী প্রভুর ভবিষ্যৎবাণীর কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। পরে দৈবাৎ এক দিবস তাঁহার জনৈক শিষ্যের সহিত তৎপ্রবর্ত্তিত নাম-ব্রহ্মের আলোচনা-প্রসঙ্গে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পূর্ব্বের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইলে, তিনি আনন্দাশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে গোস্বামী প্রভুর নিকট অশেষবিধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদবধি তিনি অধিকতর আগ্রহসহকারে বৈষ্ণবশাস্ত্র আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

কার্ত্তিক মাসে এইস্থানে গোস্বামী প্রভুর আদেশে আকাশপ্রদীপ প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"কার্ত্তিক মাসে অনেক মহাপুরুষ সূক্ষ্মশরীরে শূন্যপথে গমনাগমন করেন। তখন তাঁহারা দৈবাৎ যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই দিকই পবিত্র হইয়া যায়। এই সকল মহাপুরুষদিগের দৃষ্টি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের প্রতি আকর্ষণ করা আকাশপ্রদীপ প্রদানের একটী উদ্দেশ্য।"

এতদ্ভিন্ন আকাশপ্রদীপ প্রদানের মাহাত্ম্যসম্বন্ধে "হরিভক্তি বিলাসে" উল্লিখিত আছে ; যথা :—

উচ্চৈঃ প্রদীপমাকাশে যো দন্তাৎ কার্ত্তিকে নরঃ।
সর্ব্বং কুলং সমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ॥

পদ্মপুরাণোধৃত শ্লোক, ১৬ বিলাস।

যে মানব কার্ত্তিকমাসে উচ্চ আকাশে প্রদীপ দান করেন, তিনি তাঁহার সমস্ত কুল উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন।

মাঘ মাসে এইস্থানে সরস্বতী পূজা হয়। গোস্বামী প্রভু স্বহস্তে শ্রীবিগ্রহকে পুষ্প-চন্দনের দ্বারা পূজা করিয়া আবির ও মালা প্রদান করিয়াছিলেন।

অতঃপর ফাল্গুন মাস আগমন করিলে, গোস্বামী প্রভু স্বীয় গুরুদেবের আদেশে শিষ্যগণসমভিব্যাহারে পুরীধামে গমন করেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

পুরীধাম যাত্রা, শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান ও লীলা সংবরণ।

১৩০৪ সনের ২৪ শে ফাল্গুন অপরাহ্ণে কলিকাতা কয়লাঘাট হইতে একখানি ষ্টীমলঞ্চ সংযুক্ত বজ্‌রাতে আরোহণ করিয়া, গোস্বামী প্রভু প্রায় পঞ্চাশ জন শিষ্যসমভিব্যাহারে কেনেলের পথে শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করেন; কারণ, পুরীর রেলপথ তখনও নির্ম্মিত হয় নাই। ষ্টীমলঞ্চের সহিত দুইখানি বজ্‌রা সংবদ্ধ করা হইয়াছিল। একখানিতে পতিপুত্রসহ শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবী, গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য সস্ত্রীক শ্রদ্ধেয় উমেশচন্দ্র বসু, সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, কতিপয় আত্মীয়সহ শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রমোহন মজুমদার ও অপর খানিতে সশিষ্য গোস্বামী প্রভু আরোহণ করিয়াছিলেন। উক্ত ষ্টীমারের স্বত্বাধিকারী সাহেব কোম্পানির বড় বাবু এবং গোস্বামী প্রভুর প্রিয়ভক্ত সোমরা-নিবাসী সাধনশীল সৎধর্ম্ম-পরায়ণ শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ রায় মহাশয়, সশিষ্য গোস্বামী প্রভুর সাহায্যার্থে পথপ্রদর্শকরূপে ষ্টীমলঞ্চে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহাদের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত রাধারমণ গুহ, ঢাকানিবাসী শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন বসু, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ ঘোষ প্রভৃতি বহুশিষ্য এবং হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী, ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী শ্রদ্ধেয় উমাপদবাবু

প্রভৃতি কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গোস্বামী প্রভুর সঙ্গে গঙ্গার ঘাট পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন। বিদায়কালে চারুবাবু গোস্বামী প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা কি ভাবে দিনযাপন করিব?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন—"শ্রীমন্ মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণানন্তর শ্রীক্ষেত্র যাইবার সময় তাঁহার ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন। উত্তরে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন, 'ঘরে কর নাম সংকীর্ত্তন, শ্রীগুরু বৈষ্ণব সেবন।" অতঃপর গোস্বামী প্রভু শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।" তিনি সাশ্রুনয়নে উত্তর করিলে—"আমরা আপনাকে কি আশীর্ব্বাদ করিব?" গোস্বামী প্রভু বলিলেন—"এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন জগন্নাথদেব আমাকে গ্রহণ করেন।" গোস্বামী প্রভুর মুখে এই কথা শুনিয়া ভাবী বিপদের আশঙ্কা করিয়া শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জনবাবু, কৈলাসবাবু প্রভৃতি বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অতিকষ্টে তাঁহাদিগের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া, অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় গোস্বামী প্রভু ষ্টীমার খুলিতে আদেশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র ষ্টীমলঞ্চ সশিষ্য গোস্বামী প্রভুকে বহন করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে নীলাচলাভিমুখে ধাবিত হইল। যতদূর দৃষ্টি চলে তীরস্থিত ভক্তবৃন্দ সতৃষ্ণনয়নে উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন; অবশেষে ষ্টীমার অদৃশ্য হইলে, না জানি কি গভীর মর্ম্মবেদনা হৃদয়ে বহন করিয়া সকলে ধীরে ধীরে স্ব স্ব আবাসাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে গোস্বামী প্রভু সহযাত্রী শিষ্যদিগের সহিত শ্রীক্ষেত্রের মহিমা, মহাপ্রসাদ মাহাত্ম্য ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অপার করুণাব্যঞ্জক কথোপকথন করিতে লাগিলেন। শিষ্যবৃন্দের উৎসাহ আনন্দ আর ধরে না। তাঁহারা গুরুদেবকে বেষ্টন করিয়া গোবিন্দদর্শনে চলিয়াছেন, যে স্থানে সংকীর্ত্তনের শিরোমণি শ্রীগৌরাঙ্গদেব একাদিক্রমে ১৮ বৎসর বাস করিয়া

ভক্তবৃন্দ সহ সংকীর্ত্তনযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন সেই স্থানে যাইতেছেন, এই আনন্দেই তাঁহারা বিভোর। কিন্তু তাঁহারা যে তাঁহাদের প্রাণের প্রিয়তম দেবতাকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের জগমনমোহন লীলারসসায়রে চিরবিসর্জ্জন দিতে লইয়া চলিয়াছেন, এ কথা তখন কাহারও মনে উদয় হয় নাই। সে যাহা হউক, এইরূপে শিষ্যদলসহ গোস্বামী প্রভু সপার্ষদ মহাপ্রভুর ন্যায় মনের আনন্দে হরিনাম করিতে করিতে নীলাচল-চন্দ্র দর্শন করিতে চলিয়াছেন। পাঠ, পূজা, কীর্ত্তনাদি গোস্বামী প্রভুর আশ্রমের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যসমূহ যথাযথ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। রন্ধনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য যে দিবস যে স্থানে ষ্টীমার লাগান হইত, সেই দিনই তথায় যেন একটী আনন্দের বাজার বসিয়া যাইত। স্থানীয় বহু-লোক শিষ্যগণ-পরিবেষ্টিত এই অপরূপ সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিত। কলিকাতা হইতে হরিবোলানন্দ (গাড়ুদাস বাবাজী) নামক একজন নিষ্ঠাবান্ সাধু, গোস্বামী প্রভুর সঙ্গ ধরিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার সন্নিকটে বসিয়া একতারাসংযোগে নাম সাধন করিতেন। দোলপূর্ণিমার দিবস পথিমধ্যে কেনেলের একটী ঘাটে ষ্টীমার লাগিলে, তথাকার ডাকবাঙ্গলায় মহানন্দে দোলোৎসব-ক্রিয়া সম্পন্ন করা হইয়াছিল। আবিরাদি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য শিষ্যগণ কলিকাতা হইতেই সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। এইরূপে মহানন্দে ভাসিতে ভাসিতে পুরুষোত্তমযাত্রীর দল পঞ্চম দিবসে কটক সহরে উপনীত হইলেন। বরিশাল, নারায়ণপুরনিবাসী শ্রদ্ধেয় দুর্গামোহন চক্রবর্ত্তী (পণ্ডিত), বানরিপাড়ানিবাসী স্বর্গীয় ললিতমোহন গুহ প্রভৃতি অপর একদল শিষ্য ইতঃপূর্ব্বেই কলিকাতা হইতে সমুদ্রপথে চাঁদবালী হইয়া কটকে আগমন পূর্ব্বক গোস্বামী প্রভুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। অদ্য অপরাহ্নে অনুমান ৫ ঘটিকার সময় দুই দলে একত্র মিলিত হইলে, একটী অপূর্ব্ব

আনন্দের স্রোতঃ বহিতে লাগিল। নিকটস্থ দোকানে একখানি ঘর ভাড়া করিয়া রন্ধনাদিকার্য্য সম্পন্ন হইলে, সকলে আনন্দসহকারে ভোজন করিলেন; গোস্বামী প্রভুকে আহার্য্য বস্তু বজরাতে আনাইয়া দেওয়া হইল। শ্রীযুক্ত সারদাবাবু ও কুলদাকান্ত ব্রহ্মচারী মহাশয় তথায় তাঁহার প্রসাদ পাইলেন।

পরদিবস প্রাতে চা পান করিয়া অনুমান আট ঘটিকার সময় সশিষ্য গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে স্মরণ করিয়া কটক হইতে ৯ মাইল দূরবর্ত্তী বারং ষ্টেশনে যাত্রা করিলেন। বারং হইতে পুরী পর্য্যন্ত তখন রেলগাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। গোস্বামী প্রভু অশ্বযানে, স্ত্রীলোকেরা গোযানে ও অপরাপর শিষ্যগণ পদব্রজেই গমন করিয়াছিলেন। বারং হইতে ১২ টার গাড়ীতে আরোহণ করিয়া ৪ঘটিকার সময় পুরুষোত্তম-যাত্রীর দল নির্ব্বিঘ্নে পুরীর পুরাতন ষ্টেশনে উপনীত হইলেন। এইস্থান হইতে পুরী সহর ক্রোশাধিক দূরে অবস্থিত।

গোস্বামী প্রভুকে কেহ কেহ অশ্বযানে যাইতে অনুরোধ করিলে, তিনি পুরীধামের পঞ্চক্রোশের মধ্যে যানারোহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন, এবং যতদিন পুরীতে ছিলেন, কখনও কোন প্রকার যানে আরোহণ করেন নাই। সে যাহা হউক, গোস্বামী প্রভুর গমনবিষয়ে সকলে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন; কারণ, তিনি ইদানীং একান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, যষ্টি কিংবা মানুষের সাহায্য ভিন্ন চলিতে পারিতেন না। শিষ্যদিগকে চিন্তাকুল দেখিয়া তিনি বলিলেন—"যিনি আমাকে কলিকাতা হইতে এতদূর আনয়ন করিয়াছেন, তিনিই এখন হাত ধরিয়া লইয়া যাইবেন, তজ্জন্য তোমরা ভাবিও না।" এই বলিয়া তিনি দুইটী শিষ্যের স্কন্ধে ভরকরতঃ হস্তে যষ্টিধারণপূর্ব্বক ধীরে ধীরে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, বড় রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী একখানি ঘরের বারাণ্ডায়

বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এমন সময় অকস্মাৎ কয়েকজন পাণ্ডা উপস্থিত হইয়া গোস্বামী প্রভুর নিকটে কিছু প্রার্থনা করিলেন। তিনিও তাঁহাদিগের পদধূলিগ্রহণপূর্ব্বক দুই এক টাকা করিয়া প্রণামী দিলে, তাঁহারা তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ইহার পর হইতেই তিনি স্বীয় দেহে অমানুষিক বল অনুভব করিতে লাগিলেন, এবং 'জয় জগন্নাথ' বলিয়া গাত্রোত্থান করিয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সহরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। শিষ্যগণ হরিধ্বনি করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। এই প্রকারে আঠারনালার পুলের নিকট উপনীত হইলে, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের ধ্বজা সকলের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। গোস্বামী প্রভু ধ্বজা দর্শনপূর্ব্বক মহাভাবে বিভোর হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন, এবং গাত্রোত্থান করিয়াই হরিনামের সিংহনাদে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে এক অপূর্ব্ব তাড়িত-শক্তি প্রবাহিত হইল। শ্রদ্ধেয় বিধুভূষণ ঘোষ মহাশয় ভাবাবেশে গান ধরিলেন—

"যাঁদের হরি ব'ল্‌তে নয়ন ঝরে,
ঐ দেখ তাঁরা দু'ভাই এসেছে হে।
গৌরনিতাই ভক্ত সঙ্গে এসেছে হে।" ইত্যাদি।

অপরাপর শিষ্যগণ সাগ্রহে সংকীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য অনুরাগী ভক্ত শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় সুমধুর মৃদঙ্গ বাজাইতে লাগিলেন। শ্রবণমঙ্গল হরিনামকীর্ত্তনে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইতে লাগিল। এই ভাবে কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহারা নরেন্দ্র সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে গোস্বামী প্রভু, জনৈক

শিষ্যকর্ত্তৃক সরোবর হইতে জল আনয়নপূর্ব্বক, মহাভাবে মাতোয়ারা শিষ্যদিগের চোকে মুখে, কি জানি কি ভাবে বিভাবিত হইয়া ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধেয় বিধুবাবুর চক্ষে জল দিবামাত্র তিনি ভাবে এতদূর উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন যে, তাঁহার কিছুই বাহ্য লক্ষ্য রহিল না। তিনি পুনঃ পুনঃ ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া বুক পাতিয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাণের প্রাণ গোস্বামী প্রভুর পথ চলিতে পায়ে কঙ্করাদি বিদ্ধ হইতেছে, ইহা যেন তিনি আদৌ সহ্য করিতে পারিতেছেন না; তাঁহার মনোগত ভাব এই যে, গোস্বামী প্রভু তাঁহার বুকের উপর দিয়া গমন করেন, তাই বক্ষ পাতিয়া দিতেছেন। এমন সময়ে হঠাৎ কোথা হইতে 'কালিয়া পাগলা' নামক একজন উড়িষ্যাবাসী ছদ্মবেশী সাধু কীর্ত্তনে যোগদানপূর্ব্বক উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে, যেন এই নবাগত যাত্রীদিগকে পথ দেখাইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের দিকে লইয়া যাইতে লাগিলেন। রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী লোকসমূহ বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে এই অত্যদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সকলের দৃষ্টিই বিশেষভাবে গোস্বামী প্রভুর উপর নিপতিত হইল। তাঁহারা এই ক্ষেত্রে অনেক সাধু, অনেক দীর্ঘজটাধারী সন্ন্যাসী দর্শন করিয়াছেন; কিন্তু গোস্বামী প্রভুর ন্যায় এমন অপরূপ রূপ, এমন সুশোভন জটাবিমণ্ডিত লম্বোদর পুরুষ যেন আর কখনও দর্শন করেন নাই। গোস্বামী প্রভুর সঙ্গীয় লোকদিগের ভাবাবেশ দর্শন করিয়াও, উপস্থিত জনমণ্ডলী বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে এই পথ দিয়াই অনেক বার গৌরনিতাই সীতানাথ, ভক্তসঙ্গে হরিনাম কীর্ত্তনে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া পুরী প্রবেশ করিয়াছিলেন। অদ্যকার এই দৃশ্য অবলোকন করিয়াও, সকলের মনে যুগপৎ সেই ভাবের উদয় হইতে লাগিল। নাম-মদিরায় মাতোয়ারা শ্রীধামযাত্রীর দল এই ভাবে কীর্ত্তন করিতে করিতে, যেন

অজ্ঞাতসারেই সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে পাণ্ডা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট বড় দণ্ডস্থিত বাটীতে উপনীত হইলেন।

গোস্বামী প্রভু, তীর্থগুরু হরেকৃষ্ণ খুটিয়ার পদ পূজা করিলেন অপরাপর শিষ্যগণও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, তীর্থগুরুর পদপূজাকরতঃ অপার শান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিবার পর, পাণ্ডাদিগের অনুরোধে শিষ্যগণ গোস্বামী প্রভুকে পরিবেষ্টন করিয়া মহাপ্রসাদ পাইতে বসিয়াই তাহার অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন যে, শ্রীক্ষেত্রে ৺জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদসম্বন্ধে জাতি বর্ণ কিংবা উচ্ছিষ্ট বিচার নাই। কিন্তু গোস্বামী প্রভুর শিষ্যদিগের মধ্যে উচ্ছিষ্ট-সংস্কার অতীব প্রবল। ইতঃপূর্ব্বে তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই, মহাপ্রসাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবেন কি না বলিয়া ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। গোস্বামী প্রভুর শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী শ্রীক্ষেত্রের পথে বলিয়াছিলেন যে, তিনি ব্রাহ্মণের বিধবা কন্যা, অপর জাতীয় লোকের ভুক্তাবশিষ্টের কথা দূরে থাকুক, তিনি তাহাদের স্পৃষ্ট দ্রব্যাদিও কখনও ভোজন করিতে সমর্থ হইবেন না, সুতরাং যত কাল পুরীতে থাকিবেন ততকাল তাঁহাকে স্বহস্তে রন্ধন করিয়াই আহার করিতে হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সকলে প্রসাদ পাইতে বসিলে, সর্ব্বপ্রথমে তাঁহারই প্রসাদসম্বন্ধীয় উচ্ছিষ্ট-সংস্কার তিরোহিত হইল। তিনি সকলের ভোজনপাত্র হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া আহার করিতে লাগিলেন। কোথায় গেল তাঁহার বর্ণবিচার! কোথায় গেল উচ্ছিষ্ট-সংস্কার! ক্রমে ক্রমে অপরাপর শিষ্যগণও পরস্পর পরস্পরের পাতা হইতে ভোজন করিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। গোস্বামী প্রভু ইতঃপূর্ব্বেই পাণ্ডার মুখনিঃসৃত কিঞ্চিৎ প্রসাদ ভোজন করিয়া সকলকে পথ দেখাইয়াছিলেন। এখন তিনি শিষ্যমণ্ডলীর ভোজনপাত্র হইতে কিছু কিছু

প্রসাদ সংগ্রহপূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া মহাপ্রসাদের অপার মহিমা জ্ঞাপন করিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনধামের রজের (ধূলির) প্রভাব ও শ্রীক্ষেত্রের মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য অতিশয় প্রত্যক্ষ। যিনি যতই অবিশ্বাসী নাস্তিক হউন না কেন, বৃন্দাবনের রজে একবার 'জয় রাধে শ্রীরাধে' বলিয়া গড়াগড়ি দিতে পারিলেই যে তাহার নাস্তিকতা দূর হইবে, সে বিষয় বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্রীক্ষেত্রে অনেক গোঁড়া ব্রাহ্মণ, বহু যতী সন্ন্যাসী, যাঁহারা জীবনে কখনও অপরের স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করেন নাই, তাঁহারাও মহাপ্রসাদের নিকট হার মানিয়াছেন। সে যাহা হউক, প্রসাদ গ্রহণ করিয়াই গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পাণ্ডারা বলিলেন, আপনারা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, অদ্য বিশ্রাম করুন, কল্য দর্শন করিবেন। গোস্বামী প্রভু তদুত্তরে বলিলেন—"কি জানি, মৃত্যুর কোন স্থিরতা নাই, সুতরাং অদ্যই দর্শন করিতে হইবে।" এই বলিয়া রাত্রি অনুমান ৭৷৷০ ঘটিকার সময় ৬জগন্নাথদেব দর্শন করিবার জন্য শ্রীমন্দিরে উপনীত হইলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিগ্রহ দর্শন করিবামাত্রই তিনি ভাবে বিহ্বল হইয়া বসিয়া পড়িলেন, এবং স্থিরনেত্রে ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি করিয়া যেন কত কালের পরিচিতের ন্যায়, হাত ঘুরাইয়া, মুখ নাড়িয়া অর্দ্ধস্ফুটস্বরে কত কি বলিলেন, কতই মনের কথা প্রাণের ব্যথা জানাইতে লাগিলেন; অবিরলধারে তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। গোস্বামী প্রভুর শিষ্যগণ ও মন্দিরের পাণ্ডা, প্রহরী ও অপরাপর যাত্রিগণ অবাক্ হইয়া তাহা দর্শন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, গোস্বামী প্রভু ভাব সংবরণপূর্ব্বক পাণ্ডাদিগকে তাঁহাদের আশাতিরিক্ত অর্থ দান করিয়া, শিষ্যগণসহ স্বীয় আবাসে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই বাটীতে নানারূপ অসুবিধা বোধ হওয়াতে,

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে এ নিয়ম প্রতিপালিত হইতেছে না। এতদ্ভিন্ন প্রাতঃকালের ভোগ মধ্যাহ্নে দেওয়া হইতেছে, মধ্যাহ্নের ভোগ সন্ধ্যায় দেওয়া হইতেছে—ইত্যাদি। এই বৎসর রথযাত্রার দিনও ঠাকুরকে তিথি নক্ষত্র অনুসারে যথাসময় রথস্থ করা হয় নাই। ইহাতে গোস্বামী প্রভু অতীব দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, "শাস্ত্রে আছে, আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে পুষ্যা নক্ষত্রে রথে জগন্নাথ দর্শন করিলে 'রথস্থ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে—ইত্যাদি' শাস্ত্রবর্ণিত জগন্নাথদেব-দর্শনের ফল পাওয়া যায়। কিন্তু এই দর্শনটা ঠিক সময়মত হওয়া চাই। নক্ষত্র না হইলে অন্ততঃ দ্বিতীয়া তিথিটী হওয়া চাই-ই।" এই বলিয়া তিনি আর রথযাত্রা দর্শন করিতে গমন করিলেন না। গোস্বামী প্রভু পুরীর মন্দিরের সেবার এই প্রকার বিশৃঙ্খলা ও সেবকদিগের অবহেলা সন্দর্শনপূর্ব্বক যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়া, ইহার প্রতিবিধানকল্পে শাস্ত্রযুক্তির সহায়তায় আন্দোলন করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে পরবর্ত্তী কালে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশে অনেক বিষয়ের সংস্কার সাধিত হইয়াছে।

পুরীধামে অবস্থান কালে সাধারণতঃ যে কয়েকটী কার্য্যের জন্য গোস্বামী প্রভু সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে বানরবধ নিবারণ, ৺ জগন্নাথদেবের মন্দিরসংলগ্ন পায়খানার উচ্ছেদ সাধন ও তাঁহার দানসাগর ব্যাপার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মর্কটদিগের ব্যবহারে উৎপীড়িত হইয়া স্থানীয় মিউনিসিপালিটির

অরুণোদয় বেলায়াং নির্ম্মাল্যং শল্যতাং ব্রজেৎ।
প্রাতস্তন্ত্রামহাশল্যং ঘটিকামাত্রযোগতঃ।
অতিশল্যং বিজানীয়াত্ততো বজ্রপ্রহারবৎ॥ নরসিংহ পুরাণ।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস, ৩য় বিলাস, ৬৬,৮১ শ্লোক।

কর্ত্তৃপক্ষগণ বন্দুকের সাহায্যে তাহাদিগকে নির্ম্মমভাবে বধ করিতে আরম্ভ করেন। পুরীবাসীর এইরূপ ভয়ানক নিষ্ঠুর ব্যবহারে, গোস্বামী প্রভু এতদূর মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন যে, তিনি অনেক সময় বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতেন এবং একদিন ইহার প্রতিবিধানকল্পে জগন্নাথবল্লভউদ্যানস্থিত ৺মহাবীরের মন্দিরে যথাসাধ্য ভোগ মানস করিয়াছিলেন। সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাদিগের প্রতি গোস্বামী প্রভু ও তদীয় শিষ্যবর্গের সহানুভূতির বিষয়,জানি না কি প্রভাবে অবগত হইয়া, বানরগণ দলে দলে গোস্বামী প্রভুর বাসভবনে আগমনকরতঃ, বিবিধ প্রকার হাব-ভাব দ্বারা তাহাদের ঘোর বিপদের কথা প্রকাশ করিত; এবং এক দিবস বড়দণ্ড নামক রাস্তার জনৈক শীকারীকে দেখিয়া একটী বানর দৌড়িয়া আসিয়া গোস্বামী প্রভুর একজন শিষ্যের পদধারণপূর্ব্বক ইঙ্গিত দ্বারা তাহার আসন্ন বিপদের কথা জ্ঞাপন করিয়াছিল। অতঃপর শীকারীর সন্ধান পাইলেই বানরগণ সন্তানসন্ততিসহ গোস্বামী প্রভুর আলয়ে উপস্থিত হইত; এবং তিনিও তাহাদিগকে অতিশয় আদরের সহিত আম্র, কলা—ইত্যাদি উপাদেয় দ্রব্য সকল খাইতে দিতেন। বানরগণও নির্ভয়-চিত্তে তাঁহার আসনের নিকটে বসিয়া আহার করিত।

অতঃপর গোস্বামী প্রভুর আদেশে শিষ্যগণ বানরবধের বিরুদ্ধে শাস্ত্র-যুক্তির সহায়তায় প্রকাশ্য পত্রিকায় তীব্র আন্দোলন করিতে থাকিলে, তদানীন্তন সদয়হৃদয় ছোটলাট উডবরন সাহেব বানরবধ রহিত করিয়া দেন। বানরবধের অবৈধতা ও অশাস্ত্রীয়তা বিষয়ক ব্যবস্থাপত্রে, কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, রিপণ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, কটক কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মজুমদার এম, এ, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের লাই-ব্রেরিয়ান শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী এম, এ, মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত

তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বঙ্গ, উৎকল ও বারাণসী-বাসী প্রায় ৫০।৬০ জন প্রধান প্রধাম পণ্ডিত স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। মর্কটবধ বন্ধ হইলে, গোস্বামী প্রভু পূর্ব্বোক্ত ৺ মহাবীর ঠাকুরকে ষোড়শোপচারে পূজা প্রদান করিয়াছিলেন।

স্থানীয় মিউনিসিপালিটী মন্দিরের সেবকদিগের সুবিধার জন্য মন্দিরের প্রাচীরের সহিত সংলগ্ন করিয়া একটী পায়খানা প্রস্তুত করেন। ইহাতে গোস্বামী প্রভু আপত্তি উত্থাপিত করিয়া বলেন যে, শাস্ত্রমতে প্রাচীরাদি সমন্বিত সমগ্র মন্দিরটীই ভগবানের দেহস্বরূপ এবং তন্মধ্যস্থিত বিগ্রহ ঐ দেহের আত্মাস্বরূপ ; * সুতরাং শাস্ত্রমতে কিছুতেই মন্দিরের গাত্রে পায়খানা প্রস্তুত করা যাইতে পারে না। অতঃপর তদীয় শিষ্যবর্গ ও বহু ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি এই বিষয়ে তুমুল অন্দোলন উপস্থিত করিলে, পূর্ব্বোক্ত মহামতি উড্‌বরণ সাহেবের আদেশে মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষ পায়খানা ভগ্ন করিয়া ফেলেন।

গোস্বামী প্রভুর তৃতীয় কার্য্য দানযজ্ঞ। তিনি পুরীতে পদার্পণ করিয়াই যে দানছত্র খুলিয়াছিলেন, তাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া একটী বিরাট দানসাগরে পরিণত হইয়াছিল। এই দানব্যাপারে পাত্রাপাত্র বিচার ছিল না, জাতিবর্ণ বিচার ছিল না, সাধু অসাধু বিচার ছিল না। যিনি যে অভাব জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাঁহার তাহাই মোচন করা হইয়াছে।

---

* প্রাসাদং বাসুদেবস্য মূর্ত্তিভূতং নিবোধমে।

*   *   *

মুখং দ্বারং ভবেদস্য প্রতিমাজীব উচ্যতে।
এতচ্ছক্তিং পিণ্ডিকাং বিদ্ধি প্রকৃতিঞ্চতদাকৃতিং॥
নিশ্চলত্বং তু গর্ভোঽস্য অধিষ্ঠাতাস্য কেশবঃ।
এবমেব হরিঃ সাক্ষাৎ প্রাসাদত্বেন সংস্থিতঃ॥

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস, ২০ বিলাস, ১৯৭ শ্লোক।

কেহ আসিয়া বলিলেন, অর্থাভাবে তাঁহার পুত্রের উপনয়ন কার্য্য সমাধা হইতেছে না, দাও উহাকে ১০৲ টাকা; কেহ বলিলেন তাঁহার ঘর মেরামত করিতে পারিতেছে না, দাও উহাকে ২০৲ টাকা; কেহ বলিলেন তাঁহার দেশে যাইবার রেলভাড়া জুটিতেছেনা, দাও যাহা প্রয়োজন। ভাণ্ডারে একটী পয়সা থাকিতেও দিবানিশি এই ভাবেই দান কার্য্য চলিয়াছিল। টাকার অভাব হইলে ঋণ করিয়া পর্য্যন্ত দান করা হইয়াছে। এতভিন্ন ইমার মঠে দুই হাজার ব্রাহ্মণকে বস্ত্রদান, বড় আখড়ার চারি সম্প্রদায়ের প্রায় ৫ হাজার সাধুদিগকে ভোজন ও তাঁহাদের প্রত্যেককে একটী করিয়া লোটা ও ৮ হস্ত পরিমিত বস্ত্র দান, বড় দণ্ডের প্রায় এক হাজার কাঙ্গালীকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাপ্রসাদ দ্বারা ভোজন, এবং বহু পূজারী পাণ্ডাকে গরদের বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান, গোস্বামী প্রভুর দানযজ্ঞের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

এই দানসাগর ব্যাপারে ৩ মাসে প্রায় ৩০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই কার্য্যে পুরীনিবাসী শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সাহা (কাপুড়িয়া), শ্রীযুক্ত মাধী সোয়ার (৺ জগন্নাথদেবের ভোগ-রন্ধনকারী ব্রাহ্মণ) ও শ্রীযুক্ত গোবিন্দ গুড়িয়া (মুদী) গোস্বামী প্রভুকে ধারে জিনিষ পত্র দিয়া সেবার বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা এক ঋণ শোধ হইতে না হইতেই পুনরায় সহস্র সহস্র টাকার দ্রব্যাদি বাকীতে দিয়াছেন। গোস্বামী প্রভুর কোন সংস্থান নাই, টাকা বাকী পড়িলে তাহা আদায় হইবারও কোন উপায় নাই, ইহা বিশেষরূপ জানা সত্ত্বেও এই সকল বিষয়ী লোক কিরূপ বিশ্বাস ও নির্ভরের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের শোণিততুল্য রাশি রাশি অর্থ এই কপর্দ্দকশূন্য বিদেশী সন্ন্যাসীর পায়ে হাসিমুখে ঢালিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা বিষয়াসক্ত লোকের বুদ্ধির অগোচর। তবে যাঁহার আদেশে গোস্বামী প্রভু এই দানছত্র

খুলিয়া ছিলেন, যাহার ইঙ্গিত ভিন্ন তিনি এই দানযজ্ঞের একটী সামান্য বিষয়েও হস্তক্ষেপ করিতেন না, সেই দাতার শিরোমণি শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের কৃপা হইলে যে অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে, পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘনে সমর্থ হয়, তাহা কে অস্বীকার করিবে? এই দানসম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করিলে গোস্বামী প্রভু বলিতেন—"আমি স্বেচ্ছায় এই দানকার্য্যে নিরক্ত হই নাই, স্বয়ং জগন্নাথদেবের আদেশে আমি দান করিতেছি। গঙ্গাস্রোতঃ বহিয়া যাইতেছে, আমরা তাহাতে হাত ধুইয়া পবিত্র হইতেছি মাত্র।"

গোস্বামী প্রভু যখন সমুদ্রস্নান অথবা শ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করিতে বাহির হইতেন, তখন শত শত যাচক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া গমন করিত এবং তাঁহার নিকটে অর্থাদি যাজ্ঞা করিত। গোস্বামী প্রভুর ইঙ্গিতে শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ আশ্রম হইতেই সিকি, দুয়ানী, আধুলি, পয়সা, টাকা প্রভৃতি কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেন এবং তাঁহার আদেশপ্রাপ্তি-মাত্রই মুদ্রামুষ্টিকে ধূলিমুষ্টির ন্যায় দান করিতেন। অর্থ ফুরাইয়া গেলে, গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য সরলবিশ্বাসী শ্রীযুক্ত সরলনাথ গুহ মহাশয় ছুটিয়া গিয়া পূর্ব্বোক্ত শ্রদ্ধাভাজন গোবিন্দ গুড়িয়ার নিকট হইতে ধার করিয়া আনিয়া শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেন। রাশি রাশি অর্থ এই প্রকার জলের মত দান করিতে দেখিয়া, কত বিষয়াসক্ত লোকের বিষয়াসক্তি ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, কত ধনীর অর্থাভিমান চূর্ণ হইয়াছে, কত কৃপণ লোকের হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? গোস্বামী প্রভু একদিন ঠাকুরদর্শনে বহির্গত হইলে, তাঁহার দানে মুগ্ধ হইয়া জনৈক পাণ্ডা বলিল, "গোঁসাই প্রভু বড় নাম করিলেন"। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "নাম অতলজলে ডুবে যাক্, নাম দিয়ে কি হবে?"

একদিবস গোস্বামী প্রভু শিষ্যগণপরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব

দর্শন করিতে চলিয়াছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে জনৈক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরের বয়স কত?" গোস্বামী প্রভু উত্তর করিলেন, "অনন্তকালের মধ্যে আমরা একটী বুদ্‌বুদ্ মাত্র, ৭২ চতুর্যুগে এক মন্বন্তর। ১৪ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন হয়। সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়, কেবল গুরুপাদপদ্মে যাঁহার মতি তিনিই জীবিত।"

অপর একদিবস স্বর্গদ্বারের ঘাটে সমুদ্র-স্নান করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়, ছিন্নবস্ত্রপরিহিতা, আলুলায়িতকেশা, পাগলিনীপ্রায়া জনৈক ভিখারিণীকে দেখিয়া গোস্বামী প্রভু বলিলেন, "যাহার নিকটে যাহা আছে সমস্তই ইঁহাকে দাও।" বলা বাহুল্য, তাঁহার আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল। স্বীয় আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গোস্বামী প্রভু পূর্ব্বোক্ত পাগলিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"অদ্য বিমলা দেবী (পুরুষোত্তমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী) কৃপাপূর্ব্বক তোমাদিগকে দর্শন দিবার জন্য এই ভাবে রাস্তার পার্শ্বে উপবিষ্টা ছিলেন।"

পুরীতীর্থে কত স্থানে কত মহাপুরুষ কি ভাবে বিরাজ করেন, তাহা বুঝা বড়ই কঠিন ব্যাপার। সাধুরা নিজেরা ধরা না দিলে, অপরের পক্ষে তাঁহাদের চেনা অসাধ্য। এইস্থানের একটী গুপ্ত সাধুর বৃত্তান্ত গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য শ্রদ্ধাভাজন ৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক জনৈক সতীর্থের নিকটে লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা :—

"একদিন সমুদ্র-স্নান হইতে ফিরিবার সময়, ঠাকুর একটী মহাপ্রসাদ ফেলান মট্‌কি হইতে নেংটীসার একজন সাধুকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিলেন; আমাকে (সতীশকে) বলিলেন, চারিটী পয়সা দাও এবং নিজের গায়ের মূল্যবান্ কাপড় দিলেন; পয়সা নিলেন না, কাপড় লইয়া গেলেন। পয়সা দিতে গেলে, তৃণগুচ্ছ হাতে আরতি! কিছু দূরে গিয়া গান করিলেন— "নীলচক্র জগন্নাথ, মন ভজনা চৈতন্য, মন ভজনা চৈতন্য"। পরে

বলিলেন—"আমি বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম, সেস্থান খালি দেখিলাম, এখানে তুমি দণ্ডকমণ্ডলু লইয়া বিরাজ করিতেছ।" আবার পয়সা দিতে গেলে বলিল—"আমার প্রারব্ধ কর্ম্ম যাহা আছে, তাহা হইবে। একশত বৎসরের উপর কাটাইলাম। এখন আবার জগদ্বন্ধু এসব দিতেছ কেন?" আবার গান গাইতে লাগিলেন, যেন দর্শন হইতেছে। কোনমতে কিছু নিলেন না। ঠাকুর বলিলেন,"কাপড় কিনিয়া রেখে এস, যে নেয়।" ইনি শুনিলাম এই দেশী লোক। ইনি লেখাপড়া জানিতেন। কেবল পড়িতে পড়িতে ধ্যান করিয়া অজ্ঞান হইতেন। পর হইতে এই দশা। ঠাকুর বলিলেন—"পঞ্চম পুরুষার্থ একেই বলে। অনেক যোনী ভ্রমণ করিয়া মনুষ্যজন্ম লাভ হয়। পরে আমি কে? কি করিতেছি? কোথা হইতে আসিলাম? কোথা যাইব? —ইত্যাদি চিন্তা আসে। এই সময় গুরু লাভ হয়। ৩ জন্ম সূর্য্য, ৩ জন্ম গণেশ, পরে ১০০ জন্ম শক্তি উপাসনা করিয়া ৩ জন্ম শিবের আরাধনা করিতে হয়। ইহা চতুর্ব্বর্গের সাধনা। ইহা বেদাধীন। তারপর পঞ্চম পুরুষার্থ।" আমি (সতীশ) বলিলাম, মাথা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়াও যদি এ জিনিষ পাওয়া যায় ত ভাল।' ঠাকুর—"তাও কি হয়? রাবণ তপস্যা করিলেন, তমো ধর্ম্ম পাইলেন। তাঁহার ভাই বিভীষণ ধর্ম্ম চাহিলেন, সত্ত্ব ধর্ম্ম পাইলেন, ইহার গন্ধও পাইলেন না। শ্রুতিরা বলিল—"আমরা চতুর্ব্বর্গ পর্য্যন্ত তোমার স্তুতি করিতে পারি, কিন্তু তারপর পঞ্চমপুরুষার্থ বিধায় তাহাতে আমাদের অধিকার দাও।" ঠাকুর (শ্রীরামচন্দ্র) বলিলেন —বৈবস্বত মন্বন্তরে অমুক দ্বাপর হবে। তাই তাঁহারা গোপী হইলেন। ব্রাহ্মণী হইলেও জাতীয় গৌরব থাকিত। দণ্ডকারণ্যের ঋষিরা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন। তাঁহারা রামচন্দ্রকে বলিলেন—"তোমার নবজলধররূপ দেখিয়া আপনার করিয়া তোমাকে ভজিতে চাই।" তিনি বলিলেন,"দ্বাপরে হবে!" তাই তাহারা পান।

"পুনঃ সেই সাধুটী উপস্থিত হইয়া গাইলেন—"চৈতন্য ভজনা মন, চৈতন্য ভজনা, * * * দেখ মোর কেলে সোনা * * এত চন্দ্রবদন আমি দেখিয়াছি। আমার সাধ পূর্ণ হইল", এই বলিয়া আরতি! মেয়েরা ছাদে ছিল, তাঁহাদিগকে দেখিয়া আরতি। ঠাকুরকে দেখিয়া হাসিয়া আটখানা— কোথায় বা রহিল ন্যাকড়ার টুপি! আবার গান—"কত রোজ দেখি নাই তোর চন্দ্রবদন, এমন প্রেম দেখি নাই।" পুনঃ আর একদিন দ্বিপ্রহরে আসিয়া বলিল—"আজ অবলা বলিমু, অচেনা চিনিমু", এই বলিয়া ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। তখন মহেন্দ্রবাবু ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন— "ও কি বলে?" ঠাকুর—"বড়ই আশ্চর্য্য লোক, বলে—দণ্ডকমণ্ডলুধর জটাধারীর চাঁদমুখ দেখিলাম। কত চাঁদমুখ দেখিলাম, কোন চাঁদমুখই এমন নয়।"

এই সময় পুরীতে একটী জাতিস্মর বালক অবস্থান করিতেন। তাঁহার বয়ঃক্রম তখন অনুমান ১৩।১৪ বৎসর হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বদা মৌনী অবস্থায় থাকিলেও, কোন কোন সময় অজ্ঞাতসারে আনন্দাধিক্যে তাঁহার মুখ দিয়া দুই একটা কথা বাহির হইয়া পড়িত। কিন্তু সাধারণ লোকে তাঁহাকে বোবা বলিয়াই জানিত। ইনি কি শীত, কি গ্রীষ্ম, সকল ঋতুতেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় থাকিতেন, কেহ কোন কৌশলে গাত্রাবরণ প্রদান করিলেও, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা ফেলিয়া দৌড়িয়া পলাইতেন। ইনি সর্ব্বদাই 'জড়োন্মত্ত পিশাচবৎ' বিচরণ করিতেন। অপরাহ্ণ ৪।৫ ঘটিকার সময় ছত্রে যখন প্রসাদ বিতরণ করা হইত, তখন ইনি তথায় গিয়া দাঁড়াইতেন, কেহ কিছু দিলে খাইতেন, না হয় উপবাসী থাকিতেন। সাধারণ ভিক্ষুকদিগের ন্যায় কেহ তাঁহাকে কখনও লোককে উদ্বেগ দিতে দেখে নাই। গোস্বামী প্রভু পুরী গমন করিবার পর, ইনি প্রায়ই একটী ভিখারী বালকের সহিত মিলিয়া তাঁহার আলয়ে আগমন করিতেন, কিন্তু

আহার্য্যদ্রব্য ব্যতীত কেহ কিছু দিতে উদ্যত হইলেই দৌড়িয়া অদৃশ্য হইতেন। গোস্বামী প্রভু যখন দর্শনে বহির্গত হইতেন, তখন এই স্বভাব-সাধুটী কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া তাঁহার অনুগমন করিতেন, এবং সময় সময় যেন অজ্ঞাতসারে হঠাৎ অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন। বালকটীর এইরূপ অনেক ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করিয়া, এক দিন জনৈক শিষ্য তাঁহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে গোস্বামী প্রভু বলিলেন—"ইনি জড়ভরতের ন্যায় জাতিস্মর। ইঁহার পূর্ব্ব-জন্মের সমস্ত স্মৃতিই আছে। এই দেশের বিশেষ কোন কল্যাণসাধন করিবার জন্য ইঁনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।" গোস্বামী প্রভু ইঁহার সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিবার পর হইতে, তদীয় শিষ্যমণ্ডলী ইঁহাকে অতিশয় আদর যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় গোস্বামী প্রভুর অন্তর্ধানের পর ২।১ বৎসরের মধ্যে ইনি কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন কেহই বলিতে পারে না।

৺পুরীধামে, এই সময় ভূতানন্দ স্বামী নামক একজন হঠযোগসিদ্ধ মহাত্মা অবস্থান করিতেন। ইঁনি পুরীধামস্থ প্রসিদ্ধ জগন্নাথবল্লভ মঠের মোহান্ত ছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ইঁহার বয়ঃক্রম চারিশত বৎসরের অধিক বলিয়া লোকে বলিত। তাঁহার কথা-বার্ত্তা, আকার ইঙ্গিতে প্রকাশ পাইত যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহা-প্রভুর সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। সমস্ত জীবনে ইঁহার কখনও ব্রহ্মচর্য্যব্রত ভঙ্গ হয় নাই এবং ইনি অত্যন্ত তেজস্বী মহাপুরুষ ছিলেন। লোকে ইঁহার প্রকৃত ভাব বুঝিতে অক্ষম হইয়া, ইঁহাকে একটী নরহত্যার মোকদ্দমার অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া জেলে প্রেরণ করিয়াছিল। মহামান্য হাইকোর্টের বিচারে যদিও স্বামীজী মুক্তিলাভ করেন, তথাপি স্থানীয় লোকে তাঁহাকে মোহান্তের পদ হইতে বিচ্যুত করে। এই সকল কারণে শেষজীবনে ইনি অত্যন্ত ম্লান হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন সময়

গোস্বামী প্রভু পুরীতে আগমন করেন; এবং তিনিই তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব ও মহত্ত্বের কথা লোকসমাজে প্রচারপূর্ব্বক পরনিন্দাজনিত অন্তরের কালিমা বিদূরিত করিয়া, তাঁহাকে নবজীবন প্রদান করিয়াছিলেন। গোস্বামী প্রভু একদিবস কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, স্বামীজীর সঙ্গ করা তাঁহার পুরী আগমনের অন্যতম কারণ। স্বামীজী, গোস্বামী প্রভুর নিকটে সর্ব্বদা আগমন করিয়া, ধর্ম্মতত্ত্বাদি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিতেন। একদিবস তিনি গোস্বামী প্রভুর সমীপে উপবেশনপূর্ব্বক তাঁহার দিকে স্থিরনেত্রে দৃষ্টি করিয়া ভাবাবেশে বলিতে লাগিলেন, "শ্রীসূর্য্য, শ্রীমহাদেব, শ্রীনারায়ণ, সাক্ষাৎ ভগবান্।" এই কথা বলিয়াই তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ যোগনেত্রদ্বারা গোস্বামী প্রভুর ভিতর কি দেখিয়া এইরূপ স্তব করিলেন, তাহা সাধনহীন মাদৃশ ব্যক্তির বুদ্ধির অগোচর। গোস্বামী প্রভুর তিরোভাবের কিয়দ্দিন পরে, স্বামীজী তাঁহার সম্বন্ধে প্রভুপাদ যোগজীবন গোস্বামী মহোদয়ের নিকট বলিয়াছিলেন—"গোঁসাইজী মানুষ নন, অবতার। তাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যুও নাই এবং কেহ তাঁহার কিছু করিতেও পারে না। তাঁহার ইচ্ছাই সব। তিনি কর্ম্মকাণ্ডের বাহির। তিনি যে শ্রীক্ষেত্রে দেহ রাখিবেন তাহা তিনি জানিতেন, তাঁহার মা জানিতেন ও আমি জানিতাম। যত যত অবতার সকলেই অল্পবয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমি ঋষি, তাই এত দিন বাঁচিয়া আছি। গোঁসাইজী জগন্নাথদেবের সহিত মিলিয়া গিয়াছে, যেমন চৈতন্যপ্রভু টোটাপোপীনাথে মিলিয়া গিয়াছিলেন। মহা-প্রসাদ দিয়া তাঁহার ভোগ দেওয়া উচিত নয়, কারণ তাঁহার প্রসাদই মহাপ্রসাদ তুল্য।" * দুঃখের বিষয় এই যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ, গোস্বামী

---

* গয়ার মুন্সেফ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র বসু বি, এল, মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধৃত।

প্রভুর তিরোভাবের পর অল্প কালের মধ্যেই শ্রীক্ষেত্রধামে কলেবর পরিত্যাগ করেন।

কোন একদিন ৺জগন্নাথদেবের পূজারি পাণ্ডাদিগের গোলযোগে সমস্ত দিবস ঠাকুরের ভোগ হইয়াছিল না। বড়দণ্ডস্থিত প্রসাদোপজীবী শত শত কাঙ্গালিগণ সারাদিন ক্ষুধায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল, কারণ পুরীধামস্থ কয়েকটী ছত্র হইতে প্রদত্ত মহাপ্রসাদের উপরেই তাহাদের জীবন নির্ভর করে। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে একজন ক্ষুধার্ত্ত ভিখারী গোস্বামী প্রভুর আশ্রমের দ্বারে উপনীত হইয়া, 'মঁয় ভুখা হুঁ, মঁয় ভুখা হুঁ' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। দ্বারে তখন কেহ ছিল না, সুতরাং তাহার কাতরপ্রার্থনা কাহারও কর্ণগোচর হইল না। গোস্বামী প্রভু স্বীয় আসনে ধ্যানস্থ ছিলেন। তিনি এই শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, এবং "কে কোথায় আছ, শীঘ্র এই ভিক্ষুককে অন্ন প্রদান কর" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার চীৎকারধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া সেবকগণ নিকটে আগমন করিলে, তিনি অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন—"আজ সমস্তদিন ৺জগন্নাথদেবের ভোগ না হওয়াতে তিনি ক্ষুধায় কাতর হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন। যদিও তিনি নিজে ক্ষুধাতৃষ্ণার অতীত, তথাপি যে সকল ভক্ত ও কাঙ্গালিগণ একমাত্র মহাপ্রসাদের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ক্ষুধা তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিতেছে।" ইহার কিয়ৎকাল পরে পাণ্ডাদিগের গোলযোগ মীমাংসা হইলে ঠাকুরের ভোগ হইল। ভক্তবৃন্দ প্রসাদ পাইয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন; গোস্বামী প্রভুরও অন্তরের জ্বালা দূরীভূত হইল।

গভীর রাত্রিতে একটী শ্বেতকায় বৃহৎ সর্প প্রায়ই গোস্বামী প্রভুর দৃষ্টিপথে পতিত হইত। সর্পটী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া বড়দণ্ডের উপর দিয়া জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে গমন করিত। এই অদ্ভুত

সর্পের কথাপ্রসঙ্গে একদিবস গোস্বামী প্রভু বলিয়াছিলেন যে, "ইনি সাক্ষাৎ অনন্তদেব। ইঁনি প্রত্যহ রাত্রে জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে বিহার করিতে গমন করেন, তখন কচিৎ কোন ভাগ্যবান্ পুরুষ তাঁহাকে দেখিতে পান।" এই কথা শুনিয়া উপস্থিত শিষ্যমণ্ডলী বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

গোস্বামী প্রভু পুরী গমন করিবার পর ৩।৪ মাস পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রত্যূষে শিষ্যগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া সমুদ্র-স্নান করিতেন। পুরীতে সমুদ্র স্নান করা বড়ই বিষম ব্যাপার। সমুদ্র-গর্ত্ত হইতে অনবরত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরঙ্গমালা আগমনপূর্ব্বক তীরে ঠেকিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ইহার মধ্যে একটু অন্যমনস্ক হইলে হাত পা ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা। একদিন শ্রদ্ধেয় বিধুভূষণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সেবকগণ, গোস্বামী প্রভুকে স্নান করাইতেছিলেন,এমন সময় অতর্কিতাবস্থায় একটী তরঙ্গ আসিয়া প্রভুপাদের হাঁটুতে লাগিলে হাঁটুর সন্ধি খসিয়া গেল; এবং ইহার অব্যবহিত পরেই আর একটী তরঙ্গ আসিয়া সন্ধিস্থলে লাগিলে পুনরায় তাহা যথাস্থানে সংযুক্ত হইল। কিন্তু কেহই এই ব্যাপার লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। গোস্বামী প্রভুও তখন কাহাকেও কিছু না বলিয়া, শ্রদ্ধেয় বিধুবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর স্কন্ধে ভর করিয়া ধীরে ধীরে স্বীয় আলয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সকলের পথশ্রান্তি দূর হইলে, তিনি উক্ত ঘটনা ব্যক্ত করিয়া একটী প্রলেপের ব্যবস্থা করিলেন। উক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতে করিতে প্রায় এক মাসে গোস্বামী প্রভু সম্পূর্ণ সুস্থ হন। ইতিমধ্যে একদিবস কীর্ত্তনের মধ্যে অকস্মাৎ কোথা হইতে একটী দিব্যকান্তি পুরুষ আগমনপূর্ব্বক প্রথমতঃ ডমরু বাজাইয়া গোস্বামী প্রভুকে বেষ্টনপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন; এবং কীর্ত্তনান্তে কিয়ৎকাল তাঁহার আঘাতপ্রাপ্ত পদ ধীরে ধীরে টিপিয়া

দিয়া হঠাৎ অদৃশ্য হইলেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, গোস্বামী প্রভুকে এই অপরিচিত পুরুষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, "ইনি সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে আমার হাঁটুর সন্ধি স্খলিত হইয়া গিয়াছিল। তাহাতে ইনি নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া অদ্য আমাদের নিকট আগমন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে আছে যে, যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, ব্রহ্মাদি দেবতারাও তাঁহাদের সেবায় তৎপর থাকেন। তোমরা সাক্ষাৎ বরুণদেবের দর্শনলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছ।"*

অপর একদিন পুরীধামের প্রসিদ্ধ লোকনাথ মহাদেব, জনৈক ভক্তের দেহে আবিষ্ট হইয়া কীর্ত্তনের মধ্যে গোস্বামী প্রভুর গলদেশ ধারণপূর্ব্বক অদ্ভুত নৃত্য করিয়া উপস্থিত সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন।

শিবচতুর্দ্দশীর দিবস গোস্বামী প্রভু কতিপয় শিষ্য-সমভিব্যাহারে ৺ লোকনাথ মহাদেব দর্শন করিতে লোকনাথ গমন করেন। ঐ দিন এই স্থানে একটী মহামেলার অধিবেশন হয় এবং ইহাতে প্রায় ৫০।৬০ হাজার যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। গোস্বামী প্রভু শিষ্যগণপরিবেষ্টিত হইয়া, এই বিপুল জনসঙ্ঘের মধ্য দিয়া অতি কষ্টে মন্দিরের সমীপবর্ত্তী হইলেন; এবং ক্ষণকাল পরেই ভাবে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, আর—মুহুর্মুহু 'হরিহর' 'হরিহর'; 'জয় লোকনাথদেব', 'জয় লোকনাথ-

---

কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকশ্চ ব্রাহ্মণ শ্বপচোপিবা।
ব্রহ্মলোকং সমুলঙ্ঘ্য যাতি গোলোকমুত্তমং॥
ব্রহ্মণা পূজিতঃ সোঽপি মধুপর্কাদিনা চ বৈ।
স্তুতঃ সুরৈশ্চ সিদ্ধৈশ্চ পরমানন্দভাবনঃ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ৩৬ অ, ৮০, ৮১ শ্লোক।

দেব', বলিয়া উচ্চধ্বনিতে দশদিক্ প্রকম্পিত করিতে লাগিলেন। এমন সময় অকস্মাৎ দুইজন লোকনাথদেবের পাণ্ডা তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দেখিয়াই 'তুই ত নন্দী, আর তুই ত ভৃঙ্গী', এই বলিয়া গাঢ় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—"শাস্ত্রে আছে, যিনি কৃষ্ণকে পূজা করেন, আর শিবকে মানেন না, তিনি নরকে গমন করেন, আবার যিনি শিবকে পূজা করেন অথচ কৃষ্ণকে মানেন না, তিনিও নরকে গমন করেন। * 'ওঁ নমো শিবায়' ওঁ নমো শিবায়' এই নাম জপ করো। যিনি এই নাম জপ করিবেন তিনিই সিদ্ধ হইবেন। স্বয়ং দ্বারকানাথ এই নাম জপ করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন।" † এই কথা শুনিয়া একজন পাণ্ডা তখনই 'ওঁ নমো শিবায়' এই নাম জপ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে গোস্বামী প্রভু ভাব সংবরণ করিয়া, পাণ্ডা পূজারীদিগকে তাঁহাদের আশাতিরিক্ত অর্থ দান করিয়া স্বীয় বাসভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পুরীতে পর্ব্বাদি উপলক্ষে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিভিন্ন প্রকার বেশ হইয়া থাকে। এই বেশনির্ম্মাণকার্য্যে পাণ্ডাদিগের নৈপুণ্য অতীব প্রশংসার্হ। এক দিবস গোস্বামী প্রভু কতিপয় শিষ্যসমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-

---

* শিবরাত্রি ব্রতং কৃষ্ণ চর্তুর্দ্দশ্যান্তু ফালগুনে।
বৈষ্ণবৈরপিতৎকার্য্যং শ্রীকৃষ্ণপ্রীতয়ে সদা। ৬৬
মদ্ভক্তঃ শঙ্করদ্বেষী মদ্বেষী শঙ্করপ্রিয়ঃ।
উভৌ তৌ নরকং যাতৌ যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ। ৬৭
শিবায় বিষ্ণুরূপায় শিবরূপায় বিষ্ণবে।
শিবস্য হৃদয়ং বিষ্ণুঃ বিষ্ণোস্ত হৃদয়ং শিবঃ। হরিভক্তিবিলাস, ১৪ অধ্যায়।

† মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব, চতুর্দ্দশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

দেবের 'রাজরাজেশ্বর' বেশ দর্শন করিতে গমন করেন। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াই তিনি ভাবাবেশে ভগবানের বিরাট রূপের বর্ণনা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"এই যে আকাশ পাতাল ব্যাপিয়া জগন্নাথদেব বিরাজ করিতেছেন! তাঁহার শ্রীঅঙ্গের জ্যোতিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আলোকিত হইয়াছে! এই জ্যোতির কাছে চন্দ্র সূর্য্যের জ্যোতি অতিশয় তুচ্ছ! দেব দানব, যক্ষ কিন্নর, পর্ব্বত সমুদ্র, স্থাবর জঙ্গম, নদ নদী সমস্তই ইঁহার মধ্যে দেখা যাইতেছে! তেত্রিশ কোটী দেবতা, লক্ষ শালগ্রাম নির্ম্মিত জগন্নাথদেবের সিংহাসন মস্তকে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন, আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর করযোড় তাঁহার স্তুতি গান করিতেছেন! মণিকোঠার একটী পরমাণুও জড়ীয় নয়, সমস্তই চৈতন্যময়! লোকে কি করিয়া ঐ স্থানে পদার্পণ করে? জয় জগন্নাথ! জয় জগন্নাথ! তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য—ইত্যাদি।" এই রূপ স্তুতি করিয়া তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। উপস্থিত পাণ্ডা পূজারী, শিষ্য দর্শক প্রভৃতি গোস্বামী প্রভুর এবম্প্রকার ভাব দর্শনকরতঃ ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার পর হইতে গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করিতে কখনও মণিকোঠায় গমন করেন নাই, দূর হইতে দর্শন করিতেন।

এই ঘটনায় কিয়দ্দিন পরে, দৈব দুর্ব্বিপাকবশতঃ জগন্নাথদেবের ললাট-সংলগ্ন স্বর্ণালঙ্কারের কতকাংশ কোন দুর্বৃত্ত উৎপাটিত করিয়া লয়। এই আকস্মিক ব্যাপার গোস্বামী প্রভুর কর্ণগোচর হইলে, তিনি স্বীয় ললাটের চর্ম্ম ছিন্ন করিলে যেরূপ যন্ত্রণা হয়, সেইরূপ ভাবে ক্লেশ প্রকাশকরতঃ বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন—"উহারা কি জগন্নাথ-দেবের বিগ্রহকে একটী জড়ীয় পদার্থ ভাবিয়াছে না কি? উহা যে

সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। সৎ-চিৎ-আনন্দ এই জড়াতীত চৈতন্যময় পদার্থ জমাট বাঁধিয়া ঐ বিগ্রহ হইয়াছে।" * শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবকদিগের অনাচারে অত্যাচারে মর্ম্মাহত হইয়া গোস্বামী প্রভু অপর একদিন বলিয়াছিলেন—"জগন্নাথদেব ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মায় ৫০ বৎসর এখানে থাকিবেন, তাই আছেন, নচেৎ এত দিন এ স্থান হইতে চলিয়া যাইতেন।"

একদিবস জনৈক নীতিপরায়ণ সাধু, গোস্বামী প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে কতকগুলি অশ্লীলতাব্যঞ্জক মূর্ত্তি স্থান পাইয়াছে কেন?" তদুত্তরে গোস্বামী প্রভু বলিলেন—"শাস্ত্রকর্ত্তৃগণ কিছুই বাদ দিয়া লেখেন নাই। জীবপ্রকৃতির নিম্নস্তরে যত প্রকারের কুৎসিত ভাব লুক্কায়িত আছে, তাহাই দেখান হইয়াছে মাত্র। আবার ঐ স্তর অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিলে, জীব ক্রমশঃ কি প্রকার সুন্দর উচ্চাবস্থা লাভ করিতে পারে, রূপকভাবে তাহাও দেখান হইয়াছে। মন্দিরের বহির্দ্দেশে নিম্নস্তরেই ঐ সকল মূর্ত্তি স্থান পাইয়াছে, কিন্তু কয়েক স্তর উপরেই নানা প্রকার দেবদেবীর মূর্ত্তি, তারপর ভগবানের বিভিন্ন অবতার ও লীলাব্যঞ্জক মূর্ত্তি, সর্ব্বোপরি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মূর্ত্তি প্রকটিত করা হইয়াছে, এবং মন্দিরের অভ্যন্তরে কোথাও ঐ প্রকারের চিত্রের স্থান দেওয়া হয় নাই।"

এই বৎসর মাদ্রাজ সহরে জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হয়। গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য বরিশালের স্বনামধন্য দেশনায়ক শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় উক্ত সভায় যোগদান করিয়া, ফিরিবার পথে গোস্বামী প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য পুরীতে তাঁহার

* নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দ রূপ॥ চৈতন্যচরিতামৃত।

বাসভবনে উপস্থিত হন। গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে অতীব সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়া, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিগ্রহ এবং মহাপ্রভুর গম্ভীরা, সিদ্ধ-বকুল, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বাড়ী প্রভৃতি কতিপয় স্থান দর্শন করাইবার জন্য জনৈক শিষ্যকে তাঁহার সহিত প্রেরণ করেন। শ্রদ্ধেয় অশ্বিনীবাবু উক্ত শিষ্যটীর সহিত সিদ্ধবকুল প্রভৃতি স্থানগুলি দর্শন করিয়া অবশেষে জগন্নাথ-দেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিগ্রহে এক মহাশক্তির অপূর্ব্ব আকর্ষণ স্বীয় প্রাণে উপলব্ধিকরতঃ তাঁহার সঙ্গীয় শিষ্যটীর নিকটে অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনি গোস্বামী প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইয়া কথা প্রসঙ্গে বলিলেন—"আশীর্ব্বাদ করুন, যেন দেশের জন্য খাটিতে পারি।" উত্তরে গোস্বামী প্রভু অতীব প্রীতি-সহকারে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয়া, 'খুব খাটো' খুব খাটো' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এই সময় একদিবস রাত্রি অনুমান ৭ ঘটিকার সময় ঢাকার প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য জমিদার শ্রীযুক্ত রূপলাল দাস মহাশয়ের পুত্র এবং গোস্বামী প্রভুর শিষ্য স্বর্গীয় রাধাবল্লভ দাস মহাশয়, গোস্বামী প্রভুকে এই মর্ম্মে তারের সংবাদ প্রেরণ করেন যে, তাঁহার আসন্নপ্রসবা স্ত্রী (ইনিও গোস্বামী প্রভুর শিষ্যা) প্রসববেদনায় অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, বড় বড় ডাক্তারগণ অস্ত্রপ্রয়োগের পরামর্শ দিয়াছেন, এই অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য, কৃপাপূর্ব্বক তারযোগে তাহার উত্তর প্রদান করেন। গোস্বামী প্রভু রাত্রি অনুমান ৮ ঘটিকার সময় জরুরীতারে এই উত্তর প্রদান করিলেন যে, "অদ্য রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে এক সহস্র ব্রাহ্মণের পাদোদক রোগিণীকে পান করাইতে পারিলে সুপ্রসব হইবে।" এই কথা শুনিয়া শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন—"প্রকৃত ব্রাহ্মণ কে, তাহা কিরূপে নির্ণীত হইবে।" তদুত্তরে গোস্বামী প্রভু বলিলেন, "এত

বিচার করিবার আমাদের দরকার নাই। ব্রাহ্মণবংশে জন্ম ও উপবীতধারী হইলেই তিনি ব্রাহ্মণ।” সে যাহা হউক, দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ তাঁরবার্ত্তা যথাসময়ে না পৌঁছিয়া পরদিন ১০ ঘটিকায় ঢাকায় পৌছিল। তখন তাড়াতাড়ি করিয়া সহস্র ব্রাহ্মণের পাদোদক সংগ্রহপূর্ব্বক রোগিণীকে পান করান হইলে, অল্পক্ষণের মধ্যে প্রসব হইল বটে, কিন্তু সন্তানটী মৃতাবস্থায় প্রসূত হইয়াছিল। সুবিজ্ঞ ডাক্তারগণের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে, অস্ত্রপ্রয়োগ ভিন্ন কিছুতেই রোগিণীর প্রাণরক্ষা করা যাইবে না। এখন তাঁহারা মৃত-সন্তান এই প্রকারে অনায়াসে প্রসূত হইতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। উক্ত মহিলাটী পরে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, প্রসব হইবার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে একটী অপূর্ব্ব জ্যোতির্গোলকের মধ্যে প্রণব-বেষ্টিত গোস্বামী প্রভুর মূর্ত্তি দর্শন করিবামাত্র তাঁহার রোগ-জনিত ক্লেশ দূরীভূত হইয়াছিল।

পুরীতে গোস্বামী প্রভুর দুইটী শিষ্য কলেবর পরিত্যাগ করেন। ১ম। স্বামী দেবপ্রসাদ। ইঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, জন্মস্থান চন্দননগর। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধিধারী এবং সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতেও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি বানরবধ নিবারণ-কল্পে শাস্ত্রের প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া যে ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিনা আপত্তিতে তাহাতেই স্ব স্ব নাম সাক্ষর করিয়াছিলেন। ১৩০৫ সালের ২১শে ভাদ্র প্রাতে পুরীর স্বর্গদ্বারের ঘাটে স্নান করিতে গিয়া সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া ইনি দেহ ত্যাগ করেন। এই ঘটনার কিয়দ্দিন পূর্ব্বে গোস্বামী প্রভু শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন—“তোমরা বিশেষ সাবধান হইয়া সমুদ্রস্নান করিবে এবং স্নানের সময় সমুদ্রতীরে উপস্থিত থাকিতে কয়েকজন ধীবর নিযুক্ত রাখিবে, কারণ আমার চক্ষে পড়িতেছে যে তোমাদের মধ্যে ২।১ জনকে সমুদ্রে ভাসাইয়া লইয়া

যাইতেছে।" কিন্তু তাঁহার এই কথায় তখন কেহ বিশেষভাবে মনোযোগ প্রদান করেন নাই। ঘটনার দিবস স্নানের পূর্ব্বে স্বামীজী সমুদ্রতীরে উপবেশনপূর্ব্বক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ধ্যানস্থ ছিলেন। ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি গোস্বামীপ্রভুর অন্যতম সেবক শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মিত্র মহাশয়ের নিকটে কথা-প্রসঙ্গে প্রকাশ করিলেন যে, তিনি ধ্যানাবস্থায় অন্তরীক্ষে তান-লয়-বিশুদ্ধ অপূর্ব্ব সঙ্গীত-ধ্বনি শ্রবণ করিতেছিলেন। তাঁহার দেহান্তে এই কথা শ্রদ্ধেয় অশ্বিনীকুমার, গোস্বামী প্রভুর নিকটে ব্যক্ত করিলে, তিনি বলিলেন—"শাস্ত্রে আছে যে মুক্ত পুরুষদিগের মৃত্যুকালে স্বর্গের অপ্সরা বিদ্যাধরীগণ নৃত্য গীত করিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন। এই ঘটনা আকস্মিক নহে। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, স্বামীজী পরমপদ লাভ করিয়াছেন।" স্বামীজীর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে বানরবধের স্বপক্ষ দল উল্লাস প্রকাশ করাতে, গোস্বামী প্রভু নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটী একখণ্ড কাগজে লিখিয়া নিজের ঘরের দেয়ালে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্লোক যথা :—

১। সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ক্ষেত্রং তৎ পরমং মহৎ।
পুরুষাখ্যং সকৃদ্দৃষ্ট্বা সাগরাম্ভ সকৃৎ মৃতঃ ॥ পদ্মপুরাণ।

২। ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রজাতি ত্যজন্ দেহং স জাতি পরমাং গতিং ॥ গীতা।

২য়। ৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইঁহার পিতার নাম ৺জগৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জন্মস্থান ঢাকা বিক্রমপুরের শ্রীনগর থানার অন্তর্গত বাঘড়া গ্রাম। ইনি মৈমনসিংহের অন্তর্গত জামালপুর হাইস্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রে ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। এই কারণে গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে আদর করিয়া সময় সময়

তত্ত্ববাগীশ বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ২।১ দিনের সামান্য জ্বরেই ইঁনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। দেহত্যাগ করিবার কিয়ৎকাল পূর্ব্ব হইতেই, জানি না কি প্রভাবে ইনি পুরীধামে গোস্বামী প্রভুর ভাবী তিরোধানের বিষয় অবগত হইয়া, তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্তর্ধানের পূর্ব্বেই যেন তাঁহার নিজের মৃত্যু হয়! ৺ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই প্রার্থনা অবগত হইয়া, এক দিবস গোস্বামী প্রভু বলিলেন—"সতীশ, জগন্নাথদেব. তোমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন।" সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইঁহার মৃত্যুতে কাহারও কোন প্রকার শোক উপস্থিত হয় নাই; এবং পরিত্যক্ত দেহ দাহকালে চিতা হইতে চন্দনের গন্ধের ন্যায় একপ্রকার সুগন্ধ নির্গত হইয়াছিল। এই দুইটী বিষয় অবগত হইয়া গোস্বামী প্রভু বলিয়াছিলেন—"শাস্ত্রে আছে যে, মৃতাত্মা সদ্গতি লাভ করিলে তাহার জন্য কাহারও শোক হয় না; এবং ভগবান্ যাঁহাদের দেহ স্পর্শ করেন, দাহকালে তাঁহাদের দেহ হইতে ঐ প্রকার সুগন্ধ বাহির হইয়া থাকে। পুতনার শবদাহকালে চতুঃসোমের গন্ধ বাহির হইয়াছিল। সতীশ, হরিদাস ঠাকুরের ন্যায় মুক্তাত্মা ছিলেন। দেহান্তে ইনি শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রাকৃত মধুরলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন—ইত্যাদি।"

পুরী আগমনাবধি গোস্বামী প্রভু নিজে করতাল বাজাইয়া "হরেমুরারে মধুকৈটভারে—ইত্যাদি" ভোর কীর্ত্তন করিতেন। পরে করতালের ধ্বনির সংযোগে সুর করিয়া তিনি যখন নিম্নলিখিত স্তুতি পাঠ করিতেন, তখন নিতান্ত পাষণ্ডের হৃদয়ও দ্রবীভূত হইত। স্তুতি যথাঃ—"বদরিকাধাম-বাসী সাধু-সজ্জনের চরণে নমস্কার; রামেশ্বর-ধামবাসী সাধু-সজ্জনের চরণে নমস্কার; দ্বারকা-ধামবাসী সাধু-সজ্জনের চরণে নমস্কার; জগন্নাথ-ধামবাসী সাধু-সজ্জনের চরণে নমস্কার; শ্রীবৃন্দাবন-ধামবাসী সাধু-সজ্জনের

চরণে নমস্কার; শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামবাসী সাধু-সজ্জনের চরণে নমস্কার; ইহলোক-বাসী পরলোকবাসী সাধু-সজ্জনের চরণে নমস্কার; স্বর্গবাসী নরকবাসী পাপী পুণ্যাত্মা সকলের চরণে নমস্কার; পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ স্থাবর জঙ্গম সকলের চরণে নমস্কার—ইত্যাদি।"

"অনেক সময় পরলোকগত আত্মারা ঠাকুরের নিকটে সংগতি ভিক্ষা করিত, অনেকে সাধন প্রার্থনা করিত। পুরী অবস্থানকালে একটী পরলোকগত আত্মা—বৈদ্য বংশ (নিবাস কাছড়াপাড়া) তাঁহার পরলোকগত পিতাকে সঙ্গে করিয়া ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "আপনি ভিন্ন গতি নাই, আমাদিগকে উদ্ধার করুন"। ঠাকুর বলিলেন "তোমরা জানিলে কি প্রকারে?" আত্মা বলিল—"আমরা পরলোকগত রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি কয়েকটী মহাপুরুষের নিকট শুনিয়াছি, আপনি ভিন্ন বর্ত্তমান সময় কলির জীবের অন্য গতি নাই।" তিনি বলিলেন, "এক এক যুগে এক এক জনের প্রতি জীব-উদ্ধারের ভার থাকে, বর্ত্তমানে গোঁসাইএর উপর ভার।" রামকৃষ্ণ পরমহংস আরও বলিলেন—"আমি আমার আশ্রিতদিগকে জীবিতাবস্থায় পুনঃপুনঃ বলিয়াছিলাম, তোমরা গোঁসাইএর অনুগত হইয়া চলিও, দেহত্যাগের পরেও কতবার বলিয়াছি, কিন্তু কেহই বুঝিল না।" *

একদিবস বরাহনগরনিবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ কথক, গোস্বামী প্রভুর নিকটে কথকতা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, তিনি সানন্দচিত্তে তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। এতদুপলক্ষে পুরীসহরবাসী কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। যথাসময় কথক মহাশয় অতিশয় সুললিত ভাষায় রুক্মিণী-বিবাহ-লীলা ব্যাখ্যা করিয়া উপস্থিত

* গয়াধামের মুনসেফ শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসু, বি, এল মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধৃত।

ভক্তমণ্ডলীকে অতিশয় তৃপ্তি প্রদান করেন। পাঠান্তে গোস্বামী প্রভু কথক মহাশয়কে বিদায়ের স্বরূপ নূতন বস্ত্র, পিত্তলের কলসী, থালা, বাসন ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিয়াছিলেন।

অপর এক দিবস গোস্বামী প্রভুর অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীযুক্ত রেবতী-মোহন সেন মহাশয় তাঁহার স্বরচিত 'জগাই মাধাই উদ্ধার-লীলা' গান করেন। শ্রদ্ধেয় রেবতীবাবুর সুমধুর কীর্ত্তনগানের সুখ্যাতি ইতঃপূর্ব্বেই সহরময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং এই দিন সহরস্থিত বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি তাঁহার গান শুনিতে আগমন করিয়াছিলেন। কীর্ত্তন খুব জমাট হইয়াছিল এবং উপস্থিত সকলেই তাহা শ্রবণ করিয়া মোহিত হইয়া-ছিলেন। অপর একদিন তাঁহার মধুর-কণ্ঠ-নিঃসৃত প্রাণস্পর্শী কীর্ত্তন শ্রবণকরতঃ গোস্বামী প্রভু ভাবাবেশে স্বীয় বহির্ব্বাস ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন, এবং একখানি লুই বস্ত্র দিবার জন্য যোগজীবন গোস্বামী মহাশয়কে আদেশ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার এই কৃপাদেশ যথাসময় প্রতিপালিত হইয়াছিল।

কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার" পত্রিকাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীকে শূদ্র প্রতিপন্ন করিয়া প্রবন্ধ লিখিত হইতেছিল। এই সময় কলিকাতা সিমলা-নিবাসী প্রভুপাদ অতুল-কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় উক্ত মত খণ্ডন করিয়া বঙ্গবাসী পত্রিকাতে একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইহাতে গোস্বামী প্রভু অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া একখানি পত্র লিখেন। পত্রখানি অবিকল উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

নমস্তনিত্যানন্দবংশধরচরণসরোজেষু,

অদ্য বঙ্গবাসীতে "শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী" নামক প্রবন্ধটী শুনিয়া যে কতদূর সুখী হইলাম তাহা বলিতে পারি না। যখন আমি কলিকাতায়

ছিলাম, প্রায়ই দেখিতাম যে লোকেরা আসিয়া বলিতেছে যে, বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকাতে মহাপ্রভুর গুরু ঈশ্বরপুরী যে শূদ্র ছিলেন, তাহাই লিখা হইতেছে। সেই পর্য্যন্ত আমার মনে সর্ব্বদা হইত যে, আমাদের কোন গোস্বামী বংশে কি এমন কেহ নাই যে, এই মিথ্যা এবং ভয়ানক মতের প্রতিবাদ করে। অদ্য আপনার প্রতিবাদ শুনিয়া যে কি পরিমিত আহ্লাদিত হইলাম বলিতে পারি না। যদি আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে ও সমুদ্র শুকাইয়া যায়, তথাপি ঈশ্বরপুরী যে শূদ্র ছিলেন একথা কখনও সত্য হইতে পারে না। আপনি যেরূপ যুক্তিযুক্তভাবে প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন তাহা খুব সুন্দর হইয়াছে। যুক্তিগুলি খুব অকাট্য হইয়াছে, তথাপি আমি দুই একটী কথা বলি। আপনি যাহা প্রমাণ দেখাইয়াছেন, তাহা যথেষ্ট হইয়াছে, তবে সবদিকেই ঈশ্বরপুরী যে শূদ্র হইতে পারেন না, তাহার প্রমাণ রহিয়াছে।

৮ মহাপ্রভু যখন গয়াধামে গিয়াছিলেন, সেই স্থানেই ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার প্রকটাবস্থা নয়। আর বর্ণাশ্রমধর্ম্মে থাকিয়া তিনি যে শূদ্রের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন, এ মোটেই সম্ভব হইতে পারে না। গয়াধামে গিয়া, শ্রীঈশ্বরপুরী ব্রাহ্মণ না হইলে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেনই বা কেন? তা ছাড়া গুরুপরম্পরায় শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী বলিয়া লিখা আছে। ঈশ্বরপুরী শূদ্র হইলে মাধবেন্দ্রপুরী তাঁহাকে শিষ্য করিবেন কেন?

আপনি যে সব যুক্তি দেখাইয়া লিখিয়াছেন, তাহাতে ঐ সব অসার ও অন্যায় মত খুব খণ্ডন করা হইয়াছে। এইরূপ ভয়ানক মত যাহাতে প্রশ্রয় না পাইতে পারে, তাহার জন্য আপনারা সবিশেষ চেষ্টিত থাকিবেন। আমাদের দেশে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম লোপ পাইবার মত হইয়াছে। আপনারা

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষার জন্য চেষ্টা না করিলে আর কাহারা করিবে? এই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম না দাঁড়ালে, সর্ব্বসাধারণের কখনই মঙ্গল হবে না। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম রক্ষা হইলে যথার্থ সকলের কল্যাণ হইবে। শেষে ৺ মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করি, যেন আপনাকে দীর্ঘজীবী করেন ও যেন তাঁহার সত্য-ধর্ম্ম এইরূপ রক্ষা করিতে ও লোককে বুঝাইতে শক্তি দেন।

৺ শ্রীক্ষেত্রধাম।
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬

শাস্ত্র ও সদাচাররক্ষাকারী সর্ব্ব-
সজ্জনগণের দাসানুদাস
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

একদিবস গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য শ্রীযুক্ত পান্নালাল ঘোষ মহাশয় স্বপ্নে দেখিলেন, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তাঁহার নিকটে প্রকাশিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার শ্রীমুখ মলিন, দুই চক্ষুদিয়া দরদর ধারে জল পড়িতেছে, এবং তিনি কত কি অসংলগ্ন কথা উচ্চারণ করিতেছেন। এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া শ্রদ্ধেয় পান্নাবাবু গোস্বামী প্রভুর নিকটে স্বপ্নবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"তুমি যথার্থ ই স্বপ্নাবস্থায় মহাপ্রভুর দর্শন পাইয়াছ।" পান্নাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে তাঁহার মুখ মলিন, ও চক্ষে জল দেখিলাম কেন? এবং তিনি কতকগুলি অসংলগ্ন কথাই বা বলিলেন কেন?" গোস্বামী প্রভু কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"মহাপ্রভু যে শক্তি মাত্র ৩।০ জনকে প্রদান করিয়াছিলেন, এবার তিনি তোমাদিগকে তাহাই দিয়াছেন, কিন্তু এই দেবদুর্লভ জিনিষের কেহই তেমন মর্য্যাদা দিতে পারিতেছে না, এই জন্যই তাঁহাকে ঐরূপভাবে দেখিয়াছ।"

অতঃপর একদিবস শ্রীমৎ যোগজীবন গোস্বামী মহোদয়, গোস্বামী প্রভুকে প্রকারান্তরে প্রশ্ন করিলেন—"ইহার পরে এই সাধন লোকে কি প্রকারে পাইবে?" গোস্বামী প্রভু উত্তর করিলেন—"যাঁহারা সাধন

পাইয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকেই এই সাধন দিতে পারেন। তবে কথা এই যে, যদি কেহ নিজকে সম্পূর্ণ ছেড়ে, গুরুকে প্রত্যক্ষ করে, তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সাধন দিতে পারেন, তাহা হইলেই সাধনপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের বিশেষ উপকার হইবে, নচেৎ নিজেরই ঘোর অনিষ্ট হইবে। কিন্তু এই শক্তি আর মাথা কুটিলেও কেহ পাইতে পারেন না। এই শক্তি সেবার মহাপ্রভু মাত্র ৩৷৷৹ জনকে দান করিয়াছিলেন এবং সেই সময় ইহার ছিটা ফোঁটা অপরাপর যাঁহারা পাইয়াছিলেন, তাঁহারাই এবার এই শক্তি পাইলেন।"

পুরীতে গোস্বামী প্রভুর অভূতপূর্ব্ব অদৃষ্টচর কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া, আপামর সাধারণ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। 'এমন দাতা আর হবে না,' 'এমন দয়ালু আর নাই,' 'সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় এমন শোভন মূর্ত্তিও আর কখনও দর্শন করি নাই' ইত্যাদি প্রশংসাসূচক বাক্য, রাস্তায় বহির্গত হইলে অনেকের মুখেই শুনা যাইত। শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র, সাধু অসাধু, যুবক বৃদ্ধ, স্বদেশী বিদেশী সর্ব্ব শ্রেণীর লোকই গোস্বামী প্রভুকে দর্শন করিতে, তাঁহার মুখনিঃসৃত দুটী কথা শুনিতে সদাসর্ব্বদা তাঁহার আশ্রমে যাতায়াত করিত। দূর দূরান্তর হইতে যাত্রীর দল তীর্থ দর্শন করিতে আগমন করিয়া, তীর্থস্থানের অপরাপর দ্রষ্টব্য বস্তুর সহিত গোস্বামী প্রভুকে দর্শন না করিলে যেন তাহাদের তীর্থযাত্রা সফল হইত না; তাহারা দলে দলে আসিয়া অন্ততঃ একবারও তাঁহাকে দর্শন করিয়া যাইত। গোস্বামী প্রভুর এইরূপ অসাধারণ প্রতিপত্তি দর্শন করিয়া কতিপয় ধর্ম্মাভিমানী মাৎসর্য্যপরায়ণ লোকের হিংসানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তাহারা তাঁহাকে নানা প্রকারে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

পুরীধামে আগমন করিয়া গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহা-

প্রসাদের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলিতেন যে, 'যেমন নাম ও নামী, ভক্ত ও ভগবান্ একই তত্ত্ব, তদ্রূপ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ও মহাপ্রসাদও একই তত্ত্ব, ইঁহাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রভেদ নাই। জগন্নাথদেব দর্শনেও যে ফল, মহাপ্রসাদ সেবনেও সেই ফল।" এই কথা শুনিয়া জনৈক শিষ্য প্রশ্ন করিলেন—"তবে প্রসাদ প্রাপ্তিমাত্রই ফল পাওয়া যায় না কেন?" তদুত্তরে গোস্বামী প্রভু বলিলেন—"সকলেই প্রাপ্তিমাত্র ফল পাইতে পারে না, কারণ মানবমাত্রেরই সাধারণতঃ শরীর মন অশুদ্ধ থাকে। অশুদ্ধ শরীরে মহাপ্রসাদের ফল অনুভূত হইতে পারে না, যেমন সমল দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখা যায় না। তবে দীর্ঘকাল মহাপ্রসাদ ভোজন করিলে সময়ে সকলেই তাহার অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন, সে বিষয় বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ মহাপ্রসাদ ভোজন করিতে করিতে বস্তুগুণে শরীর মন শুদ্ধ হইতে থাকে এবং প্রকৃতিভেদে যাহার দেহ মন যত শীঘ্র, যে পরিমাণে পরিশুদ্ধি লাভ করিতে থাকে, তিনি তত শীঘ্র সেই পরিমাণে মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে থাকেন। অবশেষে ভগবৎকৃপায় মহাপ্রসাদের গুণে শরীর মন সম্পূর্ণ শুদ্ধ হইলে, তিনি তাহার পূর্ণ ফল লাভ করিতে পারেন। তখন সেই বিশুদ্ধাত্মা ভক্ত মহাপ্রসাদ প্রাপ্ত মাত্রই—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

ইত্যাদি ভগবদ্দর্শনের যে সকল লক্ষণ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে তাহা স্বীয় প্রাণে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন।"

শ্রীক্ষেত্র আগমনাবধি নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে গোস্বামী প্রভু মহাপ্রসাদ ভিন্ন অন্য কিছুই ভোজন করিতেন না এবং মহাপ্রসাদ বলিয়া কেহ

কিছু প্রদান করিলে তাহা কখনও প্রত্যাখ্যান করিতেন না। শ্রীমন্ মহাপ্রসাদের প্রতি এইরূপ গভীর শ্রদ্ধার সুযোগ অবলম্বন করিয়া একদিবস পূর্ব্বাহ্নে পূর্ব্বোক্ত দুর্ব্বৃত্তগণদ্বারা প্রেরিত হইয়া, জনৈক সাধুবেশধারী খলপ্রকৃতির লোক তীব্র বিষমিশ্রিত একটী লাড্ডু তাঁহার হস্তে প্রদান পূর্ব্বক তাহা প্রাপ্তিমাত্র ভোজনের জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয়ে অনুরোধ করিতে লাগিল। আগন্তুকের দুরভিসন্ধি বুঝিতে তাঁহার বাকী রহিল না। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই মুহূর্ত্তে সেবকগণের মধ্যে কেহ নিকটে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি মহামতি প্রহ্লাদের ইতিবৃত্ত স্মরণ করিয়া, মহাপ্রসাদরূপে প্রদত্ত বস্তুর সম্যক্ আদর ও সম্মান দেখাইবার অভিপ্রায়ে অম্লানবদনে অবিচলিতচিত্তে উক্ত বস্তু সেবন করিলেন। তীব্র হলাহলের ক্রিয়া তাঁহার দেহে প্রকাশিত হইল, তিনি ক্ষণকালের মধ্যে অচেতন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু নীলকণ্ঠ মহাদেব লোকনাথ প্রভুর কৃপাতে অত্যল্পকালের মধ্যে পুনঃ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। বিষের প্রাণহারী শক্তি দুই এক দিনের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। যেন বিশেষ কিছু ঘটে নাই, এইরূপ ভাবে তিনি পুনরায় পাঠ, পূজা, কীর্ত্তনাদি নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া পূর্ব্ববৎ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনা সংস্পৃষ্ট লোকদিগকে জানিবার কোনরূপ সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু গোস্বামী প্রভুর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন কতিপয় সাধুর কার্য্যকলাপে ভক্তিভাজন যোগজীবন গোস্বামীর সন্দেহ হওয়াতে, তিনি গোস্বামী প্রভুকে তাঁহার আকস্মিক ভয়ানক অসুখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গোস্বামী প্রভু প্রথমতঃ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, পরে প্রভুপাদ যোগজীবন ও অপরাপর শিষ্যগণ নিতান্ত পীড়াপীড়ি করাতে অবশেষে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে উত্তর করিলেন,—

"গত কল্য যখন তোমরা সমুদ্রস্নানে গিয়াছিলে তখন ঘরে কেহই ছিল না। মহাপ্রসাদের নাম করিয়া এক ব্যক্তি আমাকে তীব্র বিষমিশ্রিত

লাড্ডু খাওয়াইয়াছিল। ইহা এক বিষম ষড়যন্ত্রের ফল। প্রায় ২৫ জন ব্যক্তি ইহাতে সংশ্লিষ্ট। ভগবান্ আমাকে ঐ সকল লোককে দেখাইয়া দিয়াছেন। আমাদের পুরীর আগমনের পর ঐ সকল লোকের প্রতিষ্ঠা ও স্বার্থের ব্যাঘাত হইয়াছে বলিয়া, ইহারা এই অমানুষিক কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছে।" এই সকল ব্যক্তির নাম ও পরিচয় জানিতে চাহিলে গোস্বামী প্রভু বলিলেন—"তাহা আমি কিছুতেই বলিব না। এইরূপ ঘটনা আমার জীবনে আরও কয়েকবার ঘটিয়াছে। সমাজ, সম্প্রদায়, কি ব্যক্তিবিশেষের প্রতিষ্ঠার হানি কল্পনা করিয়া আমার প্রাণবিনাশের বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু ভগবৎকৃপায় প্রত্যেক বারেই আমি রক্ষা পাইয়াছি।" এই সকল কথা শুনিয়া তাঁহার আশ্রিত অনুগত ভদ্রসন্তানগণ অত্যন্ত উত্তেজিত হইলেন এবং ভয়ঙ্কর প্রতিবিধিৎসা তাঁহাদের হৃদয়ে জাগরিত হইল। তখন গোস্বামী প্রভু অতি সুমিষ্ট বাক্যে তাঁহাদিগকে শান্ত করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন—"ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা এক বিষম ব্যাপার। ইহার হানি হইলে লোক না করিতে পারে এমন কর্ম্ম নাই। সাধকশ্রেণীর মধ্যে বহু সংখ্যক ব্যক্তি অন্যান্য কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও এই প্রতিষ্ঠার ঘাটে, অর্জ্জিত সাধনসম্পত্তি জলাঞ্জলি দিয়া নিরয়গামী হন। তোমরা শান্ত হও। ইহাদিগকে ক্ষমা কর, উহারা বড়ই কৃপাপাত্র।"

শাসনবিভাগের কতিপয় উচ্চ কর্ম্মচারী এই ঘটনা অবগত হইয়া, গোস্বামী প্রভুর নিকটে আগমন করিয়া বলিলেন—"পুরীধামে অনেক দুষ্ট লোকের আড্ডা হইয়াছে; ইহারা ভাল মানুষের প্রতি বড়ই অত্যাচার করে, ইহার প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এই বিষ-প্রয়োগের কথা একটু লিখিয়া জানান। দুষ্টদিগের শাসনের এই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।" তদুত্তরে তিনি বলিলেন— "আমি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আশ্রয়ে বাস করিতেছি। তিনি সমস্ত

দেখিয়াছেন, ইচ্ছা হইলে তিনিই প্রতিবিধান করিবেন,' নতুবা লোকের নিকটে আমি কোনরূপ প্রতিকারের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিব না।" এই কথা শুনিয়া তাঁহারা নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

এই ঘটনার পর প্রভুপাদ যোগজীবন গোস্বামী ও অপরাপর শিষ্যগণ গোস্বামী প্রভুর শরীর রক্ষার জন্য অতীব চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কি জানি, দুর্বৃত্তগণের মনে আরও কি আছে, তাহারা পুনরায় কি নূতন বিপদ ঘটায়, এই আশঙ্কা করিয়া শিষ্যগণ তাঁহাদের প্রাণের প্রিয়তম দেবতা গোস্বামী প্রভুকে তাড়াতাড়ি কলিকাতায় গমন করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। গোস্বামী প্রভু শিষ্যদিগকে এইরূপ বিচলিত হইতে দেখিয়া একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশপূর্ব্বক, শ্রীমৎ যোগজীবন গোস্বামী মহোদয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তোরা এত ভাবছিস্ কেন? স্বয়ং জগন্নাথদেব তিনবার করিয়া আমার খবর নিচ্ছেন। ইনি স্বয়ং বিশ্বেশ্বর, আমার ভয় কি, অন্য স্থানে গেলে কি ত্রাণ পাইব? একটা কাঁটা ফুটিলেও ত মৃত্যু হইতে পারে, আর এস্থানে ধরিয়া আছড়াইলেও তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই হইবার যো নাই। অন্যদিকে তোমরা তাকাও কেন? যাইবার ইচ্ছা হইলে তোমরা চলিয়া যাও। আমি কেবলমাত্র লাঠিগাছা অবলম্বন করিয়া পড়িয়া থাকিব। তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন কদাচ কিছু করিব না। তাঁহার ইচ্ছা হইলে মুহূর্ত্তের মধ্যে সব ঠিক হইয়া যাইবে। ঠাকুর ঘরের ছেলে ঘরে পাঠাইয়া দিবেন। তিনি সময় বুঝিয়া আদেশ করিবেন।" * পরে বলিলেন,—"এখানে আমি যে উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছিলাম তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। এই স্থানে আমার আর কোন কর্ম্ম নাই। এখন আদেশ হইলেই যাইতে পারি। কিন্তু এক কপর্দ্দক ঋণ

* গোস্বামী প্রভুর অন্যতম সেবক শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ডায়েরী হইতে উদ্ধৃত।

থাকিতেও নড়িব না।" এই কথা শুনিয়া শিষ্যগণ শীঘ্র শীঘ্র ঋণ শোধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। গোস্বামী প্রভুর অনুগত শিষ্য শ্রীমান্ পান্না-লাল ঘোষ মহাশয় স্বীয় গুরুদেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ঋণ শোধের চেষ্টায় কলিকাতা অঞ্চলে আগমন করিলেন। এই সময় গোস্বামী প্রভুর মফঃস্বলস্থ শিষ্যগণ তাঁহাদের পরমারাধ্য গুরুদেবের দানকার্য্যের সহায়তার জন্য অকাতরে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন।

গোস্বামী প্রভুর শরীর ইদানীং একেবারেই ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। উঠিতে বসিতে, হাঁটিতে চলিতে, সর্ব্বদা তাঁহাকে অপরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইত; তথাপি একটী দিনের জন্যেও, তাঁহার পাঠ, পূজা, কীর্ত্তন, শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যের ব্যতিক্রম হয় নাই। শারীরিক দুর্ব্বলতানিবন্ধন তাঁহাকে বেদানা প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হইত। কিন্তু কলিকাতায় এই সময় বেদানা দুর্লভ হওয়াতে জনৈক শিষ্য প্রস্তাব করিলেন যে, উইল্‌সনের হোটেলে এক প্রকার বেদানার রস বিক্রয় হয়, তাহা তিনি খাইতে পারেন কি না। তদুত্তরে গোস্বামী প্রভু বলিলেন—"সে কি? আমি অপরের নিকট শাস্ত্র সদাচারের মহিমা প্রচার করিতেছি, আর আমি নিজে সদাচারবহির্ভূত কার্য্য করিব, তাহা কখনই হইতে পারে না।" এই কথা শুনিয়া গোস্বামী প্রভুর অন্যতম সেবক শ্রীযুক্ত কুলদাকান্ত ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন—"উইল্‌সনের হোটেলের পাউরুটী ত আপনি পূর্ব্বে খাইয়াছেন।" তদুত্তরে তিনি বলিলেন—"দশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা করিয়াছি এখনও কি তাহাই করিতে হইবে? দেখিতে পাইতেছ না, আমি কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি?"

গোস্বামী প্রভু শেষজীবনে বহু বৎসর পর্য্যন্ত একেবারেই নিদ্রা যান নাই। সমস্ত রাত্রি আসনে বসিয়া ভগবৎধ্যানে অতিবাহিত করিতেন,

কখনও বা জাগ্রত শিষ্যগণের সহিত নানাবিধ ধর্ম্মালোচনা করিতেন। বর্ত্তমানে ঈদৃশ ভগ্নশরীর লইয়াও তিনি এই কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার স্নেহশীলা শ্বশ্রূঠাকুরাণী একদিন বলিলেন—"তুমি এখন কিছুদিন শয়ন করিলেও ত পার।" তদুত্তরে গোস্বামী প্রভু বলিলেন—"আমি যেদিন শয়ন করিব সেদিন আর থাকিব না, যেদিন আসন ত্যাগ করিব, সেদিন আমি থাকিব না।" শ্বশ্রূঠাকুরাণী এই কথা শুনিয়া নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। এক দিবস গোস্বামী প্রভু কতিপয় শিষ্যের নিকট বলিলেন,—"দেখ, তোমাদের সম্মুখে বর্ষাকাল উপস্থিত। বর্ষাকালে যেমন আকাশ সর্ব্বদা মেঘাচ্ছন্ন থাকে, পথ ঘাট কর্দ্দমময় হয়, নদী নালার জল অপরিষ্কার হয়, যেখানে সেখানে পোক-জোঁক কিলবিল করে, প্রকৃতিকে যেন নিরানন্দের ছায়ায় ঢাকিয়া ফেলে; তখন মনে হয় না যে এই দিন চলিয়া যাইবে। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে বর্ষাকালের পরই শরৎকালের ব্যবস্থা। শরতের আগমনে আকাশ মেঘনির্ম্মুক্ত হয়, রাস্তা ঘাট শুকাইয়া যায়; আবার মেদিনী হাসিতে থাকে। সেইরূপ এখন তোমাদের সাধনমণ্ডলীর প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয়ের সময় উপস্থিত। এই সময় নানা প্রকার রোগ, শোক, জ্বালা, যন্ত্রণা, অপমান, নির্য্যাতন, পরস্পরে অবিশ্বাস প্রভৃতি পূর্ণমাত্রায় আগমন করিবে। সময় সময় ইহা এতদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে যে, অনেকে সাধনপন্থায় অবিশ্বাসী হইয়া সাধন পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ ভয়ানক অবস্থার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার এক মাত্র উপায়, ধৈর্য্য ধরিয়া গুরুদত্ত নাম গ্রহণ করা। যিনি তাহা করিতে পারিবেন, তাঁহার কর্ম্ম শীঘ্রই ক্ষয় হইয়া শান্তির অবস্থা উপস্থিত হইবে। আর যিনি ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বিপথে গমন করিবেন, তিনি আরও ঘোর বিপাকে পতিত হইবেন। বর্ষাকালের পরেই যেমন শরৎকাল আগমন করে, সেইরূপ তোমাদেরও এই অবস্থার পরেই চির

শান্তির অবস্থা উপনীত হইবে।" ইদানীং এইরূপ মধ্যে মধ্যে তিনি যেন বিদায়সূচক কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিলেন। এক দিবস বলিলেন—"দেখ, মাতা ঠাকুরাণীর কথাই বুঝিবা সত্য হয়।" তাঁহার মাতৃদেবী কোন সময় শিষ্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "বিজয় পুরী গেলে আর ফিরিবে না।" অপর একদিবস তিনি ধ্যানাবস্থায় হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"অন্তে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম", "গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম।" এই কথা শুনিয়া জনৈক শিষ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি এ কথা বলিলেন কেন?" গোস্বামী প্রভু ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন—"আমার অন্তর্জ্জলী হইল, দেবতারা আমার অন্তর্জ্জলী করিলেন।" গোস্বামী প্রভুর মুখে পূর্ব্বোক্ত নিদারুণ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া তাঁহার অনুগত শিষ্যগণ একেবারে বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা তাঁহাকে কলিকাতা নেওয়ার জন্য ক্ষিপ্রতার সহিত আয়োজন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি যে মহাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, সে চিন্তা তখনও তাঁহাদিগকে তাদৃশ চিন্তিত করিয়া তোলে নাই।

কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই গোস্বামী প্রভুর শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি কাহারও সহিত বেশী কথা বলিতেন না; প্রায়ই ধ্যানস্থ থাকিতেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনলীলা-বিষয়ক গান শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, কখনো শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন, কখনো বা বরিশাল, বাঁইশারিনিবাসী কোকিলকণ্ঠ সুগায়ক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ মহাশয় সুমধুর গান করিয়া তাঁহার তৃপ্তি সাধন করিতেন। এই সময় তিনি সাধারণতঃ নিম্নলিখিত তিনটী গান শ্রবণ করিতে অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেন; যথা—

১। খাম্বাজ—মধ্যমান।

দীনবন্ধু হে দিন যাবে রবে না।

দিন যাবে সুখে না হয় দুঃখে, রবে কেবল ঘোষণা॥

(লোকে বলে) তুমি দয়াময় দীনবন্ধু, প্রেমময় প্রেমসিন্ধু,
ওহে করুণার সিন্ধু, এক বিন্দু দানে শুকাবে না॥
তুমি বাম করে ধর্‌লে শৈল, সে ভার ত তোমায় সৈল,
(এই) ত্রিজগতের ভার সৈল, (বুঝি) অধমের ভার সৈল না॥
(হরি) যে তোমার ঐ নাম করে, সে না কি যায় ভবসিন্ধুপারে,
আর যে তোমারে আশ্রয় করে, তার কি সুদিন আস্‌বে না॥

২। খাম্বাজ—যৎ।

আমার শ্যামের ঐ কালরূপ ভুল্‌তে নার্‌বো কোন কালে।
লোকের কথায় কি কর্‌বো সই, বলুক্ লোকে যে বা বলে॥
কালো কেশে কালো বাসে লোটন বাঁধিব, যখন শ্যামকে পড়্‌বে মনে (কালকেশ) এলায়ে দেখিব;
কাল কালিন্দীতে যাবো, কাল জল যতনে খাবো, কাল বঁধুর গুণ গাবো, বস্‌বো কালো তমালতলে।
কালো ময়ূর কালো ভৃঙ্গ কর্‌বো দরশন, দন্তে নেত্রে নেবো কালো মঞ্জন অঞ্জন,
কালো রূপ নয়নে হের্‌বো, কালরূপ ধেয়ানে ধর্‌বো,
নীলকণ্ঠ কয় কাল হরবো, তর্‌বো মর্‌বো কালো সখীর কোলে॥

৩। সারঙ্গ – একতালা।

সখী, আমায় দেগো মোহন চূড়া বেন্ধে।
আর কেন কেঁদে মরি, কৃষ্ণরূপ ধরি, দাঁড়াবো চরণ ছেন্দে॥

আমি কৃষ্ণ তরে রাধিকা সাজাবো, এমনি করে একদিন
মথুরাতে যাবো,
(কৃষ্ণ-বিচ্ছেদের) দুঃখ জানে না, জানে না, জানাবো জানাবো,
কি যাতনা শ্যাম-বিচ্ছেদে।
তিনি যবে এই রাধারূপ ধরি, মনের জ্বালায় যাবেন ধূলায়
গড়াগড়ি,
দিবা বিভাবরী কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি, বেড়াইবেন কেন্দে কেন্দে ॥
এমনি লুকান আমি লুকাবো গোপনে, ভুলেও একদিন দেখা
দিব না স্বপনে,
দিবানিশি যেন মদন দহনে মদন শরেতে বিন্ধে।
ব্রজ বিলাস আমি করবো যতদিন, চন্দ্রাবলীর প্রিয় হব ততদিন,
তার বদন নলিন হইবে মলিন, কৃষ্ণ অদর্শন খেদে;
মান ভরে যেদিন ঘটাবেন প্রমাদ, বসনে ঝাপিয়ে রাখ্‌বেন বদন-
চাঁদ,
নীলকণ্ঠ কয় মেগে লব অপরাধ, ধরিয়ে যুগল পদে ॥

এক দিবস অপরাহ্নে, অনুমান ৪ ঘটিকার সময় গোস্বামী প্রভু মাধ্যাহ্নিক আহার করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় পার্শ্বের গৃহে দুইজন শিষ্য কোন কারণে উচ্চৈঃস্বরে বাদানুবাদ করিতে থাকেন। ইহাতে তিনি মর্ম্মান্তিক ক্লেশ অনুভব করিলেও তখন কিছু বলিলেন না। সন্ধ্যার পর কীর্ত্তনান্তে তাঁহাদিগকে নিকটে ডাকাইয়া বলিলেন—"দেখ, আজ যখন তোমরা বাদানুবাদ করিতেছিলে, তখন স্বয়ং জগন্নাথদেব এই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমার এখন কি

করা কর্ত্তব্য ?' তিনি বলিলেন—"তুমি উঁহাদের নিকটে ক্ষমা চাও।" অতঃপর তিনি উপস্থিত শিষ্যমণ্ডলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া করযোড়ে বলিলেন—"তোমরা আমাকে ক্ষমা করো, এই ক্ষমা করো যে তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ক্ষমা করো, তা'হলেই আমাকে ক্ষমা করা হইবে।" এই বলিয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত শিষ্যদ্বয়ের বয়ঃকনিষ্ঠ শিষ্যটীর নাম ধরিয়া বলিলেন—"তুমি উঁহার (প্রতিদ্বন্দ্বী শিষ্য) অপেক্ষা বয়সে ছোট, অতএব তুমি উঁহাকে প্রণাম করো।" এবং বয়ঃজ্যেষ্ঠ শিষ্যটীকে বলিলেন—"উঁনি তোমার ছোট ভাই, অতএব তুমি উঁহাকে আলিঙ্গন কর, আমি দেখিয়া চক্ষু জুড়াই।" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার এই ভাব দর্শন করিয়া শিষ্যদ্বয় সাশ্রুনয়নে প্রফুল্লচিত্তে পরস্পর পরস্পরকে প্রণামালিঙ্গনাদি করিয়া পূর্ব্বাপরাধ হইতে নির্ম্মুক্ত হইলেন। গোস্বামী প্রভু উপস্থিত শিষ্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"আজ জগন্নাথদেব তোমাদিগকে একটী সঙ্কেতের কথা বলিতে আদেশ করিয়াছেন। সঙ্কেত এই যে, যখন তোমাদের কাহারও প্রতি কামক্রোধাদির উদ্রেক হইবে, তখন সে স্থান পরিত্যাগ করিবে।" কিয়ৎকাল পরে বলিলেন—"আজ হইতে স্বয়ং জগন্নাথদেব তোমাদের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমি বলিতেছি, আমার কথা বিশ্বাস করো, নিশ্চয়ই তোমাদের শান্তি আসিবে, কিন্তু কিছু সময়সাপেক্ষ।" এই কথা বলিয়া তিনি হঠাৎ কিঞ্চিদূর্দ্ধে দৃষ্টি করতঃ বলিলেন—"এই যে, এখানে জগন্নাথদেব উপস্থিত। এসব কথা আমি বলিতেছি না, তিনিই আমার মুখ দিয়া বলাইতেছেন।" শিষ্যমণ্ডলীর প্রতি গোস্বামী প্রভুর এই শেষ উপদেশ।

২১শে জ্যৈষ্ঠ সমস্ত ঋণ শোধ হইয়া গেল। ঋণ শোধ হইলেই আত্মীয় স্বজন ও অনুগত শিষ্যগণ কলিকাতা যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ মজুমদার

মহাশয়ের নিকট ষ্টীমার ভাড়ার বাবদ ষোল শত টাকা তারযোগে পাঠান হইল। কিন্তু এদিকে গোস্বামী প্রভু যে ইহলোকের কার্য্য সমাধা করিয়া অনন্ত লীলাময়ের লীলারসসায়রে আত্মবিসর্জ্জন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহা সকলেরই অবিদিত রহিল। ২২শে জ্যৈষ্ঠ পূর্ব্বাহ্ণে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে তিনি এতদূর অবসন্ন হইয়া পড়িলেন যে, স্বীয় আসনে আসিয়া আর উপবেশন করিতে সমর্থ হইলেন না, একেবারে শয়ন করিয়া পড়িলেন এবং কিয়ৎকাল পরে সমাধিস্থ হইলেন। অতঃপর ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে সমাধি ভঙ্গ না হওয়াতে, শিষ্যগণ চিন্তিত হইয়া তাঁহার নিকটে ধীরে ধীরে কীর্ত্তন করিয়া ধ্যান ভঙ্গের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না! অনুগত শিষ্যগণের মুখকমলে ঘোর বিষাদের চিহ্ন দেখা দিল। তাঁহারা ২।৪ জন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসিয়া ভাবি বিপদের আশঙ্কা করিয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন এই ভাবে অতীত হইল। ক্রমে সন্ধ্যা উপনীত হইলে, রজনীর ঘোর অন্ধকারে দশদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অতঃপর প্রায় ৮ ঘটিকার সময় তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়াই উচ্চৈঃস্বরে শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মৈত্র মহাশয়কে ২।৩ বার ডাকিলেন। তিনি নিকটে আসিলে বলিলেন—"আজ আমার শরীর বড় খারাপ, তুমি নিকটে থাকিও।" তৎপর তিনি শৌচাগারে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, দুইজন শিষ্য তাহাকে ধরিয়া শৌচাগারে লইয়া গেলেন। তথা হইতে আগমন করিয়া আর আসনে গেলেন না। আসনের নিকটবর্ত্তী টবে রোপিত স্বীয় নিত্য পূজার তুলসীবৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। গোস্বামী প্রভুর অন্যতম সেবক শ্রীযুক্ত কুলদাকান্ত ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহাকে আসনে গিয়া উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি সে কথা যেন শুনিয়াও শুনিলেন না। ইতঃপূর্ব্বে একদিবস তিনি স্বীয় শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকট, 'যে দিন আসন ছাড়িব সে দিন

আমি থাকিব না', ইত্যাদি যাহা বলিয়াছিলেন, দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ তাহা কাহারও স্মৃতিপথে উদিত হইল না। সে যাহা হউক, সমস্ত দিন পরে গোস্বামী প্রভুকে স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে দেখিয়া শিষ্যদিগের মনে আশার সঞ্চার হইল। শ্রদ্ধেয় জগবন্ধুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার এখন কি অসুখ বোধ হইতেছে?" গোস্বামী প্রভু উত্তর করিলেন—"দুর্ব্বলতা ভিন্ন আমার আর কোন অসুখ নাই।" এই সময় তিনি কিছু ছানা ও ডাবের জল পান করিলেন। অতঃপর জগদ্বন্ধুবাবু পুনরায় বলিলেন—"আপনার চা পান করিবার অভ্যাস। সমস্ত দিন চা খান নাই, কিছু চা খাইবেন কি?" গোস্বামী প্রভু উত্তর করিলেন—"আচ্ছা ভাল ক'রে, খুব ঘন ক'রে প্রস্তুত ক'রে নিয়ে এস।" এই সময় গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য শ্রদ্ধেয় কিশোরীলাল সেন মহাশয় (অবসর প্রাপ্ত সবরডিনেট জজ) তথায় উপস্থিত ছিলেন। স্বহস্তে চা প্রস্তুত করিয়া গোস্বামী প্রভুকে পান করাইতে অনেক দিন হইতেই তাঁহার অন্তরে একটী বাসনা ছিল। অদ্য তিনি এই কথা শুনিয়া শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধুবাবুর সহিত একত্রে চা প্রস্তুত করিয়া আনিলেন। গোস্বামী প্রভুর অন্তরতম সেবক শ্রীযুক্ত সরলনাথ গুহ মহাশয় চায়ের পাত্রটী সম্মুখে ধরিয়া রাখিলেন এবং গোস্বামী প্রভু স্বহস্তে অপর একটী প্রস্তরের পাত্র লইয়া চা পান করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে চা পান করিতে করিতে গোস্বামী প্রভু ক্ষণকাল উর্দ্ধে দৃষ্টিকরতঃ মস্তক নত করিয়া কাঁহাকে যেন প্রণাম করিলেন, এবং তন্মুহূর্ত্তে উপবিষ্ট অবস্থাতেই ভগ্ন দেহের সঙ্গে তাঁহার অমর আত্মার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গেল। (১৩০৬ সন, ২২শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, সায়াহ্ন ৯ ঘটিকা ২০ মিনিট, কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথি।)

শান্তিপুর-শৈলের সমুজ্জ্বল ভাস্কর, আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া ধর্ম্মবিপ্লবের ঘোর ঘনঘটাপূর্ণ ভারতাকাশে, অনন্ত শান্তিময় সুবিমল

সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম-কিরণ বিকীরণ পূর্ব্বক, ভারতের সর্ব্বদুঃখাপহ লুপ্তপ্রায় ব্রহ্মবিদ্যা পুনঃস্থাপন করতঃ, যুগাবতার নদীয়াবিহারী শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কলিকলুষনাশন নামসংকীর্ত্তনধর্ম্মকে শাস্ত্র ও সদাচারভ্রষ্ট উপধর্ম্ম যাজকদিগের করাল কবল হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া, সজ্ঞানে প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে অসীম অতলস্পর্শ নীলাম্বুরাশির সমীপবর্ত্তী নীলাচলে চিরদিনের তরে অস্তমিত হইলেন।

এই মহাপ্রস্থানে তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও অনুগত শিষ্যগণের মর্ম্মস্থলে যে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল, তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের সর্ব্বস্ব ধন, জীবনের একমাত্র আরাধ্য দেবতার পার্থিব সংসর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া যে গভীর মর্ম্মবেদনা, যে মর্ম্মান্তিক ক্লেশ অনুভব করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনাতীত, ভুক্তভোগী ভিন্ন অপর কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অভাবে তাঁহার ভক্তবৃন্দের যে হৃদয়বিদারক মহা শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছিল, গোস্বামী প্রভুর অভাবেও তাঁহার অনুগত শিষ্যগণ তাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখনও যে কত শত শত নরনারী সজনে নির্জ্জনে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, কত ত্রিতাপদগ্ধ হৃদয়ের কোন্ গভীরতম প্রদেশ হইতে ঘন ঘন উত্তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস উত্থিত হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

উপসংহার।

শ্রীপুরুষোত্তমধামে যাঁহারা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন মন্দিরের বাহিরে ও ভিতরে কি প্রকার জনতা সর্ব্বদাই লাগিয়া রহিয়াছে। গোস্বামী প্রভুর পুরীধামস্থ নীলমণি বর্ম্মনের বাটীতে অবস্থানকালে এই প্রকার জনস্রোতঃ সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইত। সাধু, সজ্জন, ভিক্ষুক, কাঙ্গাল প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীর লোক তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া বাটীর সম্মুখস্থ স্থান সর্ব্বদাই পূর্ণ রাখিত। বানরগণ দলে দলে তাঁহার আসন প্রকোষ্ঠে এবং সম্মুখস্থ বারাণ্ডায় উপস্থিত হইয়া নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে বিচরণ করিত। ইহাদের আকৃতিপ্রকৃতি ও হাবভাব দেখিয়া স্বতঃই মনে হইত, প্রভুপাদের সহিত যেন ইহাদের বাক্যালাপ ও ভাববিনিময় সর্ব্বদা চলিতেছে। তিরোধানের পরদিবস প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম দর্শনেচ্ছু লোক সমূহ আশ্রম সমীপে উপস্থিত হইলে, সকলের কণ্ঠ হইতে গম্ভীর শোকোচ্ছ্বাসব্যঞ্জক হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। এমন কি, বানরগণ পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকারে প্রভুর বিচ্ছেদসূচক মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিল। পশু পক্ষীদিগকে যথারীতি আহার্য্য বস্তু প্রদান করিলে, তাহারা তাহার একটী কণাও স্পর্শ করিল না। সমস্ত পুরীধাম যেন বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইল।

প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঅদ্বৈতবংশাবতংশ ভক্তচূড়ামণি প্রভুপাদ আনন্দকিশোর গোস্বামী তপস্যা এবং অলৌকিক ভক্তি দ্বারা শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন, এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদে অবশেষে

এই অলোকসামান্য পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছিলেন। সেই মহাপুরুষপ্রবর আজ পুনঃ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দেহে বিলীন হইলেন। তিরোধানের পূর্ব্ব রজনীতে সমবেত শিষ্যমণ্ডলীকে সোৎসাহে বলিয়াছিলেন—"আজ হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব তোমাদের সকলের ভার গ্রহণ করিলেন। সকলেই সময়ে যথার্থ শান্তি লাভ করিবে।" এই বাক্য দ্বারা ভক্তমণ্ডলী বুঝিয়াছিলেন প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব অভেদাত্মা; যাঁহা হইতে আবির্ভূত হইয়া তিনি শ্রীমদানন্দকিশোর গোস্বামী প্রভুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন, আবার তাঁহাতেই নিত্যাবস্থায় প্রবেশ করিলেন।

পরদিবস দেহ সৎকারের আয়োজন হইতেছে এমন সময় প্রভুপাদের সুযোগ্য পুত্র শ্রীমদ্‌যোগজীবন গোস্বামী মহাশয়ের মনে হঠাৎ উদয় হইল যে, বহুকাল পূর্ব্বে গোস্বামী প্রভু তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে সৎকারের বন্দোবস্ত পরিত্যক্ত হইল। অতি আশ্চর্য্যভাবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নরেন্দ্রসরোবরের উত্তরতীরস্থ বিস্তীর্ণ স্থানটী প্রভুপাদের সমাধির জন্য ক্রীত হইল, এবং মহাসমারোহে শিষ্যবৃন্দ কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইয়া সেই ভাগবতী তনু সুসজ্জিত বিমানে স্থাপিত করিয়া যথাস্থানে সমাধিস্থ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কিয়ৎকালের জন্য বিষাদ-কালিমা দূরীভূত হইল এবং সকলের প্রাণে এক অপূর্ব্ব আনন্দস্রোতঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধা পূজনীয়া প্রভুপাদের শ্বশ্রূঠাকুরাণীরও অভাবনীয়রূপে শোকাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। মহোৎসাহে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

এই ঘটনার কিছুকাল পূর্ব্বে প্রভুপাদ একদিন এই সরোবরের অপর পারে দাঁড়াইয়া ভাবাবেশে বলিয়াছিলেন—"ওপারে একটী স্বর্ণমণ্ডিত চূড়াবিশিষ্ট মন্দির দেখা যাইতেছে!" তাঁহার সেই ভবিষ্যদ্বাণী এখন যথার্থই সত্যে পরিণত হইয়াছে। এই সমাধিক্ষেত্রে সেবাধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত

পুরীধামে নরেন্দ্র সরোবরের তীরে গোস্বামী প্রভুর সমাধি মন্দির।

এতদভ্যন্তরে ৺নাম-ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত।

সারদাকান্ত বন্দোপাধ্যায় ও গুরুনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সামন্ত মহাশয়ের বিশেষ যত্নে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে, এক অপূর্ব্ব মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এই শ্রীমন্দিরের প্রায় এক চতুর্থাংশ এবং ইহার দুই পার্শ্বে সাধকবৃন্দের ভজনস্থান ও বাসগৃহ প্রভৃতি ইতঃপূর্ব্বেই প্রভুপাদ যোগজীবন গোস্বামী মহাশয়ের আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টায় প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রভুপাদের অন্যতম শিষ্য ও সুহৃদ শ্রীযুক্ত নবকুমার বাক্‌চি মহাশয়ের সোৎসাহ পরিশ্রমে এই স্থান ফল-ফুল-শোভিত অপূর্ব্ব রম্যকাননে পরিণত হইয়াছে। আগন্তুক দর্শক মাত্রেই এইস্থানে উপস্থিত হইবামাত্র প্রভুপাদের নিত্য বর্ত্তমানতা হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। প্রত্যুতঃ এই নিত্য মহাপুরুষ অদ্যাপি ত্রিতাপক্লিষ্ট ধর্ম্মপিপাসু মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগকে প্রত্যক্ষ ভাবে কৃপা করিয়া চিরশান্তি লাভের পথ প্রদর্শন করিতেছেন।

সংসারে প্রেমরাজ্য সংস্থাপন করা তাঁহার জীবনের একমাত্র কার্য্য ছিল। জীবের অশেষ কল্যাণপ্রদ সেই শুভকার্য্য এখনও অনুষ্ঠিত হইতেছে। তিরোধানের পরেও ধর্ম্মপ্রাণ বহুসংখ্যক সংব্যক্তির অলৌকিক দীক্ষা ও তাহাদের জীবনে সংঘটিত অদ্ভুত ঘটনা তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বস্তুতঃ প্রভুপাদের কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। তিরোধানের পূর্ব্বে তিনি কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, "আমার এমন কতকগুলি কার্য্য আছে যাহা এই স্থূলদেহ বর্ত্তমান থাকিতে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, যথা সময়ে ঐ কার্য্য আরম্ভ হইবে।"

প্রেম ভক্তি লাভই জীবের একমাত্র লক্ষ্য। সেই পঞ্চম পুরুষার্থ লাভ করিয়া জীব পরাশান্তি প্রাপ্ত হয়। প্রভুপাদ সেই পরমপদ লাভের একমাত্র উপায় ও কলিকালের একমাত্র উপাস্য দেবতা "৺নাম-ব্রহ্ম" ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত হইয়া ভজন করিবার জন্য জীবকে উপদেশ দিয়াছেন ও দিতেছেন। তাঁহার সাধানাশ্রম গেণ্ডারিয়াতে তিনি

স্বহস্তে শ্রী "নাম-ব্রহ্ম" প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন ; এবং তাঁহার প্রত্যাদেশে তদীয় ভক্তিমান্ পুত্র শ্রীমদ্‌যোগজীবন গোস্বামী মহাশয় পুরীধামস্থ সমাধিক্ষেত্রেও উহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। *

---

* এই স্থানটী এখন 'জটিয়া বাবার সমাধি' নামে পরিচিত। প্রভুপাদ যোগজীবন গোস্বামী মহোদয়ের জীবিতাবস্থায় তিনি উক্ত সম্পত্তি রেজেষ্টারীকৃত দলিল দ্বারা ৺নামব্রহ্ম দেবতাকে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। এই দেবোত্তর সম্পত্তির শাসন-সংরক্ষণ এবং ঠাকুরের সেবাদি কার্য্য চালাইবার জন্য তিন জন মেম্বরযুক্ত একটী কমিটি এবং একজন সেবায়েত নিযুক্ত আছেন গোস্বামী প্রভুর অন্যতম সেবক শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় বর্ত্তমান সেবায়েত ; এবং শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ এম, এ, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বন্দোপাধ্যায় বি. এল, ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সাম- মহাশয় (ইঁহারা সকলেই গোস্বামী প্রভুর শিষ্য) উক্ত কমিটীর মেম্বর নিযুক্ত আছেন।

প্রভুপাদ যোগজীবন গোস্বামী-লিখিত দেবোত্তর পত্র হইতে কতিপয় ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে, যথা:—"যেহেতু উক্ত স্থান (সমাধিস্থান) প্রথমাবধি এই পর্য্যন্ত দেবালয়স্বরূপেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং চিরকাল উহাতে অবিচ্ছেদে দেবকার্য্যই প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই আমার অভিপ্রেত ; অতএব এক্ষণে উক্ত সম্পত্তি প্রকাশ্যরূপে দেবতাকে অর্পণ করিয়া, তাহা নির্ব্বিবাদে দেবোত্তর সম্পত্তি করিয়া দিতে মনস্থ করিয়াছি। তদনুসারে এই দলিল দ্বারা অদ্য উক্ত সম্পত্তি, তন্মধ্যে স্থাপিত ৺নাম-ব্রহ্ম দেবতাকে অর্পণ করিয়া, আমি নিজে সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বত্ব হইলাম। অদ্যাবধি উক্ত সম্পত্তিতে আমার সর্ব্বপ্রকারের স্বত্ব ৺নাম-ব্রহ্ম দেবতাতে বর্ত্তিল, অদ্যাবধি উক্ত সর্ব্বপ্রকার মালিকী-স্বত্ব উক্ত নাম-ব্রহ্ম দেব প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার নাম উক্ত সম্পত্তির মালিকস্বরূপ জারী হইয়া, তাঁহার মালিকীয়তে সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে ; এবং উক্ত সম্পত্তির সমুদয় আয় উক্ত ঠাকুরের সেবা-অর্চ্চনাদিতে ব্যয়িত হইবে।"

"সেবায়েত নিম্নলিখিত নিয়মাবলীর প্রতি যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখিয়া সেবা-কার্য্য পরিচালন করিবেন।"

১। শ্রীশ্রীগুরুদেবের ভাব ও উপদেশের বিরুদ্ধাচরণ না হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সেবায়েত, কমিটী, সমাধিবাসী, অতিথি, আগন্তুক ও অন্যান্যের যেন বিশেষ দৃষ্টি

ভজনশীল সাধু মাত্রেই তাঁহার প্রিয়জন। প্রকটাবস্থায় কেহ তাঁহার সেবা প্রার্থী হইলে তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন—"যাঁহারা ভক্তি সহকারে শ্বাসে প্রশ্বাসে স্বীয় গুরুদত্ত নাম সাধন করেন, তাঁহারাই আমার যথার্থ সেবা করেন, অন্য সেবায় আমার প্রয়োজন নাই এবং তাহাতে আমার তাদৃশ প্রীতিও জন্মে না।" নদীয়াবিহারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জীবের পরমকল্যাণ সাধন মানসে তাহাদিকে নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তারকব্রহ্ম হরিনাম

(ক) এই স্থানে সকল সম্প্রদায়ের লোকই সমানভাবে আদৃত হইবে। (খ) এই স্থানে জীবহিংসা করা নিষেধ। মৎস্য মাংস পাক বা ভোজন হইবে না। কেবলমাত্র চিকিৎসক ব্যবস্থা করিলে রোগীকে অন্যত্র পাক করিয়া মৎস্য দেওয়া যাইতে পারে। আত্মরক্ষার্থে হিংস্রজন্তু বধে নিষেধ নাই। প্রয়োজনবশতঃ বৃক্ষাদি ছেদনে নিষেধ নাই কিন্তু রাত্রিকালে উহা একেবারে নিষিদ্ধ। দিবসেও বিনা প্রয়োজনে নিষিদ্ধ। (গ) তামাক ভিন্ন অন্য কোনও মাদকদ্রব্য সেবন করা নিষেধ। চিকিৎসক ব্যবস্থা করিলে ঔষধস্বরূপে ব্যবহার করিতে পারিবে। সাধু কিংবা অতিথি আসিলে তাঁহাদের প্রয়োজনমত গাঁজা, আফিং আদি দেওয়া যাইতে পারে। (ঘ) পরনিন্দা, কলহ, লোকের মর্য্যাদাভঙ্গ, লোকের প্রতি কুব্যবহার, এবং ধর্ম্মসাধনে বিঘ্নকর, সমাধির মর্য্যাদাহানিকর ও অশান্তিপ্রদ, এবং সদাচারবিরুদ্ধ কোন কার্য্য হইতে পারিবে না। (ঙ) সমাধি গৃহস্থালীর আড্ডা হইতে পারিবে না। (চ) স্ত্রীপুরুষের জন্য [illegible] পৃথক পৃথক খণ্ড হইয়াছে ও থাকিবে। পতিপত্নীও একই খণ্ডে বা একই গৃহে অবস্থান করিতে পারিবেন না। সেবায়েতের পক্ষেও এই নিয়ম।

২। দান, ভিক্ষা, কি অন্য কোন সূত্রে সমাধির জন্য যাহা কিছু আমদানী হইবে তদ্দারা, ঋণ না করিয়া ঠাকুরের নিত্য সেবা, পূজা, ভোগ, আরতি, অতিথি[illegible] প্রা[illegible]সেবা, ঝুলনপূর্ণিমাতে ও সাবিত্রী চতুর্দ্দশীর পূর্ব্বে কৃষ্ণা দ্বাদশীতে সম্পাদনীয় উৎ[illegible] নির্ব্বাহিত হইবে। ব্রাহ্মণভোজন, কাঙ্গালীভোজন ইত্যাদি গুরুপ্র[illegible] প্রিয় সৎকার্য্যও, ঋণ না করিয়া, যথাসম্ভব সম্পাদিত হইবে।

৩। সমাধির জন্য লব্ধ ও সংগৃহীত অর্থ সমাধির কার্য্য ভিন্ন অন্য কোন বাবদে উপাদেয়(?) হইতে পারিবে না।

গ্রহণের উপদেশ প্রদান করিতেন। প্রেমদাতা নিতাইচাঁদ কলিহত-জীবকে শ্রীহরিনাম লওয়াইবার জন্য, কাঙ্গালের বেশে, কাতরপ্রাণে, দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের মূল কারণ শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু কলিকলুষনাশন মানসে হুঙ্কার পূর্ব্বক ঐ নাম জীবকে শুনাইতেন। জীবোদ্ধারের ইহাই একমাত্র উপায়, এই সত্য প্রাণে লাভ করিয়া শ্রীহরিদাস প্রমুখ গৌর ভক্তগণ সাগ্রহে ও সোৎসাহে কর্ণরসায়ণ, সর্ব্বক্ষেমপ্রদ সুমধুর হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতেন। সনক, সনাতন, সনৎকুমার প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারক শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের বংশোদ্ভব যে মহাপুরুষের লীলা এই গ্রন্থে প্রস্ফুটিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তিনিও প্রেমোল্লাসে মত্ত হইয়া সুমধুর 'হরিবোল' 'হরিবোল' ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক নির্নাদিত করিতেন; এবং জীবের দুঃখে কাতর হইয়া শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে নির্ব্বন্ধাতিশয়ে সকলকে অনুরোধ করিতেন। তাঁহার সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সপ্রেম হুঙ্কারে স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বজীব পুলকিত হইত, বৃক্ষ লতাদি পুষ্প ও মধু বর্ষণ করিত এবং আসন, বসন, গ্রন্থাদি সঞ্জীবিত ও হরিনামাঙ্কিত হইত।

শাস্ত্র ও সদাচারের প্রতিষ্ঠাতা, তারকব্রহ্ম হরিনামের উপদেষ্টা, পাপক্লিষ্ট জীবের চিরসুহৃদ্, শরণাগতবৎসল শ্রীমদাচার্য্য শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভু জয়যুক্ত হউন, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সত্যধর্ম্ম জয়যুক্ত হউক, তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর জয় হউক, জগতে সনাতনধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হউক। গৃহে গৃহে শ্রীহরিনামের জয়পতাকা উড্ডীয়মান হউক। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবান্ আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরিঃ ওঁ॥

৪। সমাধিস্থলের কোন অংশেও দোকানঘর, লজিং হাউস, কিংবা অন্য কার ভাড়াটিয়া বাড়ী করা হইবে না। এই স্থানের উৎপন্ন জিনিস বিক্রীত হইবে না।

শ্রীমদাচার্য্য

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-

সাধনা ও উপদেশ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ওঁ হরিঃ।

উপদেশামৃত।

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্।
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ॥
তেজো বারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা।
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত-কুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥"

যিনি সর্ব্বজ্ঞ, স্বপ্রকাশ, সর্ব্বশক্তিমান, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের আদিকারণ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় কার্য্যে সাক্ষীস্বরূপ, যিনি আদি কবি ব্রহ্মাদিরও বুদ্ধিশক্তির অতীত তত্ত্বসমূহ অন্তর্য্যামিরূপে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন, যাঁহার শক্তিতে মিথ্যাভূত সত্ত্বাদিগুণ সমূহও সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে; এবং যাঁহার জ্যোতিতে সর্ব্বমায়ান্ধকার দূরীভূত; আমরা সেই পরম সত্যকে ধ্যান করি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত শ্রীমদাচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুপাদের সংস্রব সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইবার পর, তিনি ঢাকা শহরের উপকণ্ঠস্থিত গেণ্ডারিয়া নামক স্থানে একটী স্বতন্ত্র আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক, যথাশাস্ত্র নাম-ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা করতঃ শিষ্যগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া স্বাধীনভাবে ধর্ম্মোপাজন করিতে লাগিলেন। এই সময় স্বীয় গুরুদেবের আদেশে গোস্বামী প্রভু প্রায় এক বৎসর কাল মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন।

এতদবস্থায় কেহ কোন প্রশ্ন করিলে, তিনি কাগজে কিংবা অন্য কিছুতে লিখিয়া উত্তর প্রদান করিতেন। এই সকল প্রশ্নোত্তর আশ্রমস্থ সেবক-বৃন্দ অতিশয় যত্ন সহকারে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন।

গোস্বামী প্রভুর শেষ জীবনে বহু স্থান হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত সাধু ভক্ত ও অপরাপর মহানুভব ব্যক্তিগণ ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতেন, এবং তিনি তাঁহাদের প্রশ্নে যে সকল উত্তর প্রদান করিতেন, তাহার অধিকাংশ শ্রীযুক্ত কুলদাকান্ত ব্রহ্মচারী, মাদারিপুর হাই স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুধন্যচন্দ্র দাস, মৈমনসিংহ জামালপুর হাই স্কুলের শিক্ষক ৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কতিপয় শিষ্য যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। এতদ্ভিন্ন কোন কোন শিষ্যের প্রশ্নে গোস্বামী প্রভু যে উত্তর প্রদান করিতেন, তাহাও তাঁহারা স্মরণার্থে লিখিয়া রাখিতেন। বিভিন্ন স্থান হইতে বহু পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক সেই সকল বিভিন্ন সময়ের উপদেশ সমূহ সংগ্রহ করিয়া, তন্মধ্য হইতে সর্ব্ব সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্ম্মার্থিগণের গ্রহণোপযোগী কল্যাণপ্রদ উপদেশ গুলি এই খণ্ডে প্রদত্ত হইল। এতদ্ভিন্ন প্রভুপাদ প্রণীত 'যোগসাধন' 'আশাবতীর উপাখ্যান' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেও কতিপয় প্রশ্নোত্তর ইহার সহিত সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।]

প্রশ্ন—আপনি ব্রাহ্ম-সমাজের সাধারণ উপাসনাপ্রণালীর অতিরিক্ত সাধন গ্রহণ করিলেন কেন? এবং কোথায় কিরূপে যোগ শিক্ষা করিয়াছেন?

উত্তর—পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজে প্রথম আসি। তথায় করুণাময়ের কৃপায় অনেক সত্য ও প্রভূত উপকার লাভ করিয়া ধন্য হইলাম। আমার অল্প শক্তিতে যে পরিমাণে সম্ভব তিনি আমাকে পরিশ্রম করাইয়াও

লইলেন। তাঁহার ও তাঁহার সন্তানগণের সেবায় জীবন ধন্য হইল। ক্রমে অনেক বিপদ আপদ উত্তীর্ণ হইয়া বিস্তর সত্য লাভে সমর্থ হইলাম। উপাসনা, প্রার্থনা, ধ্যান ধারনাদি করিতে শিখিলাম; এক কথায় বলিতে গেলে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে নবজীবন লাভ করিয়া উদ্ধার হইয়া গেলাম। কিন্তু আমার প্রাণের পিপাসা তাহাতেও মিটিল না। কারণ তখনও আমার প্রাণের প্রিয়তম দেবতাকে নিয়ত হৃদয়ের মধ্যে বসাইয়া পূজা করিতে পারিতাম না। উপাসনার সময় অনেক সময় তাঁহার জাগ্রত জীবন্ত আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া চরিতার্থ হইতাম, প্রাণে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ, আশা ও শান্তি উপভোগ করিতাম, কিন্তু কেন জানিনা, এই অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত না। অনেক সময় তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে হইত এবং তখন অত্যন্ত ক্লেশ হইত।

শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যার বিবাহের আন্দোলনের কিছু পূর্ব্বে আমি যখন বাগআঁচড়া গ্রামে ছিলাম, তখন একাকী থাকাতে আত্মদৃষ্টি অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ হয় এবং তাহাতে দেখি যে, জীবণের প্রকৃত ধর্ম্মের অবস্থা অতি হীন। সুবিধা হইলে এবং লোকে না জানিতে পারিলে সকল প্রকার পাপই আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারে। অর্থাৎ তখনও পাপাসক্তির মূল জীবিত ছিল, অবকাশ পাইলে অনায়াসেই আমাকে ঘোর পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিতে পারিত। এইরূপ হীন অবস্থা দেখিয়া আমার প্রাণে দারুণ আশঙ্কার উদয় হইল। এতকাল ধর্ম্ম চিন্তা, আলোচনা, ধ্যানধারণাদি এবং নানা দেশ বিদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া, হায়! আমার অবস্থা এত হীন ও শোচনীয়? সম্পূর্ণ নিরাপদ ভূমি কি নাই? এইরূপ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হইল। বুঝিলাম যে ব্রহ্মলাভ ও দিন যামিনী তৎসহবাস ব্যতীত ইহার অন্য কোন উপায় নাই। তাঁহার সহিত আমার সমস্ত প্রাণের যোগ ভিন্ন এ মহাব্যধির

অন্ধ ঔষধি নাই। তখন নানা দেশে ঐ ঔষধের অন্বেষণে ফিরিতে আরম্ভ করিলাম। কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকজন শ্রদ্ধেয় ধর্ম্মবন্ধুর সহবাসে প্রাণায়াম শিক্ষা করিলাম ও তাঁহাদের নিকট বিস্তর ধর্ম্ম কথা ও অনেক উপকার পাইলাম, কিন্তু তাহাও আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে পারিল না। আমার অন্তরের বস্তু সেখানেও পাইলাম না। তখন নানা স্থানে ভ্রমণ করিলাম। অঘোরপন্থীদিগের কাছে গেলাম। তাঁহারা সাধক বটেন কিন্তু তাঁহাদের নরমাংসাহার ও অন্যান্য বিভৎস ব্যাপারে আমার রুচি হইল না। রামাৎ, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, দরবেশ, মুসলমানফকির এবং বৌদ্ধ যোগী সকলের নিকটেই গেলাম, কিন্তু কোথাও আমার প্রাণের পিপাসা দূর হইল না। অবশেষে ঈশ্বর কৃপায় গয়া তীর্থে আকাশ গঙ্গা নামক পর্ব্বতে একজন নানকপন্থী মহাত্মা কৃপা করিয়া আমাকে এই যোগধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সেই অবধি আমার জীবনে এক অপূর্ব্ব অবস্থা খুলিয়া গিয়াছে। অবশ্য আমি দেবতা হইয়া গিয়াছি বলিতে পারি না। কিন্তু এইটুকু না বলিলে মিথ্যাকথা বলা হয় ও অকৃতজ্ঞতা হয় যে, আমার সে অভাব মোচন হইয়াছে এবং আমি এক অনন্ত রাজ্যের দ্বারে আসিয়াছি, কি যে সম্মুখে দেখিতেছি তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না।

প্রশ্ন—ব্রাহ্মসমাজের দুর্গতির কারণ কি?

উত্তর—ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা রামমোহন রায় আর্য্য ঋষিদিগের পন্থা অনুসরণ করেন। সেই পন্থা হারা হওয়াতে ব্রাহ্মসমাজের নানা দিকে গতি। ধর্ম্মসম্বন্ধে নূতন কিছু বলিতে সেই ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদিগেরই ক্ষমতা ছিল। শাস্ত্র ও সদাচার ভিন্ন অন্য পথ দিয়া যদি কেহ ব্রহ্মলোকেও লইয়া যায়, তাহাও যাইবে না। কারণ দৈবাৎ দুই এক ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবলে অন্য পথে সংগতি পাইতে পারেন; কিন্তু

যাহাদের প্রথম আরম্ভ, তাহারা ঘোর অন্ধতামসে ঘুরিয়া বেড়াইবে, ইহা ঋষিবাক্য।

প্রশ্ন—ঋষিবাক্যের লক্ষণ কি?

উত্তর—ঋষিবাক্য—তাহাতে নিন্দা থাকিবে না, কোন পক্ষের বা কোন জাতির অথবা কোন দেশের দিকৃটানা কথা থাকিবে না। সাধারণ মানবধর্ম্ম যাহা তাহাই তাহাতে স্থান পাইবে এবং তাহা বেদের অনুগত হইবে।

প্রশ্ন—ঈশ্বর দর্শন ভিন্ন মন নিঃসংশয় হয় না। কেহ বলে তিনি সাকার, কেহ বলে নিরাকার। তাহা প্রথমে কিরূপে স্থির করিব?

উত্তর—শাস্ত্রে আছে, যে তিনি নিরাকার এবং তিনি সাকার। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিছুই ছিল না। পরব্রহ্ম স্বীয় শক্তিদ্বারা এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্ট পদার্থ জড় ও চেতন। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই সকল পদার্থ এবং তত্তদ্‌যোগে যত কিছু পদার্থ হইয়াছে, সমস্তই জড়। কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, মনুষ্য ইহারা চেতন। সৃষ্টিকর্ত্তা এই উভয়বিধ পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র। তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। কর্ত্তা নিজে স্বতন্ত্র। কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা হয় না। এজন্য তিনি নিরাকার। নিরাকার বলিতে শূন্য নহে। তিনি সচ্চিদানন্দ। তাঁহার রূপ আছে। সে রূপ নিত্যরূপ। সে রূপ সচ্চিদানন্দময়। জ্ঞান চক্ষু—ভক্তি চক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে পরমেশ্বরের নিত্যরূপ দর্শন করা যায়। যতদিন তাঁহার নিত্যরূপ দর্শন না হয়, ততদিন তাঁহাকে সাকার, নিরাকার বলিয়া যাহা প্রকাশ করিবে তাহা তোমার কল্পনা অথবা শোনা কথা। চিরকাল ভক্ত সাধকগণ ভগবানকে দর্শন করিয়া অপার আনন্দ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। সেই রূপমাধুরী যে একবার দেখিয়াছে, সে আর তাহা ভুলিতে পারে না। বাগানের কর্ত্তা বাগানে আসিলে বাগানের

মালী যেমন দূরে গিয়া দণ্ডায়মান্ হয়, সেইরূপ দীনবন্ধু প্রভু হৃদয় উদ্যানে উপস্থিত হইলে, অহঙ্কার মালী দূরে গিয়া করযোড়ে অবস্থিতি করে। "প্রভো! আমি দাস," মালীর মুখে কেবল এই কথা। প্রভুর আগমনে মালী বন্দনা করিলে শরীরের রোমগুলি ভক্তিভাবে দাঁড়াইয়া প্রভুর স্তব করে, নয়ন তাঁর চরণ ধৌত করে।

প্রশ্ন—পরমপদ লাভের অধিকারী কে? কাহাকে শোকে অভিভূত করিতে পারে না?

উত্তর—ব্রহ্মবিদ্ পরমাপ্নোতি শোকং তরতি চাত্মবিদ্।
রসোব্রহ্ম রসং লব্ধ্বানন্দী ভবতি নান্যথা ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ পরমপদ লাভ করেন; আত্মবিৎ শোক হইতে মুক্ত হন; রস স্বরূপ ব্রহ্মের রস লাভ করিয়া আনন্দ হয়, অন্য উপায়ে হয় না।

সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া শাস্ত্র মত বলা অজ্ঞানতা।

বেদ উপনিষদে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে হিন্দুশাস্ত্র বুঝিতে পারা কঠিন। অষ্টাদশ পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত এই সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া না দেখিলে ধর্ম্মের জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারা যায় না। আদি পর্ব্বে একটী বিষয়ের উল্লেখ, শান্তি পর্ব্বে তাহার মীমাংসা রহিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে একটী বিষয়ের উল্লেখ আছে, তাহার সমস্ত অংশ মার্কণ্ডেয় পুরাণে। মনুসংহিতায় এক বিষয়, তাহার ব্যবস্থা বৃহৎ গৌতম সংহিতায়। নির্ব্বাণ তন্ত্রে এক বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার সমগ্র ভাগ রুদ্র যামলে। যজুর্ব্বেদ সংহিতায় ও সামবেদ সংহিতায় যে সকল আখ্যায়িকা, তাহার মীমাংসা শ্রীমদ্ভাগবতে, বিষ্ণুপুরাণে—ইত্যাদি। সুতরাং সমস্ত শাস্ত্র না পড়িয়া শাস্ত্রের মত বলা বিড়ম্বনা ও অজ্ঞানতা মাত্র।

বস্তুগুণ বুদ্ধিকে অপেক্ষা করে না।

নামে পাতকী উদ্ধার হয় ইহা বস্তুগুণ। বস্তুগুণ বুদ্ধিকে অপেক্ষা করে না। অগ্নিতে হাত দিলে পুড়িবেই। যাঁহার একটুও ভক্তি আছে, তিনি যদি অভক্তির সহিত নাম করেন, তবে সে ভক্তিটুকু শুকাইয়া যায়। ভক্তির সহিত নাম করিবে।

মানবের বুদ্ধি সীমাবদ্ধ।

মনুষ্যের যে জ্ঞান তদ্দারা সৃষ্ট বস্তুর বিচার করা যায়। ভগবৎতত্ত্ব মানবীয় জ্ঞানের অধীন নহে। ঋষিগণ অপরাবিদ্যা ও পরাবিদ্যাজ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥

নয়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং॥

অর্থাৎ সেই পরমাত্মা বাক্য, মন ও চক্ষুর অগোচর। তিনি আছেন এই বোধ ব্যতীত, জীবের তৎসম্বন্ধে অন্য জ্ঞান লাভ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? মন্ত্র তন্ত্র, তীক্ষ্ণ মেধা কিংবা বহু শাস্ত্রানুশীলন দ্বারাও তাঁহাকে পাওয়া যায় না। তিনি যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকে কৃপা করিয়া বরণ করেন, একমাত্র সেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। ভগবান্ যাঁহার নিকট স্বকীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন।

মনুষ্য ক্ষুদ্র কীট, তার এত অভিমান যে, সে আত্মজ্ঞানে ভূমা ঈশ্বরকে জানিবে? কখনই নহে। আত্মজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে জানা দূরে থাকুক, নিজের শরীর ছাড়া আত্মাকে পর্য্যন্ত জানিতে পারে না।

ভগবানে অবিশ্বাসই সমস্ত অশান্তির মূল।

ঈশ্বর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করিয়া চালাইতেছেন। বিধি ব্যবস্থা নিয়ম প্রণালী অব্যর্থ। প্রত্যেক পদার্থে দৃষ্টি করিলে সমস্তই অসীম বোধ হয়। যাহা সৃষ্ট হইয়াছে তাহারই ব্যবস্থা আছে, নিয়ম আছে। তবে আমরা একটু ঝড় বর্ষার আধিক্য দেখিলে সৃষ্টি-কর্ত্তাকে অতিক্রম করিয়া বিচার করি কেন? অসন্তোষ প্রকাশ করি কেন? মূলে অবিশ্বাস। এই অবিশ্বাসের মূল কি? পরনিন্দা, হিংসা, দ্বেষ। আত্মস্বার্থ চিন্তা করিতে করিতে এই দুর্গতি উপস্থিত হয়। এ জন্য ধার্ম্মিকের একটী প্রধান লক্ষণ তিনি প্রাণান্তেও পরনিন্দা করেন না। আত্মপ্রশংসা বিষ তুল্য জ্ঞান করেন; হিংসাকে হৃদয়ে স্থান দেন না। জীবে দয়াবান্ ও ভগবানে বিশ্বাসী হইয়া সর্ব্বদা জীবন পথে চলেন। ভগবানের কার্য্যে অবিশ্বাসী হইলেই অসন্তোষ। 'হয় রাখ সুখে না হয় রাখ দুঃখে', তোমার সম্পদ বিপদ আমার দুইই সমান। ইহাই ধর্ম্ম জীবনের পরিচয়; ইহাতে সকলের দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

ভগবানে যিনি আত্মসমর্পণ করেন, ভগবান্ তাঁহার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত।

ভগবান্ প্রথমে বামন অবতার হইয়া বলি নামক মানবাত্মারূপ অসুরের যজ্ঞে গমন করেন। মনুষ্য সংসারের ধর্ম্ম করিতে বসিয়া অত্যন্ত অভিমান প্রকাশ করে। আমি দাতা, আমি জ্ঞানী, আমি ভক্ত, আমি ইন্দ্রিয়রূপ সমস্ত দেবগণের রাজা। মনুষ্যের এই ধর্ম্মাভিমান দেখিয়া পরমেশ্বর বামন হইয়া অর্থাৎ আত্মার আত্মা হইয়া, মনুষ্যের নিকট ত্রিপাদ প্রার্থনা করেন। ত্রিপাদ শুনিতে সামান্য, কিন্তু ইহাই জীবের সর্ব্বস্ব।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, ভগবান্ এই ত্রিপাদ অধিকার করণানন্তর বিরাট মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক জীবের সর্ব্বস্ব অধিকার করিয়া, সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। বামনদেব বলির দ্বারে দ্বারী হইয়া পাতালে ছিলেন। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন, ভগবান্ তাঁহার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত; জীবকে আর ভাবিতে হয় না।

প্রশ্ন—ভগবানে অচলা ভক্তি হয় কিসে? কিরূপে তাঁহাতে মন সমর্পণ করিতে পারা যায়?

উত্তর—এ সম্বন্ধে ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রে অনেক উপদেশ আছে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। উপনিষদে বিশেষ বিশেষ উপায় বলিয়াছেন। বৈষ্ণব শাস্ত্র ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা, ভক্তমাল এই সমস্ত গ্রন্থ এবং চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পাঠ করিলে অনেক জন্মের সুকৃতি বলে, ভগবৎ-ভজনের জন্য প্রাণগত ব্যাকুলতা জন্মে। সেই সময় সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার উপদেশমত অকপটে সাধন করিলে, ভগবান্ কৃপা করিয়া সাধককে আপন দাস বলিয়া মনোনীত করিয়া দর্শন দেন। সমস্ত সুন্দর বস্তুকে যিনি রচনা করিয়াছেন, সেই পরম সুন্দরের শ্রীঅঙ্গের কোন এক অংশ মাত্র দর্শন করিলে, মনুষ্য তাঁহার চরণ ছাড়া হইতে পারে না।

প্রশ্ন—কোন্ অবস্থায় জীবের ভগবদ্দর্শনের অধিকার জন্মে?

উত্তর—ঋষিগণ বলিয়াছেন প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞান—সর্ব্বভূতে তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভব। দ্বিতীয় অবস্থা যোগ—আত্মাতে পরমাত্মার প্রত্যক্ষ লাভ। তৃতীয় ভগবৎ সম্বন্ধ—পূজা অর্চ্চনা। এই অবস্থায় তাঁহার রূপ দর্শন হয়। সে রূপ সচ্চিদানন্দময়, তাহা পাঞ্চভৌতিক নহে। রূপ বলা হয় এই জন্য যে এই ভাব প্রকাশের অন্য ভাষা নাই।

লোকের সমক্ষে সাধক যতই হীন মলিন বলিয়া পরিচিত হন, ততই তাঁহার পক্ষে মঙ্গল।

প্রথমে যদি আমি ধার্ম্মিক, সাধু, জ্ঞানী, ভক্ত এইরূপ অভিমান লাভ করি, চারিদিক্ হইতে লোক ঐরূপ সম্মান দান করে, তখন যদি অন্তর অসাধু ধর্ম্মহীন অজ্ঞান অভক্ত হয়, তবে পূর্ব্বের সম্মান বজায় রাখিতে গিয়া, মানুষ ক্রমেই কপট হইয়া ঘোর পাপের মধ্যে ডুবিতে থাকে। এজন্য লোকের সমক্ষে নিজে যতই হীন মলিন রূপে পরিচিত হই ততই মঙ্গল। এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ঋষিগণ প্রতিদিন চারিটি উপায় অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন। প্রথম স্বাধ্যায় অর্থাৎ ধর্ম্ম-গ্রন্থপাঠ, নাম (গুরুদত্ত মন্ত্র) জপ। দ্বিতীয়—সৎসঙ্গ। তৃতীয়, বিচার—সর্ব্বদা নিজের অন্তর পরীক্ষা করিতে হইবে। যদি আত্মপ্রশংসা ভাল লাগে, পর নিন্দায় আমোদ হয়, তবে আপনাকে নরকগামী মনে করিতে হইবে। সাধুর সাধারণ লক্ষণ এই যে, তিনি আত্মপ্রশংসাকে বিষবৎ অপকারী জানেন, পরনিন্দা অধর্ম্মের মূল জানেন। নিজের অন্তরের ধর্ম্মভাব প্রতিদিন হ্রাস হইতেছে, না বৃদ্ধি পাইতেছে, এই বিচারের সর্ব্বদা প্রয়োজন। চতুর্থ, দান—দান শব্দে দয়া বলিয়াছেন। কাহারও প্রাণে কোনরূপ কষ্ট না দেওয়া—শরীর বাক্য ও অন্যরূপে কাহারও প্রাণে কষ্ট দিলে দয়া থাকে না। বৃক্ষ লতা, কীট পতঙ্গ, পশু পক্ষী ও মনুষ্য—সর্ব্বজীবে দয়া কর্ত্তব্য।

এই স্বাধ্যায়, সৎসঙ্গ, বিচার ও দান প্রতিদিন সাধন করিতে হইবে। কেহ কেহ ইহার সঙ্গে তপস্যা—কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সংযত করিতে অভ্যাস করা প্রয়োজন বলিয়াছেন। এই উপায়ে সহজে নিবৃত্তি লাভ হইয়া থাকে।

কবির ও গুরু নানকের ধর্ম্মে প্রভেদ নাই।

কবির ও গুরুনানকের ধর্ম্মে প্রভেদ নাই। কবির জোলা ছিলেন, এই জন্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় মধ্যে তাঁহার মত গৃহীত হয় নাই। উত্তর পশ্চিমে মেথর, ডোম, চামার, এই সমস্ত জাতি কবিরপন্থী। তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিলে, তাহাদের পদধূলি না লইয়া থাকা যায় না। গুরুনানক ক্ষত্রিয় ছিলেন। এজন্য তাঁহার মত অবাধে সকলের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। তিনি বেদ, পুরাণ, স্মৃতি ও উপনিষৎ এ সকল মান্য করিয়া উপদেশ দিতেন এবং মনমুখী অর্থাৎ অশাস্ত্রীয় পন্থার অপকারিতা দেখাইয়া গিয়াছেন।

নানক সম্বন্ধে দুই মত। একমতে তাহাকে অবতার বলা হয়, অপর মতাবলম্বীরা বলেন তিনি রাজর্ষি জনক। জীবের দুঃখ দেখিয়া তাহাদের উদ্ধারের জন্য নানকরূপে জন্মগ্রহণ করেন। নানকের মত ও বৈষ্ণবের মত একই প্রকার। নানকজী কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না, এজন্য তাঁহার মতাবলম্বী লোকদিগকে নানকপন্থী বলে। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" তিনি ভগবানের আদেশ মত হ, ব, গ, র, (হরি, বাসুদেব, গোবিন্দ, রাম) এই আদ্যক্ষরবিশিষ্ট নাম দিতেন।

সকল দলে থাকিলে ধর্ম্ম লাভ হয় না।

সকল দলে থাকিলে ধর্ম্মভাব বর্দ্ধিত হয় না। অবিরত ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের অধীন হইয়া সত্যকে অকপটে গ্রহণ, সংসারে যাহা ধর্ম্মপথের অন্তরায় তাহা পরিত্যাগ, এবং লোকনিন্দা ও প্রশংসা অগ্রাহ্য করিতে হয়।

পুরুষকার ও কৃপা।

কৃপা অনেক উপরের কথা। মানুষের মনুষ্যত্বকে মানবীয় ধর্ম্ম বলে;

যেমন জলের ধর্ম্ম শৈত্য, অগ্নির উষ্ণত্ব—ইত্যাদি। প্রত্যেক মনুষ্য সাধনা করিলে, মানবীয় ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া দেবত্ব লাভ করিতে পারে; এই দেবত্ব লাভে কৃপা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু মানুষের প্রকৃতি অর্থাৎ মনুষ্যত্ব যদি নষ্ট হয়, তাহা সাধু উপায় দ্বারা পুনরায় লাভ করা যায়; এজন্য তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত কহে। শরীরের মধ্যে চক্ষু একটী ইন্দ্রিয়; চক্ষুর ধর্ম্ম দর্শন, যদি দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়, তবে ঔষধাদি দ্বারা আরোগ্যলাভ করা যায়। মনুষ্যত্বের মধ্যে অনেক গুণ আছে, তন্মধ্যে দয়া প্রধান গুণ। এই দয়া যথার্থভাবে পরিচালিত হইলে অহিংসা মনুষ্যের স্বাভাবিক কার্য্য হইবে। এই মনুষ্যত্ব হইতে উন্নত হইলে দেবত্ব, দেবত্ব হইতে উন্নত হইলে, জীবাত্মা পরব্রহ্মের অসীম সত্বায় প্রবেশ করিয়া লীলারস সম্ভোগ করেন।

ভগবান যখন যে ভাবে রাখেন তাহাতেই আনন্দ করিতে হইবে।

একজন প্রার্থনা করিল—'প্রভো! তুমি আমার সর্ব্বস্ব, আমার বলিতে যেন কিছুই না থাকে, সমস্তই তোমার।' পরমেশ্বর উত্তর করিলেন—'হে মানব, এমন কথা বলিও না। আমাকে যৎকিঞ্চিৎ দাও, অবশিষ্ট সকল তোমার থাকুক, তুমি জান না যে কি কথা বলিতেছ।' ঐ ব্যক্তি কাতর হইয়া বলিল—'প্রভো! তাহা হইবে না। আমার যেন কিছু না থাকে, সব তোমার হউক।' পরমেশ্বর যখন তাহার বাড়ী ঘর, আত্মীয় বন্ধু সমস্ত নষ্ট করিয়া পুত্রটিকে লইতে যান, তখন সে কাঁদিয়া বলিল—'প্রভো! কি করিতেছ? আমি যে আর সহ্য করিতে পারিতেছি না।' তখন ভগবান তাহার সমস্ত প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন—'এই লও, আগেই বলিয়াছিলাম তোমার কর্ম্ম নয়।'

ভগবান্ যখন যে ভাবে রাখেন তাহাতেই আনন্দ করিতে হইবে। আমার নিজের পছন্দ করিবার কিছুই নাই। "কাষ্ঠের পুতলি যেন কুহকে নাচায়", আমাকে সেইরূপ কর। তুমিত জীবনের আধার!

ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত উপনিষদের ভাষ্যস্বরূপ।

ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত এই দুই খানি গ্রন্থ উপনিষদের ভাষ্য স্বরূপ। গীতা এবং ভাগবতের প্রণালীতে সাধন করিলে, ঋষিদিগের প্রাণের কথা "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" প্রভৃতি বাক্যের সত্যতা প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দীক্ষা বীজবপনের ন্যায়।

দীক্ষা বীজবপনের ন্যায়। যে জমি প্রস্তুত, তাহাতে বীজবপন করিলে অঙ্কুর হয়। কৃষক বীজবপনের পূর্ব্বে অনেক যত্নে জমি প্রস্তুত করে; জমি প্রস্তুত হইলেও অসময়ে বীজ বপন করে না। কারণ, প্রত্যেক শস্যের সময় আছে। বীজ মাটির নীচে থাকে। সেইরূপ দীক্ষার মন্ত্র হৃদয়-ক্ষেত্রে রাখিয়া সাধন ভজন করিলে অঙ্কুর দেখা যায়। জমি প্রস্তুত, সময় ও বীজবপন, এই তিনের উপর অনেক নির্ভর করে।

শাস্ত্র ও সদাচার না মানিলে ঋষিদিগের পন্থার অনুসরণ হয় না।

গুরুদেবের নিকট শ্রীহরিনামে দীক্ষা গ্রহণ করিলে তবে তাহা ফলদায়ী হইবে। ইহা শাস্ত্রের শাসন। শাস্ত্র ও সদাচার না মানিলে ঋষিদিগের পথের অনুসরণ হয় না।

ব্রাহ্মণের উপনয়ন পূর্ব্বকালের বৈদিক দীক্ষা।

আমাদের দেশে ব্রাহ্মণের যে উপনয়ন হয়, তাহা পূর্ব্বকালের বৈদিক

দীক্ষা। গর্ভাধান হইতে ব্রাহ্মণের দশকর্ম্ম বৈদিক মন্ত্রে সম্পন্ন হয়। ইহা প্রাচীন প্রথামাত্র, ইহাতে প্রাণের অভাব দূর হয় না। এজন্য সমস্ত বঙ্গদেশ কেন, সমস্ত ভারতবর্ষ বলিলে অত্যুক্তি হয় না, সমস্ত দেশে তান্ত্রিক দীক্ষা প্রচলিত।

চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া জীব মনুষ্য-জন্ম লাভ করে।

শাস্ত্রে আছে জীব চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া তবে মনুষ্য-জন্ম লাভ করে। নূতন মনুষ্য-জন্ম যাহাদের, তাঁহারা কুকী, ভীল, প্রভৃতি নিরক্ষর বন্য লোকের মধ্যে দশ জন্ম পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে। পরে নিকটবর্ত্তী লোকসমাজে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপ অনেক জন্ম পরে তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হয়। বিস্ময়-জ্ঞান প্রথমজন্ম হইতেই লাভ হইতে থাকে।

শাস্ত্র ও সাধুমহাপুরুষে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিদ্বারা সভাসমিতি হইলে তদ্দ্বারা দেশের বিশেষ উপকার হইবে।

এখন শ্রদ্ধাবান্ লোক পাওয়া যাইতেছে না, সকলেই মহাত্মাদিগকে পরীক্ষা করিতে চায়। একবার পরীক্ষা দিলে আবার চায়। যখন শ্রদ্ধাবান্ লোকের সংখ্যা অধিক হইবে, তখন তাঁহারা যদি সভা করেন, সেই সভা দ্বারা বিশেষ উপকার হইবে। ইহার মধ্যেই অনেক ইংরাজী শিক্ষিত লোক শাস্ত্র ও মহাত্মাদিগকে বিশ্বাস করিতেছেন। শাস্ত্রচর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। ইঁহারা যখন ক্রিয়াশীল হইবেন, তখন অপূর্ব্ব ঘটনা হইবে। ইংরাজের কথা বাবুরা শুনেন; এজন্য ইংরাজ দ্বারা কার্য্য করান হইতেছে।

অদ্বৈতবাদ মত নহে।

অদ্বৈতবাদ মত নহে, আত্মার এক প্রকার অবস্থা। জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন হইলে, তখন আত্মা আপনাকে ভুলিয়া যান। যাহা দেখেন, কেবল ব্রহ্মসত্তাই দেখেন। অনন্ত সাগরে একটী জলকণা প্রবেশ করিলে, সে চারিদিকে সমুদ্রের হিল্লোল কল্লোল দেখে, কখনও ডোবে, কখনও ভাসে। আত্মার অস্তিত্ব নষ্ট হয় না। ইহা না হইলে ঋষিমুনিগণ এত পরিশ্রম করিয়া সাধন করিতেন কেন? ইহাই পরম গতি, পরম সম্পদ্।

কর্ম্ম—প্রারব্ধ, সঞ্চিত, বর্ত্তমান।

চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া একবার মানুষ হয়; সেই জন্মে যে কর্ম্ম করে, তাহাকে প্রারব্ধ, সঞ্চিত, বর্ত্তমান বলে। এই ত্রিবিধ কর্ম্ম শেষ করিতে অনেক জন্মমৃত্যু হয়—তাহা মানব-জন্মের ঘটনা মাত্র। এইরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিতে-করিতে, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই ত্রিবিধ দেহ নষ্ট হইয়া যায়, তখন জীব মায়া হইতে মুক্ত হয়।

প্রশ্ন—সিদ্ধ কি নিঃস্বার্থ হইলেও কি কর্ম্ম থাকে?

উত্তর—তখনই ত কর্ম্মের আরম্ভ। যত দিন স্বার্থ আছে তত দিন আর কর্ম্ম কোথায়? স্বার্থ গেলেই প্রকৃত কর্ম্মের আরম্ভ হয়। তখন সমস্ত সংসারের জন্য কর্ম্ম করিতে হয়, সকলের জন্য অবিশ্রান্ত খাটিতে হয়। নিঃস্বার্থ না হইলে প্রকৃত কর্ম্মের আরম্ভই হয় না। নিঃস্বার্থভাবে কর্ম্মকরাকেই কর্ম্মত্যাগী বলে।

প্রশ্ন—কর্ম্ম বিনা আর কোন উপায়ে মুক্তি হয় কি না?

উত্তর—তীব্র বৈরাগ্য দ্বারাও হয়। কিন্তু সেই প্রকার বৈরাগ্য কোথায়? বিষয় হইতে মনকে যখন সম্পূর্ণরূপে ভিতরে আকর্ষণ করিয়া

নিতে পারিবে এবং প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম সাধন করিতে পারিবে, এইরূপ অবস্থা হইলে, কর্ম্ম বিনাও মুক্তি হইতে পারে। কিন্তু প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম না হইলে, সব গেল। একটি শ্বাসপ্রশ্বাসে যদি নাম না লওয়া হয়, তবে সেই ছিদ্রপথে শত্রুরা আসিয়া বিঘ্ন করিতে পারে। নিষ্কাম মুক্তির পক্ষে মনুষ্য, দেবতা, গন্ধর্ব্বাদি সকলেই বিরোধী। সকলেই বিঘ্ন ঘটাইয়া পরীক্ষা করিয়া লন। তাই বাসনাবিহীন হইয়া ঐ প্রকার তীব্র সাধনা করা সহজ নহে। বৈধবিচারের দ্বারা কর্ম্ম শেষ করিলেই অতি সহজে ও স্বচ্ছন্দে কার্য্যসিদ্ধি হয়।

কর্ম্ম করা বৃথা নহে।

কর্ম্মেতে বদ্ধ থাকা বাস্তবিক বদ্ধ নহে। কর্ম্ম যথার্থ কর্ত্তব্যবোধে করিতে পারিলে, তাহাতে সহজে বাসনা কাটিয়া যায়।

কর্ম্ম করিতে করিতে যদি ভগবানের নাম লয়, তাহা হইলে বাসনা নষ্ট হয়। যাহার কর্ম্ম কাটে নাই, তাহাকে সমস্ত দিন নাম করিতে দাও, সে পারিবে না। বৃথা চিন্তা কি পরনিন্দা, বৃথা গল্প, বিবাদ, তর্ক-বিতর্ক এবং তাস, দাবা, পাশা এই সকলে সময় কাটায়। সন্ন্যাসী দাবা খেলে, তাস খেলে, বিবাদবিসম্বাদ সমস্ত করিতেছে। কর্ম্ম আছে, জোর করে কাটে না।

নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিবে। অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম এবং সকাম কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে, নিশ্চয়ই কর্ম্ম কাটিয়া বাসনাহীন হওয়া যায়। কর্ত্তব্য কর্ম্মে আলস্য, ইহা অপরাধ।

মনুষ্যের নিজের ক্ষমতা যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ তাহাকে পরিশ্রম করিতেই হইবে।

আসক্তি দ্বারা না হইলে কর্ম্ম নিষ্কাম হইবে।

লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিলে, তাহাতে ক্ষতি হয় না; উপকার হয়। তবে নিজের বিবেকমত না চলিয়া যদি অপরের মতে কর্ম্ম করে, তাহাতে হৃদয় স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া ক্ষতি হয়। ঈশ্বরের আজ্ঞা জানিয়া নিজের বিবেকমত চলিলে বিশেষ উপকার হয়।

মনুষ্য-জন্ম পাইয়া ভগবদ্ভজন না করিলে পুনরায় অধোগতি হয়।

মনুষ্য-জন্ম পাইয়া যদি ভগবানের ভজন পূজন না করে, তবে পুনরায় অধোগতি হইয়া চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে থাকে। মনুষ্য-জন্ম পাইয়া যদি একবার ভগবানের নাম শুনার মত শুনে, বলার মত বলে, ডাকার মত ডাকে, অর্থাৎ শিশু যেমন মা শব্দ শুনে, মা বলিয়া ডাকে, তাহাতে মা শিশুর নিকট দৌড়িয়া আসেন, এইরূপ হইলেই হয়।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

অর্থাৎ পরাৎপর পরমেশ্বরকে দর্শন করিলে হৃদয়গ্রন্থি (মায়াপাশ) ভেদ হয়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয় এবং সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হয়।

এই প্রতারণাময় সংসারে এক হরিনাম ভিন্ন সহজ সুখের বস্তু আর কিছুই নাই।

মায়া—বাস্তবিক মায়া কি? যদি বল সংসারে পরম সুখে আছি—ইহা ছাড়িয়া কোথায় যাইব? সংসারে কে তোমাকে ভাল বাসে? একটু বিচার করিয়া দেখ, অধিক স্থানেই প্রতারণা। কোন স্থানে স্ত্রী স্বামীকে কৃত্রিম প্রণয় দেখাইয়া অন্যকে ভাল বাসিতেছে, কোন স্থানে স্বামী স্ত্রীকে প্রতারণা করিয়া অন্য নারীতে আসক্ত। কোন স্থানে পুত্র পিতাকে বধ করিয়া বিষয় লইতেছে; কোন স্থানে পিতা পুত্রকে

বঞ্চিত করিয়া অন্যকে সুখী করিতেছে। তবে সংসারে মধ্যবিৎ লোকের মধ্যে, কৃষকদিগের মধ্যে কিছু কিছু ভালবাসা ও ভক্তি দেখা যায়। যেখানে অর্থের সম্বন্ধ, সেখানে ভালবাসা দুর্লভ। বস্তুতঃ ধনিদিগের ন্যায় যথার্থ বন্ধুহীন লোক অতি বিরল। সকলেই টাকার জন্য ভাল বাসিতেছে, হাসিতেছে, মুখপানে চাহিয়া আছে। রোগে শুশ্রূষা অর্থের জন্য। এইরূপ সংসারে ভ্রমণ করিয়া দেখিলে, সংসারে যথার্থ সুখী কে ইহা বাহির করা সুকঠিন। তবে যে ভালবাসার মধ্যে কোন প্রকার স্বার্থ নাই এরূপ লোক যদি সংসারে থাকে, তাহারাই সুখী। ইহাদের সংসার সংসার নহে—স্বর্গ, আর সকলই অসার – অসারের অসার।

একমাত্র হরিনাম ভিন্ন সহজ সুখের বস্তু আর কিছুই নাই। যথার্থ ভালবাসা হইলে মায়া হয়। সে ভালবাসা কোথায়? বরং বিচার করিয়া দেখিলে সংসার অসারই বোধ হয়। প্রকৃত মায়া হরিনামে, সংসারে কোন্ সুখের জন্য মায়া হইবে?

কোন ধর্ম্ম পন্থা গ্রহণ করা মাত্রই কেহ মুক্ত হয় না।

রোগী হাঁসপাতালে গিয়া আশ্রয় লওয়া মাত্র আরাম হয় না। ঔষধ খাবে, কুপথ্য করবে না, যথার্থ সুচিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাক্‌বে, নিশ্চয় আরাম হবে। সেইরূপ কোন সাধনপন্থা গ্রহণ করিবামাত্রই কেহ মুক্ত হয় না। সাধনের পরিণত অবস্থার নামই মুক্তি।

গীতা মাহাত্ম্য।

গীতার উপদেশ অতি সুন্দর। প্রথম কর্ম্ম—প্রবৃত্তি অনুযায়ী কর্ম্ম করিতে করিতে বিবেক বৈরাগ্য সময় সময় উদিত হয়। তখন নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা হয়। নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম শেষ হয়; কি বাসনা

থাকে। কর্ম্ম শেষ হইলে বিষয়কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তখন ভগবৎ শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতি সাধনে মতি জন্মে। ইহা করিতে করিতে ভক্তি প্রকাশিত হয়। ভক্তিতে হৃদয় ব্যাকুল হইলে, বালকবৎ, উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ অবস্থা, পরে দর্শন। পরে "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব-সংশয়াঃ"—ইত্যাদি।

গীতার এক একটী অক্ষর—এক একটী বীজ মন্ত্রের ন্যায়। বীজমন্ত্র যেমন সাধনায় জাগ্রত হয়, গীতার্থেরও সেইরূপ চৈতন্য হয়। ইহা টীকা দেখিয়া কি বুঝিবার সাধ্য আছে? শ্রীধর স্বামী ও শঙ্করাচার্য্য যে টীকা করিয়া গিয়াছেন, উহা হইতে আর শ্রেষ্ঠ টীকা হইতে পারে না, কিন্তু তাহা দ্বারাও বুঝিবার সাধ্য নাই। মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন, তখন রঙ্গনাথের মন্দিরে দেখেন একজন গীতা পাঠ করিতেছেন, কিন্তু অশুদ্ধ। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি গীতা পাঠ করিতেছেন ও কাঁদিতেছেন কেন?' তিনি বলিলেন, 'আমি গীতার অর্থ কিছুই বুঝি না; কিন্তু আমি যখন পাঠ করি, তখন দেখিতে পাই রথের উপর অর্জ্জুন ধনুক হস্তে করিয়া আছেন, আর শ্রীকৃষ্ণ অশ্বরজ্জু ধরিয়া, তাঁহার দিকে ফিরিয়া উপদেশ দিতেছেন। ইহা দেখি আর কাঁদি।' তখন মহাপ্রভু বলিলেন, 'আপনিই গীতা পাঠের প্রকৃত অধিকারী।'

প্রশ্ন—শ্রেষ্ঠ সাধন কি?

উত্তর—শ্বাসপ্রশ্বাসে গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করাই পরম সাধন।

ভগবানের রাজ্যে সমস্ত কার্য্যই নিয়মমত চলিতেছে।

ভগবানের রাজ্যে সমস্ত কার্য্যের মধ্যেই নিয়ম আছে। অনিয়মে বিশৃঙ্খলায় কোন কার্য্য হয় না। কি ধর্ম্মরাজ্যের ঘটনা, কি জড়জগতের ঘটনা, সমস্তই নিয়মের বাধ্য। মাতৃগর্ভে শিশুর জন্ম যে প্রণালীতে হয়,

হাজার চেষ্টা করিলেও তাহার অন্যথা হইবে না। ভগবান্ নিয়ন্তা এবং দয়াময়। তিনি একদিকে পাপীকে কঠোর শাস্তি দিতেছেন, সেই সময় আবার অন্য দিক্ হইতে তাহার রোগের সেবা করিতেছেন।

পুরুষকার ও দৈব—উভয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে।

পুরুষকার কৃষকের কৃষিকার্য্যের ন্যায়। কৃষক জমি প্রস্তুত করে, শস্য রোপণ করে, এই পর্য্যন্ত তাহার কার্য্য। তাহার পর তাহার আর ক্ষমতা নাই। আকাশ হইতে জলবর্ষণ না হইলে, সে জলসেচন করিয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। আন্তরিক উদ্যম তপস্যা, ইহা প্রযুক্ত হইলেই মেঘ হইতে জলবর্ষণের ন্যায় ভগবানের কৃপা বর্ষণ হয়।

মনে বৈরাগ্য আসিবামাত্র গৃহত্যাগ অবিধেয়।

কিছুদিন সংসারে থাকিয়া সাধন করিলে এবং তাপে দগ্ধ ও শুষ্ক হইলে, অগ্নি পরীক্ষিত হইলে, যেখানে যাউক, কেহ নষ্ট করিতে পারে না। মনে বৈরাগ্য আসিবামাত্র যদি গৃহ ত্যাগ করে, তবে পতনের অনেক কারণের মধ্যে পতিত হইতে হয়। সেই সময় সাবধান না হইলে সর্ব্বনাশ।

বিষয় কর্ম্ম, ইহাও এক প্রকার সাধন। কর্ম্মেতে বদ্ধ থাকা বাস্তবিক বদ্ধ নহে। কর্ম্ম যথার্থ কর্ত্তব্যবোধে করিতে পারিলে, তাহাতে সহজে বাসনা কাটিয়া যায়।

নামের নেশাই শ্রেষ্ঠ নেশা।

হরিনাম, ইষ্টনাম করিতে করিতে এক প্রকার নেশা হয়, তাহার নিকট ভাং, গাঁজা, আফিং, সুরা প্রভৃতি যত প্রকার মাদক আছে, তাহা কিছুই নহে। নামের নেশা ছুটে না, তাহা সর্ব্বদা স্থায়ী।

একাগ্রতা লাভের উপায়।

একাগ্রতা অভ্যাস অনেক প্রকার। কিন্তু যত উপায় আছে সমস্তই সাময়িক। যতক্ষণ উপায় অবলম্বন করা যায়, ততক্ষণ অল্প অল্প মন স্থির হয়। এজন্য বাহিরের উপায় সাময়িক মাত্র। মনের সঙ্কল্প বিকল্প নষ্ট না হইলে চিত্তের যথার্থ একাগ্রতা হয় না। এজন্য উপনিষদে আছে—

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥

ভগবান্ আছেন-এইটী সর্ব্বদা স্মরণ করিতে হইবে। স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন এই সকল একাগ্রতা লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। স্মরণ—প্রথমে অস্তিত্ব স্মরণ, সর্ব্বকালে স্মরণ, সর্ব্বভূতে, সর্ব্ব স্থানে, সকল ঘটনায় স্মরণ। দ্বিতীয় মনন—অস্তিত্ব বোধ হইলেই মন সেই দিকে আপনা হইতেই যায়। যেমন সর্প আলোক দর্শন করে; সর্প আলো দেখিলে দৃষ্টি ফিরাইতে প্যারে না। তৃতীয় নিদিধ্যাসন—গরু যেমন জাবর কাটে। স্মরণমননে যাহা স্বাদ পাইয়াছি, পুনঃ পুনঃ তাহা ভোগ করা। এই তিনটী একাগ্রতা লাভের বিশেষ উপায়।

পিশাচ সিদ্ধির ভয়ানক অপকারিতা।

ডাকিনী যোগিনী সিদ্ধি করিলে সাত জন্ম ভগবৎভজন হইবে না। দেবতা সিদ্ধি, পিশাচ সিদ্ধি এখন এ সকল সাধন অধিক প্রচলিত। শ্রীবৃন্দাবনে একবার একটী পিশাচসিদ্ধ ব্যক্তি তাহার পিশাচের দ্বারা একটি দেবমূর্ত্তি দর্শন করাইয়া আমাকে ভুলাইতে চাহিয়াছিল। পিশাচেরা নানা প্রকার দেবদেবীর মূর্ত্তি ধরিতে পারে। প্রকৃত ভগবৎদর্শন হইলে,

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

এই সকল লক্ষণ (দর্শনকারীর মধ্যে) প্রকাশিত হইবে। ইহা না হইয়া যদি প্রাণে জ্বালা আসে অথবা কোন প্রকার ভয় উপস্থিত হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে উহা প্রেতাদির কার্য্য।

আহারের সঙ্গে ধর্ম্মের বিশেষ যোগ আছে।

যাহার যে অভাব তাহা সেই জানে, অন্যে বুঝে না। নিজের শরীরে কি চায়, তাহা অনেক বিজ্ঞও জানেন না। ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, ইহার কোন্ পদার্থের কোন্ কার্য্য তাহা না জানিলে প্রকৃত আহার কি তাহা জানা যায় না। বালক শৈশবে নিজে মলত্যাগ করিয়া নিজে ভক্ষণ করে এবং অতি আনন্দে হাস্য করে, কিন্তু পিতা মাতা ঘৃণায় নাকে হাত দেন।

ক্রোধী যদি লঙ্কা, সর্ষপ প্রভৃতি পিত্তবৃদ্ধিকর উত্তেজক বস্তু ভোজন করে, কামুক যদি মৎস্য, মাংস, ঘৃত, মধু এবং মিঠাই ইত্যাদি খায়, লোভী যদি অধিক তিক্ত খায়, অহঙ্কারী যদি অধিক মসূরের ডাইল খায়, সংসার-মোহে আসক্ত ব্যক্তি যদি অধিক অম্ল খায়, অভিমানী যদি অধিক লবণ খায়; তাহা হইলে ঐ শিশুর ন্যায় আহার করা হয়। জ্ঞানী পুরুষগণ অবাক্ হইয়া থাকেন।

সাঙ্খ্যযোগে কপিলদেব পঞ্চতত্ত্বকে বিভাগপূর্ব্বক সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন ইত্যাদি লইয়া, ঊনবিংশতি তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, ও প্রত্যেক তত্ত্বের সহিত শরীর মনের কি সম্বন্ধ এবং আত্মার সহিত শরীর মনের কি সম্বন্ধ তাহা ঠিক করিয়া, আহার বিহার সকল ঠিক্ ঠিক্ দেখাইয়া দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। বিষ্ণু-পুরাণ, মার্কণ্ডেয়-পুরাণ, যোগবাশিষ্ঠ, মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব, পাতঞ্জল-দর্শন, মৈত্রোপনিষদ, শ্রীমদ্ভগবৎগীতা, রুদ্রযামল তন্ত্র ইত্যাদি গ্রন্থে এবিষয়ে

অনেক কথা লিখিত আছে। তাহা দেখিয়া ক্রমে ক্রমে আহার অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

আহারের সঙ্গে ধর্ম্মের যোগ আছে, কারণ শরীর ও আত্মা একত্র আছে। এই আহার অতি সাবধানে না করিলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়। এক ব্যক্তি লঙ্কা খায় না, তাহাকে লঙ্কা খাইতে দিলে, সমস্ত দিন তাহার শরীরে জ্বালা হইবে এবং তাহার ধর্ম্মসাধনও রহিত হইবে।

প্রশ্ন—মনঃসংযমের প্রধান অন্তরায় কি ?

উত্তর—মনের সঙ্কল্প বিকল্প সর্ব্বদাই হইতেছে। ইহাতে মন অস্থির হয়, মনের উপর কর্তৃত্ব আসে না। ইহার প্রধান কারণ দুইটি ইন্দ্রিয় প্রবল, জিহ্বা ও উপস্থ। উপস্থ অনায়াসেই লোকে দমন করিতে পারে, কিন্তু জিহ্বাকে সহজে লোকে দমন করিতে পারে না। কেহ নিন্দা করিলে, কটুবাক্য বলিলে, জিহ্বা তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিবে। এই জিহ্বা বশীভূত হইলে, নিন্দা প্রশংসায় চঞ্চল করিতে পারে না।

প্রকৃত বৈরাগ্য কি ?

বৈরাগ্যের অর্থ ইহা নয় যে, সকল ছাড়িয়া আসিলাম, ভিক্ষা করিয়া খাইলাম—ইত্যাদি। ইন্দ্রিয় সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়ার নামই বৈরাগ্য। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের দিক্ যখন আর ইন্দ্রিয়ে যাইবে না, তখনই বৈরাগ্য হইয়াছে বুঝিবে। কর্ম্ম না কাটিলে বৈরাগ্য হয় না।

কামিনী ও কাঞ্চন দুই ধর্ম্মলাভের বিরোধী।

যে স্ত্রী-সংসর্গ করে, তাহার সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাব হওয়া দূরে থাকুক, অহৈতুকী ভক্তিই হয় না। ভক্তিশাস্ত্রে যোষিৎ সঙ্গীরও সঙ্গ করিতে নিষেধ আছে।

টাকা কালকূট, উহা ঘরে কখনও পুষিয়া রাখিবে না। টাকা উপার্জ্জন

করিয়া প্রয়োজনমত খরচ করিবে। যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা ভগবানের গচ্ছিত ধন মনে করিবে। যদি তিনি লোক পাঠান, (অর্থাৎ কেহ বিপদে পড়িয়া আসে) অমনি তাহাকে দিয়া দিবে। যাঁহারা ধনী হইতে চান, তাঁহাদের কথা ভিন্ন। যাহারা ধর্ম্ম চান, তাহাদের কোনমতে দিন কাটিয়া গেলেই হয়।

শ্রাদ্ধ ও গয়ায় পিণ্ডদানের প্রয়োজনীয়তা।

শাস্ত্রকর্ত্তারা শ্রাদ্ধ প্রভৃতির কি সুন্দর নিয়মই করিয়া গিয়াছেন! গয়ায় পিণ্ড দিলে লোকের উপকার হয়। যাহার কোন সংস্কার নাই, তাহার কোন উপকার নাও হইতে পারে। কার্য্যে বিশ্বাসানুরূপ ফললাভ হয়। গয়ায় পিণ্ডদানে যে উপকার হয়, তাহা প্রত্যক্ষ হইয়াছে। চেহারা পর্য্যন্ত বদল হইয়া যায়।

স্থূলদেহ—আহারে পুষ্ট হয়, সূক্ষ্মদেহ দর্শনে পুষ্ট হয়, কারণ দেহ কেবল শুভ ইচ্ছায় পুষ্টিলাভ করে। পুষ্টি অর্থ সন্তোষ। গয়ায় পিণ্ড দিলে সূক্ষ্মদেহের বাসনা নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কেবল মনের শুভ ইচ্ছা হইতেই কারণদেহের নাশ হয়।

প্রশ্ন—নরক প্রভৃতি স্থান আছে কি না? যমদূত প্রভৃতি কি?

উত্তর—শাস্ত্রে নরকের যেরূপ বর্ণনা আছে, নরক প্রকৃতই তদ্রূপ। যমদূত, বিষ্ণুদূত সকলই সত্য। মৃত্যুর পর ইহাদের সহিত বিচার হয়। পিতৃপুরুষও মৃত্যুসময় উপস্থিত থাকেন। যাহার আত্মা নরকেই যাইবে, পিতৃপুরুষগণ তাহাকে সান্ত্বনা দেন। পিতৃপুরুষগণও মায়ার অতীত নহেন, তাহারাও ত্রিগুণের অধীন।

প্রশ্ন—ধর্ম্ম প্রকৃতিতে লাভ হইয়াছে কি না কখন জানা যায়?

উত্তর—আগুন যেমন সকল অবস্থায়ই একরূপ থাকে, কোন অবস্থায় উহার রূপান্তর হয় না, সেইরূপ বিপদের সময় যাহার ধৈর্য্য নষ্ট

না হয়, সত্য ও ধর্ম্ম একই রূপ থাকে, এবং সাম্যের কিছুমাত্র ভাবান্তর হয় না, সেই প্রকৃতিতে ধর্ম্মলাভ হইয়াছে বুঝিবে। বিপদের সময় ধৈর্য্য, বিনয়, মিত্রতা ঠিক থাকিলেই ধর্ম্মলাভ হইয়াছে জানিবে।

প্রশ্ন—সাধনের পর সময় সময় অত্যন্ত নিরাশভাব ও শুষ্কতা আসে, ঐ সময় সাধন ভাল লাগে না। এইরূপ নিরাশার ভাব আসে কেন?

উত্তর—গ্রীষ্মকাল যেমন ভয়ানক বলিয়া বোধ হয়, পুকুর খাল ইত্যাদি শুকাইয়া যায়, সূর্য্যের উত্তাপে মানুষ অস্থির হয়, সকল প্রাণী হাহাকার করে, গাছ পালা আর সেরূপ থাকে না, দেখিয়া বোধ হয় যেন কিরূপ এক কষ্টকর অবস্থা। বাস্তবিক, প্রকৃতির পক্ষে এরূপ ভয়ানক অবস্থা আর হয় না। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, এই গ্রীষ্মকাল না থাকিলে বর্ষা আসে না, প্রকৃতি আবার সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হয় না। এই গ্রীষ্মকালই সমস্ত সৌন্দর্য্যের মূল। গ্রীষ্মকাল হয় বলিয়াই আমরা বর্ষার সুখ অনুভব করি। সেইরূপ সাধনের সময় বিবিধ অবস্থা হয় বলিয়াই ধর্ম্মের এত সৌন্দর্য্য। নানা প্রকার শুষ্কতা ও নিরাশভাব না আসিলে, ধর্ম্মের এত শোভা হইত না, ধর্ম্মে সুখ বুঝা যাইত না। নানা বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়া যখন ধর্ম্মের উচ্চতর শৃঙ্গে উঠা যায়, তখনই চিরশান্তি। এই শান্তি একবার লাভ হইলে আর নষ্ট হয় না।

প্রশ্ন—অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অনেক সাধুসঙ্গের দ্বারা কোন ক্ষতি হয় কি না?

উত্তর—সকল কার্য্যেরই একটী প্রণালী আছে। শাস্ত্রালোচনারও সেইরূপ প্রণালী আছে—অসময়ে, অপ্রণালীতে শাস্ত্রালোচনা করিলে কোন ফল নাই। শাস্ত্রে অনেক পথ আছে। একটী পথ ধরিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পরে ধীরে ধীরে শাস্ত্র পাঠ করিতে হয়। নিজের সাধন-পন্থায় নিষ্ঠা না জন্মিলে, কোন শাস্ত্রপাঠ, কি সাধুসঙ্গ ঠিক নয়। সাধুদের

সকলের এক পথ নহে। নিজের পন্থায় বিশেষ নিষ্ঠা জন্মিলে, ভিন্ন-পথাবলম্বী সাধু হইতে কোন ভয় থাকে না।

আনন্দ প্রকৃতি।

আনন্দ প্রকৃতি। সমস্ত জগতের যে বস্তু স্বভাবে আছে তাহাই আনন্দময়। চন্দ্র, সূর্য্য, পর্ব্বত, সমুদ্র, বৃক্ষলতা, ফল ফুল, পশুপক্ষী সমস্ত আনন্দময়। মনুষ্যও যতটুকু স্বভাবে থাকে, ততটুকু আনন্দ পায়। মনুষ্যের স্বভাব যত বিকশিত হইতে থাকে, আনন্দও তত বিকশিত হয়। যাহারা পাপচিন্তা ও পাপকার্য্য দ্বারা স্বভাবকে বিকৃত করিয়াছে, তাহারা নিরানন্দ ভোগ করে। পাপে শরীর রুগ্ন হয়, মন অপবিত্র হয়। পুণ্যলাভ করিয়া স্বভাব লাভ না করিলে আনন্দ পাওয়া যায় না। রোগ ও পাপ-যন্ত্রণায় জীবন গত হয়।

হরিনামে ফল ধরিতে আরম্ভ করিলে যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কীর্ত্তনে একটু নৃত্য করিল, একটু ভাব হইল, ইহাকেই এখন ধর্ম্ম বলে। ইহা ধর্ম্ম সন্দেহ নাই, কিন্তু ধর্ম্মের প্রথম অঙ্গ। সত্য, ন্যায়, জীবে দয়া, পিতা মাতা গুরুজনে ভক্তি, সৎসঙ্গে স্পৃহা, পরস্ত্রীদর্শনে সাবধানতা, পরধনে অলোভ এইগুলি প্রথম অঙ্গ। হরিনামে ফল ধরিতে আরম্ভ হইলে উক্ত লক্ষণগুলি প্রথমে দেখা দেয়। উহা না হইলে জীবনে ধর্ম্মের আরম্ভই হইল না।

বাস্তবিক বেদ বিভিন্ন নয়, কেবল বুঝিবার ভুল।

ঋক, যজু, সাম, অথর্ব্ব। বেদ এক, তাহার শিক্ষার জন্য তাহাকে চারি-ভাগ করা হইয়াছে। সমস্ত চারিবেদ শিখিতে হইলে অন্ততঃ ছত্রিশ বৎসর

সময় আবশ্যক। সুতরাং সকলে সমুদয় বেদ অধ্যয়ন করিতে পারে না। এক ভাগ কি দুইভাগ অধ্যয়ন করে। সুতরাং যিনি যে অংশ অধ্যয়ন করেন, তিনি তাহারই আচার্য্য হন। এজন্য বেদ বিভিন্ন। বেদ যে ভিন্ন তাহা নহে। যেমন হাতের সঙ্গে পা ভিন্ন, বস্তুতঃ এক শরীর মাত্র। যিনি সামবেদের আচার্য্য তিনি যজুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন না। অথবা যজুর্ব্বেদের মধ্যে সামবেদের বিষয় নাই। যদি যজুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে চাও, তবে যজুর্ব্বেদীর নিকট যাইতে হইবে। যদি সম্পূর্ণ বেদবেত্তা পাওয়া যায়, সেখানে বেদ বিভিন্ন নহে। মানবাত্মার মধ্যে যদি প্রবেশ করিতে পার, তবে সমস্ত লাভ হইবে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে লাভ করা যায়। বেদ শব্দে—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও পরব্রহ্ম বুঝায়।

দান, দাতা ও দানের পাত্র।

যে সর্ব্বদা যাচ্ঞা করে, সে ব্যক্তি দানের পাত্র নহে। ভয়, স্নেহ, লজ্জা, মান, বংশমর্য্যাদা, প্রত্যুপকার-প্রত্যাশা এই সমস্ত ভাবে দান, অপাত্রে দান, প্রকৃত দান নহে।

স্বর্গকামনা, পাপমোচন, পরকালের জন্য অর্থসংগ্রহ ইত্যাদিভাবে দান করিলে, তাহা দান শব্দ বাচ্য নহে। দান করিয়া অনুতাপ হইলে তাহা দান নহে।

যেমন পিপাসা হইলে ব্যগ্রতার সহিত জল পান করে, সেইরূপ যিনি প্রকৃত দাতা, তিনি দানের পাত্র দেখিলে দান করিতে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়েন। আপনার সর্ব্বস্ব দিয়াও যদি দুঃখ দূর করিতে পারেন, তাহাতেও কুণ্ঠিত হন না। দান করিলে আনন্দের সীমা থাকে না। উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা দাতা বলিয়া মহাভারতে বর্ণনা করা হইয়াছে।

যুক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে মিলাইয়া প্রত্যেক বিষয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

যতক্ষণ শরীর, মন, আত্মা ঐক্য না হয়, ততক্ষণ আমার পক্ষে তাহা স্বাভাবিক নহে। স্বভাবই ধর্ম্ম। সমস্ত মনুষ্যের স্বভাবে একতাও আছে, স্বতন্ত্রতাও আছে। কেবল মনুষ্য বলিয়া কেন? সৃষ্ট বস্তুর প্রত্যেকের স্বভাবে একতা ও বিচিত্রতা আছে। আমি যেমন সকলের এক, তেমনি আবার ভিন্ন। আমার শরীর, মন, আত্মা যাহাতে ঐক্য হইবে, তাহাতেই আমার মঙ্গল।

এক ব্যক্তি কুইনাইনে উপকার পাইয়াছেন, আমার জ্বর নাই, আমি কেবল বড়লোকের কথা বলিয়া কুইনাইন খাইব কেন? এই জন্য যুক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ের সহিত মিলাইয়া প্রত্যেক বিষয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

প্রকৃত জাতিভেদ কি?

সত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটী গুণ। এই তিনটীই প্রকৃত জাতি। এই তিনটী গুণ ত্যাগ না হইলে জাতি ত্যাগ করা যায় না। এক কথায় বলিলে অভিমানই জাতি। এই অভিমান পরিত্যাগ না করিলে জাতি-ভেদ যায় না। অভিমান ত্যাগ কর, সমদর্শী হও, জাতিভেদ আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে।

যিনি যে সম্প্রদায়ে অবস্থান করিতেছেন, তিনি সেই সম্প্রদায়ের আচার-পদ্ধতি অনুসারে চলিবেন। অবস্থা না হইলে দেখাদেখি কোন কার্য্য করিবে না। সাধন উদ্দেশ্যে জীবনগঠন। ভিতরে বাহিরে এক হওয়াই প্রকৃত জীবন।

প্রশ্ন—"কৃষ্ণনামে দীক্ষা পুরশ্চর্য্যার অপেক্ষা না করে।" এই কথার অর্থ কি?

উত্তর—কৃষ্ণনাম অর্থাৎ শক্তিশালী কৃষ্ণনাম, সদ্‌গুরুদত্ত কৃষ্ণনাম। সদ্‌গুরুদত্ত নামে তন্ত্রোক্ত কোন দীক্ষা বা পুরশ্চরণের কোন দরকার নাই, এই অর্থ।

কর্ম্ম, বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস।

যতদিন আসক্তি না যায়, প্রকৃত অনুরাগ না হয়, ততদিন কর্ম্ম শেষ হয় না। সুতরাং সন্ন্যাসাদি নিলেও কোন না কোনরূপ কর্ম্ম করিতেই হইবে। ধন, বাড়ী, ঘরকে সংসার বলে না। দেহাত্মবুদ্ধিই সংসার।

আসক্তি থাকিতে বৈরাগ্য হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণাদিতে কার্য্যের ব্যাঘাত করিলে জানিতে হইবে যে, ত্রিতাপ নষ্ট হয় নাই। বিষয়ে অনাসক্তি ও ত্রিতাপ নষ্ট হইলেই বৈরাগ্য হয়। ইহার পূর্ব্বে পঞ্চম-পুরুষার্থ লাভ হয় না।

বৈরাগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত নিয়মেতে সময় কাটাইতে হয়। কোন কারণেই ঐ সকল নিয়মে বাধা দেওয়া উচিত নয়। সংসারে থাকিয়া যাঁরা না পারেন, তাঁরা যে অবস্থায় পারেন তাহাই করিবেন। সকলের পথ এক নহে। কর্ম্মত্যাগই সন্ন্যাস। সম্যক্‌প্রকারে আত্মসমর্পণ সন্ন্যাস।

প্রশ্ন—পুরুষকার কোন্ পর্য্যন্ত? নির্ভর কখন করিতে হয়? এবং কৃপাই বা কি?

উত্তর—পদ্মা মেঘনার ন্যায় খুব বড় এবং বেগবতী নদী পার হইতে হইলে, গুণ (সত্ত্ব রজো তমো) দ্বারা নৌকা বাঁধিয়া, নদীর পরপারের নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতেও অনেক দূরে উজানে যাইয়া গুণ খুলিয়া লইতে হয়। এই স্থানে পুরুষকারের শেষ। এই সময় মাঝির (গুরুর) উপর নির্ভর করিতে হয়। শক্ত সুচতুর মাঝি তখন পাল তুলিয়া দিয়া হাল ধরিয়া ঠিক হইয়া বসে। অতঃপর কৃপাবাতাস ভিন্ন আর গতি

নাই। বাতাস বহিতে আরম্ভ করিলে, সুচতুর মাঝি ঢেউ কাটিয়া কাটিয়া আরোহীসহ তরণীকে নিরাপদে পরপারে লইয়া যায়।

কলির অধিকারের বিস্তৃতি।

পরীক্ষিত যখন কলিকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন কলি বলিলেন—"তোমাকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাকেও তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং আমাকে বধ করিবার তোমার কি অধিকার আছে?" তার পর তিনি পরীক্ষিতের নিকট কতিপয় স্থান প্রার্থনা করিলেন। পরীক্ষিত বলিলেন—"যে স্থানে দ্যূতক্রীড়া, সুরাপান, স্ত্রী ও প্রাণী হত্যা-রূপ চারি অধর্ম্ম দেদীপ্যমান, তুমি সেই স্থানে গিয়া বসতি কর।" কলি আরও স্থান প্রার্থনা করিলেন। তখন রাজা তাহাকে মিথ্যা, গর্ব্ব, কাম, হিংসা ও বৈর প্রদান করিলেন। আমাদের প্রাণ যাইবে, তবুও ঐ সকল হইতে সাবধান থাকিতে হইবে।

প্রশ্ন—শক্তিসঞ্চার কাহাকে বলে?

উত্তর—ঈশ্বরের শক্তিসকলের মধ্যেই আছে। একটী মহাপুরুষের প্রবল শক্তিদ্বারা সেই শক্তিকে (কুলকুণ্ডলিনী) জাগরিত করিয়া দেওয়াকেই শক্তিসঞ্চার বলে। এ শক্তি সাধারণতঃ নিদ্রিত অবস্থায় থাকে। তাহাকে শক্তিসঞ্চারের দ্বারা জাগরিত করিলেও, পুনরায় নিদ্রা যাওয়ার জন্য চেষ্টা করে। যাহারা অনবরত শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করিয়া উহাকে ঘুমাইতে না দেয়, তাহাদেরই শক্তি বেশ খেলিতে থাকে।

মহাপুরুষদিগের শক্তিসঞ্চারের প্রণালী।

মহাপুরুষেরা তিন প্রকারে শক্তিসঞ্চার করেন। দৃষ্টি দ্বারা, স্পর্শের দ্বারা এবং ধ্যানের দ্বারা। দৃষ্টি দ্বারা শক্তিসঞ্চারের উদাহরণ মৎস্য। মৎস্য ডিম পেড়ে সর্ব্বদা তাহা দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে রাখে এবং সেই দৃষ্টিশক্তি

ডিমে সঞ্চারিত হইয়া ডিম প্রস্ফুটিত হয়। স্পর্শের উদাহরণ পক্ষী। পক্ষী ডিম পেড়ে তা দিতে থাকে। তাহার স্পর্শশক্তি ডিমে সঞ্চারিত হইয়া ডিম ফুটে। ধ্যানের উদাহরণ কচ্ছপ। কচ্ছপ ডিম পাড়িয়া মাটি চাপা দিয়া চ'লে যায়, কিন্তু সে মনে মনে সর্ব্বদা উহা ধ্যান করে। সেই ধ্যানশক্তি দ্বারা ডিম ফুটে।

প্রশ্ন—ব্রাহ্মসমাজে যত দিন ছিলাম, সেই সময় মনের যেরূপ একটা তেজ, সত্যানুরাগ, জীবনের উৎকর্ষ ইত্যাদি নানা বিষয়ে একটা সুন্দর অবস্থা ছিল, আজ কাল তাহা নাই। তবে সাধন গ্রহণ করিয়া আমার অবনতি হইল না কি ?

উত্তর—এই সাধনের ভিতরে যত লোক আছে, সকলেরই এই অবস্থা। আমি সকল বিষয়ের কর্ত্তা, আমাকে আমি উন্নত করিতে পারি, অবনত করিতে পারি, এইরূপ যে একটা অভিমান, উহা নষ্ট করিবার জন্যই এই সকল অবস্থার দরকার। মানুষ যে কিছুই নয়, তার কিছুই করিবার অধিকার নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। নচেৎ উন্নতি হইতে পারে না। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সংগ্রাম করিতে বলিয়াছেন। এই সংগ্রাম সাধকমাত্রেরই জীবনে আসিবে। নানা প্রলোভনের মধ্য দিয়া সাধক সংগ্রাম করিতে থাকিবে। কখন জয়, কখন পরাজয়। এইরূপ বিষম সংগ্রামে বহুদিন কাটাইতে হয়। এই সংগ্রামের সময় গুরুদত্ত নামকেই একমাত্র আশ্রয় করিয়া, অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে রিপুদিগকে পরাজয় করিতে চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক। অনেকে এই সংগ্রাম-উপস্থিত হইলে, সাধনে অবিশ্বাসী হইয়া নাস্তিক হইয়া যায়। সাধক-জীবনে ইহা অপেক্ষা আর ভয়ানক অবস্থা নাই। এই রণে যাহারা গা ছাড়িয়া দেয়, তাহাদের কালবিলম্ব হয়। অনেক ভোগে পতিত হইতে হয়। আর যাহারা প্রাণপণে সংগ্রাম করিতে পারে, তাহাদের সংগ্রাম

সকালেই শেষ হইয়া যায়। যার যেরূপ প্রকৃতি সে সেইরূপ যুদ্ধ করে। যার রজঃগুণ খুব বেশী, তাহাকে বেশী দিন যুদ্ধ করিতে হয়। এই সংগ্রামে সকলকেই পরাস্ত হইতে হইবে। পরে পরাজয় হইতে হইতে যখন হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইবে, সাধক দেখিবে যে তাহার কোন ক্ষমতা নাই, সকল বিষয়েই সে অত্যন্ত হীন, নিজের চেষ্টায় নিজের জীবন উন্নত করিতে অসমর্থ, তখন নিজকে সে নিতান্ত হীন অক্ষম জ্ঞান করিয়া অন্য কোন শক্তির উপর নির্ভর করে। তখনই সে ভক্তির পথে চলে। তখন আর তার কোন প্রকার চেষ্টা, ইচ্ছা বা স্বাধীনতা থাকে না। সমস্তই ভগবান্ করেন ইহা সে স্পষ্ট বুঝিতে পারে।

সংগ্রামের কথা গীতায় কর্ম্মযোগ এবং ইহার পরেই ভক্তিযোগ বলা হইয়াছে। এই ভক্তিযোগ আরম্ভ হইলে ভক্ত ক্রমে সকল বিষয়ে ভগবানের হাত প্রত্যক্ষ করিতে থাকে। তখন নানা আশ্চর্য্য তত্ত্ব তাঁহার নিকটে প্রকাশ পাইতে থাকে। এই অবস্থাকে জ্ঞানযোগ বলে। সুতরাং সংগ্রাম করিতে থাক। এই সংগ্রাম জীবনে আসাও সহজ নয়। অনেকের জীবনে এই সংগ্রাম হয় না। সংগ্রাম আসিলেই মনে করিবে যে, এই ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাত হইল। এই সাধনের মধ্যে যত জন আছেন, কেহই এই সংগ্রাম না করিয়া পারিবেন না। সকলকেই সকল প্রকার রিপুর নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হইবে। নিজের যাহা প্রকৃত অবস্থা তাহাতে দাঁড়াইতে হইবে। এই সময় দীনবন্ধু পতিত-পাবন বলিয়া ডাকা ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। নিজের দুরবস্থা অনুভব করিয়া ডাকিলে তাহা পূর্ণ হইবে।

প্রশ্ন—সংসারে থাকিয়া মন একান্ত করা যায় কিরূপে? কিসে ঐকান্তিকতা হয়?

উত্তর—মন অন্তর্ম্মুখীন না হইলে হয় না। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, জপ

এই সকলে মন অন্তর্ম্মুখীন হয়। নিকটে মানুষ না থাকিলেই যে একান্ত হওয়া যায় তাহা নহে, মন হয়তো ভোঁ ভোঁ করে বেড়াইতেছে। নির্জ্জনে থাকা, কোন ঘরে দ্বার বদ্ধ ক'রে থাকা, কোন বনে সঙ্গহীন হইয়া থাকা, ইহা ঐকান্তিকতা বটে; কিন্তু মূল কথা হ'চ্ছে—মন অন্তর্ম্মুখীন হওয়া চাই। আমি একটী ফকিরকে দেখিয়াছি, তিনি বাজারের মধ্যে ব'সে থাক্‌তেন, ধ্যান করিতেন, কি জপ করিতেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি এইরূপ কোলাহলের মধ্যে থাকেন কেন? তিনি বলিলেন, ইহার মধ্যে যদি আমার মন ঠিক থাকে তবে হ'ল।

মন যদি একান্ত হয়, তবে এই যে শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছে, ইহার সহিত সর্ব্বদা নাম (গুরুদত্ত মন্ত্র) চলিতে থাকে। হয়ত ভগবৎপ্রসঙ্গ কি সঙ্গীত শুনিতেছেন, কাহারও সহিত কথা বলিতেছেন, গল্প করিতেছেন, প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন, কিন্তু ভিতরে নাম চলিতেছে। মনে কোন বিষয়ে আসক্তি রাখিতে হয় না। শাস্ত্রকর্ত্তারা দেখাইয়াছেন যে, তপস্যার নিয়মে পর্য্যন্ত আসক্তি জন্মে। এই অবস্থায় তপস্যার এবং এবং নিয়মের উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া মাত্র বাহ্য অনুষ্ঠান করা হয়।

প্রশ্ন—যদি নামে আসক্তি হয়?

উত্তর—হাঁ, তাহাতো হওয়া দরকারই। অসৎ বিষয় অর্থাৎ যাহা থাকে না, যাহা অনিত্য, তাহাতে আসক্তি করিবে না। সত্য যাহা, তাহাতে ত আসক্তি হইবেই।

প্রশ্ন—একটী জন্তু অপর একটী জন্তুকে আহার করে; ইহা মঙ্গলময় ভগবানের কিরূপ ব্যবস্থা?

উত্তর—এই সকল তত্ত্ব বুঝা ভার। জীব, বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি ৮৪ লক্ষ যোনী ভ্রমণ করিয়া, পরে মনুষ্য-জন্ম লাভ করে। মনুষ্য-জন্ম অতি দুর্ল্লভ। নীচ যোনীতে জন্মগ্রহণ ক'রে দীর্ঘায়ু

হ'লে, মনুষ্য-জন্ম লাভ করিতে বিলম্ব হয়। তাই ভগবানের এই বিধান যে একে অন্যকে ভক্ষণ করে, উহাতে মনুষ্য-জন্ম নিকটতর করে।

প্রশ্ন—প্রকৃত যোগলাভ করিতে হইলে কি নিয়মে চলিতে হইবে ?

উত্তর—বীর্য্যধারণ ও সত্যরক্ষা না হইলে যোগলাভ হয় না। কল্পনাও সত্য হওয়া দরকার। বীর্য্যধারণ যেমন এক পক্ষে শরীর, মন ও আত্মা রক্ষার কারণ, সত্যও তদ্রূপ। বৃথা চিন্তায় বিশেষ অনিষ্ট হয়। ভগবৎ-চিন্তায় মস্তিষ্কের শক্তি এত বৃদ্ধি পায় যে, বলা যায় না। বৃথা চিন্তায় অর্থাৎ মিথ্যা চিন্তায় মস্তিষ্ক নষ্ট হয়। মিথ্যা বলায় যেরূপ পাপ, মিথ্যা কল্পনায়ও ঠিক সেইরূপ পাপ। যাঁহারা যোগপথে চলিবেন, তাঁহাদের সকলেরই সত্যের সঙ্গে যোগ রাখিতে হইবে। নাটক নভেল ইত্যাদি কল্পনাপ্রসূত গ্রন্থাদি পাঠ করা যোগশাস্ত্রে নিষেধ।

প্রশ্ন—শাক্ত ও বৈষ্ণবে পার্থক্য কি ?

উত্তর—শাক্ত ও বৈষ্ণবের শেষ অবস্থা একই প্রকারে লাভ হয়, কিন্তু রাস্তা ভিন্নপ্রকার দৃষ্ট হয়। যাঁহারা বৈষ্ণবপ্রকৃতির লোক, তাঁহারা কোন প্রকার ঐশ্বর্য্য চান না, দাস হইতে চান। বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুভক্তিই আশা করেন। তাহাতেই তাঁহাদের অভয়পদ লাভ হয়, এবং আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য শক্তিলাভ হয়। ঐশ্বর্য্য তাঁহারা চান না, প্রকাশ করেন না। ঐশ্বর্য্য দাসদাসীর ন্যায় তাঁহাদের অনুগমন করে।

আর যাঁহারা শাক্ত, তাঁহারা ঐশ্বর্য্য প্রথমে আকাঙ্ক্ষা করেন। নানা প্রকার অলৌকিক ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা তাঁহারা ভগবানের কার্য্য করেন, পৃথিবীর নানা মঙ্গল সাধন করেন। এইরূপে ভগবানের সেবার দ্বারা অবশেষে মোক্ষ পান।

ভগবান্‌কে বশ করিবার সহজ উপায়।

গরুকে যেমন দড়ি ধ'রে টেনে নিলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এদিক ওদিক

যায়, কিন্তু তাহার বাছুরটী কোলে ক'রে নিয়ে চ'লে গেলে আপনা হইতেই 'হাম্বা' 'হাম্বা' ক'রে পিছনে পিছনে ছুটিতে থাকে, সেইরূপ মানুষ ভগবানকে জানে না, ভক্তিও করিতে পারে না; কিন্তু যদি তাঁহার ভক্তকে পূজা করে, তবে তিনি আপনা হইতেই বশ হন।

সাধকের পক্ষে অহঙ্কারের মত শত্রু আর নাই।

ধূলি হইতে হইবে, মাটি হইতে হইবে, জ্যান্তে মরা হইতে হইবে। যতদিন ভিতরে অহংভাব আছে, ততদিন মাথার উপর পাহাড় পর্ব্বত। ভগবান্ দর্পহারী, কোন রকমে একটু অহঙ্কার হইলেই, এ গালে এক চাপড়, ও গালে এক চাপড়, নাকমলা, কাণমলা, মারে বাপরেও ব'ল্‌তে দেবে না। এতে যদি হ'ল তো হ'ল, নতুবা ঘাড় ধ'রে একেবারে কোথায় নিয়ে ফেল্‌বে তার ঠিক নাই।

সাধন-ভজন ক'রে আমার এই অবস্থা লাভ হ'য়েছে, আমার এত উন্নতি হ'য়েছে এই ভাব যদি মনে হয়, তাহা হইলেও রক্ষা নাই। ভগবানের বিচার নিক্তির কাঁটার মত। লক্ষ্মণ, সীতার পায়ের দিকে মাত্র তাকাইতেন। তিনি কি আর কিছুই দেখিতেন না? তাহা নহে। তিনি সমস্তেরই পায়ের দিকে তাকাইতেন। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা সকলেরই নিকটে অবনত হইবে। এই প্রকার হইতে পারিলেই কৃতকার্য্য হওয়া যায়। ইহা হইলে আকাশে অল্প সাদা মেঘ থাকিলে যেমন বিদ্যুৎ দেখা যায়, সেইরূপ দেখা যায়। তখন ধনুকধারী রামচন্দ্র সঙ্গে থাকেন।

গোস্বামীপ্রভুর সমাধি অবস্থার উক্তি।

১। নূতন নূতন ঘট স্থাপন হ'ল, জীবের আর ভয় নাই। মৃদু মন্দ বাতাসে পতাকা দুল্‌ছে। স্ত্রী-পুরুষ সকলের পদধূলি গ্রহণ কর।

২। উজ্জ্বল নিশান উড়িয়াছে, ডঙ্কা পড়িয়াছে। শিশুদের কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিও না, তা'হলে পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িতে পারে।

যাহারা প্রথমে আসিয়াছে, তাহারা পাছে যাইবে। যাহারা পাছে আসিয়াছে, তাহারা প্রথমে যাইবে।

৩। মঙ্গলচণ্ডীর পূজা হউক, আনন্দময়ীর ঘটস্থাপন কর। ঘরে ঘরে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা কর। দেহে ঘট স্থাপন কর। পূজা কর, মর্য্যাদা কর, সেবা কর। মর্য্যাদা না করিলে মা চলিয়া যান। পূজা না করিলে থাকেন না।

৪। স্ত্রীলোক সকল মায়ের মত দেখ্‌তে হবে। মা জননী, সেই বিশ্বজননী মা, গর্ত্তধারিণীর সমান। স্ত্রীলোকের মধ্যে মাকে দেখে প্রণাম কর। মা আনন্দময়ী যদি সমস্ত নরনারীর মধ্যে দেখ, কি একটী নারীকে যদি সেই ভাবে ভালবাসিতে পার, সে দেবী! দেবী! দেবী! তাঁহাকে প্রণাম করিলে পাপ দূর হয়। এরূপ যদি পার, এক দিনে সিদ্ধি লাভ করিতে পার: চণ্ডীদাস যেমন রজকিনীর দ্বারা ক'রেছিল। লোকে দোষ দেয়, ও কিছু নয়, মিথ্যা কথা। নারীর প্রতি যে কুদৃষ্টি করে, তার মরণ জান'।

৫। বৃথা কথা কহিও না। বাক্য সংযত কর। সত্য কথা বলা এক, আর সত্যবাদী হওয়া আর এক। সত্যবাদী যাহা বলিবে, তাহাই ঠিক হইবে। যখন প্রেম না হইবে, তখন মনে ভাবিও যে কাহাকেও তুমি অহঙ্কার, অপমান, অভক্তি, অবজ্ঞা করিয়াছ। তিনি দর্পহারী, তিনি ভক্তের অভক্তের দর্প চূর্ণ করেন।

৬। গুরুকৃপাই পরম সাধন। অন্য সাধন মাত্র। গুরুশিষ্যে ভেদ নাই। যেখানে তুমি আমি, সেখানে গুরুতত্ত্ব নাই। অনেক জন্মের পুণ্য তপস্যায়, সুকৃতিতে গুরুতত্ত্ব বোধ হয়। গুরুতত্ত্ব বোধ হইলে পরাতত্ত্ব পাওয়া যায়।

৭৭। ভক্তি ভালবাসা নয়, ভক্তি ভজন। ভালবাসা আসক্তি। পুত্রকে স্নেহ করি, বন্ধুকে ভালবাসি, এ সকল মায়ার। পুত্রকে পূজা করি, কন্যাকে পূজা করি, স্ত্রীকে ভক্তি করি পূজা করি। পূজা কি? ভগবানের চরণপদ্ম যে ভাবে পূজা, পুত্রকে বন্ধুকে সেই ভাবে পূজা করি—এই ভক্তি। এই সব মায়ার নয়। ভক্তি মায়া নয়।

প্রশ্ন—ঈশ্বরের আদেশ কি প্রকারে বুঝিতে পারা যায়?

উত্তর—বাল্যকালে একজনের সঙ্গে বন্ধুতা ছিল। ঘটনাক্রমে বিশ বৎসর তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। একদিন হঠাৎ সেই বন্ধু নাম ধরিয়া ডাকিল। তাহার স্বর কিরূপে জানিতে পারি? ইহা যেমন কখনও প্রকাশ করিতে পারা যায় না, তদ্রূপ ঈশ্বরের আদেশ কিরূপে জানা যায় তাহা কেহ বুঝাইতে পারে না।

ঈশ্বরের আদেশ বিবেক নহে, মনের ভাবও নহে। তাহা আত্মাতে শ্রবণ করা যায়।

প্রশ্ন—কি কি কারণে অভিমান জন্মে?

উত্তর—অভিমান অনেক টাকা থাকিলে হয়, অনেক বিদ্যাতে অভিমান হয়। অনেক ধর্ম্মেতে তপস্যায় অভিমান হয়, এই অভিমান সহজে নষ্ট করা যায়। কিন্তু আর এক প্রকার অভিমান ঠিক ইহার বিপরীত। নির্ধন দরিদ্র মনে করে যে, ধনী আমাকে ঘৃণা করে। অতএব আমিও উহাকে ঘৃণা করিব, নতুবা আমার নীচতা প্রকাশ পাইবে। মূর্খ বিদ্বানের প্রতি অভিমান করে, পাপী সংসারাসক্ত মনুষ্যের প্রতি, ধার্ম্মিক উদাসীন সন্ন্যাসীর প্রতি অভিমান প্রকাশ করে। রাজা জনকের নিকটে অনেক ঋষি ঐ প্রকার অভিমান প্রকাশ করিতেন।

প্রশ্ন—অভিমান কিসে নষ্ট হয়?

উত্তর—অভিমান নষ্ট করা বড় সহজ নয়। মুক্ত না হওয়া

পর্য্যন্ত অভিমান থাকে। যত দিন পর্য্যন্ত নিজকে কাঙ্গাল করিতে না পারিবে, তত দিন কিছুই হইল না। মুটে মজুর, ভাল মন্দ সকলকেই ভক্তি করিতে হইবে। সকলের নিকটেই নিজকে ছোট করিতে হইবে। এই অভিমানের ভাব একটু মাত্র আসাতে ও বড় বড় যোগীর পতন হইতে দেখিয়াছি। অভিমান ভয়ানক শত্রু।

প্রশ্ন—রিপু পরাজয়ের কি কোন উপায় আছে? কোন রিপুকে হঠাৎ এত প্রবল হইতে দেখা যায় কেন?

উত্তর—যখন যে রিপু একেবারে নষ্ট হইবে, তাহার কিছু পূর্ব্বে ঐ রিপু অত্যন্ত প্রবল হয়, অনেকেরই তখন সাধনবিষয়ে অবিশ্বাস আসিয়া পড়ে এবং নাস্তিকতার উদয় হয়। ঐ সময় বড় ভয়ানক, সাধক ঐ সময় সর্ব্বদা উন্মত্তের ন্যায় থাকে। যদি ঐ সময় গুরুদত্ত নাম ত্যাগ না করে, তবে নিরাপদে উত্তীর্ণ হইয়া উৎকৃষ্ট অবস্থা লাভ করিতে পারে, নতুবা ভয়ানক দুরবস্থায় পতিত হয়। সকল রিপুকেই নির্ব্বাণ পাইবার পূর্ব্বে অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। নাম স্মরণ করিলে কোন ভয়ই থাকে না।

সাধুসঙ্গ।

সাধুর সঙ্গে আলাপ করাই সাধুসঙ্গ নয়। নিকটে বসিয়া তাঁহাদের কার্য্যকলাপ দেখিতে হয়। তাঁহা হইলে নিজের ভিতরে যে ত্রুটি আছে তাহা ধরা পড়ে।

গুরুবাক্যে নিষ্ঠার অসীম ক্ষমতা।

গুরুদেব যাহার পক্ষে যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। নিয়মের একটী ছাড়িলেই সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটী ছাড়িতে হয়। শত শত বাধাবিঘ্নের মধ্যেও আপনার কর্ত্তব্য রক্ষা করিতে

হইবে। এ বিষয়ে বজ্রের মত কঠিন ও পুষ্পের মত কোমল হইতে হয়। পাহাড় পর্য্যন্ত সম্মুখে পড়িলেও টলিবে না। আর ঐ বিষয়ে প্রবেশ করিতে পুষ্পের মত হইবে। অতি ধীর ও শান্তভাবে কার্য্য করিয়া যাইবে। নিজের কর্ত্তব্য রক্ষার জন্য দৃঢ়তা থাকিলে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবও কিছু করিতে পারিবেন না। আর স্বয়ং ভগবান্‌ও আসিয়া যদি নানা প্রকার উচ্চ অবস্থা দিয়া, তোমাকে তোমার ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে বলেন, তাহাও করিবে না। তিনি যদি শক্তি প্রকাশ করিয়া তোমাকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা করেন, তাহা পারিবেন না। সমস্ত দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচাদির নিকটও পরাস্ত হইবে না। নিশ্চয় জানিবে যে, উপরোধ অনুরোধ ছাড়াইতে হইবে; তাহা দেখিয়া চলিতে গেলে আর ধর্ম্মকর্ম্ম হয় না।

প্রত্যেক কার্য্যেরই একটী সময় আছে।

প্রত্যেক কার্য্যেরই একটী সময় আছে। অসময়ে কিছুই হইবার যো নাই। বৃক্ষে ফল হয় দেখিয়া যদি কেহ চারা বৃক্ষ দেখিয়া মনে করে যে, এই বৃক্ষের মধ্যেই ফল আছে, সুতরাং বৃক্ষ চিরিয়া ফল বাহির করি, তাহা হইলে উহা বৃথা হইবে। বৃক্ষ চিরিলেও ফল পাইবে না, বরং বৃক্ষই শুষ্ক হইয়া যাইবে; ঠিক যখন সময় হইবে, তখন বিনা চেষ্টাতেই ঐ কাষ্ঠের ভিতর হইতে ফল বাহির হইবে। ধর্ম্মের সম্বন্ধেও সেইরূপ। অসময়ে কিছুই হইবার যো নাই, চেষ্টা করিলেই নষ্ট হইবে। সময় হইলে যেরূপেই হউক, কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে। যে অসময়ে কাহাকেও বুঝাইতে যায়, সে নিশ্চয়ই বুঝে নাই।

প্রশ্ন—ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া বিশ্বাস হারাইয়াছি, মন নানাপ্রকার

সন্দেহে পূর্ণ হইয়াছে, সত্যপথের অনেক ব্যভিচার করিয়াছি, তবে সেখানে যাওয়া কি বৃথা হইয়াছে ?

উত্তর—ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া অনেক উপকার হইয়াছে, নীতি চরিত্রাদি ব্রাহ্মসমাজে যাওয়াতেই রক্ষা পাইয়াছে। প্রথম অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান চাই। ধর্ম্মশাস্ত্র বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, প্রথম অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান চাই-ই ; ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে ঠিক তত্ত্ব জানিবার অধিকার জন্মে না, এজন্য ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত। ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপী, সত্য, পবিত্র, নির্ব্বিকার, নিরাকার, মঙ্গলময় ভাব ধ্যান করিতে করিতে, ক্রমে যখন উহার ভিতর দিয়া রূপের ছটা বাহির হয়, তখনই সব বুঝিতে পারা যায়।

প্রশ্ন—সাধনাদির পর ব্রহ্মজ্ঞান হয় কি না ?

উত্তর—হইবে না কেন ? কিন্তু বড় কঠিন। প্রথমে যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তাঁহাদের তত্ত্ব সকল ধরিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু যাঁহাদের পরে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তাঁহাদের অনেক কষ্ট করিতে হয়। তাঁহারা সহজে তত্ত্ব ধরিতে পারেন না ; তোমরা প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবে, তাহাতেই সমস্ত সহজ হইবে।

প্রশ্ন—সুখ কিসে হয় ?

উত্তর—'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি'। ভূমা অর্থাৎ যাহার জন্ম মৃত্যু নাই তাহাতেই সুখ, অন্তবিশিষ্ট বস্তুতে সুখ নাই। যার অন্ত আছে এক দিন তাহা থাকিবে না ; সুতরাং তাহাতে আসক্ত হইলে নিশ্চয়ই দুঃখ পাইতে হইবে।

প্রশ্ন—শ্রীরামচন্দ্র বালিকে বধ করিয়াছিলেন, সীতাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহাতে অনেকে, অনেক কথা বলে কেন ?

উত্তর—যাহারা শাস্ত্র জানে না, বুঝে না, তাহারা ঐরূপ কথা বলে। তাহাদিগের কথায় কর্ণপাত করা উচিত নয়। যাহারা শাস্ত্র

বিশ্বাস করে না, তাহারা নানা প্রকার কুআলোচনা ও কুতর্ক করে। শাস্ত্রে যাহা আছে সমস্তই বিশ্বাস করিতে হইবে, আধা আধি বিশ্বাস করিলে চলিবে না। শাস্ত্রকর্ত্তারা কিছুই পরিত্যাগ করেন নাই, সমস্ত বিষয়েরই মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা শাস্ত্রচর্চ্চা করেন, শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বুঝেন। যাঁহারা শাস্ত্রের ঐরূপ কুতর্ক উত্থাপন করেন, তাঁহারা যেন ইংরাজী কুকুর ও বাঘের গল্প পড়েন।

প্রশ্ন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতিকে সন্তুষ্ট না করিলে কি মুক্ত হওয়া যায় না?

উত্তর—সকলকেই সম্মান করিবে। কাহাকেও অসন্তুষ্ট করিবে না। কিন্তু তাঁহাদের পূজা না হইলেও চলে। তাঁহাদের পূজার দ্বারা কেবল তাঁহাদেরই লোক লাভ হয় মাত্র, কিন্তু মুক্তিলাভ হয় না।

প্রশ্ন—পূজা করিয়া সন্তুষ্ট না করিলে বিরোধ হইবে না ত?

উত্তর—পরব্রহ্ম পূজার দ্বারাই সব হয়। যেমন গাছের গোড়ায় জল দিলে সমস্ত ডাল ও পত্রে যায়, সেইরূপ এক পরব্রহ্মকে পূজা করিলেই সকলে পায়।

বংশ-মর্য্যাদা।

প্রথমে বটতলায় যে চৈতন্যভাগবত ছাপান হইত, তাহাতে আছে যে, একদিন মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভুকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন, তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে। তিনি বলিলেন—তুমি দেশে দেশে এইরূপ ঘুরিবে, আর আমি বিবাহ করিয়া ঘরকন্না করিব? মহাপ্রভু বলিলেন, ইহার কারণ আছে। তুমি যতই প্রেমভক্তি বিলাও না কেন, আমাদের অন্তর্ধানের পর ইহার আর মাহাত্ম্য থাকিবে না। যদি আমাদের বংশধর থাকে, তবে তাহারা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্ম বলিয়া ইহার বিশেষ আদর করিবে; তাহা হইলেই সব ঠিক থাকিবে। আমি

সন্ন্যাস লইয়াছি, গৃহী হইতে পারিব না। তোমাকে ও অদ্বৈতপ্রভুকে সন্তান জন্মাইতে হইবে। এজন্য নিত্যানন্দ প্রভু বিবাহ করেন। ইহা আজকালকার চৈতন্যভাগবতে নাই। সংক্ষেপ করিবার জন্য অনেক বৃত্তান্ত বাদ দিয়া বর্ত্তমান বহি ছাপান হয়। নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাস নিয়াছিলেন না। তিনি সন্ন্যাসীর বেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

প্রশ্ন—মৃত্যুর সময় কাহাদের অত্যন্ত কষ্ট ও ভয় হয়?

উত্তর—যে সকল মানুষ সংসারে নিতান্ত আসক্ত, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার ঘর, আমার বাড়ী, এই ভাবে নিতান্ত মত্ত, তাহাদের মৃত্যুর সময় অত্যন্ত কষ্ট হয়, প্রাণ বহির্গত হইবার পূর্ব্বে ছট্‌ফট্ করে, অবশেষে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। কিন্তু যাহাদের ততটা আসক্তি নাই, তাহাদের মৃত্যুর পূর্ব্বে পরলোক দর্শন হয়। মৃত্যুকালে ভয় হইলে পিতৃলোক মধ্যে যাঁহারা সিদ্ধ পুরুষ, তখন তাঁহারা আসিয়া সান্ত্বনা দেন। যেখানে যে পরিমাণে বিলাসিতা ও ঐশ্বর্য্য, সেখানে সেই পরিমাণে মৃত্যুভয়। বৈরাগ্য না হইলে মৃত্যুভয় দূর হয় না।

ভক্তি সাধ্য-সাধনায় হয় না।

ভক্তি সাধ্য-সাধনায় হয় না। যাহার হয়, সে ধন্য। ভক্তির বিচার নাই। পিতা পুত্রকে, ধূলা মাথাই থাকুক, অথবা পরিষ্কারই থাকুক, অমনি কোলে তুলিয়া নেন। সন্তান হইবার পূর্ব্বে অপত্য-স্নেহ কেমন, তাহা যেমন কেহ বুঝে না, সেইরূপ ভক্তবৎসল সেই পরমেশ্বরকে না পাইলে, তাঁহার প্রসন্নমুখ না দেখিলে, ভক্তি কি, তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। ভক্তি অহৈতুকী, তাহাতে ভালমন্দ বিচার করে না। ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য তিন ভাই ভগ্নী বৃদ্ধ ছিলেন। ভক্তি বৃন্দাবনে গিয়া যুবতী হইলেন, জ্ঞান ও বৈরাগ্য বুড়াই রহিলেন।

অবতার-তত্ত্ব।

গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন:—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥ ইত্যাদি।

ইহার অর্থ এমন নয় যে, একযুগে একবার মাত্রই অবতীর্ণ হইবেন, কিন্তু যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই তিনি তাহা দূর করিবার জন্য অবতীর্ণ হন। কোথাও মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, কোথাও শক্তিরূপে, কোথাও বা ভাবরূপে আবির্ভূত হন। ইহার মধ্যে আবার যাহাদের জন্য অবতীর্ণ হন, তাহাদের মধ্যেই তাঁহার কার্য্য হয়। যিশুখৃষ্ট পাশ্চাত্য-জাতিদিগের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার যত কার্য্য তাহাদেরই জন্য। ভারতবর্ষে তাঁহার কার্য্য হইবে না। ঐরূপ রজোগুণবিশিষ্ট লোকদিগের সেবা ভিন্ন আর উপায় নাই, তাই তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য সেবাধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন।

প্রশ্ন—অঘোরপন্থী, বাউল প্রভৃতিরা নরমাংস, বিষ্ঠামূত্রাদি আহার করে কেন? উহা কি তাহাদিগের সাধনের অঙ্গ?

উত্তর—বৈষ্ণব বাউল ও অঘোরপন্থীরা বিষ্ঠা, মূত্র, মরা মানুষের মাংস ভক্ষণ করে,ইহা সাধনের অবস্থার কথা। ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন:—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, জানি জাতানি জীবন্তি, যস্মিন্ প্রত্যভিসংবিসন্তি তদেব ব্রহ্ম, ত্বং বিদ্ধি,নেদং যদিদমুপাসতে।" ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হইতেছে, ব্রহ্মতেই জীবিত আছে, শেষে ব্রহ্মতেই লয় হইবে। মাকড়সা যেমন আপনার ভিতর হইতে সূতা বাহির করিয়া জাল তৈয়ার করে, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে এই প্রপঞ্চের সৃষ্টি। যখন ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই, তখন বিষ্ঠা মূত্র খাইতে দোষ কি? এইরূপ ভাব

হইয়াছে কি না, সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম উপলব্ধি হইয়াছে কি না, ইহা পরীক্ষার জন্য তাঁহারা ঐরূপ করেন। উহা একটা প্রণালী মাত্র। সকলকেই যে ঐরূপ করিতে হইবে তাহা নহে।

সাধকদের পক্ষে স্ত্রীলোক হইতে সাবধানতা সম্বন্ধে মহাপ্রভুর উপদেশ।

মহাপ্রভু স্ত্রীলোক হইতে সাবধান থাকিতে কত প্রকার উপদেশ দিয়াছেন। ছোট হরিদাস কেবল মাত্র একটী স্ত্রীলোকের নিকট হইতে চাউল ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিলেন, এই অপরাধের জন্য তাঁহাকে লোক-শিক্ষার জন্য বর্জ্জন করিলেন। হরিদাস, মহাপ্রভুর বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া, প্রয়াগে ত্রিবেণীতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

(পুরীধামে) একদিন একটী স্ত্রীলোক বেগুণ তুলিবার সময় গীত-গোবিন্দ গান করিতেছিলেন। গান শুনিতে শুনিতে মহাপ্রভু ভাবাবেশে তাহার দিকে ধাবিত হইলে, গোবিন্দ নামক মহাপ্রভুর একজন সেবক তাঁহাকে বাধা প্রদান করিলেন। চৈতন্য প্রাপ্ত হইলে মহাপ্রভু বলিলেন, "গোবিন্দ, তুমি আমাকে রক্ষা করিলে, নতুবা স্ত্রীলোকস্পর্শ হইলে আমাকে সমুদ্রে প্রবেশ করিতে হইত।"

একটী বিধবার ছেলে মহাপ্রভুর নিকটে সর্ব্বদা আসিত, তিনিও তাহাকে আদর করিতেন। দামোদর নামক মহাপ্রভুর জনৈক ভক্ত একদিন বলিলেন, "গোঁসাই এইবার বুঝিব, শত হইলেও তুমি সুন্দর যুবক, আর ইহার মাতা সুন্দরী যুবতী। ইহার মধ্যেই কত লোক কত কাণাকাণি করিতেছে। তুমি লোকদিগকে এইরূপ সন্দেহ করিবার অবসর দাও কেন?" মহাপ্রভু বলিলেন, "দামোদর, তুমি আমার পরম বন্ধুর কাজ করিলে।" এবং সেই অবধি এই বালককে মহাপ্রভু আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবী রাখা ও ভেক্ গ্রহণ প্রথা শাস্ত্রসম্মত নহে।

কামিনীকাঞ্চন হইতে সাবধান না থাকিলে আর রক্ষা নাই। এখনকার গোড়ীয় বৈষ্ণবেরা তন্ত্রের শৈববিবাহ ও বামাচার অনুকরণ করিয়া বৈষ্ণবী রাখেন, কিন্তু ইহা বিশুদ্ধ অবস্থা নহে।

মহাপ্রভু, রঘুনাথ দাসকে মর্কট বৈরাগ্য ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন; বাহিরে কর্ত্তা হইয়া ভিতরে অকর্ত্তা হইতে বলিয়াছিলেন। মর্কট বৈরাগ্য—যেমন আজ কৌপীন পরিলাম, সংসার ছাড়িলাম, কাপড়-ত্যাগ করিলাম, কিছুদিন পরে আবার ধরিলাম। এখনকার বাবাজিরা প্রকৃত বৈরাগ্য হইয়াছে কি না, তাহা বিচার না করিয়া, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, যে কেহ ভেকগ্রহণেচ্ছু হউক, তাহাকেই ভেক দেন। ইহারা ভেক গ্রহণের পর ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারে না, নানারূপ কুৎসিত আচরণ করে। বৈষ্ণবস্মৃতি হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে, কি অন্য কোথাও, কাহারও নিকট ভেকগ্রহণের কথা উল্লেখ নাই। যাহার যখন বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, সে নিজ অনুরাগে তখন ভেক গ্রহণ করিবে। প্রকৃত বৈরাগ্য হইলে সে তখনই চলিয়া যাইবে, কোন দিকে চাহিবে না। যতদিন এইরূপ অবস্থা না হয়, ততদিন মান-মর্য্যাদা, নিন্দা-প্রশংসা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি থাকে। এই অবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত ঘরে থেকে ধর্ম্মানুশীলন ও কর্ম্ম করা উচিত।

জনৈক ভুটীয়া কর্ত্তৃক জীবতত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরঃ—

এই শরীর আমি নহি। এই শরীরের মধ্যে একজন আছে, যে কথা বলে, শুনে—ইত্যাদি। যদি শরীরই সব হইত, তবে মৃত মানুষের শরীর

কেন দেখে না, শুনে না, কথা বলে না? অতএব দেহের মধ্যে দেহ ব্যতীত একজন আছেন, তিনি আত্মা।

দেহ তিন প্রকার, স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ ও কারণদেহ। স্থূলদেহ চক্ষে দেখা যায়, কারণদেহ দেখা যায় না। গুটিপোকা যেমন কোষ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আবদ্ধ হয়, আত্মাও সেইরূপ পঞ্চকোষ মধ্যে আবদ্ধ থাকে। পঞ্চকোষ যথাঃ—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ। আত্মা যখন বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থান করে, তখন তাহার নিকট আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি? কোথায় যাইব?—ইত্যাদি প্রশ্ন আসে। তাহার পর আনন্দময় কোষ, এ পর্য্যন্ত আত্মা বদ্ধাবস্থায় থাকে। আত্মা পঞ্চকোষে যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ জীবাত্মা নামে খ্যাত। এই অবস্থায় কখনও সুখ, কখনও দুঃখ। পঞ্চকোষ ভেদ হইলে, তখন উহাকে আত্মা বলে। ইহার পরও আত্মার বাসনা থাকে, সেই বাসনা পূর্ণ করিতে আত্মা দেহ ধারণ করে। কেহ স্থূলদেহ ধারণ করিয়া, কেহ বা আতিবাহিক দেহ ধারণ করিয়া বাসনা পূর্ণ করেন। ইঁহারা জননীজঠরে প্রবেশ করেন না, ইচ্ছামাত্র কোন একটী দেহ ধারণ করেন। বাসনা অন্তে আত্মা মুক্ত হয়। মুক্তির পরে আর কোন ক্লেশ থাকে না। সত্যলোক, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠলোক প্রভৃতি স্থানে তখন মুক্তাত্মা বিহার করেন।

ভগবান্ জীবের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহাকে অবতার বলা হয়, যেমন আপনাদের বুদ্ধদেব। যিনি ভগবান্ তাঁহাকে মানুষ দেখিলে ভয় পায়, তাই মানুষের মত হ'য়ে জন্মগ্রহণ করেন, আচরণ করেন, লোকশিক্ষার জন্য নিজে সমস্ত করেন। ভগবান্ ও জীবে কিরূপ সম্বন্ধ? যেমন সূর্য্য ও তাহার কিরণ। সূর্য্য ও তাহার কিরণ একও নয়, পৃথকও নয়; সমুদ্রতরঙ্গ ও বুদ্বুদ্; একও নয়, পৃথকও নয়। আপনাদের

শাস্ত্রে যাহা আছে, আমাদের শাস্ত্রেও তাহাই আছে। শাস্ত্রে কোন বিরোধ নাই। কেবল বুঝিবার ভুল।

প্রশ্ন—শ্রীচৈতন্যভাগবতে আছে যে, মহাপ্রভু আরও দুই বার শচীমাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করিবেন, ইহার তাৎপর্য্য কি?

উত্তর—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আর দুই কলিযুগে শচীমাতার গর্ব্ভে জন্মিবেন। এই কলিযুগে যেমন একবার জন্মিলেন, এইরূপ আর দুই বার জন্মিবেন। এই কলিযুগে আর দুইবার জন্মিবেন এ অর্থ নহে; কোন ব্যক্তিতে আবেশ হওয়া, কি কোথাও প্রকাশ হওয়া, সে ভিন্ন কথা। দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণলীলা ও তাহার পর কলির প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা আরও দুইবার হইবে। আমরা ভাবি কতকাল বাকী, কিন্তু ইহা ভগবানের পক্ষে এক মুহূর্ত্তও নহে। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভজনা করেন, তাঁহারা গঙ্গাতীরে, শ্রীধাম নবদ্বীপে, শান্তিপুরের সান্নিধ্যে, শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ঘরে এবং শচীমাতার গর্ব্ভে যিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাকে বুঝিবেন। এখন যদি শ্রীগৌরাঙ্গ চট্টগ্রামে কি অন্য কোথাও আবির্ভূত হন, তবে উঁহারা তাহাকে বুঝিবেন না। আর ঐরূপ ভাবে অবতীর্ণ হইলে, পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বের আর কোন মাহাত্ম্য থাকে না এবং এই তত্ত্বটীও নষ্ট হইয়া যায়।

ভগবান্ কোন যুগে একই কার্য্য লইয়া, একইরূপে, দুইবার অবতীর্ণ হন নাই। ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্র ও দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একবার মাত্রই অবতীর্ণ হইয়াছেন; সেইরূপ মহাপ্রভুও কলিতে একবার মাত্রই অবতীর্ণ হইয়াছেন, এ কলিতে আর জন্ম লইবেন না। তিনি কি মরিয়াছেন যে আবার জন্ম লইবেন? "অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর-রায়। কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥" শ্রীগৌরাঙ্গদেব কলি-যুগের ভার লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যাবৎ কলিযুগ থাকিবে, তাবৎ

তিনি জীব উদ্ধার করিবেন। তাঁহার লীলা ত শেষ নাই। সেবার মাত্র উঁকি মারিয়া অন্তর্ধান করিয়াছিলেন। দেখ না, এখন কেমন খৃষ্টান-দের মধ্যেও খোল বাজিতেছে। এমন সময় আসিবে যখন সমস্তই মৃদঙ্গময় হইয়া যাইবে।

প্রশ্ন—জীবের প্রথমে কোন কর্ম্ম থাকে না, তবে কি প্রকারে কর্ম্মপাশে বদ্ধ হয়?

উত্তর—মায়া দুই প্রকার—বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়া। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই ত্রিগুণ অবিদ্যামায়া হইতে উৎপন্ন। জীব এই ত্রিগুণে আবদ্ধ হয়। কর্ম্ম বাস্তবিক কিছু নয়, উহা যেমন নাটক প্রভৃতিতে সাজিয়া অভিনয় করে, তদ্রূপ। শাস্ত্রকর্ত্তারা 'বালকক্রীড়াবৎ' 'উন্মাদ নৃত্যবৎ' এইরূপ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। বালক ক্রীড়া করিতে করিতে ঘর বাঁধিতেছে আবার ভাঙ্গিতেছে, ইহাতে তাহার কোন বিশেষ ইচ্ছা নাই। উন্মাদ বলিয়া যাইতেছে, আর একটু নৃত্য করিতেছে, ইহাতে তাহার বিশেষ কোন ইচ্ছা নাই। যাহারা জগতে ঈশ্বরের মহিমা দেখিয়া তাঁহাকে উপলব্ধি করেন, তাঁহারা ইহাকে কর্ম্ম বলেন। ভগবৎভক্তেরা ইহাকে ভগবানের ইচ্ছা বলেন। ভগবানের ইচ্ছাই সমস্ত, কর্ম্ম কিছুই নয়। নাটকের অভিনয় করিয়া, সাজ পোষাক ছাড়িয়া যেমন আবার যাহা তাহাই। যেমন জল ও বুদ্‌বুদ্ একই বস্তু, তবে বুদ্‌বুদের মধ্যে একটু বায়ু আছে, তাহাতে পৃথক্ দেখা যায়, সেইরূপ ত্রিগুণাধীন বলিয়া জীব কর্ম্মবদ্ধ এইরূপ মনে হয়। গুটিপোকা কোষে আবদ্ধ হইয়া যেমন উহা কাটিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করে, তদ্রূপ ত্রিগুণাধীন জীব যখন মায়ার আবরণ ভেদ করিতে চায়, তখনই তাহার কর্ম্ম। কেহ ঈশ্বরের সহিত একত্ব উপলব্ধি করিতে চায়, কেহ তাঁহার সঙ্গে লীলা করিতে চায়। এই দুই প্রকার প্রারব্ধকে ভক্তেরা কর্ম্ম বলেন না, ভগবানের ইচ্ছা বলেন।

যাঁহারা কর্ম্ম বলেন, তাঁহারা বলেন, এই কর্ম্ম কাটিয়া গেল। নতুবা কর্ম্মপ্রবাহ নিবারণের কারণ আর কি বলা যাইতে পারে?

প্রশ্ন—গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অষ্টকালীন লীলা স্মরণ মনন দ্বারা অন্তরে লীলা দর্শন হয় কি না?

উত্তর—সদ্‌গুরুশক্তি ভিন্ন লীলাদর্শন কিছুতেই হয় না। বর্ত্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় এই শক্তি বিহীন হইয়া শুধু লীলা স্মরণ করাতে, অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত জ্ঞানের দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করাতে, তাহাদের স্ত্রীলোকঘটিত দুর্গতি ঘটিয়াছে।

ঈশ্বর-দর্শনের চিহ্ন।

ঈশ্বরের স্বরূপ গুলি আত্মাতে উপলব্ধি করিতে হইবে, তাহাতেই ঈশ্বরদর্শন হইবে। বিশেষতঃ যেমন সূর্য্য উদয় হইলে রৌদ্র হয়, তদ্রূপ আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বর হৃদয়াকাশে উদিত হইলে, আনন্দ-কিরণ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তখন শরীর রোমাঞ্চিত হয় এবং নেত্রনীরে গণ্ডদ্বয় প্লাবিত হইতে থাকে। এই আনন্দই ঈশ্বরদর্শনের চিহ্ন।

প্রকৃত ব্রহ্মচক্র কি?

নদীর জল যেমন একবার সাগরে যাইতেছে, আবার তথা হইতে মেঘরূপে আসিয়া পৃথিবীকে শীতল করিতেছে, আমরাও সেইরূপ এই স্রোতোবেগে একবার পরমেশ্বরেতে ডুবিব, আবার পৃথিবীর নরনারীকে হৃদয়ে ঢালিয়া দিব। আমরা কেবল সাগরে যাইব না, সাগরে যাইব, আবার মেঘ হইয়া পৃথিবীতে বৃষ্টিরূপে পড়িব। প্রকৃত ব্রহ্মচক্র যোগচক্র এইরূপে ঘুরিতেছে।

যথার্থ সাধুর আশ্রয় গ্রহণ আবশ্যক।

যাঁহারা যথার্থ সাধু মহাজন, তাঁহাদের আশ্রয় লইতে হইবে। লোকের মুখে শুনিয়া কাহাকেও ধার্ম্মিক, কি সাধু নির্ণয়করতঃ তাহার আশ্রয় গ্রহণ

করিলে উপকার হয় না। এজন্য পূর্ব্বপুরুষদের পথে চলিতে চলিতে প্রকৃত সাধুর সহিত দেখা হইলে, সকল দিক্ নিরাপদ হয়।

ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির লক্ষণ কি ?

১। যে ব্যক্তি অক্ষক্রীড়া, পরস্বাপহরণ, ও নীচজাতি যাজন পরিত্যাগ করেন এবং ক্রোধবশতঃ কাহাকেও প্রহার করেন না, তাঁহার হস্তদ্বার রক্ষিত হয়।

২। যে ব্যক্তি সত্যব্রত, মিতভাষী ও অপ্রমত্ত হইয়া ক্রোধ, মিথ্যা-বাক্য, কুটিলতা ও লোকনিন্দা পরিত্যাগ করেন, তাঁহার বাক্‌দ্বার সুরক্ষিত হয়।

৩। যে ব্যক্তি অতিভোজন ও লোভ পরিত্যাগ করিয়া দেহরক্ষার জন্য যৎকিঞ্চিৎ আহার ও প্রতিনিয়ত সাধুগণের সহিত বাস করেন, তিনি জিহ্বাদ্বার রক্ষা করিতে পারেন।

৪। যে ব্যক্তি একপত্নী সত্ত্বে সম্ভোগের জন্য অন্য স্ত্রীর পাণিগ্রহণ ও অন্যস্ত্রী গমন না করেন, এবং ঋতুকাল ব্যতীত স্বীয় স্ত্রী গমন না করেন, তিনি উপস্থদ্বার রক্ষা করিতে পারেন।

৫। যে মহাত্মা ঐরূপ চারিদ্বার রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহাকে ব্রহ্মবিৎ বলিয়া গণ্য করা যায়। যাঁহার ঐ চারিদ্বার রক্ষা না হয়, তাঁহার সমস্ত কার্য্য বিফল হয়।

প্রশ্ন—গুরু ব্রহ্ম ইহার অর্থ কি ?

উত্তর—শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম করিতে করিতে এক অবস্থা আসে, যাহাতে গুরুর মধ্যে নামের চৈতন্যরূপ দর্শন হয়। তখনই গুরু ও ব্রহ্ম এক হইয়া যায়। যাঁহাদের ঐরূপ দর্শন হয় ও অবস্থা লাভ হয়, তাঁহাদের নিকটে নিশ্চয়ই গুরু ব্রহ্ম। তাহা না হইলে ব্রহ্ম কল্পনা মাত্র। কল্পনা করিলে বরং ক্ষতি হয়।

প্রশ্ন—বৈষ্ণবদিগের মধ্যে দুইজন গুরু কেন?

উত্তর—মহাপ্রভু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, শিক্ষা পেলেন রামানন্দের কাছে। লোকশিক্ষার জন্য এ সমস্ত করিয়াছেন। ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে আর দেখা হয় নাই। জাতি-গৌরব নষ্ট করিবার জন্য শূদ্রজাতির নিকটে শিক্ষা লইলেন। মহাপ্রভুর নিকটে কোন ব্রাহ্মণ শিখিতে গেলে রায় রামানন্দের নিকটে পাঠাইতেন। সেই হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের মধ্যে দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু-ভেদে দুই জন গুরুকরণের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে দুইজন গুরুর কোন প্রয়োজন নাই, তাহাতে অনেক সময় বরং নিম্নাধিকারী সাধকের পক্ষে গুরুনিষ্ঠার ব্যাঘাত ঘটে।

বিনয় ধর্ম্মের ভূষণ।

প্রকৃত ধার্ম্মিক কি না তাহা স্বভাব দ্বারাই বিচার করা যায়। প্রকৃত ধার্ম্মিকেরা বিনয়ী। রোমের পোপ একবার দেখিলেন, বহুলোক একটী স্ত্রীলোকের নিকটে যাইতেছে। ঐ স্ত্রীলোকটীর উপর না কি খৃষ্টের ভর (আবেশ) হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। পোপ অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। তাঁহার কার্ডিনেল বলিলেন—আমি পরীক্ষা করিয়া আসিতেছি। তিনি ঐ স্ত্রীলোকটীর নিকটে গিয়া বলিলেন—আমার পায়ের জুতা খুলিয়া দাও। স্ত্রীলোকটী তাহা করিলেন না। কার্ডিনেল এই ব্যবহার দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং পোপের নিকটে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিয়া বলিলেন—এ ব্যক্তি ভণ্ড, যদি খৃষ্ট হইতেন, তবে তিনি বিনয়ী হইতেন এবং আমার কথানুযায়ী কাজ করিতেন।

পরসেবাই ধর্ম্ম।

পরসেবাই ধর্ম্ম। এক স্থানে যাহারা থাকিবেন, তাহারা পরস্পরের সাহায্য করিবেন। এক জনের দ্বারা কার্য্য আদায় করিলে অপরাধ

হইবে। সকলেই নিজের কার্য্যের জন্য দায়ী। যত সেবা করিতে পারিবে ততই ধর্ম্ম লাভ হইবে।

অভিমান কি সহজে যায়? ইহাকে কেবল পরসেবা দ্বারাই জয় করিতে হইবে। সংসারে তোমাদের চেয়ে যাহাদিগকে ছোট মনে কর, (প্রকৃত ছোট কেহই নহে) তাহাদিগের সেবা করিতে হইবে। সেবায় বিরক্ত হইলে তাহা সেবা হইবে না।

প্রশ্ন—প্রকৃত সেবা কাহাকে বলে?

উত্তর—যেমন নিজের প্রয়োজন হইলে তাহা পূর্ণ করিতে ইচ্ছা হয়, সেইরূপ অন্যের প্রয়োজন যদি আমার মনে লাগে, তাহাও পূর্ণ করিতে ব্যাকুলতা হয়। মা শিশুর সেবা করেন এই ভাবে। শিশুর অভাবে মাতা অস্থির। ইহারই নাম সেবা। নতুবা ভিতরে অনুরাগ নাই, দেখাদেখি খাইতে দিলাম, কি অন্য প্রকার সাহায্য করিলাম, তাহাকে সেবা বলে না। বৃক্ষ সেবা, পশুপক্ষী সেবা, পিতামাতার সেবা, পত্নী সেবা, সন্তান সেবা, প্রভু সেবা, রাজ সেবা, ভৃত্য সেবা, এ সমস্ত এইভাবে করিলেই সেবা। নতুবা সেবা নাম করা উচিত নহে।

সাধনপন্থার অগ্নিপরীক্ষা।

কোন সাধক প্রশ্ন করিলেন, "আমার প্রাণের ক্লেশ যায় না কেন?"

উত্তর—যেমন বাহিরে গ্রহাদির প্রভাব হয়, ভিতরেও সেইরূপ হয়। যাহারা সংসারে ব্যস্ত থাকে, তাহারা বুঝিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা সাধন ভজন করেন, তাঁহারা বিশেষরূপে অনুভব করেন। পূর্ব্বকালে সাধকগণ ইহাকে ইন্দ্রদেবের অত্যাচার বলিতেন। ইহাদের যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিবে। অনেক সাধককে অতিশয় কষ্ট দিয়াছে। মুসলমান ও খৃষ্টান সাধকগণ ইহাকে সয়তান বলিয়া থাকেন। ইহার হস্ত হইতে কেহই নিস্তার পায় না। প্রথমে কামক্রোধরূপে আসে, তাহাতে না হইলে

বাসনাকল্পনারূপে আসে। তাহাতে না হইলে ধর্ম্মরূপে আসিয়া অহঙ্কার হইয়া সাধকের সর্ব্বনাশ করে। কত যুগযুগান্তরের মধ্যে কেবল মহাদেব, বুদ্ধদেব, হরিদাস ঠাকুর, শুকদেব, এই কয়জন সাধনকালে উহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। নরনারায়ণ ঋষির নিকট বিশেষ অপমানিত হয়। ইহার একমাত্র ঔষধ ধৈর্য্য ধরিয়া পড়িয়া পড়িয়া ভগবানের নাম গ্রহণ করা।

চিররোগীর ঔষধ খাইতে খাইতে ঔষধে শ্রদ্ধা থাকে না। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে, তথাপি ঔষধ খাইতে হয়। কারণ, অন্য উপায় নাই। পূর্ব্বজন্মে যে সকল কর্ম্ম করা হয় তাহার ফল ভোগ করিয়া মুক্তি পাইতে হইলে, অনেক জন্ম ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহা শেষ করিতে হয়। ভগবৎনামের বলে মুক্তি সহজে হয়। কিন্তু এই বিঘ্ন শীঘ্র নামে রুচি আসিতে দেয় না। দুঃখে, কষ্টে, চারিদিকে অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া নাম লইতে হইবে। প্রহ্লাদচরিত্র ইহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। সংসার পাপ, সয়তান হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদ সাধক। তাঁহার আহারের বস্তু বিষ, অগ্নিকুণ্ডে বাস, হস্তিপদে দলন, অস্ত্রাঘাত, সমুদ্রজলে নিক্ষেপ, চারিদিকে বিপদ, সহায় কেবল এক হরিনাম। এত যন্ত্রণায় প্রহ্লাদ ক্ষতবিক্ষত হইলেন। অবশেষে প্রহ্লাদ জয় লাভ করিলেন। শ্রীহরি নরসিংহ হইলেন। প্রহ্লাদ বর চাহিলেন হিরণ্যকশিপুর মঙ্গল হউক। অতএব সাধনপথের এ যন্ত্রণার মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। খৃষ্টান সাধকেরা যাত্রিকের গতি নামে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে এই বিবরণ। মুসলমান ফকিরদিগের এই ঘটনা। এই যন্ত্রণা, অগ্নি পরীক্ষা। ইহাতে যত পোড়া খাইবে, তত বিশুদ্ধি লাভ হইবে। এই যন্ত্রণা নানারূপে সাধকের হৃদয়কে দগ্ধ করে। প্রকৃতি ও সংস্কার অনুসারে যন্ত্রণার ন্যূনাধিক্য ঘটে। শ্রীশ্রীহরিনাম তারকব্রহ্মনামই ইহার ঔষধ। এই যন্ত্রণায় দুইবার আমি আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলাম। অগ্নি জ্বলিত।

কত জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত পাপ; তাহাকে দগ্ধ করিতে অনেক অগ্নির প্রয়োজন। এই যন্ত্রণাই যথার্থ মুক্তির হেতু। উহা যাহার হয় সে কৃত্রিম ধর্ম্মের ভান করিতে পারে না। যাহাতে জ্বালা নিবারণ হয়, তাহা ভিন্ন তাহার তৃপ্তি হয় না। আমার পাপ সত্ত্বেও যদি ধর্ম্মের আনন্দ হয়, তাহা বিড়ম্বনা; যেমন রোগী কুপথ্য খাইয়া সুখী হয়। প্রথমে যন্ত্রণায় শুকাইয়া নীরস হইবে। বিষয়-রস একবিন্দু থাকিতে ব্রহ্মানন্দ আসে না। এই যন্ত্রণার ভিতর অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে। সময়ে সমস্তই প্রকাশ পাইবে। এখনও আমাকে পরীক্ষা করে। সোমবার রাত্রিতে (২৩ শ্রাবণ ১৩০০ সাল) হঠাৎ ঘরের মধ্যে চারিজন পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক আসিয়া আমাকে পরীক্ষা করিতে লাগিল। কিছুতেই যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিল না; তখন এক কলসী সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিল, তাহাতেও কিছু হইল না। তখন বলিল আমাদিগকে শিষ্য কর। আমি বলিলাম, তোমরা কে? তাহারা উত্তর করিল, আমরা পতিতা নারী, উদ্ধার কর। আমি বলিলাম, মাথার চুল মুড়াও, অলঙ্কার ও সুন্দর বস্ত্র ত্যাগ করিয়া ছিন্ন বস্ত্র পর। ইহা শুনিয়া হাসিয়া বলিল, "আমাদের চেন নাই? আমরা মায়ার দাসী, কতদিন আমাদের চরণসেবা করিয়াছ! এখন দিন পাইয়া চিনিতে পারিতেছ না। ভাল, তোমার কল্যাণ হউক, আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর," এই বলিয়া চলিয়া গেল।

হিংসাবৃত্তির ভয়ানক অপকারিতা।

মারিলেই যে হিংসা হয় তাহা নহে। ক্ষত্রিয় সম্মুখসমরে শতশত নরহত্যা করিতেছে, তাহাতে তাহাদের অধর্ম্ম হইতেছে না। হিংসা অন্তরে থাকিলে এবং ক্রোধ পূর্ব্বক অথবা স্বীয় তৃপ্তির জন্য বধ করিলে, হিংসা হয়। অন্তরে হিংসা থাকিলে ভগবানের লীলা দর্শন হয় না।

যদি কিছু সময়ের জন্যও হৃদয় হিংসাশূন্য হয় তখন লীলা দর্শন হইতে পারে।

গীতা ও ভাগবতে সাধনের লক্ষ্য।

ব্রহ্মের দুইটি ভাব—নিত্য এবং লীলা। নিত্য সাধন গীতার দ্বারা হয়; লীলা সাধন ভাগবতের দ্বারা হয়।

অপরের ধর্ম্মমতের মর্য্যাদা করা আবশ্যক।

যিনি যে ভাবে ধর্ম্ম আচরণ করিতেছেন তাহা করুন। আমি কাহাকেও নিন্দা করিব না। বরং যদি কিছু প্রশংসার থাকে, তবে তাহাই করিব। ভগবান্ কর্ত্তা, তিনি কাহাকে কি ভাবে উদ্ধার করিবেন, তাহা আমি কি জানি? ইহা মনে করিয়া চুপ করিয়া থাকাই ভাল।

কোন কার্য্যের পূর্ব্বে চিত্তের প্রসন্নতা ভগবৎ সম্মতিজ্ঞাপক।

কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে যদি চিত্তটী প্রসন্ন বোধ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ইহাতে ভগবানের সম্মতি আছে।

কামক্রোধের মত মাদক আর নাই।

বাহিরের মদ শরীরের উপর ক্রিয়া করে। যদি নেশা না হয়, তবে তাহা ধর্ম্মপথের বাধক নহে; কিন্তু কামক্রোধের মত মাদক আর নাই। এই মাদক ধর্ম্ম নষ্ট করে, ভগবান্ হইতে বিচ্যুত করে। ইহা যিনি ত্যাগ না করেন, তিনি মাদক সেবন করেন।

সর্ব্বদা নিজকে হীন মনে করা উচিত নয়।

সর্ব্বদা নিজকে হীন মনে করা উচিত নয়। একদিকে যেমন তৃণ হইতেও নীচ, অন্য দিকে আবার আমি ভগবৎ অংশ, আমার শক্তির সীমা

নাই, ধর্ম্মের সীমা নাই, পবিত্রতার সীমা নাই, ইহা বিশ্বাস করিয়া ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে। আমি যে তৃণ হইতে নীচ, তাহা আমার উচ্চতা বোধ করিলেই বলিতে পারি।

প্রশ্ন—মুক্তি কত প্রকার এবং গোলোকধাম কাহাকে বলে?

উত্তর—জীবের দেহ তিন প্রকার—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। বাসনা লয় হইলে স্থূলদেহের লয় হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ থাকে। সূক্ষ্ম-দেহ যে বাসনা দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা লয় হইলেও কারণদেহ থাকে। সমস্ত বাসনার একেবারে নিষ্কৃতি না হইলে কারণদেহের লয় হয় না। এই কারণদেহের লয়ে সম্যক্ মুক্তি। কারণদেহের বিনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত মনুষ্য নির্ব্বিঘ্ন অবস্থায় পৌছে না। মুক্তিলাভ হইলে জীব সর্ব্বদা সচ্চিদানন্দের আনন্দসাগরে ডুবিয়া থাকিবে। সেখানে সর্ব্বদাই ভগবানের লীলা দর্শন হয়। ইহাকে গোলোকধাম, কৈলাসধাম বলে।

প্রশ্ন—কোন্ অবস্থায় আত্মদর্শন লাভ হয়?

উত্তর—চিত্ত স্থির হইলে আত্মদর্শন, গুরুদর্শন ও দেবদর্শন হয়।

নাদ কি?

নাদ কি? অনাহত ধ্বনি। বীর্য্যস্থির না হইলে নাদ শুনিবে না। খুব শুদ্ধ পবিত্র থাকিলে বীর্য্য স্থির হয়।

প্রতিষ্ঠাকে শূকরের বিষ্ঠার তুল্য মনে করিতে হইবে।

কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন "প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা", লোকে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইলেই ক্ষতি। যেমন কোন বৃক্ষে ফল ধরিলে, কালো হাঁড়িতে চূণের দাগ দিয়া, অথবা খড়ের মানুষ দিয়া রাখে, সেই রকম সাধনের অবস্থা লাভ হইলে বালক, উন্মত্ত ও পিশাচবৎ আবরণ দিয়া

রাখিতে হয়। ইহা অপেক্ষা একজন যদি গালাগালি দেয়, তাহাতেও উপকার হয়। ভাব ইত্যাদি চেপে রাখাই ভাল। খুব চেষ্টা করিতে হইবে, না পারিলে নিরুপায়। মোটে কিছু না হয়, চুপ ক'রে ব'সে থাকে সেও ভাল, কিন্তু কিছু হ'য়ে অহঙ্কার হ'লেই সর্ব্বনাশ। কুকুর-বানরকে লাই দিলেই ঘাড়ে চড়িবে। আসা মাত্রই যদি শাসন করা যায়, তবে দূরে গিয়া ব'সে থাকে, কিছু খাবার দিলে ত খেলে। প্রতিষ্ঠাও তদ্রূপ।

প্রশ্ন—স্বপ্নে মন্ত্র পাওয়া কিরূপ ?

উত্তর—কখনও কখনও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের মন্ত্র প্রকাশ পায় ও কখনও কখনও মহাপুরুষেরা কৃপা করেন।

শাস্ত্রে অধিকারি-ভেদে উপদেশ।

আমাদের শাস্ত্রে সমস্তই অধিকারি-ভেদে উপদেশ। শাস্ত্রের যে যে অংশ পূর্ব্বে পরিত্যজ্য মনে হইত, এখন দেখি যে, তাহার একটী অক্ষরও ছাড়িবার যো নাই। খৃষ্টান প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের শাস্ত্রে অধিকারী বিচার না করিয়া, সকলের পক্ষেই এক উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। অল্প-বয়স্ক দুর্ব্বল বালকের স্কন্ধে দশ মণ বোঝা চাপাইলে, সে তাহা বহন করিতে পারিবে কেন ?

প্রশ্ন—মনঃ সংযম হয় না কেন ?

উত্তর—যাহাকে অপরাধী শত্রু বলিয়া বিশ্বাস কর, মনে মনে অনিষ্ট চিন্তা কর, অকপটে তাহার সেবা কর। যাহাতে তাহার হিত হয়, এরূপ আচরণ কর। হৃদয়ের অভ্যন্তরে শত্রুতা থাকিলে কিছুতেই মন স্থির হইবে না। ভিতরে পচা ক্ষত রাখিয়া, উপরে মলম দিলে পড়িয়া যায়।

হরিনামে প্রেমলাভের ক্রম।

প্রথম, পাপবোধ, দ্বিতীয়, পাপকর্ম্মে অনুতাপ, তৃতীয়, পাপে অপ্রবৃত্তি,

চতুর্থ, কুসঙ্গে ঘৃণা, পঞ্চম, সাধুসঙ্গে অনুরাগ, ষষ্ঠ, নামে রুচি ও গ্রাম্য কথায় অরুচি, সপ্তম, ভাবোদয় এবং অষ্টম, প্রেম।

নামাপরাধ।

যাহারা নাম ক'রে পাপ করে, তাহারা ভয়ানক অপরাধী। নামাপরাধের মত পাপ আর নাই।

প্রশ্ন—নিত্যবৃন্দাবনে আর এ বৃন্দাবনে প্রভেদ কি?

উত্তর—এক প্রকট, অপর অপ্রকট। একদিন দেখিলাম সমস্ত বৃন্দাবন অন্ধকারময় হইয়া গেল, একটু পরেই সমস্ত আবার আলোকিত হইয়া উঠিল। তখন দেখিতে পাইলাম কত মণি, কত মুক্তা, কত গোপ-গোপী বিরাজ করিতেছে! একটা পরদার দ্বারা আবরণ দেওয়া রহিয়াছে মাত্র। ভগবানের কৃপায় যদি কোন দিন অন্তশ্চক্ষু ফুটে, তখন দেখিয়া কৃতার্থ হইবে।

ষোল হাজার আট মহিষীর মধ্যে একই সময় ক্রীড়া আমোদ, কোন স্থানে যজ্ঞ, কোন স্থানে বিবাহ। প্রত্যেক স্থানে বিশেষ ভাবে। গোলোকে ও বৃন্দাবনে একই সময় লীলা হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যেক স্থানে বিশেষ ভাবে।

কাম ও প্রেমের পার্থক্য।

কাম নষ্ট হউক এ কথা ঠিক নয়। কাম থাকুক, কিন্তু ত্রিগুণের অতীত হইয়া। শারীরিক গুণের সহিত মিশ্রিত থাকিলেই কাম, ও শরীর হইতে ভিন্ন হইয়া পড়িলেই তাহাকে প্রেম বলা হয়। তখন উহা আত্মার অংশ অথবা আত্মা।

ত্রিগুণাতীত না হইলে কাম নষ্ট হয় না।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এ তিন মায়া হইতে উৎপন্ন। মায়া কি? কামনা। যত দিন ত্রিগুণের মধ্যে থাকিবে, তত দিন কাম তাহার উপর

আধিপত্য করিবে। এ জন্য ত্রিগুণাতীত হইয়া সিদ্ধ যোগিগণ অনায়াসে কামিকে জয় করেন।

ভগবান্ ও তাঁহার দেহ অভিন্ন।

সৃষ্ট বস্তু মাত্রেরই দেহদেহী ভিন্ন। মানুষের দেহ পাঞ্চভৌতিক। আত্মা শুদ্ধচৈতন্য, এজন্য শরীরকে ক্ষেত্র বলে, মনুষ্যকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। ভগবান্ যখন দেহ ধারণ করেন, তখন তাঁহার দেহ ও তিনি অভিন্ন। তাঁহাকে যত দর্শন করা যায়, ততই হৃদয় পরিষ্কার হয়।

প্রশ্ন—কোন্ অবস্থায় ভগবৎ আশ্রয় লাভ হইয়া থাকে?

উত্তর—তপস্যা দ্বারা আত্মা যত নির্ম্মল হইবে, ততই নিজেকে নিকৃষ্ট মনে হইবে। শরীর হইতে আপনাকে ভিন্ন দেখিয়া আত্মদৃষ্টি প্রবল হইবে।

তপস্যাদ্বারা, সৎসঙ্গ দ্বারা আত্মায় ধর্ম্মভাব প্রবল হয়, তখন পাপ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় ভগবৎ আশ্রয় লাভ হইয়া থাকে।

যতদিন আসক্তি থাকে ততদিন তাপ লাগা উচিত।

যতদিন আসক্তি থাকে ততদিন তাপ লাগা উচিত, তাহাতে অন্তরের আসক্তি দগ্ধ হয়; যেমন স্বর্ণ অগ্নির দ্বারা নির্ম্মল হয়। আসক্তি গেলে যখন শুদ্ধ আত্মায় ভগবৎপূজা হয়, তখন সেখানে তাপ লাগিলে ইষ্ট-দেবতার অঙ্গে তাপ লাগে। ভক্ত তাহা সহ্য করিতে পারে না, এজন্য পলায়ন করে।

মোক্ষদ্বার কি এবং তাহার ব্যাখ্যা।

মোক্ষের চারিটী দ্বার—১ম, শম; ২য়, বিচার; ৩য়, সন্তোষ; ৪র্থ, সৎসঙ্গ।

শম—যাহাই ঘটুক না কেন, তাহাতে অধীর না হওয়া; সরলতাই ইহা লাভের উপায়।

বিচার—নিত্য অনিত্য ইত্যাদি বিচার।

সন্তোষ—যে দিন যাহা ঘটে, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা। কাহারও মনে উদ্বেগ না দেওয়া, কাহারও নিকট প্রত্যাশা না করা, এবং ভগবান্ পালনকর্ত্তা এই বিশ্বাস রাখা সন্তোষ লাভের উপায়। ইহাই মোক্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দ্বার—সিংহদ্বার।

সৎসঙ্গ অর্থ সাধুলাভ। যাহাকে দেখিলে ভগবানের নাম স্ফুরণ হয়, সেই প্রকৃত সাধু।

প্রশ্ন—একজন একটু তপস্যা করিলেই চারিদিক্ হইতে তাহার দিকে লোক ঝুঁকিয়া পড়ে, ইহার কারণ কি?

উত্তর—ভগবানের নিকট কতজন যাইতে পারেন? তিনি কিছু কিছু (প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি) দিয়া বিদায় করিয়া দেন

প্রশ্ন—মহাপ্রভু কে?

উত্তর—পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে বুঝা যায় যে, মহাপ্রভুই স্বয়ং ভগবান্, তিনিই জ্ঞাতব্য। অন্যান্য অবতারের ন্যায় অসুর সংহার প্রভৃতি কার্য্য ছিল না, কেবল অনর্পিত বস্তু দান এবং ঋণ শোধ করিবার জন্যই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু অবতার নয়, অবতারী।

প্রশ্ন—নিত্যানন্দ প্রভু ও অদ্বৈত প্রভু?

উত্তর—নিত্যানন্দ প্রভু—অংশ-অবতার—বলরাম। অদ্বৈত প্রভু—অংশ-অবতার—মহাবিষ্ণু।

প্রকৃত পাপ বোধ হয় কখন।

শুনে শুনে পাপবোধ এক, আর প্রকৃত পাপবোধ অন্য প্রকার।

সাধু কৃপাতে যখন পাপী আপন পাপ অনুভব করে, তখন তাহার অনুতাপ এত প্রবল হয় যে, তাহার নিকট নরক-যন্ত্রণা অসার বোধ হয়। জগাই মাধাইয়ের পাপ গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভুর গৌরবর্ণ কালো হইয়া যায়, পরে জগাই মাধাইয়ের রোদনে নবদ্বীপের পশুপক্ষী পর্য্যন্ত কেঁদেছিল।

যোগসাধন সম্বন্ধে অষ্টপাশ।

১। লজ্জা। ২। ঘৃণা। ৩। ভয়। ৪। শোক। ৫। জুগুপ্সা। ৬। কুল। ৭। শীল। ৮। জাতি।

প্রশ্ন—মৃত্যুর পরে কি হয়? পরলোক বলিয়া যে সকল স্থানের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা সত্য কি না?

উত্তর—মৃত্যুর পরে সমস্ত লোকই পিতৃলোকে গমন করে। পিতৃলোকে প্রত্যেক বংশেরই এক এক জন পিতৃপুরুষ থাকেন। তিনি তাহার যে অবস্থা, তাহা তাহাকে দেখাইয়া দেন। তথায় ক্রমে ক্রমে তাহার বাসনা জন্মে। বাসনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে জন্মের ইচ্ছা হয়। জন্ম যে কেবল এই পৃথিবীতেই হইবে এমন নহে। সৌরজগৎ বলিয়া আমরা যাহা জানি, ঐরূপ অসংখ্য সৌরজগৎ আছে। বিষ্ণুলোক, চন্দ্রলোক প্রভৃতি স্থান আছে। তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। বাসনা অনুসারে জন্মের অত্যন্ত ইচ্ছা হইলে, কোন্ স্থানে তাহার জন্ম হইবে, তাহা পিতৃপুরুষ বলিয়া দেন। সে তদনুযায়ী প্রার্থনা করে। প্রার্থনা পূর্ণ হইলে, অবস্থা অনুসারে নানা গ্রহে তাহার জন্ম হয়। এই পৃথিবীতে যে একজনের জন্ম না হইলে সে মুক্ত হইল এমন নহে। অন্যান্য গ্রহে উপগ্রহে থাকিবার বাসস্থান আছে। তথায় স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক এরূপ (এই পৃথিবীর স্ত্রীপুরুষের মত) নহে। কিন্তু তাহারাও মোহের অধীন। সেখানেও বাসনা আছে। এইরূপ গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে জন্মগ্রহণ করে। বাসনা অনুসারে জন্ম হইলেও সকলের বাসনা এক রকম নহে।

সেই বাসনার তারতম্যে নানাবিধ গ্রহে জন্ম হয়। সকলের এক গ্রহে হয় না।

নামে রুচি না হইলে কি করা কর্ত্তব্য।

প্রতিদিন কিছু অল্প সময়ের জন্যও সাধন করা কর্ত্তব্য। ভাল না লাগিলে ঔষধ গেলার মত অনিচ্ছার সহিত নাম করিলেও ক্রমে রুচি জন্মে। নামে অরুচির ঔষধ নামই। যেমন পিত্তরোগে মুখ তিক্ত হইলে মিশ্রিও তিক্ত লাগে; কিন্তু ঐ রোগের ঔষধও মিশ্রি, খাইতে খাইতে মিশ্রি মিষ্ট লাগিতে থাকে, তদ্রূপ নাম করিতে করিতে নামে রুচি জন্মে।

মৃত্যুকালে হরিস্মৃতি সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

মানুষ যেরূপ চিন্তা ও কার্য্য সমস্ত জীবন ভরিয়া করে, মৃত্যুকালে তাহারই চিন্তা আসে। দৃষ্টান্ত ভরতরাজা। মৃত্যুকালে হরিস্মৃতি সকলের ভাগ্যে হয় না। জীবনে যেমন চিন্তা, স্বপ্নেও সেইরূপ, মৃত্যুকালেও সেইরূপ। গুরুতর পাপ করিলে অথবা কোন বস্তুতে বা জন্তুতে অত্যন্ত আসক্তি হইলে অধোগতি হয়।

প্রশ্ন—বৌদ্ধমন্দিরে রথযাত্রা হয় কেন?

উত্তর—রথ মনুষ্যদেহ, তিন তলা। উপর তলায় সহস্রদল পদ্মে শ্রীশ্রীবামনদেব অর্থাৎ জগন্নাথ বিরাজ করেন। বামন-অবতারে ত্রিভুবন অধিকার করেন, এজন্য জগন্নাথ। এই রথে বামনদেবকে দর্শন করিলে পুনর্ব্বার জন্ম হয় না। মধ্য তলায় সমস্ত দেবদেবী একপদ্মে ও কুটীরে বিরাজ করেন। সমস্ত অবতার ও তাঁহাদের কার্য্য এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। নীচের তলায় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য রিপুগণ তাহাদের পরিবারগণের সহিত বিরাজ করেন। বামনদেব রথে উঠিবামাত্র চারিদিকে শঙ্খঘণ্টা বাজিতে থাকে, নীচের তলায় সিঁড়ি পড়ে।

চারিদিক হইতে ভক্তমণ্ডলী আসিয়া ভিড় করিলে, কামক্রোধগণ পরিবার লইয়া পলায়ন করেন। তখন সত্ত্ব.রজঃ.তমঃ রূপ প্রকাণ্ড তিন গাছা কাছি রথে বাঁধিয়া টানিতে থাকে। দুঃখসুখময় কালচক্র ঘুরিতে ঘুরিতে, ঠাকুরমন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলে কাছি খসাইয়া লয়।

বুদ্ধদেব সিদ্ধিলাভ করিয়া কাহার নিকটে এ তত্ত্ব প্রকাশ করিবেন, ইহা ভাবিতে ভাবিতে পূর্ব্বের পঞ্চ শিষ্যের কথা মনে হইল। বুদ্ধদেব তাহাদের নিকট সমস্ত তত্ত্ব বর্ণনা করিয়া নিজের শরীর রথ, তাহাতে দেবতা ও কন্দর্পের প্রকাশ, পরে, ব্রহ্মলাভ এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন; তাহাই রথ। সেই জন্য বৌদ্ধমন্দিরমাত্রেই রথযাত্রা হইয়া থাকে।

সাধন করিবার প্রকৃষ্ট সময়।

মহাপুরুষেরা রাত্রি ১॥০ টার সময় বাহির হন এবং রাত্রি ৪টা পর্য্যন্ত থাকেন। এই সময় রাত্রিজাগরণ অভ্যাস করা উচিত। এই সময় সাধনার প্রশস্ত সময়। দুই এক বার প্রাণায়াম করিয়া নাম করিবে, মশারির মধ্যে বসিয়া করিলেও হয়। নাম করিবার সময় মহাপুরুষেরা কাছে আসিয়া দাঁড়ান এবং সাহায্য করেন। কোন মহাপুরুষ আসিলেই চন্দনের এবং ধূপের গন্ধ বাহির হয়। কখন কখন গাঁজার গন্ধও পাওয়া যায়। মহাত্মাদিগের গাত্রগন্ধে মন অতি প্রফুল্ল হয়।

প্রশ্ন—নাম করিতে বসি মন এদিক্ ওদিক্ চলিয়া যায়। উপায় কি করি?

উত্তর—নাম করিতে করিতে নামের স্বাদ পাওয়া যায়। তখন এক প্রকার শব্দ শরীরের মধ্য হইতে শোনা যায়। উহা শ্রবণ করিলে আর মন বিচলিত হয় না। যখন ঐ প্রকার হইতে থাকে, তখন মনকে পৃথক্ ব্যক্তি কল্পনাকরতঃ লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক বড় করিয়া, করযোড়ে

মনের নিকট "মনরে তোর পাঁয়ে ধরি" ইত্যাদি প্রকারে প্রার্থনা করিতে পারিলে এক প্রকার আদেশ শুনিতে পাওয়া যায়। ঐ আদেশ অনুসারে কাজ করিতে হয়।

প্রশ্ন—সদ্‌গুরু কৃপা করিয়া অবস্থা খুলিয়া দিলেই ত পারেন?

উত্তর—সদ্‌গুরুর কৃপায় সকলই হয় ইহা সত্য কথা। সদ্‌গুরু যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন এবং যখনই ইচ্ছা তখনই করিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে লাভ কি? বস্তুর মূল্য অবগত হইবার পূর্ব্বে যদি তাহা লাভ হয়, তবে বস্তুলাভের আনন্দ হইবে না, বস্তুর জন্যও আদর হইবে না। বস্তুর অভাবজ্ঞানে যত দুঃখ-যন্ত্রণা হইবে, বস্তুলাভে ততই আনন্দ হইবে এবং তাহার মূল্য বুঝিবে।

পরমহংস কাহাকে বলে।

হংস যেমন মিশ্রিত জল ও দুধ হইতে দুধের অংশ গ্রহণ করে ও জল ভাগ ত্যাগ করে, সেই প্রকার যিনি এই অনিত্য, মিথ্যা সংসার হইতে কেবল সারই সংগ্রহ করেন, তিনিই পরমহংস। তিনি কেবল গুণগ্রাহী হইবেন।

অঙ্গন্যাস করন্যাসের উপকারিতা।

গভীরভাবে একাগ্রতাসহকারে ভক্তির সঙ্গে আরাধ্য-দেবতার নাম বা ইষ্টমন্ত্রের সঙ্গে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে ন্যাস করিলে, সাধকের বিবিধ অঙ্গ ও ইন্দ্রিয় ভগবদ্ভাবে পূর্ণ হইয়া, পরম বিশুদ্ধতা লাভ করিতে পারে। যাহার যে ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা বা অবিশুদ্ধতা যত বেশী, তিনি বিশেষভাবে সেই ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার সঙ্গে যোগ করিয়া, ভগবানের নাম ও পবিত্রতা ক্রমাগত স্মরণ ও চিন্তা করিলে বিশেষ ফল পাইবেন। যাঁহার দৃষ্টি অপবিত্র, তিনি প্রতিদিন আপনার নেত্রদ্বয়ে মন স্থাপন করিয়া ভক্তিভাবে ইষ্টদেবতার নাম করিবেন—ইত্যাদি।

শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার উপায় ও প্রয়োজনীয়তা।

যতদিন চক্ষু কর্ণ ইন্দ্রিয়গণ বহির্ব্বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, ততদিন শরীর বিস্মৃত হইয়া ভিতরে প্রবেশ করা যায় না। ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিলে কিছুতেই শরীর ভুলিতে পারা যায় না। ভিতরে প্রবেশ করিবার বিভিন্ন উপায় আছে। কোন উপায়ে ভগবানকে দর্শন করিলে তখন শরীরের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। সহজেই শরীর ভুলিতে পারা যায়। কিন্তু এ অবস্থা সকলের ঘটে না। এ জন্য কাহাকেও ভাল বাসিতে হইবে। অকৃত্রিম নিঃস্বার্থ ভাল বাসিতে হইবে। এ ভালবাসা লাভ করিবার জন্য অহিংসা অভ্যাস কবিতে হইবে। কায়মনোবাক্যে কাহাকেও কষ্ট দিবে না। কেহ প্রহার করিলে, গালাগালি দিলে, এমন কি সর্ব্বনাশ করিলেও তাহার অমঙ্গল কামনা করিবে না। এইরূপে দ্বেষ হিংসা নষ্ট হইলে ভালবাসা আসে। সেই ভালবাসা কোন স্থানে অর্পণ করিয়া তাহাকে ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত বিস্মৃত হওয়া যায়। এই অবস্থা হইলে সহজে ভগবানকে পাওয়া যায়।

ঈশ্বর-দর্শনের পূর্ব্বে দেবতা-দর্শন হয়।

ঈশ্বর-দর্শনের পূর্ব্বে মহাপুরুষ ও দেবতা দর্শন হয়। তাহাতে হৃদয়ের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না। ভগবৎদর্শনই লক্ষ্য। দেবতাদর্শনে যিনি যে দেবতাকে ভাল বাসেন, তাহাই প্রকাশ হয়।

ধর্ম্ম বাহিরের কতকগুলি কার্য্য নহে।

বাহিরের কতকগুলি কার্য্য না করিলেই আজকাল লোকসমাজে ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য হওয়া যায়। যদি কেহ বেশ্যাবাড়ী না যান, চুরি না করেন, ঘরে আগুন না লাগান ইত্যাদি, তাহা হইলেই তিনি ভাল লোক

বলিয়া গণ্য হন। কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণে হিংসাবৃত্তি, যাহা তুষানলের ন্যায় মানবচিত্ত দগ্ধ করে, তাহা থাকিতে পারে। হয়ত তিনি, যে পর-নিন্দা, শাস্ত্রনিন্দা, দেবনিন্দা, নরহত্যা হইতেও অধিকতর পাপজনক, তাহা করিতে পারেন, তথাপি তিনি ধার্ম্মিক বলিয়া সমাজে গণ্য হন। ধর্ম্ম কেবল বাহিরের কতকগুলি কার্য্য নহে। যাঁহাদের আত্মপ্রবেশের ক্ষমতা আছে, তাহারা সর্ব্বদা নিজের চিত্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বের শ্রেষ্ঠতা।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে যে, পঞ্চ উপাসনায় মুক্তি পর্য্যন্ত হইতে পারে। মুক্তির পর পঞ্চমপুরুষার্থ। তাহার জন্য রাধাকৃষ্ণের উপাসনা প্রয়োজন।

ভক্তিবিষয়ক গানের উপকারিতা।

নীলকণ্ঠের গানে অনেক উপকার হইয়াছে। নাস্তিক বিশ্বাসী হইয়াছে। শান্তিপুরে একদিন আমি স্নানে যাইতেছি, শুনিলাম, গান হইতেছে, মনে হইল একটু শুনে যাই। তখন বেলা চারিটা। এক ঠাকুর-বাড়ীর নাটমন্দিরে গান হইতেছে। একজন মুসলমান মগ্ন হইয়া, গান শুনিতেছে, আর চক্ষের জলে তাহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। এমন সময় একজন গোস্বামী তাহার নিকট গিয়া বলিলেন, "ওঠ্ বেটা, তুই এখানে কেন? একি হাট বাজার?" নীলকণ্ঠ তখন যোড়হাত করিয়া গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন—"প্রভো! একি? কৃষ্ণনামে জাতি বিচার! হরিদাস যবন হইয়াও হরিনামে জগৎপূজ্য হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তিকে আপনি "ওঠ্, বেটা" বলিতেছেন, এখন দেবতারা উঁহার চরণ ধূলি প্রার্থনা করিতেছেন"। অতঃপর তিনি এই ভাবের একটী গান রচনা করিয়া গাইলেন।

স্বপ্নে রামচন্দ্র দর্শন উপলক্ষে জনৈক রাম-উপাসকের প্রতি উপদেশ।

প্রত্যেক উপাসকের এই অবস্থা, স্বপ্নে ইষ্টদেবতা দর্শন দিয়া আকর্ষণ করেন। ইষ্টদেবতা প্রসন্ন হইলে পর ব্রহ্মজ্ঞান হয়; তারপর যোগ, তার পর ভক্তি। ক্রমে রামচন্দ্র হইতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব প্রকাশ হইবে। রামই ব্রহ্ম; তাহা হইতে মায়া; মায়া হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—সমস্ত জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়। এই সকল তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হইলে মায়া হইতে মুক্তি পাইয়া, পরাভক্তি লাভ হয়। সেই পঞ্চমপুরুষার্থ। গোলোক, বৃন্দাবন, কৈলাস এই তিন ধামে নিত্য দেবতা বিরাজমান। রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা, হরগৌরী, একই দেবতা, একই বিগ্রহ। সাধকের ভাবানুসারে ভিন্নরূপ দর্শন। যেমন কোন খৃষ্টানভক্ত কালীঘাটের কালী ও দক্ষিণেশ্বরের আনন্দময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া যিশুখৃষ্টের রূপ দর্শন করিয়াছিলেন।

ভক্তি ও ভজন।

অভক্ত ব্যক্তিও দীনহীন অকিঞ্চন ভাবে যদি ভগবৎচরণে পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে ভক্তিদেবী অবশ্যই তাঁহাকে কৃপা করিবেন; কিন্তু আমি ভক্ত, এই অভিমান যেখানে, সেখানে ভক্তিদেবী গমন করেন না। যে বৃত্তি দ্বারা ভগবৎভজন করা যায়, তাহাই ভক্তি। সাধকগণ এজন্য প্রথমে ভক্তিকে বৈধী এবং অহৈতুকী এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বৈধী ভক্তি চারি শ্রেণীর জীবে দৃষ্ট হয়—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। আর্ত্তশব্দের প্রকৃত অর্থ এই যে, যখন আমাদের প্রাণ অবিশ্বাস, অভক্তি, শুষ্কতা, পাপতাপে কাতর হইয়া পড়ে, তখনই আমরা আর্ত্ত শ্রেণীভুক্ত। এই অবস্থায় ভগবানের নাম লইতেও বিরক্তি ও অবিশ্বাস আইসে।

তখন করযোড়ে নাম লইতে চেষ্টা করাই ভজন। শুষ্কতা ও অবিশ্বাসে নাম লইলেও তাহা বৃথা যায় না। ঔষধ তিক্ত—বিরক্তির সহিত সেবন করিলেও রোগ শান্তি হয়।

যাঁহার যেরূপ ভজন, তিনি নিষ্ঠাপূর্ব্বক তাহা করিবেন। প্রত্যেক সাধক আপন আপন মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিবেন, ইহা শিববাক্য।

প্রজ্বলিত দীপ ও জাগ্রৎ মহাপুরুষ।

প্রদীপ যদি প্রজ্বলিত থাকে, তাহা হইতে সহস্র প্রদীপ জ্বালা যায়। তৈল, সলিতা, তৈলাধার বর্ত্তমান সত্ত্বেও অগ্নির সংযোগ না হইলে, একটী প্রদীপও জ্বলে না। অগ্নি সর্ব্বত্র ইহা বলিলে দীপ জ্বলে না। যে উপায় দ্বারা জ্বলে, তাহা না করিলে কিছুতেই দীপ জ্বলিতে পারে না। শক্তি-সঞ্চারও সেইরূপ।

শালগ্রাম পূজার সার্থকতা।

শালগ্রাম পূজা বড় কঠিন। কারণ, মূলাধার প্রভৃতির কেবল এক চক্রে সহজে মন স্থির করা যায়, কিন্তু শালগ্রামচক্রে মন স্থির করা সহজ-সাধ্য নহে। সাধক দৃষ্টি সাধন অর্থাৎ যোগ অভ্যাসের পর শালগ্রামচক্র ভেদ করিতে পারিলে, সেই ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে অসীম ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়। তখন প্রত্যেক পরমাণুতে বিষ্ণু দর্শন করা যায়। এই কারণে প্রাচীন কাল হইতে ব্রাহ্মণগণ শালগ্রামচক্র পূজা ও ধ্যান করিয়া আসিতেছেন।

প্রশ্ন—গুরুসমক্ষে অন্য পূজা, অর্চ্চনা ও সাধনভজনের প্রয়োজন আছে কি নাই?

উত্তর—গুরুর অনুমতি থাকিলে করিতে পারে। যদি কোন প্রকার ঔদ্ধত্য প্রকাশ হয়, (লোক দেখাইবার ভাবে করিলে তাহাকেই

ঔদ্ধত্য বলে) তবে তাহা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। গুরুতে বিশ্বাস হইলে সে কথা স্বতন্ত্র। গুরুতে সর্ব্বদেবের অধিষ্ঠান দর্শন হইলে, পৃথক্ স্থানে অর্থাৎ গুরু ভিন্ন পূজা নিষেধ।

প্রশ্ন—স্ত্রীলোকের নিকট দীক্ষা লইলে উপকার হয় কি না? এবং স্ত্রীলোকের দীক্ষা দিবার অধিকার আছে কি না?

উত্তর—যদি স্ত্রীলোকের নিকট মন্ত্র গৃহীত হয়, তবে সেই গুরু-বংশের কাহাকেও উপগুরু করতঃ, তাঁহার নিকট সমস্ত পূজাপদ্ধতি শিক্ষা করিয়া পুরশ্চরণ করিলে উপকার হয়; ইহা দেশাচার, কিন্তু শাস্ত্র-শাসন নহে।

যোগতন্দ্রার লক্ষণ।

যোগতন্দ্রা—১ম, নাম জপ করিতে করিতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া রহিত হইয়া নিদ্রার ন্যায় হইবে। ২য়, নিদ্রাভাব আসিলে দেহের ভিতর হইতে একরূপ ভাষায় মধ্যে মধ্যে কোন কোন কথা শুনা যাইবে— ঐ সকল কথা ধরিয়া চলিতে হয়। ৩য়, ভবিষ্যৎ অবস্থার দর্শন স্বপ্নের ন্যায় হইবে। ৪র্থ, শরীরে কোন জ্ঞান থাকিবে না, কিন্তু ভিতরে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকিবে।

প্রশ্ন—সদ্‌গুরুর নিকট সাধন নিলেও কর্ম্ম শেষ করিতে এত বিলম্ব হয় কেন? তাঁহার দীক্ষার পরেও কি নিজের চেষ্টায় কর্ম্ম শেষ করিতে হইবে?

উত্তর—সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইলেই ক্রমে ক্রমে কর্ম্ম শেষ হইয়া আসিবে। সামান্য আগুনের উপর খুব বেশী পরিমাণ কাঠ রাখিলে যেমন কিয়ৎকাল ধীরে ধীরে জ্বলিবার পর একেবারে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এবং অল্প কাল মধ্যে সমস্ত কাঠ দগ্ধ করতঃ ভস্ম করিয়া ফেলে, তদ্রূপ গুরুপ্রদত্ত শক্তিও বহুজন্মের কর্ম্মরূপ আবর্জ্জনার নীচে ধীরে ধীরে

কার্য্য করিতেছে, ঐ আবর্জ্জনার কতক নষ্ট করিয়া যখন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে, তখন সমস্ত কর্ম্ম মুহূর্ত্তের মধ্যে নষ্ট করিয়া প্রকৃত শান্তির অবস্থায় লইয়া যাইবে। গুরুশক্তি আপনা আপনি কার্য্য করিবে।

শ্বাসে প্রশ্বাসে স্বাভাবিকভাবে নাম অভ্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সাধক নিরাপদ নহেন।

যে দিন ২৪ ঘণ্টা একটী শ্বাসপ্রশ্বাস বৃথা না যাইয়া নাম চলিবে, সেই দিনই সিদ্ধি লাভ হইবে। ইহা না হওয়া পর্য্যন্ত সাধক নিরাপদ ভূমিতে পৌঁছিল না। ইহার পূর্ব্বে প্রতি মুহূর্ত্তেই পতনের আশঙ্কা থাকে।

সাধকের নিত্য বিচার ও আত্মানুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

তপস্যাদ্বারা আত্মা যত নির্ম্মল হইবে, ততই নিজকে নিকৃষ্ট মনে হইবে। শরীর হইতে আপনাকে ভিন্ন দেখিয়া আত্মদৃষ্টি প্রবল হইবে। তপস্যা দ্বারা আপনাকে নিকৃষ্ট মনে করিলেও, শরীর মনকে শাসন করিতে করিতে এক প্রকার অহঙ্কার জন্মে; তাহাতে মনে হয়, আমি স্বাধীন, আমি মুক্ত। এই ভাব প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যেই আছে। তপস্যা দ্বারা ইহা প্রবল হয়। এই সময় আত্মসমর্পণ করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু পারে না। মনে করিয়া গেলাম আমার সমস্ত অর্পণ করিয়া আসিব; কিন্তু অমনি ভিতর হইতে রোদন আসে। কে যেন নিষেধ করিয়া বলে যে পারিবে না। এখন যদি বলে, 'মর' তখন কি করিবে? যদি বলে স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া, কৌপীন পরিধান করিয়া বনে যাও, তখন কি করিবে? এই মানসিক সংগ্রাম প্রত্যেক সাধকের অন্তরকে আন্দোলিত করে; এজন্য সম্পূর্ণরূপে আপনাকে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া দেখিবে। ডাক্তার যেমন পচা ঘা কাটিতে কাটিতে অস্থি ভেদ করিয়া

মজ্জার মধ্যে যে বিষম রোগ তাহা ধরিয়া কাটিয়া ফেলিয়া দেয়, সেইরূপ শোনা কথায় বা গ্রন্থের উপদেশে হঠাৎ কিছু স্থির না করিয়া, অতি গভীর-ভাবে বিচারপূর্ব্বক আত্মানুসন্ধান করা কর্ত্তব্য, এবং যাহা যথার্থ আমার অবস্থা, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকাই উচিত। যদি আমার আত্মার ভাব হয়, অবস্থা হয়, তবে চুপ করিয়া তাহার গতি দেখিলে পরমানন্দ লাভ করা যায়। আর যদি পাপ ভিতরে চোরের মত লুকাইয়া থাকে, তবে সমস্ত দিন সাধনভজন করিতেছি, ইহার মধ্যে আমাকে নরকে আনিল কিরূপে, ইহা দেখিয়াও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্মের পরিচয়।

সকাম নিষ্কামের এক পরীক্ষা এই যে, যখন সকাম অবস্থা, তখন মন অজ্ঞাতসারে অনেক বৃথা চিন্তা করে। বাড়ী, ঘর, বাগান, হাতী, ঘোড়া, রাজত্ব এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া সুখী হয়। নিষ্কাম হইলে, মন সেই অভ্যস্তদোষে অজ্ঞাতসারে বৃথা চিন্তা করিতে গিয়া পারে না। যাহা চিন্তা করে তাহাতেই ঘৃণা হয়। যেমন বিষ্ঠা দেখিয়া লোকে স্নানের পর লাফিয়ে যায়, সেইরূপ। যেমন চিন্তা করে, অমনি থু থু করিয়া পলাইয়া যায়। এইরূপ দুই এক বার করিয়া মন লজ্জিত হইলে বোকার মত বসিয়া থাকে।

সাধনভজনের উপযুক্ত স্থান।

সাধনভজনের যথার্থ স্থান হিমালয়। তাহার পর নর্ম্মদা, গোদাবরী, গঙ্গা, যমুনা এই সকল নদী-তীরস্থ প্রস্তরময় স্থান ভাল। পঞ্জাবে রাভি নদীর তীরস্থ প্রস্তরময় স্থানও ভাল। গয়াও সাধনভজনের অনুকূল স্থান। বঙ্গদেশ নানা কারণে উপযুক্ত নহে। জল, বায়ু, মৃত্তিকা সমস্তই বিরোধী।

আত্মা মুক্তাবস্থা লাভ করেন কখন ?

আত্মা পঞ্চকোষে আবদ্ধ আছে। পঞ্চকোষ ভেদ করিয়া উঠিতে পারিলে আত্মা মুক্তাবস্থা লাভ করিল। পঞ্চকোষ যথা :—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ।

অন্নময় কোষ ভেদ হইলে পার্থিব বস্তুতে আকর্ষণ থাকে না। প্রাণময় কোষ ভেদ হইলে শারীরিক উত্তেজনা থাকে না। মনোময় কোষ ভেদ হইলে সঙ্কল্প বিকল্প নষ্ট হইয়া যায়। বিজ্ঞানময় কোষ ভেদ হইলে সংশয়বুদ্ধি থাকে না। আনন্দময় কোষ ভেদ হইলে পার্থিব আনন্দ মুগ্ধ করিতে পারে না।

কি প্রকারে ভগবৎস্মরণ মননে রুচি জন্মে।

লোকে বলে ভগবানের চিন্তা অথবা নাম করিতে ইচ্ছা হয় না কেন ? ভগবান্ এই নামমাত্র শুনিয়াছে, কিন্তু তিনি কে, কোথায় থাকেন, তাহা জানে না। এই জন্য শাস্ত্রে আছে যে, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চভূত আমাদের শরীরমনকে রক্ষা করিতেছে, একারণ উহাদের যজ্ঞ করিবে। বৃক্ষ, লতা, ফুল, পুষ্প, শস্য ইহাদের যজ্ঞ করিবে। পশু, পক্ষী, জীবজন্তুদিগের যজ্ঞ করিবে। পিতামাতা প্রভৃতি পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধ করিবে। মনুষ্যের সেবা, অতিথিসেবা করিবে। এইরূপ করিলে তবে ক্রমে ভগবানকে জানা যায়।

প্রশ্ন—যাহার যে জিনিষের উপর লোভ হয়, তাহার সেই জিনিষের উপর একটী আকৃতি পড়ে না কি ?

উত্তর—মানুষ যাহা কিছু দেখে, তাহাতেই তাহার একটা আকৃতি পড়ে। সেই আকৃতি আসক্তিতেই স্থায়ী হয়, যেমন ফটোগ্রাফ রসেতে স্থায়ী হয়। আয়নাতে ছায়া পড়ে, কিন্তু সেই বস্তু যতক্ষণ আয়নার

নিকট রাখা যায়, ততক্ষণ তাহার ছায়া দেখা যায়। সেইরূপ সাধারণ দৃষ্টিতে চেহারা পড়িলেও তাহা স্থায়ী হয় না। ফটোগ্রাফের আয়নাতে যে চেহারা পড়ে, তাহার কারণ রস। রসেতেই আকৃতি স্থায়ী হয়। সেইরূপ যে বস্তুতে আসক্তি-রস আছে, তাহাতে আকৃতি পড়িলে আর উঠে না, বদ্ধ হইয়া থাকে। যাহাদের অন্তশ্চক্ষু ফুটিয়াছে তাহারা অনায়াসে দৃষ্টিমাত্রই ছায়া দেখিতে পায়, ইহা শুনিয়া বুঝা যায় না। যে সকল বিষয়ে যাহার লোভ হইবে, তাহাতে তাহার নিশ্চয় ঐরূপ আকৃতি পড়িবে। যত দিন বিষয়ে আসক্তি থাকিবে, ততদিনই ঐ আকৃতি স্থায়ী হইবে। যখন আসক্তি চলিয়া যাইবে, তখন আকৃতিও চলিয়া যাইবে।

ভাবের ঘরে চুরি করা ভয়ানক অপরাধ।

মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, কলিযুগে অনেকে নাচিয়া গাহিয়া নরকে যাইবে। কপটতা করিয়া নাচিবে, তাহাতেই ঐরূপ হইবে। স্ত্রীলোকের স্তন উঠিলে যেমন কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখে, ভাব ইত্যাদি সম্বন্ধেও সাধকদিগকে ঐরূপ সতকতা অবলম্বন করিতে হইবে। অপরকে দেখাইলেই ক্ষতি।

কীর্ত্তনে ভাব তিনপ্রকার।

কীর্ত্তনে সাধারণতঃ তিন প্রকার ভাব উপস্থিত হয়—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক ভাবে উপস্থিত লোক উপকৃত হয়। রাজসিক ভাবে অন্য লোকের কখনও উপকার কখনও অপকার হয়; এজন্য তাহা সংবরণ করা উচিত। তামসিক ভাবে উপস্থিত লোকদিগের উৎপাত বোধ হয়। কারণ, তমোগুণের নৃত্য অধিকাংশ বেতাল হইয়া লম্ফঝম্ফ হয়। নৃত্যকারীর পা লাগিয়া অনেক সময় খোঁড়া হয়, ঘরের দ্রব্যাদি নষ্ট হয়। বালকগণ ভয় পাইয়া চীৎকার করে।

মানুষ রজ্জুবদ্ধ পশুর মত স্বাধীন।

মানুষের স্বাধীনতা কিছু আছে। যেমন একটা গরুর গলায় দড়ি বাঁধা থাকিলে, দড়ি যত দূর লম্বা ততদূর ঘুরিতে ফিরিতে পারে। সেই-রূপ মনুষ্য আপন প্রবৃত্তির বিষয় যতটুকু ততটুকু স্বাধীনভাবে চলিতে পারে। চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি, কর্ণের শ্রবণ, নাসিকায় ঘ্রাণ—চক্ষু দৃশ্য দেখে, কর্ণ শব্দ শোনে, নাসিকা ঘ্রাণ লয়, তাহার উপরে যাইবার ক্ষমতা নাই। নিজের ছেলেকে যেমন ভালবাসে, অন্যের ছেলেকে তেমন ভাবে ভাল-বাসিতে পারে না। হাজার চেষ্টা করিলেও অন্তরে তাহা আনিতে পারে না। সুতরাং মনুষ্য বাঁধা গরুর মত স্বাধীন।

প্রশ্ন—জীব পরাধীন, তবে আর কর্ম্ম-বন্ধন কেন?

উত্তর—যাহার যেরূপ বাসনা তাহার সেইরূপ কর্ম্ম-বন্ধন। জীব সম্পূর্ণ পরাধীন বটে, কিন্তু এই বাসনাই বন্ধনের হেতু।

যোগৈশ্বর্য্য লাভের সহজ উপায় এবং তাহার অপব্যবহারের প্রলোভন।

অন্যান্য ত্যাগ কোন কাজেরই নয়, সহজেই উহা পারা যায়। যোগের অণিমাদি যে সকল ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, তাহা ত্যাগ করাই প্রকৃত ত্যাগ। ঐশ্বর্য্য যে অতি সহজে লাভ হয় তাহা নহে। কোন বিষয়ে চিত্ত একাগ্র হইলে উহা লাভ হয়।

শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম করার উপকারিতা অন্য রকম। শ্বাসে প্রশ্বাসে নামসাধন ঠিক হইয়া গেলেই, ক্রমে আত্মদর্শন লাভ হয়। শরীর হইতে আত্মা পৃথক্ জানিলেই সেই আত্মার দ্বারা অনেক অলৌকিক কার্য্য করা যায়। অনেক লোক দেখা গিয়াছে, যাহারা ঐরূপ সামান্য একটু বুঝিয়াই ঐ সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রকাশ করিয়া একেবারে নষ্ট হইয়া

গিয়াছে। ঐ অবস্থায় ইচ্ছানুরূপ নানা প্রকার কার্য্য করিবার ক্ষমতা জন্মে। ইহা এক ভয়ানক প্রলোভন। এই সকল শক্তি প্রয়োগ না করিলে, ক্রমে নানা রূপ আশ্চর্য্য অবস্থা লাভ হয়। আর ক্ষমতা প্রয়োগ করিলেই উহা শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়।

শরীর হইতে আমি ভিন্ন বুঝিলেই শরীরের অভ্যন্তর দর্শন হয়। এই শরীর যেন নিকটে রহিয়াছে বোধ হয়। উহার উদরের ভিতরের নাড়ী-ভূঁড়ী, বস, মাংস ইত্যাদি স্পষ্ট চোখে পড়ে। তখন কোন্ জিনিষটী শরীরের কোন্ স্থানে থাকে, শরীরের কোথায় কি অভাব আছে তাহা দেখা যায়। কোন্ বস্তুর সহিত শরীরের কি সম্বন্ধ সমস্ত জানা যায়, দেখা যায়—ইত্যাদি।

স্ত্রীলোক হইতে সর্ব্বদা সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য।

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো বসেৎ।
বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥

অর্থাৎ মাতা, ভগিনী কিংবা দুহিতার সহিতও নির্জ্জনে একাসনে বসিবে না। কারণ, বলবান্ ইন্দ্রিয় সমস্ত বিদ্বান্‌কেও আকর্ষণ করে।

এক দণ্ডী সন্ন্যাসী ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বিদ্যাশক্তি কখনও ইন্দ্রিয়বশ হয় না। পরে ঘটনাচক্রে ঐ দণ্ডী অন্ধকার রাত্রিতে যাঁহার আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তিনি একটী স্ত্রীলোক। তিনি ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া ছিলেন। দণ্ডী, রিপুর বশীভূত হইয়া স্ত্রীলোকটীকে অনেক সাধ্যসাধনা করিলেন, কিন্তু তিনি সম্মত হইলেন না, এবং বলিলেন—তুমি বিদ্বান্ হইয়া রিপুর বশীভূত হইতেছ কেন? তখন দণ্ডী ঘরের চাল ছিদ্র করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে গিয়া, নীচেও নামিতে পারেন না,

উপরেও উঠিতে পারেন না। প্রাতঃকালে সমস্ত লোক দণ্ডীস্বামীর এই দুরবস্থা দেখিয়া বলিল, ইনিই ব্যাসের লেখা কাটিতে গিয়াছিলেন। এ অবস্থা সকলেরই ঘটিতে পারে। এজন্য স্ত্রীপুরুষে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিতে হইবে।

ধর্ম্মসাধনে চরিত্রই প্রধান। চরিত্র নির্ম্মল রাখিতে যত্ন করিবে।

ঊর্দ্ধরেতা হইলেও স্ত্রীলোক হইতে অনিষ্ট হয়।

যেই কেন যেমন উন্নত হউন না, স্ত্রীলোক হইতে তফাৎ থাকিতে হইবে। ঊর্দ্ধরেতা হইলেও স্ত্রীলোক হইতে অনিষ্ট হয়।

কলিযুগকে শূদ্রযুগ বলে।

কলিকালের নাম শূদ্রযুগ, অর্থাৎ এই যুগে শূদ্রজাতি ধর্ম্মসাধন করিয়া মহৎজীবন লাভ করিবে।

প্রকৃত সত্য ও মিথ্যা কি?

মিথ্যা—যাহার লক্ষ্য অসৎ। সত্য—যাহার লক্ষ্য সৎ।

প্রশ্ন—ধর্ম্ম এক, কিন্তু পন্থা ভিন্ন হয় কেন?

উত্তর—সকলের এক নিয়মে (ধর্ম্মসাধন) হয় না। শরীরের প্রকৃতি, মনের প্রকৃতি ভিন্ন; সুতরাং পন্থাও ভিন্ন।

সদ্‌গুরুর শাসন-প্রণালী।

দুই রূপ চিকিৎসক দেখা যায়, এক নিদানবিৎ, অপর অজ্ঞ। জ্বর হইলে কাহারও কাহারও মাথা ধরে, পায় ব্যথা হয়, প্লীহা যকৃৎ বৃদ্ধি পায়—ইত্যাদি। অজ্ঞ চিকিৎসকেরা রোগের মূলের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, মাথাধরা প্রভৃতির ঔষধ দেয়। নিদানবিৎ চিকিৎসক জ্বরের ঔষধ দেন। উহা গেলেই আনুষঙ্গিক সমস্ত উপসর্গ অন্তর্হিত হয়। ইঁহারা ভিতরের

ব্যারাম বাহিরে প্রকাশ করিয়া বিনষ্ট করেন। তদ্রূপ সদ্‌গুরু, কাম ক্রোধ প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, অভিমানের প্রতি আঘাত করেন। অভিমান বিনষ্ট হইলে সকলই বিনষ্ট হইবে। বাহিরে ক্রোধ প্রভৃতির ক্রিয়ার প্রয়োজন। উহাদ্বারা অভিমান নষ্ট হয়।

ভগবানের মত নিকটস্থ বস্তু আর কিছুই নাই।

ভগবান্ যে আমাদের নিকট হইতে অনেক দূরে আছেন তাহা নহে। তিনি সর্ব্বদাই আমাদের কাছে। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম দ্বারা অন্তরের পাপরাশি জ্বলিয়া গেলেই তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়। এইরূপ ভাবে নাম করিতে করিতে সম্মুখে এক খানা আয়নার মত বস্তু প্রকাশ হয়, তাহাতে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, ধূলি হইতে সৌরজগৎ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়। মনুষ্যের পাপপুণ্য প্রকাশিত হয়। গ্রহ উপগ্রহ সমস্তই স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয়। বীর্য্য এই আয়নার পারাস্বরূপ।

প্রশ্ন—যাহারা ভগবানে অবিশ্বাসী, তাহাদের পরলোকে কি অবস্থা হইবে?

উত্তর—এই অবিশ্বাস অপরাধ নয়, ভ্রম মাত্র। পরলোকে ইহা সংশোধিত হয়। পরলোকে অবিশ্বাসজনিত একটা ক্লেশ হয় এবং স্বীয় কার্য্যের ফলভোগ করিতে হয়।

মন্ত্রদাতা গুরু ও আচার্য্য গুরু।

মনুসংহিতায় মন্ত্রদাতা গুরুর বিষয় বলা হয় নাই, আচার্য্য গুরু অর্থাৎ যিনি বেদ পড়ান তাঁহার বিষয় বলা হইয়াছে। বেদ, উপনিষদে আচার্য্য গুরুর বিষয় আছে। মন্ত্রদাতাগুরুর বিষয় তন্ত্র, সনৎকুমারসংহিতা, গৌতমসংহিতা, নারদপঞ্চরাত্র ইত্যাদি গ্রন্থে আছে।

বৌদ্ধশাস্ত্র যোগমূলক।

বৌদ্ধশাস্ত্র সমস্ত যোগমূলক। অথর্ব্ববেদে যোগের উপদেশ অধিক। তন্ত্র সকল তাপনিশ্রুতির অন্তর্গত। বৌদ্ধদিগের উপাসনা তন্ত্রমূলক। নির্ব্বাণ, তন্ত্রের উদ্দেশ্য। এই জন্য উহাকে বৌদ্ধশাস্ত্র বলে। যখন বৌদ্ধদিগের সহিত ব্রাহ্মণদিগের বিবাদ হয়, তখন ঐরূপ বচন পুরাণের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয়। দেবীভাগবতে আছে যে, কলিতে যে সকল ব্রাহ্মণ পতিত, তাহাদের জন্য মহাদেব তন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন।

স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই ত্রিবিধ দেহেতেই ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে।

স্থূলদেহে ক্ষুধা তৃষ্ণা হইলে তাহা স্থূলদেহে গ্রহণ করে। উত্তম পদার্থ হইলে, প্রতি গ্রাসেই তৃপ্তি, ক্ষুধানিবৃত্তি ও পুষ্টি হইয়া থাকে। সূক্ষ্মদেহের কেবল আহার্য্য বস্তু দর্শনমাত্র তৃপ্তি, ক্ষুধানিবৃত্তি ও পুষ্টি হইয়া থাকে। কারণশরীরে শরীর নিজে কিছু করিতে পারে না। কোন ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ যদি খাদ্যবস্তু দ্বারা স্বীয় জঠরাগ্নিতে হোম করেন, তদ্দারা পরলোকবাসী কারণদেহের তৃপ্তি, ক্ষুধানিবৃত্তি ও পুষ্টি হয়। এজন্য শ্রাদ্ধপাত্র, ঘৃত, পায়স ব্রাহ্মণকে দিবার প্রথা আছে।

কুলগুরু ও পৈত্রিক গুরুর পার্থক্য।

বর্ত্তমানকালে শাস্ত্রমত দীক্ষা হয় না। কারণ, শাস্ত্রে আছে যে, শিষ্য এক বৎসর গুরুকে পরীক্ষা করিবেন, গুরুও শিষ্যকে এক বৎসর পরীক্ষা করিবেন। যদি শাস্ত্রমত উভয়ে লক্ষণযুক্ত হন, তবে দীক্ষা হইবে। নতুবা অপাত্রে দীক্ষা হইলে অথবা প্রদান করিলে, তাহার ফল লাভ হয় না।

পৈত্রিক গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবে, শাস্ত্রে এরূপ কথা নাই।

শাস্ত্রে আছে কুলগুরুর নিকট দীক্ষা লইবে। কুলগুরুর অর্থ যাঁহার কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র বঙ্গদেশেই পৈত্রিক গুরু গ্রহণের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু অন্যত্র কুত্রাপি এ প্রথা নাই। যাঁহার প্রতি যাঁহার বিশ্বাস হইতেছে, তিনি তাঁহার নিকটেই দীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। তাহাতে ফল ভাল হইতেছে। সে সব দেশে কুলগুরুর (পৈত্রিক গুরুর) ভয়াবহ অত্যাচার একেবারেই নাই। পৈত্রিক গুরুতে শ্রদ্ধা হইলে অবশ্যই তাঁহার নিকট দীক্ষা গৃহীত হইবে।

প্রশ্ন—মহাপ্রভু তাঁহার নিজের ভাবাবেশের অবস্থাকে মৃগীরোগ বলিতেন কেন?

উত্তর—সাধারণে মৃগীরোগ বলিত, কিন্তু সব তাঁহার সাত্ত্বিকভাব। তিনি আপনাকে ভক্ত মনে করিতেন না, তাহা হইলে অভিমান আসিত। এখন যেমন একটু নাচিলে নিজকে ভক্ত বলিয়া অভিমান হয়, মহাপ্রভুর সময় সেরূপ ছিল না; এজন্য দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন; একটু অভিমান আসিলেও ভক্তি হয় না।

প্রশ্ন—শঙ্করাচার্য্য না কি রাধাকৃষ্ণের স্তোত্র প্রণয়ন করিয়াছেন? কোন্ প্রামাণিক গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে?

উত্তর—শঙ্করাচার্য্য তাঁহার শিষ্যদিগকে একদিন বলিলেন, 'তোমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে বল'। শিষ্যগণ বলিলেন—'আমাদের ভক্তিলাভ হয় নাই, তাহার উপায় কি বলুন।' তিনি বলিলেন—'সগুণ উপাসনা ভিন্ন ভক্তি হইবে না।' ইহার পর তিনি সরস্বতী মঠ, ঝুসী মঠ প্রভৃতি চারিটি মঠ স্থাপন করেন। সকলে একরকমের সগুণ উপাসনা ভালবাসেন না। কেহ শক্তি উপাসনা, কেহ বিষ্ণু উপাসনা, কেহ বা শিব উপাসনা ভাল বাসেন। শঙ্করাচার্য্য এই সময় নানাবিধ স্তব স্তোত্র

রচনা করেন। রাধাকৃষ্ণের স্তোত্রও এই সময় লিখেন। শঙ্কর দিগ্বিজয়ে এই সকল স্তোত্র আছে। এদেশে শঙ্করবিজয় প্রচলিত আছে। শঙ্কর-দিগ্বিজয়ের কথা অনেকে জানেন না।

শূন্যসমাধি ও তাহার অকিঞ্চিৎকরতা।

কোন প্রকার প্রাণায়ামে শরীর সুস্থ থাকে ও মনের একাগ্রতা হয়। এইরূপ একাগ্রতা অভ্যাস করিতে করিতে মন নিরোধ হইলে সমাধি হয়, ইহাকে শূন্যসমাধি বলে। এইরূপ শূন্যসমাধিতে সহস্র বৎসর থাকিলেও কোন উপকার হয় না। এ বিষয়ে যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে আছে যে, একদা বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে লইয়া বনভ্রমণে বাহির হন। নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে একটী সমাধিস্থ বালিকাকে দর্শন করিয়া রামচন্দ্র বিস্ময় প্রকাশ করেন। বালিকাটী একটী বটবৃক্ষের শিকড়ের দ্বারা এমন ভাবে জড়িত অবস্থায় ছিল যে, দেখিলে মনে হয় যেন কত কাল এই ভাবে সমাধির অবস্থায় আছে। বশিষ্ঠদেব, রামচন্দ্রকে বিস্ময় প্রকাশ করিতে দেখিয়া কি একটী প্রক্রিয়াকরতঃ তিনটী তুড়ি দিবামাত্র বালিকাটী গাত্র ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া পুরস্কার প্রার্থনাকরতঃ মস্তক অবনত করিল। রামচন্দ্র দেখিয়া অবাক্। বশিষ্ঠদেব বলিলেন যে, "এই স্থানে বহু বৎসর পূর্ব্বে একটী রাজবাড়ী ছিল। তথায় এই বালিকাটিকে সঙ্গে লইয়া কয়েকজন বাজিকর ভেল্কি দেখাইতে আসিয়াছিল। অন্যান্য প্রক্রিয়া দেখাইবার পর, এই বালিকাটী সমাধিস্থ হইয়া শূন্যে উঠিবার কৌশল দেখাইতে গিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শূন্যেই রহিয়া গেল, কিছুতেই পুনরায় ভূতলে অবতরণ করিতে পারিল না। সঙ্গের অন্য সকলে বলিল যে, এই ব্যক্তি নামিবার প্রক্রিয়া ভুলিয়া গিয়াছে। আমরাও তাহা জানিনা, আমাদের আর নামাইবার সাধ্য নাই, তবে যত দিন এ অবস্থায় থাকিবে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় উহাকে কাতর করিতে পারিবে না।"

তথাকার রাজা দয়াপরবশ হইয়া বালিকাটীর আসনের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত একটী বেদী গাঁথিয়া একটী বটবৃক্ষ রোপণ করিয়া দিয়াছিলেন। এখন সে রাজ্য নাই, রাজপুরী এখন জঙ্গলময় হইয়াছে, বটবৃক্ষটীও কত বড় হইয়াছে, কিন্তু উহার শরীর পূর্ব্বেও যেমন ছিল, এখনও ঠিক্ তদ্রূপই আছে। তবে আশ্চর্য্য এই যে, উহার মানসিক ভাব ঠিক্ পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে। তাই আমাদের নিকট পুরস্কার প্রার্থনা করিল।"

প্রক্রিয়া দ্বারা যে সমাধি লাভ হয় তাহা কিছুই নয়। অধ্যাত্মযোগে অর্থাৎ জীবাত্মায় পরমাত্মার সংযোগ হইলে যে সমাধি হয়, তাহাতেই ব্রহ্ম-লাভ হয়। ব্রহ্মকৃপা ভিন্ন এরূপ সমাধি হয় না।

প্রক্রিয়ালব্ধ অবস্থা ও ভগবৎকৃপালব্ধ অবস্থার তারতম্য।

গুরুনানক এক সময়ে সশিষ্য রামেশ্বরদেব দর্শন করিতে গিয়া সমুদ্রতীরে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় তিনটী হঠযোগী তথায় গিয়া গুরু-নানককে অভিবাদন করিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে নানকের প্রভাবের কথা অবগত ছিলেন। কিছুক্ষণ সদালাপের পর তাঁহারা নানককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামেশ্বর দর্শন করিতে বিলম্ব করিতেছেন কেন?" নানক বলিলেন, "কিরূপে এত লোকজন লইয়া সমুদ্র পার হইব ইহাই ভাবিতেছি। রামেশ্বরদেবের কখন দয়া হইবে তা তিনিই জানেন।" ইহা শুনিয়া যোগী তিনটী বলিলেন—"সে কি! আপনি এত বড় মহাত্মা, কিন্তু সমুদ্র পার হইতে পারেন না, তবে এতদিন ধরিয়া কি শিক্ষা করিয়াছেন?" এই বলিয়া তাঁহারা তিনজন কি এক প্রক্রিয়া দ্বারা শূন্যে উঠিতে উঠিতে সমুদ্র পার হইতে লাগিলেন। কিন্তু পরপারে গিয়া দেখেন, গুরুনানক সশিষ্যে তথায় উপবিষ্ট আছেন। তাহা দেখিয়া তাঁহারা অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহারাজ, আপনি কি প্রকারে এতগুলি লোকজন লইয়া, এত অল্প সময়ের মধ্যে এপারে আসিলেন?" গুরুনানক উত্তর করিলেন, "রামেশ্বরদেব কৃপা করিয়া এপারে রাখিয়া গেলেন, আমি নিজে কোন কৌশল জানিনা। ভগবানের কৃপার উপরেই নির্ভর করিয়া থাকি।" এই সকল দেখিয়া শুনিয়া যোগী তিনটী আত্মদুর্গতি বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহারা এতদিন ধর্ম্মের নামে যে সকল উৎকট পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা যে বৃথা গিয়াছে ইহা অবগত হইয়া নানকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

নারীজাতির প্রধান কর্ত্তব্য পতিসেবা।

পতির প্রতি অসদ্ব্যবহার করিলে, পতিকে সর্ব্বদা কটুবাক্য বলিলে, নারীর যন্ত্রণাদায়ক পীড়া ভোগ করিতে হয়, ইহা শাস্ত্রকর্ত্তারা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। এই রোগের একমাত্র ঔষধ পতির পদানত হওয়া এবং কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাওয়া। পতি দেবতা, তিনি অত্যন্ত দুঃখ-দরিদ্রতায় পতিত হইলেও নারীর পূজনীয়। পতিও নারীকে ভগবৎশক্তি জানিয়া সর্ব্বদা সদ্ব্যবহার করিবেন।

নিজের মতের ন্যায় অপরের মতকেও যথাযোগ্য সম্মান করিতে হইবে।

বিবেক উজ্জ্বল থাকিলে নিজের মতকে যেমন সম্মান করা যায়, অপরের মতকেও তেমনি সম্মান করা যায়। তবে ভুল ভ্রান্তি ত্রুটি এ সকল সকলের মধ্যেই থাকে, সময়ে চলিয়া যায়। কেবল নিজের মতের সহিত যাহা মিলে তাহাই উত্তম, এ অতি অনুদার মত। সত্য উদার, সঙ্কীর্ণ নহে।

সম্বন্ধ—দৈহিক ও আত্মিক।

সম্বন্ধ দুই প্রকার, দৈহিক ও আত্মিক। আত্মিক সম্বন্ধ অতি